মনোবিজ্ঞান

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা

নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮।১ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ ঃ জুন, ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ
জে. কে. সেন
নিউ সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮।১ চিন্তামণি দাস লেন ঃ কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৮১ সিমলা স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'থ্রি ইয়ার ডিগ্রি কোর্স'-এর পাঠ্যতালিকা অনুসারে এবং বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উপযোগিতার কথা মনে রেখে বর্তমান পুস্তক প্রণয়নের প্রয়াস করেছি। পাঠ্যতালিকা প্রস্তুতের সময় সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয়নি; বর্তমান পুস্তকেও এ-জাতীয় পক্ষপাতিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, এখানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্যাংশের উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস করেছি এবং সমালোচনাংশ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছি।

বিদেশী মনোবিজ্ঞানী রচিত কয়েকটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই বর্তমান পুস্তকটির রচনা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উড্ওয়ার্থ, মান্ এবং মর্গান রচিত মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের সুদক্ষ আলোচনা অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। এ-ছাড়া, পরিভাষা ও বাংলা প্রকাশভঙ্গির জন্য অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় রচিত মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক দু'টিও অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান রচনার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থে মুদ্রিত ছবিগুলির জন্য চিত্রকর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত রায়-এর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সিটি কলেজ
কলিকাতা-৯
১৫।৬।৬৪

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্নায়ুতন্ত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংবেদন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কল্পনা ও স্মৃতি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিন্তা ও বিশ্বাস

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুভূতি ও আবেগ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেষণা

নবম পরিচ্ছেদ

মনোযোগ

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিক্রিয়া-কাল

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনঃসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

১। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ (The Psychological Point of View)

'সাইকোলজি'-র (Psychology) প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় মনোবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, মনোবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত। 'সাইকি' (*psyche*) এবং 'লোগস' (*logos*)—এই দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে 'সাইকোলজি' শব্দের উৎপত্তি। 'সাইকি' মানে আত্মা, 'লোগস' মানে জ্ঞান। অতএব, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'সাইকোলজি'-র অর্থ 'আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান' বা 'আত্মতত্ত্ব'।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দীর্ঘদিন ধরে 'সাইকোলজি'-কে মূলত এই অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে: আত্মা সংক্রান্ত দার্শনিক বা তত্ত্বগত আলোচনাই মনোবিদ্যা বলে বিবেচিত হয়েছে, মনোবিদ্যা হয়ে থেকেছে দর্শনেরই অঙ্গমাত্র। কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 'সাইকোলজি' শব্দটি প্রত্যাখ্যান না করলেও তার উপরোক্ত অর্থ বর্জন করেছেন। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আত্মা বলে সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র কিছু একান্তই আছে কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কী—ইত্যাদি প্রশ্ন দার্শনিকদের পক্ষে অবান্তর না হলেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তার স্থান নেই। কেননা, মনোবিজ্ঞান আর দর্শনের অঙ্গ বলে বিবেচিত নয়—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মনোবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত করতে চান।

অবশ্যই মনোবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এক বিজ্ঞানে পরিণত করার এই প্রয়াস অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক এবং তার সার্থকতাও সম্পূর্ণ তর্কাতীত নয়। তবুও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে এই কথাটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য: মনোবিজ্ঞান আসলে একটি বিজ্ঞান, অতএব তার দৃষ্টিকোণও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ।

বিজ্ঞানকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়: জ্ঞান-নিষ্ঠ (Positive) এবং আদর্শ-নিষ্ঠ (Normative)। কোন বিষয় আসলে ঠিক কী রকম—জ্ঞান-নিষ্ঠ বিজ্ঞানে তারই সুশৃঙ্খল আলোচনা। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান। অপরপক্ষে, কোন বিষয় ঠিক কী রকম হওয়া উচিত তারই সুশৃঙ্খল আলোচনাকে বলা

হয় আদর্শ-নিষ্ঠ বিজ্ঞান। যেমন, নীতিবিজ্ঞান বা তর্কবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান জ্ঞান-নিষ্ঠ বিজ্ঞান ; আদর্শ-নিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়।

আবার জ্ঞান-নিষ্ঠ বিজ্ঞানের মধ্যে জ্যামিতি প্রভৃতি গণিতবিজ্ঞানে কয়েকটি মূলসূত্র থেকে শুরু করে অবরোহ-পদ্ধতি (Deductive Method) অনুসারে অগ্রসর হবার আয়োজন। অপরপক্ষে, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পর্যবেক্ষণ (Observation) ও পরীক্ষার (Experiment) সাহায্যে—অর্থাৎ, অভিজ্ঞতামূলকভাবে—উপাদান সংগ্রহ করে আরোহ-পদ্ধতি (Inductive Method) অনুসারে অগ্রসর হবার আয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে এই দ্বিতীয় প্রকার বিজ্ঞানেই পরিণত করতে চান। অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও গাণিতিক হিসাব প্রভৃতির স্থান আছে ; তবুও বিজ্ঞানগুলি প্রধানতই অভিজ্ঞতামূলক। তেমনি মনোবিজ্ঞান থেকেও গাণিতিক বিচার প্রভৃতি বর্জন করার প্রশ্ন না-উঠলেও মনোবিজ্ঞানকে প্রধানতই অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করতে হবে—অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানেও প্রধানত পরিদর্শন ও পরীক্ষার উপরই নির্ভর করতে হবে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণকে এই অর্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বলে গ্রহণ করলেও প্রশ্ন উঠবে, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কী হবে? মনোবিজ্ঞান নাম থেকে সহজেই মনে হয়, তার আলোচ্যবিষয় হল 'মন'। বস্তুত অনেকেই এই কথা বলে থাকেন। কিন্তু কথাটি সর্ববাদীসম্মত নয়। আসলে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বহু মৌলিক প্রশ্নেও মতভেদ আছে। যেমন, একটি সম্প্রদায়ের মত আচরণবাদ (Behaviorism) নামে খ্যাত। এই মতে, 'মন' বলে আসলে কিছুই নেই—আত্মার মতো মনও প্রাচীন দার্শনিক সংস্কারের স্মারকমাত্র ; তথাকথিত মন বা মানসিক অবস্থাগুলি দৈহিক প্রক্রিয়াবিশেষ। অন্যেরা অবশ্য এ-জাতীয় চরম মত গ্রহণ করেন না। কিন্তু মন বা মানসিক অবস্থা প্রভৃতি অস্বীকার না-করলেও তাঁরা অনেকেই মনোবিজ্ঞানকে মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে সম্মত নন। কেননা, মন কিংবা চিন্তা-চেতনা ও ভাব-আবেগ প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয় ; অতএব মনোবিজ্ঞানকে মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান বললে তা আর অভিজ্ঞতামূলক হবে না। কিন্তু মন বা মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলেও আচরণ (behaviour) অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বলছেন, এই আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। যেমন, আমরা জানি একটি মানুষের অভ্যন্তরে নানা ঘটনা ঘটে চলে ; এগুলিকে আমরা সাধারণভাবে মানসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করি। যথা : চিন্তা-চেতনা, ভাব-আবেগ ইত্যাদি। এ-জাতীয় ঘটনা সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য

অনুমানও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কখনই আমরা এগুলিকে জানতে পারিনা। প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি শুধুমাত্র তার আচরণটুকু: লোকটি যা বলছে, যা করছে, যা লিখছে ইত্যাদি। এবং এ-জাতীয় আচরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই আমরা তার আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি অনুমান করতে পারি। যে-মানুষ কথা বলতে পারেনা, লিখতে পারেনা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে পারেনা তারও অভ্যন্তরে চিন্তা-চেতনা বা ভাব-আবেগ জাতীয় ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়; কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর কাছে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকবে। কেননা শুধুমাত্র আচরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই তিনি মানুষের আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি অনুমান করতে পারেন।

এইভাবে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত হলে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হবে। মনোবিজ্ঞানী শান্ত ও নির্লিপ্তভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবেই নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রভৃতিও বোঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সে-সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এই কারণে তিনি অন্যান্য ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণের উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপণ করতে চান। অতএব, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-কথা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে; সমস্ত মানুষই ছাঁচে-ঢালা হুবহু একই রকমের নয়। কিন্তু এই পার্থক্যের দিকটিই একমাত্র সত্য হলে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে কোন সার্বিক বা সাধারণ সত্যে উপনীত হবারও সম্ভাবনা থাকেনা। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য স্বীকৃত হলেও সকলের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্যও স্বীকারযোগ্য। একই অবস্থায় সকলে মোটের উপর একইভাবে আচরণ করে, একই পরিবেশের সঙ্গে সকলে মোটের উপর একইভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে, একই সমস্যা সকলে মোটের উপর একইভাবে সমাধান করতে চায়। বস্তুত মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের মধ্যে আচরণের এ-জাতীয় মৌলিক সাদৃশ্য স্বীকৃত বলেই তিনি শুধু যে কয়েকটি সার্বিক সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস পান তাই নয়, তাঁর পক্ষে ব্যবহারিকভাবেও অন্যান্য ব্যক্তিকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। নিজেদের জীবনে বাধাবিঘ্ন ও সমস্যার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপণের প্রবণতা অনেকেরই হতে পারে; ফলে কোন ব্যক্তি কল্পনা করতে পারে যে তার মতো সমস্যার সম্মুখীণ আর কাউকেই হতে হয়নি। এ-জাতীয় কল্পনার ফলে সমস্যা-সমাধানের পরিবর্তে ব্যক্তিটি আরো হতাশই হয়ে পড়বে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী তাকে

দেখাতে পারেন, আরো বহু ব্যক্তি মোটের উপর একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং সে-সমস্যার সমাধানও করেছে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনোবিজ্ঞানী আলোচ্য ব্যক্তিটিকে বিশেষ সাহায্য করতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ অনুসারে শুধু যে পরিণত বয়সের সমস্ত মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান তাই নয়, বস্তুত সমগ্র প্রাণীজগতে আচরণের বহুবিধ সাদৃশ্য স্বীকার-যোগ্য। কেননা, উন্নততর মস্তিষ্ক প্রভৃতির অধিকারী হিসাবে উন্নততর প্রাণী হলেও মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রাণীজগতেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, প্রাণী হিসাবে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার আচরণের বহুবিধ সাদৃশ্যও বর্তমান। বস্তুত এই স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানা প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে অনেক সময় মানব-আচরণের মূলসূত্রও অনুসন্ধান করে থাকেন। তবুও মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষের আচরণ নিছক একটি প্রাণীর আচরণমাত্র নয়। কেননা, মানুষ মূলতই সামাজিক প্রাণী; তাই তার আচরণের একটি সামাজিক দিকও বর্তমান। যেমন, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষের কথা কওয়া শুধুই তার স্বরযন্ত্রের প্রক্রিয়া নয়, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে চিন্তা আদানপ্রদানের কৌশলও।

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন ব্যক্তিরই অতীতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে সম্মত নন। তাঁর দৃষ্টিতে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানব-আচরণের মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান। কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, 'কিছুদিন আগে আমি নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলাম', কিংবা, 'এখন আমি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছি, নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছি', ইত্যাদি। কিন্তু শৈশবকে সত্যিই সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়। পরিণত বয়সের মানুষ নানান নূতনদিকে নূতনভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে; কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের সূত্রপাত শৈশব থেকেই। বস্তুত, জন্ম থেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব কীভাবে বিকশিত হয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তার আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে আরো বক্তব্য এই যে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিজ্ঞানও কার্য-কারণ বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ঘটনাই অকারণে ঘটেনা, প্রতিটি ঘটনারই সুনির্দিষ্ট কারণ বর্তমান। তাই মনোবিজ্ঞানী বলেন, প্রত্যেক আচরণেরই বিশিষ্ট কারণ স্বীকার্য। অনেকে হয়ত বলেন, 'লোকটাকে এমনিই খারাপ লাগে', 'হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল', 'অকারণেই মেজাজটা খারাপ লাগছে', ইত্যাদি। যেন এ-জাতীয় মানসিক ঘটনার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী তা অস্বীকার করেন। কোন মানসিক ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে যত

তুচ্ছ, অর্থহীন বা অবান্তর মনে হোক না কেন, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তার নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য এবং অনুসন্ধানের সাহায্যে কারণটি সনাক্ত করাও সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই মনঃ-সমীক্ষণ (Psychoanalysis) নামের একটি আধুনিক সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানীরা দৈনন্দিন ভুলচুকের মত তুচ্ছ ও আপাত-অকারণ আচরণেরও সুনির্দিষ্ট কারণ আবিষ্কারের দাবি করেন।

২। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (The Subject-matter of Psychology)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, পদ্ধতি প্রভৃতি নানা মৌলিক প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। অতএব, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন সর্ববাদীসম্মত মত প্রত্যাশা করা যায় না। তবুও, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বড় অংশ মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে চান। আচরণ বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে, ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

সামনে একটা সাপ দেখলাম—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাকে একভাবে প্রভাবিত করল: প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে একপ্রকার আলোক-তরঙ্গ আমার চোখে এলো, ফলে আমার চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে একরকম পরিবর্তণ ঘটল এবং আমার অভ্যন্তরে 'দেখা' বা 'জানা' বলে এক অবস্থার সৃষ্টি হল। আভ্যন্তরীণ অবস্থাটিকে আমরা মানসিক আখ্যা দিই। কিন্তু শুধু 'জানা' বলে মানসিক অবস্থা নয়। সাপ দেখে আমি ভয় পেলাম; অর্থাৎ সাপ সংক্রান্ত জ্ঞান আমার মধ্যে আরো একরকম আভ্যন্তরীণ পরিবর্তণ ঘটালো, তাকে বলা হয় অনুভূতি। এই অনুভূতির ফলে আবার আরো একরকম আভ্যন্তরীণ পরিবর্তণ ঘটল; অর্থাৎ আমার কর্মপ্রবৃত্তি জাগলো—আমি একটা লাঠি এনে সাপটা মেরে ফেললাম। অতএব, আমার পারিপার্শ্বিক পৃথিবীতেও আমি এক ধরণের পরিবর্তন আনলাম: পারিপার্শ্বিক পৃথিবী আমাকে একভাবে প্রভাবিত করেছিল, প্রত্যুত্তরে আমিও পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে একভাবে প্রভাবিত করলাম। অনেকের মতে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলতে প্রধানত ঐ আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীই, যেগুলিকে সাধারণত মানসিক আখ্যা দেওয়া হয়। এ-জাতীয় ঘটনাবলীকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করার প্রথা আছে: চিন্তন (Thinking), অনুভূতি (Feeling) ও সংকল্প (Willing)। কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ বা মানসিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, পারিপার্শ্বিক জগৎ

আমাদের কীভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যুত্তরে আমরা পারিপার্শ্বিক জগৎকে কীভাবে প্রভাবিত করি শুধুমাত্র সেটুকুরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব। এই পারস্পরিক প্রভাবকে আচরণ বলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেই বলবেন, এই আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং এই আচরণকে অবলম্বন করেই উক্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি অনুমিত হতে পারে। যথা, উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আমার জ্ঞান, ভয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে সাপ দেখে আমি চিৎকার করেছি, দৌড়ে গিয়ে লাঠি এনে সাপটা মেরে ফেলেছি—শুধুমাত্র এ-জাতীয় আচরণগুলি সম্বন্ধেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে। তাই মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক অন্যান্য বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় একটি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে এ-জাতীয় আচরণকেই তার বিষয়বস্তু বলা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু শুধুমাত্র আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বললেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়না। কারণ, আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে মনোবিজ্ঞান ছাড়াও আরো দুটি বিজ্ঞান বর্তমান। একটি হল শরীরবিজ্ঞান (Physiology) এবং অপরটি হল সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। অতএব, মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্য এই দুটি বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা দরকার।

আমাদের সমস্ত আচরণ একাধারে শারীরিক প্রক্রিয়াও। সামনে সাপ দেখলাম—পারিপার্শ্বিক জগৎ আমাকে একভাবে প্রভাবিত করল, আমি সাপের অস্তিত্ব জানলাম। কিন্তু তার জন্য চোখ বলে শরীরের অঙ্গটির এবং স্নায়ুতন্ত্রের—বিশেষত মস্তিষ্কের—প্রক্রিয়া প্রয়োজন। শরীরের এই অঙ্গগুলির প্রক্রিয়া ছাড়া পারিপার্শ্বিক জগৎ আমাকে প্রভাবিত করতে পারতো না, আমার অভ্যন্তরে চিন্তন নামের মানসিক অবস্থা ঘটত না। তেমনি, আমরা পরে দেখবো, সাধারণত যে-আভ্যন্তরীণ ঘটনাকে ভয় নামের অনুভূতি বলা হয় তার জন্য শরীরের স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) এবং কয়েকটি গ্রন্থির (Gland) প্রক্রিয়া প্রয়োজন। চিৎকারের ক্ষেত্রে শরীরের স্বরযন্ত্র সক্রিয়; দৌড়ে যাওয়া, লাঠি আনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে শরীরের পেশীগুলি সক্রিয়। এইভাবে যে-কোন আচরণের মূলেই কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া বর্তমান। এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে কাজ করে তার আলোচনা শরীরবিজ্ঞানে। অর্থাৎ, শরীরবিজ্ঞানী দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বিচার করেন: দেখবার সময় চোখের মধ্যে কী ঘটে, কথা বলার সময় স্বরযন্ত্রে কী ঘটে, কীভাবে কাজ করে শরীরের বিভিন্ন পেশী, ইত্যাদি, এবং এই সমস্ত অঙ্গের ক্রিয়া কীভাবে স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে সুসংবদ্ধ সমগ্রতায়

পরিণত হয়,—তারই আলোচনা শরীরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। অতএব, শরীরবিজ্ঞান ছাড়া মনোবিজ্ঞান সম্ভব নয়; মনোবিজ্ঞান শরীরবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলতে যদি আচরণ বোঝায় এবং আচরণ যদি প্রধানত শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া হয় তাহলে শরীরবিজ্ঞান ছাড়াও মনোবিজ্ঞান বলে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের সুযোগ কোথায়? উত্তরে বলা হয়, আচরণ সংক্রান্ত আমরা যা জানতে চাই তা শুধুমাত্র শরীরবিজ্ঞান থেকেই জানা সম্ভব নয়। কেননা, একটি মানুষ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগফলমাত্র নয়; পক্ষান্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানুষটির এক সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাও বর্তমান। সেই ব্যক্তি-মানুষটি, উড্ওয়ার্থ (Woodworth) যেমন বলছেন, ভালবাসে বা ঘৃণা করে, সাফল্য অর্জন করে বা অকৃতকার্য হয়। তাকে সম্পাদন করতে হয় দায়িত্ব, সমাধান করতে হয় সমস্যা। আশপাশের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারে, বা হয়ত পারে না। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে এই মানুষটি এক বিচিত্র ও জটিল সম্পর্কজালে জড়িত। অবশ্যই তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এই সম্পর্কজালটি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রক্রিয়া জানলেই পুরো মানুষটির—ব্যক্তিটির—সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সে-পরিচয়ের জন্য শরীর-বিজ্ঞান ছাড়াও মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন।

আবার, কোন মানুষই পৃথিবীতে একা-একা বাঁচে না। বাঁচবার জন্য আদিম যুগ থেকেই মানুষ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, গড়েছে নানারকম সম্পর্ক। এই কারণে বলা হয়, মানুষ একান্তভাবেই সামাজিক জীব। এবং সামাজিক জীব হিসাবে তার আচরণ দলগত, ব্যক্তিগত নয়। এই দলগত আচরণই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

যেহেতু সামাজিক পরিপ্রেক্ষাবাদ দিয়ে কোন মানুষের আচরণ বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝা সম্ভব নয় সেইহেতু মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সমাজবিজ্ঞানকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যটুকুও উপেক্ষণীয় নয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি মানব-আচরণের সমাজগত দিকটির উপরই একান্তভাবে আবদ্ধ, কিন্তু মনোবিজ্ঞানী মানব-আচরণকে বোঝবার জন্য তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষাকে অগ্রাহ্য না-করলেও এই সমাজগত আচরণের উপরই একান্তভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন না—অর্থাৎ, তার আচরণের ব্যক্তিগত দিকটির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন।

অতএব, সংক্ষেপে, আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে প্রধানত তিনটি:

শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। শরীরবিজ্ঞানে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রক্রিয়া আলোচিত হয়, সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের সমাজগত বা সমষ্টিগত আচরণ। মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে একদিকে তা দৈহিক প্রক্রিয়াবলীকেও অগ্রাহ্য করেনা, আবার অপরদিকে সামাজিক পটভূমি বাদ দিয়েও মানব-আচরণের ব্যাখ্যা খোঁজে না; কিন্তু এইভাবে শরীরবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেও মনোবিজ্ঞানী তাঁর বিশিষ্ট বিষয়বস্তু হিসেবে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরো মানুষটির বা ব্যক্তিটির আচরণ বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

আচরণ-সংক্রান্ত এই তিনটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে উড্‌ওয়ার্থ একই দেশের তিন রকম মানচিত্র রচনার উপমা ব্যবহার করেছেন। কোন মানচিত্রে দেশটির বিভিন্ন গ্রাম ও নগরকে খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার আয়োজন,—যেমন শরীর-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে বিচার করা হয়। কোন মানচিত্রে আবার দেশটির স্থান মূলতই এক মহাদেশের অংশ হিসেবে,—যেমন সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের দিক উপেক্ষা করে সমাজগত আচরণের উপরই ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণ করা হয়। এ-ছাড়াও দেশটির একটি মাঝারি ধরণের মানচিত্র রচনা করা যায়—যে-মানচিত্রে দেশটির গ্রাম ও নগরকে খুঁটিয়ে বর্ণনা করবারও আয়োজন নেই, আবার দেশটিকে শুধুমাত্র এক মহাদেশের অংশ হিসেবেও দেখাবার প্রয়াস নয়। মনোবিজ্ঞানে যেন মানব-আচরণের এই জাতীয় একটি মাঝারি ধরণের মানচিত্র রচনার প্রয়াস করা হয়। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানব-আচরণ শুধুমাত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া নয়, তার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিটির আচরণই তিনি বিচার করেন; এই ব্যক্তি অবশ্যই সামাজিক জীব, কিন্তু তবুও মনোবিজ্ঞানী তার আচরণের ব্যক্তিগত দিক উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সমাজগত বা দলগত আচরণের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন না।

৩। আচরণের ব্যাখ্যাসূত্র। ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিক জগৎ

পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ বলা হয়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায় তা বিচার করা যাক।

মানুষ অবশ্যই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপযুক্ত নাহলে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করাই সম্ভব নয়। যেমন অসহ্য শীতে বা অসহ্য গরমে আমরা বাঁচতে পারিনা; পারিপার্শ্বিক পৃথিবী থেকে খাদ্য ও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক

জগতের উপর নির্ভরশীল হলেও মানুষ নিষ্ক্রিয় নয়; পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে সে প্রতিরোধও করে এবং প্রয়োজন মতো পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্তনও করে। অর্থাৎ, একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক জগৎ মানুষের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে, অপরদিকে তেমনি মানুষ নিজেও পারিপার্শ্বিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই পারিপার্শ্বিক জগৎকে পরিবর্তিতও করে। পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক জগৎ আবার তার উপর নূতনভাবে প্রভাব বিস্তার করে; ফলে মানুষও আবার নূতনভাবে পারিপার্শ্বিক জগৎকে প্রভাবিত করে। এইভাবে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের আদানপ্রদান চলে।

উড্‌ওয়ার্থ সাংকেতিক সূত্রের সাহায্যে এই আদানপ্রদানের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। পারিপার্শ্বিক জগৎ বা World অর্থে W অক্ষর ব্যবহার করে এবং দেহ-ধারী জীব হিসেবে মানুষ বা Organism অর্থে O অক্ষর ব্যবহার করে বলা যায়

$$W \rightarrow O \rightarrow W$$

এই সাংকেতিক সূত্রের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের সক্রিয় আদানপ্রদানের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতে পারে। $W \rightarrow O$: অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক জগৎ সক্রিয়ভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে। আবার $O \rightarrow W$: অর্থাৎ, মানুষও সক্রিয়-ভাবে পারিপার্শ্বিক জগৎকে প্রভাবিত করে। এইভাবে, $W \rightarrow O \rightarrow W \rightarrow O \rightarrow W \cdots$ …. অবিরাম পারস্পরিক প্রভাব ঘটে চলেছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

রাত্রে ঘরে শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল; অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক জগৎ সক্রিয়ভাবে আমাকে প্রভাবিত করল। একে বলব: $W \rightarrow O$। ফলে, উঠে পড়ে আমি আলো জ্বালালাম—অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক জগৎকে আমি প্রভাবিত করলাম। একে বলব: $O \rightarrow W$। আলো জ্বলতে দেখলাম, ঘরে চোর ঢুকেছে; পারিপার্শ্বিক জগৎ আবার সক্রিয়ভাবে আমাকে প্রভাবিত করল। একে বলব: $W \rightarrow O$। চোর দেখে আমি চিৎকার করে সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম—অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক জগতে নতুন করে পরিবর্তন আনলাম। একে বলব: $O \rightarrow W$; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইভাবে পরপর ঘটনাবলী বিচার করে গেলে দেখা যাবে একদিকে আমার উপর পারিপার্শ্বিক জগতের প্রভাব বা $W \rightarrow O$ এবং অপরদিকে পারিপার্শ্বিক জগতের উপর আমার প্রভাব বা $O \rightarrow W$।

গ্রাহক ও কারক (Receptor and Effector): কিন্তু বহির্জগৎ বা পারিপার্শ্বিক পৃথিবী ব্যক্তির উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিই বা কীভাবে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে? কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। চোখে দেখলাম মেঘ জমেছে, কানে শুনলাম মেঘ ডাকছে; ইত্যাদি,

ইত্যাদি। বহির্জগৎ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল। অর্থাৎ, W→O। কিন্তু কী করে করল? পদার্থবিজ্ঞানে জেনেছি, কোন বস্তু থেকে আলোক-তরঙ্গ আমার চোখে এলে বস্তুটি দেখতে পাই; শব্দ-তরঙ্গ কানে এলে শুনতে পাই। আমার দেহে কয়েকটি অঙ্গ আছে যেগুলি এইভাবে বহির্জগৎ থেকে-আসা প্রভাব গ্রহণ করে। এগুলিকে বলে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় (Receptors বা Sense Organs)। যথা: চোখ দিয়ে আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করি, কান দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করি, ত্বক বা চামড়া দিয়ে পারিপার্শ্বিকের তাপ ইত্যাদি গ্রহণ করি, নাক ও জিভ দিয়ে গ্রহণ করি নানারকম রাসায়নিক প্রভাব। অর্থাৎ, এই গ্রাহক বা Receptor-গুলির মধ্যস্থতাতেই পারিপার্শ্বিক জগৎ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার, আমাদের দেহে কয়েকটি অঙ্গ আছে যার সাহায্যে আমরা পারিপার্শ্বিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করি। এগুলিকে বলা হয় কারক বা Effector। কারক বলতে প্রধানতই নানাপ্রকার পেশী: হাত-পা পরিচালনা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া শরীরের পেশীর সাহায্যে সম্পাদিত হয় এবং এ-জাতীয় ক্রিয়ার ফলেই আমরা পারিপার্শ্বিক জগতে পরিবর্তন আনতে পারি। কারক বা Effector হিসাবে অবশ্য শরীরের পেশী ছাড়াও নানা গ্রন্থি বা Gland আছে।

উদ্দীপক ও প্রতিবেদন (Stimulus and Response) : বহির্জগৎ থেকে আমাদের উপর যে-প্রভাব এসে গ্রাহক বা Receptor-গুলিকে উদ্দীপিত করে সেগুলিকে বলা হয় উদ্দীপক (Stimulus)। চোখে আলো আসে, কানে শব্দ আসে,—এই আলো, শব্দ প্রভৃতিকে বলা হয় উদ্দীপক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ উদ্দীপকের উৎস বহির্জগৎ হলেও আমাদের শরীরের অভ্যন্তর থেকেও নানান উদ্দীপকের উদ্ভব হতে পারে। যেমন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধের সময় উদ্দীপক বাইরে থেকে আসে না, শরীরের অভ্যন্তর থেকেই তা পাওয়া যায়। উদ্দীপক পেলে আমরা যেন নানাভাবে সেগুলির প্রতি সাড়া দিই; অর্থাৎ, উদ্দীপকগুলি পাবার ফলে আমরা নানাভাবে সক্রিয় হই। এই সাড়া বা সক্রিয়তাকে বলা হয় প্রতিবেদন (Response)—অর্থাৎ, উদ্দীপক হল কারণ, প্রতিবেদন কার্য।

অধিকাংশ প্রতিবেদনের মূলেই অবশ্য শরীরের কোন-না-কোন কারক বা Effector ক্রিয়াশীল। সাপ দেখে লাঠি তুলে নিলাম—হাতের পেশীগুলির ক্রিয়া ঘটল। খাবার দেখে মুখে লালা এলো—চোয়ালের কাছের কয়েকটি গ্রন্থি (যার নাম Salivary Glands) সক্রিয় হল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের ফলে আমাদের যে-কোন সক্রিয়তাকে মনোবিজ্ঞানে প্রতিবেদন বলা হয়। কানে শব্দ এলো, শব্দ শুনলাম—'শোনা'-র জন্য কান ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তা দরকার।

শব্দটিকে মেঘের ডাক বলে চিনতে পারলাম, একে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা বা Recognition এবং মনোবিজ্ঞানে এই জাতীয় ক্রিয়াও প্রতিবেদন বলে স্বীকৃত। অতএব, অধিকাংশ প্রতিবেদনের জন্য পেশী প্রভৃতি কারকের সক্রিয়তা প্রয়োজন হলেও সমস্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তা নয়।

তাহলে, সংক্ষেপে, উদ্দীপকের ফলে প্রতিবেদন, বা, প্রতিবেদনের কারণ হল উদ্দীপক। উদ্দীপক (Stimulus) বোঝাবার জন্য S অক্ষর ব্যবহার করে এবং প্রতিবেদন (Response) বোঝাবার জন্য R অক্ষর ব্যবহার করে সাংকেতিক সূত্র হিসাবে বলা যায় :

$$S \rightarrow R.$$

কিন্তু এই সাংকেতিক সূত্রটিকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে মনে করা যায়না যে উদ্দীপক জানা থাকলেই হিসাব করে প্রতিবেদন নির্ণয় করা সম্ভব বা প্রতিবেদন থেকে হিসাব করে উদ্দীপক নির্ণয় করা যায়। কেননা, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে : একই উদ্দীপক সকলের মধ্যে হুবহু একইভাবে প্রতিবেদন জাগায় না। যেমন, সাপ দেখার ফলে আমার ও সাপুড়ের হুবহু একই প্রতিবেদন হবে না। আবার, বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির মধ্যে একই উদ্দীপক বিভিন্ন প্রতিবেদন জাগাতে পারে। যেমন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আহারের আমন্ত্রণ যে-প্রতিবেদন জাগায় ক্লান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় তা জাগায় না। তাই উপরের সাংকেতিক সূত্রটিকে সংশোধন করে বলা উচিত :

$$S \rightarrow O \rightarrow R.$$

অর্থাৎ, উদ্দীপক ও প্রতিবেদনের মাঝে দেহধারী জীব বা Organism হিসাবে ব্যক্তিটির বৈশিষ্ট্যও মনে রাখা প্রয়োজন : এই ব্যক্তির উপরই উদ্দীপক সক্রিয় হয় এবং তার ফলে ব্যক্তিটির বিশিষ্ট প্রতিবেদন জাগে। অর্থাৎ, প্রতিবেদন নির্ভর করে 'উদ্দীপক-এবং-ব্যক্তির' উপর ; ব্যক্তি বাদ দিয়ে নিছক উদ্দীপকের উপর নয়।

আরো মনে রাখা দরকার, উদ্দীপক পেয়ে ব্যক্তির যে-প্রতিবেদন জাগবে তার জন্য প্রায়ই ব্যক্তির অভ্যন্তরে একরকম পূর্বপ্রস্তুতি বর্তমান থাকে। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু করার আগেই ব্যক্তিটি কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এই পূর্বপ্রস্তুতিটিকে বলা হয় Set। যেমন, ফুটবল খেলার মাঠে রেফারী বাঁশী বাজালেই খেলোয়াড় বল মারবে। বাঁশীর শব্দ হল উদ্দীপক ; বল মারা প্রতিবেদন। কিন্তু এই প্রতিবেদনের জন্য খেলোয়াড় আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকছে। তার এই প্রস্তুতি বা Set বাদ দিলে উদ্দীপক ও প্রতিবেদন সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না।

অতএব, উদ্দীপক, প্রতিবেদন, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও পূর্বপ্রস্তুতি এই সমস্ত বিষয়

মনে রাখলে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তির আদানপ্রদান বা তার আচরণ বোঝাবার জন্য পূর্ণাঙ্গ সাংকেতিক সূত্র হিসাবে বলা যায় :

$$W\rightarrow S\rightarrow O_w\rightarrow R\rightarrow W.$$

প্রথমত, উদ্দীপক আসে (প্রধানত) বহির্জগৎ থেকে ; বহির্জগতই উদ্দীপকের উৎস। অতএব, $W\rightarrow S$। W অক্ষর দিয়ে জগৎ (World) এবং S অক্ষর দিয়ে উদ্দীপক (Stimulus) বোঝানো হয়েছে। এই উদ্দীপক দেহবিশিষ্ট জীব বা Organism হিসাবে ব্যক্তির উপর সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই একরকম পূর্বপ্রস্তুতি বর্তমান থাকে। O অক্ষর দিয়ে ব্যক্তি এবং w অক্ষর দিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি—অর্থাৎ, O_w অক্ষর দিয়ে পূর্বপ্রস্তুতিবিশিষ্ট ব্যক্তি—বোঝানো হয়েছে। এই ব্যক্তির মধ্যে জাগে প্রতিবেদন। অতএব, $O_w\rightarrow R$। R অক্ষর দিয়ে প্রতিবেদন (Response) বোঝানো হয়েছে। এবং প্রতিবেদনের ফলে বহির্জগতে কোন পরিবর্তন ঘটে। অতএব, $R\rightarrow W$। তাই উপরের $W\rightarrow S\rightarrow O_w\rightarrow R\rightarrow W$ সংকেত-সূত্রের সাহায্যে আচরণ বা বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির আদানপ্রদান সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়।

৪। মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত (Data) ও পদ্ধতি (Method) : অন্তর্দর্শন (Introspection) ও পরিদর্শন (Inspection)

প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা। যে-তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে বলা হয় উপাত্ত (Data)। স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত বলতে কী বোঝায়? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান ; অতএব মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত হল আচরণ সংক্রান্ত উপাত্ত। আচরণকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, তার প্রধানত তিনটি দিক আছে : (১) বহির্জগৎ থেকে পাওয়া কোন উদ্দীপক (Stimulus), (২) সেই উদ্দীপকের ফলে দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন, (৩) এই দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতে পরিবর্তন। **অতএব, মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত বলতে এই তিনটি দিক সংক্রান্ত তথ্যই। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানী তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ত্রিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। (১) বহির্জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপক সংক্রান্ত তথ্য, (২) উদ্দীপক লাভের ফলে দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে ব্যক্তিটির অভ্যন্তরে যে-পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তন**

সংক্রান্ত তথ্য, এবং (৩) ব্যক্তিটির ক্রিয়া ও তার ফলে বহির্জগতে যে-পরিবর্তন ঘটে সে-সংক্রান্ত তথ্যও।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞানী এ-জাতীয় তথ্য বা উপাত্ত আহরণ করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। একটি মতে, মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি বলতে মূলতই অন্তর্দর্শন (Introspection)। অপর মতে, এই পদ্ধতি বলতে মূলতই পরিদর্শন (Inspection)।

যাঁরা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির পক্ষপাতী তাঁরা অবশ্য একথা স্বীকার করেননা যে আচরণই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্তু। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল মন বা মানসিক অবস্থা। এবং মন বা মানসিক অবস্থাকে জানবার একমাত্র উপায় হল নিজের মনের প্রতি মনোনিবেশ করা, মনকে অন্তর্মুখী করে নিজের মানসিক অবস্থাবলী সংক্রান্ত সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা। যথা, একটি মানসিক অবস্থাকে বলা হয় 'ভয়'। এই ভয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবার একমাত্র উপায় হল আমি যখন নিজে ভয় পাই তখন আমার অভ্যন্তরে ঠিক কী ঘটে তা অনুভব করা। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, নিজের মনের সাহায্যে নিজের মন ও মানসিক অবস্থাকে স্পষ্টভাবে অনুভব করা, জানা, বোঝা। স্বভাবতই অন্তর্দর্শনকে নিজের ভাব-আবেগ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকা বা অহেতুক মাথা ঘামানো বা কল্পনাবিলাস বলে মনে করলে ভুল করা হবে। অন্তর্দর্শনের সমর্থকেরা অন্তর্দর্শনকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবেই গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে মনোবিজ্ঞানী যথাসম্ভব নৈর্বক্তিক বা অনাসক্ত ভাবেই নিজের আভ্যন্তরীণ বা মানসিক অবস্থাকে সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আয়োজন করবেন এবং এ-জাতীয় আয়োজন ছাড়া মনোবিজ্ঞান সম্ভবই নয়। কেননা, মন বা মানসিক অবস্থাকে জানবার আর কোন উপায় নেই—অন্যের মনে কী ঘটছে না-ঘটছে তা আমি কখনই সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারিনা; যদি জানতে চাই তাহলে ঐ অন্য ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করে তার মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তারই অনুভূতির উপর আমাকে নির্ভর করতে হবে —অর্থাৎ, নির্ভর করতে হবে তার অন্তর্দর্শনের উপরই। অতএব, সংক্ষেপে, মনোবিজ্ঞানকে যদি মন ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে নিজের মন ও নিজের মানসিক অবস্থাকে নিজেনিজে অনুভব করা বা সাক্ষাৎভাবে জানা ছাড়া মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহের আর কোন পদ্ধতি হতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি তোলেন। এবং মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য অভিজ্ঞতামূলক একটি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে শুধুমাত্র অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর নির্ভর করা অসম্ভব। কেননা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সার্বিক সত্যে উপনীত হওয়া; অপরপক্ষে, ব্যক্তিবিশেষ যদি অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাস্তবিকই সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেন তাহলেও তাঁর জ্ঞানটুকু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকই হয়ে থাকবে—সেই জানার ভিত্তিতে কোন সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবেনা। তাছাড়া, যাঁরা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরোধী তাঁরা বলেন প্রকৃতপক্ষে এইভাবে এমনকি নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবলীরও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, পদ্ধতি হিসাবেই অন্তর্দর্শন অসম্ভব, বা অন্তত গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ। অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধানতম আপত্তি হল :

(১) অন্তর্দর্শন অসম্ভব, কেননা যখনই আমি আমার কোন মানসিক অবস্থাকে সাক্ষাৎ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জানবার চেষ্টা করি তখনই আমার উক্ত মানসিক অবস্থাটি অন্তর্হিত হতে বাধ্য। ধরা যাক, রাগ বা উত্তেজনা জাতীয় মানসিক অবস্থা। আমি যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমার নিজের এই জাতীয় মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ পরিচয় পেতে চাই তাহলে আমাকে নির্লিপ্ত ও নৈর্বক্তিক হতে হবে—অর্থাৎ, তখনই আমাকে ধীর, স্থির ও শান্তভাব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ধীর-স্থির ভাব গ্রহণ করা মানেই রাগ বা উত্তেজনা জাতীয় আমার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অন্তর্হিত হওয়া। তেমনি, ভীত অবস্থাতেই কেউ যদি ভয় বলে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে জানতে চান তাহলে তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত—অর্থাৎ, নির্লিপ্ত ও নৈর্বক্তিক—হবে না; অপরপক্ষে, নিজে নির্লিপ্ত ও নৈর্বক্তিক ভাব অবলম্বন করে ভয় বলে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উপলব্ধি করতে গেলে সেই মানসিক অবস্থা প্রশমিত হবে বা অন্তর্হিত হবে। অতএব, নিজের মানসিক অবস্থাকে নিজে-নিজে জানা অন্তত বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়।

(২) তাহলে, অন্তর্দর্শনের সমর্থকেরা যাকে অন্তর্দর্শন বলেন তা বড় জোর 'অতীতদর্শন' বা Retrospection মাত্র। অর্থাৎ, নিজের মনের সাহায্যে নিজের মানসিক অবস্থাকে কখনই সরাসরি অনুভব করা যায় না; তার বদলে বড় জোর অনুভব করা যায় নিজের অতীত মানসিক অবস্থার স্মৃতিবিশেষই। যথা, উত্তেজনা বলে আভ্যন্তরীণ অবস্থাটি ঠিক কী তা উত্তেজিত অবস্থাতেই সম্যকভাবে জানা সম্ভব নয়; বড় জোর উত্তেজনা প্রশমিত হলে উত্তেজিত অবস্থায় আমাদের

অভ্যন্তরে ঠিক কী ঘটেছিল তা ভেবে দেখতে পারি। অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ অবস্থা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না ; তার পরিবর্তে বড় জোর অতীতমুখী হওয়া—অর্থাৎ, অতীত আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্মৃতি বিচার করা—যেতে পারে। অতএব, অন্তর্দর্শনের পরিবর্তে বড জোর অতীতদর্শন (Retrospection) সম্ভব।

(৩) কিন্তু এ-জাতীয় সম্ভাবনার বিরুদ্ধেও একটি দার্শনিক আপত্তি উঠে। অন্তর্দর্শন অনুসারে একই মন একাধারে জ্ঞাতা (Knower) ও জ্ঞেয় (Known বা Object) ; কিন্তু তা সম্ভব নয়। চোখ যেমন সমস্ত বস্তু দেখে কিন্তু নিজেকে দেখতে পারে না তেমনি জ্ঞাতাও সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয় কিন্তু নিজেকে জ্ঞানের বিষয় হিসাবে জানতে পারে না।

(৪) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে আরো একটি আপত্তি এই যে আমাদের জানার স্বাভাবিক প্রবণতা বহির্বিষয়ের প্রতি, আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি নয়। যেমন, কোন একটি চিত্তাকর্ষক খেলা দেখার সময় স্বভাবতই আমরা খেলার প্রতি আকৃষ্ট হই, কিন্তু খেলা দেখতে দেখতে আমাদের অভ্যন্তরে যে-অবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টি হয় সেগুলিকে নির্লিপ্তভাবে বিচার করার প্রবণতা থাকে না।

অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্দর্শন পদ্ধতিটি পরিহার করে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে পরিদর্শনের (Inspection) উপর নির্ভর করতে চান। এই পরিদর্শনকে অনেক সময় বহির্দর্শন (Extrospection) বা বিষয়গত পদ্ধতি (Objective Method) বলা হয়। এই পদ্ধতির মূল কথা হল, অপরের আচরণাবলী পর্যবেক্ষণ করা। যথা, সাপ দেখে ভয় পাওয়া বলে আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে জানবার জন্য আমরা নিজেদের ভীত অবস্থাকে সাক্ষাৎভাবে জানবার চেষ্টা না করে সাপ দেখে অপরাপর ব্যক্তি কীভাবে আচরণ করে—চিৎকার করে, দৌড়োয়, পাংশুবর্ণ ধারণ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—তা পরিদর্শন করে মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত আহরণের প্রয়াস করব। আচরণাবলী পরিদর্শন বলতে অবশ্যই শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবভঙ্গি বা কার্যকলাপ পরিদর্শন করা নয় ; সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমেও যেহেতু আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ সেইহেতু পরিদর্শন পদ্ধতি অনুসারে এ-জাতীয় কীর্তিকলাপ বিচার করেও মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাত্ত আহরণ করা যায়।

আরো কথা আছে। অন্তর্দর্শন যদিই বা সম্ভব হয় তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে তার উপর নির্ভর করার প্রশ্নই উঠে না ; অর্থাৎ পরিদর্শন ছাড়া সে-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। যেমন শিশু, বিকারগ্রস্ত মানব বা মানবেতর প্রাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানবার পক্ষে অন্তর্দর্শন স্পষ্টতই অসম্ভব ;

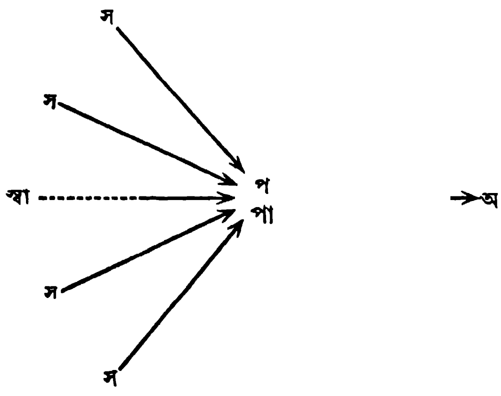
অথচ, শিশু প্রভৃতির আচরণ পরিদর্শন করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বহু মূল্যবান তথ্য সঞ্চিত হয়েছে। আবার, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষ সমাজ-নিরপেক্ষ নয়; সমাজবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে মনোবিজ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু মানুষের সমাজগত আচরণকে জানবার একমাত্র উপায় পরিদর্শন : সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, কাহিনী প্রভৃতিকে বিচার করা। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই কেন মনোবিজ্ঞানকে আর মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান না বলে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে চান এবং মনোবিজ্ঞান যদি আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলেই স্বীকৃত হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি বলতে মূলতই পরিদর্শন হতে বাধ্য; আচরণকে অন্তর্দর্শন করবার প্রশ্ন উঠে না, আচরণ সংক্রান্ত তথ্য আহরণের একমাত্র উপায় পরিদর্শনই। কিন্তু তাই বলে অনেকে যেমন অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধুমাত্র পরিদর্শনের উপর নির্ভর করার প্রস্তাব করেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, কোন কোন সময় অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর করেই পরিদৃষ্ট আচরণের ব্যাখ্যা অন্বেষণ করতে হয়। তাই অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার না-করেও বলা যায়, মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে প্রধানত পরিদর্শনের উপর নির্ভরতাই বাঞ্ছনীয়।

৫। মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method in Psychology)

স্বাভাবিক অবস্থায় বা প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-ঘটনা ঘটে তা পরিদর্শন করাকে অনেক সময় শুধু পর্যবেক্ষণ (Simple Observation) বলা হয়। এ-জাতীয় পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে অনেক সময় সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সুনিশ্চিত জ্ঞানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। অতএব, বিজ্ঞানীরা তাঁদের পর্যবেক্ষণকে আরো বেশী নির্ভরযোগ্য করবার উদ্দেশ্যে একপ্রকার কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করেন; এই পরিবেশ তাঁদের আয়ত্তাধীন; এ-জাতীয় আয়ত্তাধীন পরিবেশে কোন ঘটনা ঘটিয়ে সুনিপুণভাবে ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষা (Experiment)। স্বভাবতই পরীক্ষামূলক জ্ঞান অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য; এই কারণে বিজ্ঞানীরা সম্ভব হলে পরীক্ষার উপরই নির্ভর করার পক্ষপাতী। পরীক্ষার সময় পরিবেশটি বিজ্ঞানীর আয়ত্তাধীন বলেই তিনি প্রয়োজন মতো পারিপার্শিক অবস্থাকে নানা ভাবে পরিবর্তন করে দেখতে পারেন তার ফলে আলোচ্য ঘটনাটিতে ঠিক কোন ধরণের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এইভাবে অগ্রসর হয় তিনি নির্ভুল কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান।

মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে নোবিজ্ঞানীর পক্ষেও পরীক্ষার উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রয়োজন-াধেই মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রচলনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ার আচরণ পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে তাকে বলা হয় পরীক্ষা-পাত্র Subject)। আয়ত্তাধীন—অতএব সুস্পষ্টভাবে জানা—কয়েকটি অবস্থায় পরীক্ষা-াত্রের আচরণ কী ভাবে ঘটে মনোবিজ্ঞানী সুনিপুণভাবে তাইই দেখতে চান। ়ই উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি পরিবেশ রচনা করেন যে-পরিবেশে আলোচ্য াচরণের উপর প্রভাব থাকতে পারে এ-জাতীয় সমস্ত সর্তই মনোবিজ্ঞানীর ায়ত্তে থাকে। এই সর্তগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবগুলিকে হুবহু একই াবে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র ঐ একটি সর্তকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে াওয়া হয়। যে-সর্তটিকে এইভাবে পরিবর্তন করে যাওয়া হয় তাকে বলে 'স্বাধীন রিবর্তনশীল' (Independent Variable) সর্ত। মনোবিজ্ঞানী দেখেন, এইভাবে াকি সর্তগুলি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র 'স্বাধীন পরিবর্তনশীল' সর্তটিকে রিবর্তন করার ফলে পরীক্ষা-পাত্রের প্রতিক্রিয়ায় কী পরিবর্তন দেখা দেয়। ্রতিক্রিয়ার এ-জাতীয় পরিবর্তনকে বলা হয় 'অধীন পরিবর্তনশীল' (Dependent Variable) প্রতিক্রিয়া। এইভাবে পরীক্ষক 'স্বাধীন পরিবর্তনশীল' সর্ত এবং অধীন পরিবর্তনশীল' প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভরযোগ্য কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ্রয়াস করেন। যথা :—

এই ছবিতে মনোবিজ্ঞানে ারীক্ষামূলক পদ্ধতির ্রয়োগ দেখান হয়েছে। া দিকে পরীক্ষকের আয়ত্তাধীন সর্তগুলি নির্দিষ্ট য়েছে— পরীক্ষা-পাত্রের আলোচ্য আচরণের উপর গুলির প্রভাব থাকা সম্ভব। ার মধ্যে চারটি সর্ত সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে—



গুলিকে 'স' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; মাত্র একটি সর্ত পরিবর্তনশীল—'স্বাধীন রিবর্তনশীল' সর্ত হিসাবে সেটি 'স্ব' বলে উল্লিখিত। এই সর্তটি সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে গেলে পরীক্ষা-পাত্রের প্রতিক্রিয়ায় যে-পরিবর্তন দেখা দেয় 'অধীন

পরিবর্তনশীল' প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছবির ডান দিকে তা 'অ' হিসাবে উল্লিখিত। আলোচ্য পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানী 'স্বা' ও 'অ'-র মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবেন।

আগেই দেখেছি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের পক্ষে শুধু পর্যবেক্ষণের তুলনায় পরীক্ষা অবশ্যই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এই কারণে যেখানে পরীক্ষা সম্ভব সেখানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার উপরই নির্ভর করতে চান। তাই আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত—এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই মনোবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভ করতে পারবে, সম্ভব হবে মনোবিজ্ঞানে বিতর্কাতীত বা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কিন্তু মনে রাখা দরকার, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ যত সহজ মনোবিজ্ঞানে তা নয়। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ-প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে ; পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে সে-জাতীয় সমস্যা নেই। কেননা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে জড় বা অচেতন বস্তু নিয়ে আলোচনা ; অপরপক্ষে মনোবিজ্ঞানের বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়ই হল ভাবাবেগ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থাপন্ন চেতন ব্যক্তি। তাই পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পরীক্ষার সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা যত সহজে এবং যত সুনিপুণভাবে আয়ত্তে রাখা যায় মনোবিজ্ঞানে তা সম্ভব নয়।

সমস্যাটি বিচার করা যাক। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পারিপার্শ্বিক সর্ত ছাড়াও পরীক্ষা-পাত্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এক রকমের সর্ত এবং এই সর্ত পরীক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকে না। অতএব সমস্যা হল, পরীক্ষক কী করে পরীক্ষা-পাত্রর আভ্যন্তরীণ সর্তগুলিকে আয়ত্ত করবেন? যথা, পরীক্ষার সম্ভাবনায় পরীক্ষা-পাত্র যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে তাহলে এই উত্তেজনাবশত তার আচরণে পরিবর্তন ঘটবে, অতএব পরীক্ষার ফলে বিশুদ্ধভাবে 'অধীন পরিবর্তনশীল' প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হবে না —অর্থাৎ, 'স্বাধীন পরিবর্তনশীল' সর্তের প্রভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবে পরীক্ষা-পাত্রের আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা প্রভৃতির প্রভাবও। দ্বিতীয়ত, সমস্ত ব্যক্তিই ছাঁচে ঢালা হুবহু একই রকমের নয়। অতএব, একই পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এ-জাতীয় পার্থক্যের ফলে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়—পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে সে-জাতীয় সমস্যা নেই।

সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে মনোবিজ্ঞানী প্রধানত দু'রকম প্রচেষ্টা করে থাকেন। প্রথমত, পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষা-পাত্রকে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ দেবার সময়ই তিনি

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন, যাতে পরীক্ষা-পাত্র পরীক্ষার সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে না-ওঠে বা তার অভ্যন্তরে কোন রকম অবাঞ্ছিত ভাবাবেগ দেখা না-দেয়। পরীক্ষকের এ-জাতীয় নির্দেশের উপর পরীক্ষার সাফল্যকে বহুলাংশে নির্ভর করতে দেখা গিয়েছে। তাছাড়া দেখা যায়, একই পরীক্ষা-পাত্রের উপর কিছু-দিন ধরে পরীক্ষা চালাবার পর তার মধ্যে অবাঞ্ছিত আভ্যন্তরীণ অবস্থা উদয়ের সম্ভাবনা বহুলাংশেই প্রশমিত হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের স্বার্থকতা অনেক বেশি নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার উপর। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বলতে, নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা শুধু যে একই পরীক্ষা-পাত্র নিয়ে বারবার একই পরীক্ষা করেন তাইই নয়, বহু ব্যক্তিকে পরীক্ষা-পাত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের সকলের আচরণ একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিদর্শন করতে চান। এইভাবে, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের বিশেষ অসুবিধাগুলি অনেকাংশে দূর হয়—অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিব সমস্যার বহুলাংশেই সমাধান সম্ভব হয়।

৬। জনি-পদ্ধতি (Genetic Method)

মনোবিজ্ঞানীর একটি প্রচেষ্টা হল, জন্ম থেকে—বা এমনকি জন্ম-পূর্ব ভ্রূণাবস্থা থেকে—পরিণত বয়স পর্যন্ত ব্যক্তির আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ করা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কিসের দ্বারা এবং কী ভাবে এই বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়? যে-পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এই সমস্যার সমাধান খোঁজেন তাকে বলে জনি-পদ্ধতি Genetic Method) বা বিকাশমূলক পদ্ধতি (Developmental Method)। এবং উপরোক্ত সমস্যার সমাধান অন্বেষণে মনোবিজ্ঞানীকে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়: ব্যক্তির বিকাশেব মূলে বংশ-প্রভাব (Heredity) কতখানি দায়ী? কতখানি দায়ী বাহ্য-পরিবেশ (Environment)? কোন্ অবস্থা স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল? আবার কোন্ অবস্থা স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিকূল—অর্থাৎ, কোন্ অবস্থায় প্রতিপালিত হলে অপরাধ-পরায়ণতা, মনোবিকার প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়? মনোবিজ্ঞানী নানা প্রকার অভীক্ষা (Test) এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে অবশ্যই নির্ভরযোগ্যভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারেন কোন্ বয়সে বা কোন্ পর্যায়ে কী রকম বিশিষ্ট আচরণের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই জনি-পদ্ধতিকে সুনিশ্চিত বা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করার নানা বাধা আছে। কেননা, জন্ম থেকে মানবশিশুর আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য শিশুকে এমন অবস্থায়

প্রতিপালন করে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যে-অবস্থা মনোবিজ্ঞানীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। এমনকি, কোন্ অবস্থায় শিশু প্রতিপালিত হলে তার মধ্যে অপরাধ-পরায়ণতা, মনোবিকার প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণ পরিস্ফুট হয় তা পরীক্ষামূলক ভাবে দেখবার জন্য মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে বিভিন্ন শিশুকে এ-জাতীয় প্রতিকূল অবস্থায় প্রতিপালন করে দেখাও দরকার। স্বভাবতই, মানবশিশু নিয়ে এ-রকম কোন পরীক্ষা সম্ভব নয়। পরীক্ষা করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হতো; কিন্তু মনোবিজ্ঞানী কী এমন কোন পরীক্ষা করতে পারেন যার ফলে একটি মানবশিশুরও ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হবার সম্ভাবনা? কিংবা, শৈশব থেকে অর্ধাহারে বা উপযুক্ত আহারের অভাবে প্রতিপালিত হলে একটি ব্যক্তির আচরণের বিকাশ কী ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে—এ-বিষয়ে অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাবার জন্য অর্ধাহারে প্রতিপালন করে পরীক্ষামূলকভাবে কারুর আচরণের বিকাশ পরিদর্শন করা প্রয়োজন। কিন্তু এ-জাতীয় কোন পরীক্ষা অবশ্যই সম্ভব নয়।

অতএব বোঝা যায়, পরীক্ষামূলকভাবে জনি-পদ্ধতির প্রয়োগে নানা বাধা আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মনোবিজ্ঞানীর কাছে জনি-পদ্ধতির কোন মূল্য নেই। কেননা, কোন কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা একান্তই অসম্ভব; সে-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নিছক পর্যবেক্ষণের (Simple Observation) উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হন। যেমন, জ্যোতিবিজ্ঞানীর পক্ষে চন্দ্র-গ্রহণ সূর্য-গ্রহণ জাতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়; অতএব এ-জাতীয় ঘটনা সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্য তিনি শুধু পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য। মনোবিজ্ঞানীও অনেকটা এইভাবেই জনি-পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে শুধু পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন। যথা, আয়ত্তাধীন প্রতিকূল পরিবেশে কোন শিশুকে মানুষ করে তার আচরণের উপর এ-জাতীয় পরিবেশের প্রভাব পরীক্ষামূলকভাবে দেখা সম্ভব না হলেও মনোবিজ্ঞানী এমন শিশুর ক্রমবিকাশ অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে পারেন যারা বাস্তবিকই প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে। কিংবা, আচরণের উপর অর্ধাহারের প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্য দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব; এ-জাতীয় দেশের শিশুরা বাস্তবিকই অর্ধাহারে বা উপযুক্ত আহারের অভাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক মূল্যের দিক থেকে অবশ্যই শুধু পর্যবেক্ষণের তুলনায় পরীক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য; কিন্তু নিছক পর্যবেক্ষণও মূল্যহীন নয়। এ-ছাড়াও মনে রাখা দরকার, মানব-আচরণের সঙ্গে বিবিধ জীবজন্তুর আচরণে নানা সাদৃশ্য বর্তমান এবং মানবশিশুকে নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব না-হলেও বিবিধ জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে মানব-আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত

বহু মূল্যবান তথ্য অনুমিত হতে পারে। মনোবিজ্ঞানী এই উপায়েও জনি-পদ্ধতির দুর্বলতা দূর করার প্রয়াস করে থাকেন।

জনি-পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা আর একটি পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়াস করেন। তাকে বলা যায়, ব্যক্তি-ইতিহাসমূলক পদ্ধতি (Case History Method)। জনি-পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য যে-ভাবে ব্যক্তির আজন্ম আচরণ পরিদর্শন করা প্রয়োজন তা সব সময় সম্ভব হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির আচরণ বিকারগ্রস্ত হলে তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে উপস্থিত করা হয়। এ-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে ব্যক্তিটির আজন্ম বিকাশ পরিদর্শনের প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না; অথচ ব্যক্তিটির অতীত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকলে তার বর্তমান মনোবিকারকে স্পষ্টভাবে বোঝাও সম্ভব নয়। অতএব, ব্যক্তিটির বিকাশ ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ না থাকলেও মনোবিজ্ঞানী নানা ভাবে তার বংশ-ইতিহাস এবং বাহ্য পরিবেশের ইতিহাস সংগ্রহ করার প্রয়াস করেন। যেমন, তিনি ব্যক্তিটির নিজের কাছ থেকে এবং তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তার অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং অনেক সময় পারদর্শী বা অভিজ্ঞ অনুসন্ধানকারীকে পাঠিয়ে ব্যক্তিটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে ব্যক্তিটির বিকাশ ইতিহাস তাঁর কাছে বহুলাংশেই জ্ঞাত হয়। অবশ্যই এই ব্যক্তি-ইতিহাস সংক্রান্ত পদ্ধতিটি প্রয়োগের জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা, ব্যক্তিটির আত্মীয় প্রভৃতির যাঁদের কাছ থেকে এ-ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় তাঁরা সাধারণত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নিষ্ঠা সম্পন্ন ব্যক্তি নন; অতএব তাঁদের বিবরণীতে অতিরঞ্জন প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা বর্তমান এবং লোকলজ্জা প্রভৃতির আশঙ্কায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য গোপনের প্রবণতাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ফলে ব্যক্তি-ইতিহাস সংগ্রহের সময় মনোবিজ্ঞানী বিশেষ সতর্ক থাকেন এবং এমনকি তিনি নানা ভাবে যেন জেরা করতেও বাধ্য হন।

৭। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Psychology)

আগেই দেখেছি, দীর্ঘ যুগ ধরে মনোবিজ্ঞানকে 'আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান' বা 'আত্মতত্ত্ব' বলে গ্রহণ করার প্রথা ছিল। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনেরই অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন। আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির মত

একটি স্বাধীন ও অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করতে চান; অতএব মনোবিজ্ঞানকে আর 'আত্মা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' বলা হয় না।

মনোবিজ্ঞানের ঐ প্রাচীন সংজ্ঞাটি পরিহার করে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছিল, 'মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান'। কিন্তু বিচার করলে বোঝা যায় এই সংজ্ঞাও বিশেষ অসন্তোষজনক এবং এই অর্থে গৃহীত হলে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে একটি স্বাধীন বিজ্ঞানে পরিণত হবার পথে বাধা সৃষ্ট হয়। কেননা, দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'মন' শব্দটির উপযোগিতা থাকলেও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাৎপর্য অস্পষ্ট। দেহের মধ্যে 'মন' বলে স্বতন্ত্র কিছুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই সম্ভব নয়। বস্তুত, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মন' বলে শব্দটি 'আত্মা' শব্দের মতই অসন্তোষজনক। অবশ্যই আমরা আমাদের নানা আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সাধারণত 'মানসিক' আখ্যা দিয়ে থাকি এবং রক্তচলাচল জাতীয় নিছক দৈহিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এই জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলির কোন-একটি স্বতন্ত্র আখ্যার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও 'মন' বলে কোন কিছুর স্বতন্ত্র সত্তা কোন প্রকার অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়ে না: 'মন' বলে কিছু আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, ইত্যাদি। অতএব মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে তার সংজ্ঞা 'মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান' হতে পারে না।

উপরের সংজ্ঞাটি সংশোধন করে মনোবিজ্ঞানকে 'চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' (Science of Consciousness) সংজ্ঞা দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই সংজ্ঞাটির মূলে একটি দার্শনিক মতের প্রভাব আছে। মতটি হল, চেতনাই মনের সারধর্ম। ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (Doscartos) মতটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক হতে পারে না। প্রথমত, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই দেকার্ত-এর উপরোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। অর্থাৎ, চেতনাকেই মনের সারধর্ম বলা যায় না; যে-আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকে সাধারণত 'মানসিক' আখ্যা দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হলেও অনেকগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নির্জ্ঞান (the Unconscious) এবং অন্তর্জ্ঞান (the Subconscious) নামের নানা আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা স্বীকার করেন যেগুলি সম্বন্ধে আমরা সাধারণত সচেতন নই। বস্তুত, মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) নামের একটি আধুনিক সম্প্রদায়ের মতে যে-আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সম্বন্ধে আমরা সাধারণত সচেতন হই সেগুলি মূলতই আমাদের নির্জ্ঞান অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মতটি সর্বাংশে

গ্রহণযোগ্য হোক আর নাই হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মনোবিজ্ঞানকে 'চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' সংজ্ঞা দিলে অতি-সংকীর্ণতা দোষ ঘটবে। কিন্তু সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে আরো বড় আপত্তি এই যে দেহাতিরিক্ত আত্মা বা মনের মতই 'চেতনা' বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অভিজ্ঞতা হয়না। আমাদের কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আমরা অবশ্যই সচেতন আখ্যা দিতে পারি; কিন্তু নিছক 'চেতনা'কে বড় জোর একটি দার্শনিক পদ বলা যায়। অতএব মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক কোন স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে তাকে 'চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান' আখ্যাও দেওয়া যায় না।

অতএব মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও পরিত্যাগ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মনোবিজ্ঞানকে 'আচবণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' বা 'মানব আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' আখ্যা দিতে চান। বস্তুত, মনোবিজ্ঞানকে যদি অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য অভিজ্ঞতামূলক একটি বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে তাকে আত্মা বা মন বা চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান না বলে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা, মন প্রভৃতি শব্দর অর্থ অস্পষ্ট এবং এ-জাতীয় কোন পদার্থের স্বাধীন সত্তা বিতর্কমূলক। ওই আত্মা, মন প্রভৃতির কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, আচরণ বা মানব-আচরণ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে: পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে আচরণ সংক্রান্ত সার্বিক সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। অতএব আমরা মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করার প্রস্তাব করি: মনোবিজ্ঞান আচরণ সংক্রান্ত—বা মানব-আচণ সংক্রান্ত—বিজ্ঞান।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদেব মধ্যে অনেকেই মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলেও সংজ্ঞাটি বিশেষ করে ম্যাক্‌ডুগাল (William McDougall) এবং ওয়াট্‌সন্ (J. B. Watson) নামে দুজন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে জড়িত। ম্যাক্‌ডুগালই প্রথম মনোবিজ্ঞানের সাবেকী সংজ্ঞাগুলি বিচারমূলকভাবে প্রত্যাখ্যান করে মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান আখ্যা দেন এবং ওয়াট্‌সন্ এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। তারপর মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে সংজ্ঞাটি বহুলভাবে সমাদৃত হয়। তবুও ম্যাক্‌ডুগাল ও ওয়াট্‌সন্ ঠিক যে-দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে-অর্থে মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে তা সর্ববাদীসম্মত নয়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ওয়াট্‌সন্ ও ম্যাক্‌ডুগাল দুটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ওয়াট্‌সনের সম্প্রদায়টির নাম 'আচরণবাদ' (Behaviorism)।

এই মতে মন বা মানসিক অবস্থা জাতীয় সমস্ত ধারণাই প্রাচীন সংস্কারের স্মারকমাত্র। মানবসত্তা দেহমাত্র এবং মানব-আচরণ দেহের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। এই প্রক্রিয়ার মূলকথা হল উদ্দীপক→প্রতিবেদন : অর্থাৎ, বহির্জগৎ থেকে নির্দিষ্ট উদ্দীপক (Stimulus) এলে মানবদেহে যন্ত্রের মতই নির্দিষ্ট প্রতিবেদন (Response) দেখা দেয় —যেমন, বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে বিদ্যুত পরিচালিত হলে যন্ত্রটি ক্রিয়া করে ঠিক সেই রকমই। ম্যাক্ডুগালের মতবাদ কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। তাঁর সম্প্রদায়টির নাম 'হরমিক' (Hormic) মনোবিজ্ঞান। এই মতে সমস্ত আচরণের মূলকথা হল কোন-না-কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন। অর্থাৎ, সমস্ত আচরণই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে একটি অভিপ্রায় সাধন করতে চায় ; অতএব প্রতিটি আচরণের পিছনেই কোন এক ভবিষ্যৎ-লভ্য ফল সংক্রান্ত দৃষ্টি এবং সেই ফল লাভের জন্য বাসনা বর্তমান থাকে। ম্যাক্ডুগালের মতে এই দূরদৃষ্টি ও এই বাসনা জন্মগত সংস্কার বা সহজ প্রবৃত্তির (Instinct) পরিচায়ক।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও আচরণ সংক্রান্ত উপরোক্ত দ্বিবিধ চূড়ান্ত মতবাদের একটিও গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে আমরা প্রধানত এই কারণে উৎসাহী যে আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় ; অতএব এই আচরণই মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে স্বীকৃত হলে মনোবিজ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাই বলে ওয়াট্সনের মত আচরণকে নিছক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মনে করার কারণ নেই। আচরণ অবশ্যই উদ্দীপক-প্রতিবেদন-মূলক প্রক্রিয়া ; কিন্তু উদ্দীপক গ্রহণ করে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানব এবং এই উদ্দীপকের ফলে তার অভ্যন্তরে চিন্তা-চেতনা, ভাব-আবেগ জাতীয় নানা ঘটনা ঘটে ; এই আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই সাধারণত 'মানসিক' আখ্যা দেওয়া হয় ; এবং ব্যক্তিটির প্রতিবেদনও বহুলাংশেই এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনোবিজ্ঞানী অবশ্য লাভ করেন না ; কিন্তু তিনি আচরণকে বিশ্লেষণ করে এগুলিকে অনুমান করতে পারেন। অতএব তাঁর চোখে আচরণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র নয়। কিন্তু তাই বলে সমস্ত আচরণকেই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচায়ক উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়াস মনে করার কারণ নেই। এবং এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য 'হরমিক' সম্প্রদায় যে-ভাবে সমস্ত আচরণের মূলে কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে চায় তাও সর্ববাদীস্বীকৃত হতে পারে না। অতএব, মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও আমরা আচরণকে ওয়াট্সন্ বা ম্যাক্ডুগালের মত কোন একটি চূড়ান্ত অর্থে গ্রহণ করতে সম্মত নই।

৮। মনোবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Psychology)

যতদিন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান বলে পরিকল্পিত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত তার আলোচনার প্রসারও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ। সে-আলোচনা বলতে আত্মা সংক্রান্ত বিবিধ দার্শনিক বিতর্কমাত্র। কিন্তু বর্তমান কালে দর্শনশাস্ত্রর প্রভাব থেকে মুক্ত করে মনোবিজ্ঞানকে এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের ফলে তার পরিসরও ক্রমশই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। প্রথমত, আত্মা বা মন বলে দেহাতিরিক্ত কোন সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র পদার্থের পরিকল্পনা ছেড়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন সমস্ত আচরণই একাধারে শারীরিক প্রক্রিয়াও। ফলে, শরীরবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে মনোবিজ্ঞান সম্ভব নয়। এই কারণে শরীরবিজ্ঞানের নানা বিষয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানেরও পরিসরভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাবেকী দার্শনিক ধারণা অনুসারে শুধুমাত্র মানুষেরই আত্মা ও চেতনা আছে। দার্শনিক দেকার্ত যেমন বলেছিলেন, জীবজন্তুরা যন্ত্রমাত্র—তাদের আত্মা নেই, চেতনা নেই। কিন্তু এ-জাতীয় দার্শনিক মতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই স্পষ্টভাবে অনুভব করেছেন প্রাণীজগতে মানুষ এবং মানুষেতরদের মধ্যে কোন চরম সীমরেখা টানা যায় না—অর্থাৎ, মানুষও যেহেতু দেহবিশিষ্ট প্রাণীই সেইহেতু তার আচরণের সঙ্গে বিবিধ জীবজন্তুর আচরণের নানা সাদৃশ্য স্বীকার্য। অতএব নানা জীবজন্তুর আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান মানব-আচরণের উপরও আলোকপাত করে। এইভাবে নানা জীবজন্তুর আচরণ মনোবিজ্ঞানের পরিসরভুক্ত হয়েছে। এবং তার ফলে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন পরীক্ষামূলক পরিদর্শন ; কিন্তু মানবতা-মূলক নানা নৈতিক ও সামাজিক কারণে মানবসন্তান নিয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে না ; জীবজন্তু নিয়ে এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বাধা নেই। অতএব, পরীক্ষামূলকভাবে জীবজন্তুর নানা আচরণ পরিদর্শন করে তারই ভিত্তিতে আধুনিক কালে মানব-আচরণ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য জ্ঞানলাভের সুযোগ বেড়েছে। তৃতীয়ত, মনোবিজ্ঞানকে 'আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান' আখ্যা না দিয়ে 'আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' আখ্যা দেবার ফলে মনোবিজ্ঞানীরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে মানুষ যেহেতু একান্তভাবেই সামাজিক জীব সেইহেতু তার আচরণও নিছক ব্যক্তিগত আচরণ নয়—সে-আচরণের একটি অনিবার্য সমাজগত বা সামাজিক দিকও বর্তমান। তাই সমাজবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে মনোবিজ্ঞানও সম্ভব নয়, কেননা মানুষের সমাজগত আচরণ বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়। চতুর্থত, সাম্প্রতিক কালে

মনোবিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মনোবিকার বা মানসিক রোগ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের ঔৎসুক্য। সাবেকী কালে উন্মাদ রোগ প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী শুধু যে মনোবিকারের নিরাময়-কল্পেই একে সম্যকভাবে বোঝবার প্রয়াস করেন তাইই নয়, তাঁদের মতে এ-জাতীয় বিকারগ্রস্ত আচরণ বিশ্লেষণ করে সাধারণভাবে মানব-আচরণ বোঝবার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। এইভাবে অস্বাভাবিক আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিসরভুক্ত হয়েছে। পঞ্চমত, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন মানব-আচরণেরও ক্রমবিকাশ আছে; তাই মানব-আচরণকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য মানবশিশুর জন্ম—বা এমনকি জন্মপূর্ব জ্রূণাবস্থা—থেকে তার আচরণের বিকাশ পরিদর্শন করা প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই স্পষ্টভাবে বুঝেছেন যে পরিণত বয়সের আচরণের কাঠামোটি বহুলাংশে শৈশব অবস্থাতেই সুনির্দিষ্ট হয়; ফলে শিশু-আচরণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিসরভুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠত, বিজ্ঞান মানে বন্ধ্যা জ্ঞান নয়—আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ বলেই আধুনিককালে বিজ্ঞানের এত মর্যাদা। মনোবিজ্ঞানও যত প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে ততই মনোবিজ্ঞানীরা তার ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন। এই ব্যবহারিক উপযোগিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক বলতে শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে মানাবিজ্ঞানের প্রয়োগ। স্বভাবতই এইভাবে প্রযুক্ত হবার জন্য মনোবিজ্ঞানকেও শিক্ষা ও শিল্প সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে; ফলে শিক্ষা-সংক্রান্ত ও শিল্প-সংক্রান্ত নানা বিষয়ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিসরভুক্ত হয়েছে। এইভাবে মনোবিজ্ঞানকে যতই সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র একটি বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হয়েছে ততই বেড়ে চলেছে তার পরিসর বা জিজ্ঞাসা-ক্ষেত্র।

৯। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Branches of Psychology)

ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার ফলে তার পরিসর বা আলোচনাক্ষেত্র ক্রমশই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে। কিন্তু এইভাবে কোন বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি ঘটলে গবেষণার সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানটিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করে নেন এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এ-জাতীয় বিভিন্ন বিভাগ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। যেমন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ

াকৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন : ক্ত, স্নায়ু, হৃদ্‌যন্ত্র, এমনকি চোখ, দাঁত, চুল প্রভৃতির উন্নততর গবেষণা আজ িকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিষয়বস্তু। একই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ-জাতীয় ভিন্ন বিভাগকে বিজ্ঞানটির বিভিন্ন শাখা বলা হয়। স্বভাবতই, মনোবিজ্ঞানের রিসর বা আলোচনাক্ষেত্র বিস্তৃত হবার ফলে মনোবিজ্ঞানেরও এ-জাতীয় নানা াখা দেখা দিয়েছে। আমরা কয়েকটি প্রধান শাখার পরিচয় দেখবো।

১॥ ক॥ শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)

শিশু-মনোবিজ্ঞান নামের আধুনিক মনোবিজ্ঞানের শাখাটির বিশেষ আলোচ্য ষয় বলতে ক্রমবিকাশশীল শিশু-আচরণ। সাধারণত ডারউইন-কেই (Charles arwin) শিশু-মনোবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বলে ধরা হয়; তারপর আধুনিক নোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটিতে যাঁদের বিশেষ অবদান তাঁদের ধ্যে প্রেয়ার (Preyer), স্টান্‌লি হল্ (Stanley Hall), সালি (Sully), কার্ল জ (Karl Gross), শিন্ (Shinn), বিনে (Binnet), ওয়াট্‌সন্ (Watson), র্ল ও শার্লোট্ বুলার (Karl and Charlotte Bubler), জাঁ পিয়াজে Joan Piaget), সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud), আনা ফ্রয়েড (Anna 'reud), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্যই এঁরা সকলে একই দৃষ্টিভঙ্গি কে শিশু-আচরণের বিকাশ আলোচনা করেননি; এমনকি শিশু-আচরণ ংক্রান্ত একই সমস্যা এঁদের সকলের গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে লা যায়, বিনে-র (Binnet) প্রধান প্রচেষ্টা ছিল শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ নির্ণয়ের ন্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা (Test) উদ্ভাবন করা; জাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) বিশেষ করে আবিষ্কার করতে চান ২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের শুদের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে গড়ে ওঠে; সিগ্‌মুণ্ড য়েড (Sigmund Freud) বিশেষ করে দেখাতে চান কীভাবে অত্যন্ত শৈশবের ভিজ্ঞতা পরিণত বয়সের ব্যক্তিত্বের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মোটের পর বলা যায়, এইসব বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে আজ শিশু-নোবিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে এবং একদিকে যেমন তা শিশুর আচরণ—বিশেষত শ-আচরণের বিকাশ—সংক্রান্ত বহুবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে পরদিকে আবার তা শিশুকে সুস্থ-পথে পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সাধন রতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানের এই দুটি দিকের ংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক।

আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশুর আচরণ সংক্রান্ত বিশেষত নিম্নোক্ত জ্ঞান অন্বেষণ করেন : শিশু-আচরণের ক্রমবিকাশ ও তার বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ; শিশু-আচরণের উপর বংশ প্রভাব ; শিশু-আচরণের উপর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ; শিশু-জীবনে বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি ও প্রচেষ্টাদির বিকাশ ; শিশুর শিক্ষাদীক্ষা এবং সুস্থ আচরণের সর্ত ; শিশু-আচরণের সঙ্গে পরিণত বয়সের আচরণের সম্পর্ক ; ইত্যাদি। শিশু-মনোবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বিবিধ বিষয়ে গবেষণা আজ ব্যবহারিকভাবেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে : শিশু-শিক্ষার প্রণালী, শিশুর সুস্থ বিকাশের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ণয় করা, শিশুর বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতিকে সুস্থপথে পরিচালনা করা, শিশুর অপরাধ-পরায়ণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণের উপযুক্ত প্রতিকার করা—প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমাধানে আজ শিশু-মনোবিজ্ঞানীর অবদান স্বীকৃত হয়েছে।

৯ ॥ খ ॥ পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology)

মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত (Data) আহরণের পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষার (Experiment) উপর নির্ভর করা হলে—অর্থাৎ, এ-জাতীয় তথ্য অবলম্বন করে মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে উপনীত হলে—সেই মনোবিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক আখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষার উপর নির্ভরতা। অবশ্যই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী ; কেননা পরীক্ষামূলকভাবে যে-তথ্য সংগৃহীত হয় তা অনেক বেশি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। স্বভাবতই সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানীরাও মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি সুনিশ্চিত বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার পরীক্ষার উপর নির্ভর করে উপাত্ত আহরণের প্রয়াস করেন এবং এই প্রয়াস মনোবিজ্ঞানের কোন একটি বিভাগের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—অর্থাৎ, আজকের দিনে মনোবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলতে মনোবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিভাগ নয়। এইদিক থেকে অন্তত বর্তমান কালে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানকে শিশু-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মত মনোবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট শাখা বলা যায় না। তবুও অনেক সময় মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেই পরীক্ষা-মূলক মনোবিজ্ঞান উল্লিখিত হয়। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয় এব

খন কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রথম প্রচলন শুরু করেন তখন বাকি মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশের উদ্দেশ্যে তাঁদের পরীক্ষা-পরায়ণ মনোবিজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং মনোবিজ্ঞানে তাঁদের পরীক্ষামূলক যে-গবেষণা তারই স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা বলেই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বর্তমান কালে পবীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে গ্রহণ করার কারণ না থাকলেও মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এখানে সংক্ষেপে তার মধ্যে প্রধানতম ঘটনাবলীর উল্লেখ করা যায়।

জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভেবর (Weber) মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ শুরু করেন। তিনি যে-সব পরীক্ষা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল উদ্দীপকের (Stimulus) হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদন-এর (Sensation) তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা: অর্থাৎ, উদ্দীপকের পরিমাণ কোন্ হারে বাড়লে সংবেদনের তীব্রতাও কী হারে বাড়ে এ-বিষয়ে বহু পরীক্ষা করে ভেবর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান। পরে, সংবেদন-প্রসঙ্গে আমরা এই পরীক্ষার বিস্তৃততর আলোচনা করব। ভেবর অবশ্য এ-ছাডাও মনোবিজ্ঞানে আরো নানা পরীক্ষা করেন। তাঁর পরে ফেক্‌নার (Fechner) এই পরীক্ষারই সিদ্ধান্তকে আরো বেশি বিজ্ঞানসম্মত করার প্রয়াস করেন; তাঁর সে-প্রয়াসের সার্থকতা আমরা পরে বিচার করবো। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর পর উল্লেখযোগ্য নাম বলতে মুয়েলার (Muller); পরীক্ষার উপর নির্ভর করে তিনি এই মতবাদে উপনীত হন যে আমাদের দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শুধুমাত্র একই রকমের বিশিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং সেই ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুও ঐ বিশিষ্ট উদ্দীপক-জনিত বিশিষ্ট উদ্দীপনাই পরিবহণ করতে পারে। এই মতবাদটিও আমরা পরে আলোচনা করব। এর পর নানা বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের নানা সমস্যা নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করেন: তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম বলতে ইয়ং Young), হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্‌ (Helmholtz), হেরিং (Hering), ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত পরীক্ষাকে সুসংবদ্ধ রূপদানের উদ্দেশ্যে যিনি প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম ভুণ্ডট্ Wundt) এবং এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষা-

মূলক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা পুরোদমে চলতে থাকে। এই কারণে ভুণ্ডট্-কেই পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

৯॥ গ॥ শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (Physiological Psychology)

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আচরণ। শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গর প্রক্রিয়া ছাড়া আচরণকে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রক্রিয়া শরীর-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অতএব শরীরবিজ্ঞান ছাড়া মনোবিজ্ঞান সম্ভব নয়; মনোবিজ্ঞান বহুলাংশেই শরীরবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই, শরীরবিজ্ঞানে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গর কথা আলোচিত হয়; কিন্তু শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গর সঙ্গেই আচরণের সম্পর্ক সমান নয়। শরীরের যে-নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে আমাদের আচরণ বিশেষভাবে সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞানে সেগুলিরই আলোচনা অপরিহার্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখায় বিশেষ করে আচরণের এই শারীরিক দিকটি আলোচিত হয়। সেই শাখাকে শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ, শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আচরণের দিক থেকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সেগুলির প্রক্রিয়া।

আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরের কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ? প্রধানতই অবশ্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক (Brain), মেরুদণ্ড (Spinal Cord) এবং বহু স্নায়ুর (Nerves) সংগঠনবিশেষ। আচরণের জন্য আমরা শরীরের ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির উপর স্পষ্টতই নির্ভরশীল। তাছাড়া, আচরণ অনেকাংশে বংশপ্রভাব-এর (Heredity) উপরও নির্ভরশীল। অতএব শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিদ্যায় বংশপ্রভাবের বিষয়ও গবেষণা হয়। এছাড়া, আমরা পরে দেখবো, শরীরের এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি (Endocrine Glands) এবং স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) উপরও আমাদের আচরণ নানাভাবে নির্ভরশীল। অতএব শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানে শরীরের বিশেষত এ-জাতীয় অঙ্গগুলিরই ক্রিয়াদি আলোচনা করা হয়।

৯॥ ঘ॥ অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে অস্বভাবী আচরণের আলোচনা হয় সেটিকে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অস্বভাবী আচরণ বলতে ঠিক কী বোঝায়, স্বভাবী (Normal) আচরণের সঙ্গে তার পার্থক্য-

সীমা বলতে ঠিক কী,—এ-জাতীয় প্রশ্ন অবশ্যই কঠিন এবং এগুলির উত্তরে আধুনিক মনোবিদ্‌দের মধ্যেই নানা মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তবুও মোটের উপর বলা যায় বাস্তবভাবে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানে বিশেষ করে উন্মাদ (Insanity), উদ্বায়ু (Neurosis) অপরাধ-পরায়ণ প্রভৃতি আচরণ-বিকারই আলোচিত হয়েছে। অবশ্যই অস্বভাবী আচরণ সবসময় প্রকট বিকারের রূপ গ্রহণ করতে নাও পারে; চলতি কথায় আমরা যাকে বলি ছিটগ্রস্ত বা বাতিকগ্রস্ত আচরণ মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সেগুলিও অস্বভাবী। সাম্প্রতিক কালে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার শুধু যে মানব-আচরণের নানা নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে তাইই নয়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে।

আগেকার কালে উন্মাদ প্রভৃতি অস্বভাবী আচরণকে 'ভূতে পাওয়া', 'দেবতার ভর' জাতীয় অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখা হত এবং অনেক সময় তাদের সাধারণ অপরাধীর মতই কারারুদ্ধ করে রাখা ও নির্যাতন করা হত। এই অবস্থার বিরুদ্ধে য়ুরোপে প্রথম প্রতিবাদ করেন পিনেল (Pinel)। তিনিই প্রথম বলেন, শারীরিক রোগের মতই মানসিক রোগও একপ্রকারের রোগই; অতএব মানসিক রোগীরাও সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতিরই অধিকারী। এবং পিনেল মানসিক রোগের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁর পর এস্‌কুইরল্ (Esquirol), শার্কো (Charcot), রিবো (Ribot), মর্টন প্রিন্স (Morton Prince), প্রভৃতি বিজ্ঞানী অস্বভাবী আচরণ সংক্রান্ত বহুবিধ গবেষণা করেন। তবে সাম্প্রতিক কালে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম বলতে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud): বস্তুত অস্বভাবী আচরণের সূত্র অবলম্বন করেই তিনি মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) নামের মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। অবশ্যই এই সম্প্রদায়টির বিবিধ মতবাদ নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানাবিধ বিতর্কের অবকাশ আছে।

৯ ॥ ঙ ॥ শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে শিক্ষাসংক্রান্ত আচরণের আলোচনা সেটিকে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়। শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা হয়: বিশেষত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? কোন্ বয়সের শিশু ও কিশোরদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় বলতে কী হওয়া বাঞ্ছনীয়? শিক্ষালাভের পক্ষে কোন্ ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল এবং কোন্ ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল?

তাছাড়া, শিশুদের মধ্যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে নানা পার্থক্য আছে; এই পার্থক্যগুলি নিরূপণ না করে সকলকে একই ধরণের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি সমস্যা হল, কীভাবে বা কোন কৌশলে শিশুদের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি নিরূপণ করা যায় এবং পার্থক্যগুলি নিরূপিত হলে বিভিন্ন শিশুদের পক্ষে উপযোগী শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা ব্যবস্থা কী হওয়া বাঞ্ছনীয়? শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের জীবিকাবৃত্তির সম্পর্ক সুস্পষ্ট; অতএব কোন্ শিশু ভবিষ্যতে কী বৃত্তি অবলম্বন করবে এ-বিষয়ে সচেতন হওয়াও প্রয়োজন। শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারেই তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য, শিশুদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ধারণের সহায়তা।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্যার পরিচয় দেখা গেল। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকু থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষার সমস্যা প্রধানতই শিশু এবং কিশোর সংক্রান্ত সমস্যা। অতএব, শিশু-মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; বস্তুত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই দুটি শাখার মধ্যে পার্থক্য-সীমা সবসময় সুস্পষ্ট নয়: শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের নানা আলোচনা শিশু-আচরণ সংক্রান্ত আলোচনাই।

৯ ॥ চ ॥ শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ আলোচিত হয় তাকে শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞান বলে। শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য শিল্প-উৎপাদনের সহায়তা; কিন্তু শিল্প-উৎপাদন শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির উপরই নির্ভর করে না; তার জন্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অতএব শিল্প-উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন যন্ত্রপাতির উন্নতি প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণের উন্নতি। অতএব শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানে নানা সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা হয়: শিল্পায়নের কোন্ ধরণের পরিবেশে শ্রমিকেরা সহজেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়, আবার কোন্ ধরণের পরিবেশে তারা প্রফুল্লচিত্তে ও সোৎসাহে কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে? শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা কোন্ ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়? তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য পরস্পরের মধ্যে কীভাবে সৌহার্দ্য-মূলক প্রতিযোগিতার ভাব আনা যায়? তাদের বিশ্রাম, অবসর-বিনোদন প্রভৃতির জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন? কলকারখানায় আকস্মিক দুর্ঘটনা কেন

ঘটে এবং কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার সম্ভাবনা কমে ? তাছাড়া, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের পটুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় ; এমনকি একই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধরণের কাজ থাকে। অতএব বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক-নির্বাচন প্রয়োজন। তাই শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের কর্মপটুতা, স্বাভাবিক প্রবণতা প্রভৃতি নির্ধারণ করার কৌশল উদ্ভাবন ; এই পার্থক্য অনুসারে শ্রমিক-নির্বাচন করে মনোবিজ্ঞানী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

১০॥ মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা (The aim and utility of Psychology —Utility in Individual and Social Life)

কোন মানুষই একা-একা বাঁচে না ; বাঁচবার জন্য প্রত্যেককেই অন্যান্য মানুষের সঙ্গে নানা রকম সম্পর্কে আসতে হয়। ফলে প্রত্যেকেই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করে অন্যান্য মানুষকে ঠিক মতো বুঝতে পারা-না-পারার উপর তার নিজের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বহুলাংশেই নির্ভরশীল। ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি প্রত্যেকের পক্ষেই অপরাপর মানুষের আচরণ সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন। জীবিকার কথা বাদ দিলেও, এমনকি নিজের পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ঠিক মতো বোঝা বা জানা দরকার। কিন্তু শুধু অন্যান্য মানুষকে বোঝবার সমস্যা নয়—প্রত্যেকের পক্ষেই নিজেকেও ঠিক মতো বোঝবার প্রয়োজন আছে ; কেননা প্রত্যেকেরই কমবেশি ব্যক্তিগত সমস্যা আছে এবং এ-জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য প্রত্যেকের পক্ষেই নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের চিন্তা-ভাবনা আবেগ-অনুভূতি জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা-গুলিকে ভাল করে জানা দরকার। অতএব অপরকে জানা এবং নিজেকে জানা—উভয় উদ্দেশ্যেই সকলের কাছে মনোবিজ্ঞান আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই পরিস্থিতিটির—অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের প্রতি সকলের স্বাভাবিক আগ্রহের—সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। কননা মনোবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল আচরণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং নোবিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস তুলনায় সাম্প্রতিক লেই এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনো বহুলাংশেই গবেষণা-সাপেক্ষ। এ-ক্ষেত্রে নোবিজ্ঞানের প্রতি সকলের স্বাভাবিক আগ্রহ একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানের

গবেষণার সহায়ক হয় অপরদিকে তেমনি সেই গবেষণার পথে কিছুটা বাধাও সৃষ্টি করে। কেননা, কোন একটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সে-বিষয়ে গবেষণার সহায়ক হলেও মনোবিজ্ঞানের প্রতি এই স্বাভাবিক আগ্রহের ফলে অনেকেই 'শখের মনোবিজ্ঞানী' (amateur psychologist) হবার উপক্রম করতে পারেন—অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুকঠিন ও সুসংযত পন্থা অবলম্বন না-করেই মানব-আচরণের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রবণতা দেখাতে পারেন। ফলে মানব-আচরণ সংক্রান্ত বিবিধ অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রশ্রয় পাবার সম্ভাবনা। এ-জাতীয় সম্ভাবনা মনোবিজ্ঞানের মতো একটি তরুণ বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। অতএব এ-জাতীয় সম্ভাবনার প্রতিষেধক হিসাবে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, মনে রাখা প্রয়োজন, মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মানব-আচরণ সংক্রান্ত নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; তার জন্য নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, আয়াসসাধ্য গবেষণার পথ ধরে অগ্রসর হবার প্রয়োজন, প্রয়োজন অবৈজ্ঞানিক কল্পনা-প্রবণতা বর্জন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংযম।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান হলেও সে-জ্ঞান বন্ধ্যা বা শুষ্ক নয়—অর্থাৎ, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সেই জ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় প্রয়োগমূলক দিকও বর্তমান। বস্তুত সাধারণের কাছে এ-জাতীয় প্রয়োগমূলক দিকটির জন্যই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব। স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও বন্ধ্যা বা শুষ্ক জ্ঞান নয়; মনোবিজ্ঞানে মানব-আচরণ সংক্রান্ত যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করা হয় আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তারও উপযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে মাত্র এক শতাব্দীরও কম। এবং এই ইতিহাসের প্রথমাবস্থায়—অর্থাৎ, স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের যখন নেহাতই শৈশবাবস্থা তখন মনোবিজ্ঞানে প্রধানতই গবেষণামূলকভাবে বিবিধ তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা হয়েছে; বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে সেই তথ্যগুলির বিশেষ কোন উপযোগিতা থাকেনি। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ক্রমশ এ-জাতীয় শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে এবং বিশেষ করে 'বুদ্ধির অভীক্ষা' (Intelligence Tests), 'ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা' (Personality Tests) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশই ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্যাসমাধানে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে বিবিধ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা তর্কাতীত। এই উপকারিতাকে আমরা প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) ব্যক্তিগত জীবনে উপকারিতা (খ) সামাজিক জীবনে উপকারিতা।

॥ ক ॥ ব্যক্তি-জীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা

ব্যক্তি-জীবনে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা বলতে প্রধানত দু'রকম: চিকিৎসামূলক, (২) পরামর্শমূলক।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসামূলক উপযোগিতার দিকটি সুস্পষ্টভাবে ঝার জন্য 'মানসিক রোগের' চিকিৎসায় নিযুক্ত প্রধানত তিন রকম ব্যক্তির মধ্যে র্থক্য দেখা দরকার। এই তিন প্রকার ব্যক্তি বলতে: (ক, মনোরোগ-চিকিৎসক sychiatrist), (খ) মনঃসমীক্ষক (Psychoanalyst) এবং (গ) আরোগ্য-সহায়ক নাবিজ্ঞানী (Clinical Psychologist)। এঁদের মধ্যে মনোরোগ-চিকিৎসক ত্তপক্ষে ডাক্তার বা চিকিৎসকই—অর্থাৎ, তিনি সাধারণভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্ষাগ্রহণের পর মানসিক রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হয়েছেন; ইনি বৈদ্যুতিক ভিঘাত (Electric shock) এবং ওষুধপত্রের সাহায্যে মানসিক রোগীর চিকিৎসা রন। মনঃসমীক্ষকও সাধারণত চিকিৎসকই; তবে তিনি ওষুধপত্র প্রভৃতি বহার করেন না; তার বদলে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্ প্রবর্তিত 'মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি'তে sychoanalytic Method) কয়েকটি মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। ' পদ্ধতি ও তার সার্থকতা প্রসঙ্গে আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আরোগ্য-য়ক মনোবিজ্ঞানী সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করার পর বিশেষ করে নাবিজ্ঞানের অভীক্ষা (Psychological Tests) এবং 'মনোবিজ্ঞানমূলক কিৎসা' (Psychotherapy) নামের কয়েকটি কৌশলে পারদর্শিতা অবলম্বন রন।

এঁদের মধ্যে অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসার প্রধানতম দায়িত্ব নারোগ-চিকিৎসকের উপরই; কিন্তু তিনি ক্রমশই আরোগ্য-সহায়ক মনো-জ্ঞানীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়েছেন। প্রথমত, রোগের লক্ষণনির্ণয়ের মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষাগুলির বিশেষ উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এই ীক্ষাগুলির প্রয়োগ করে অরোগ্য-সহায়ক মনোবিজ্ঞানীই রোগীর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত দিতে পারেন; মনোরোগ-চিকিৎসক সে-অভিমতের র নির্ভর করে রোগলক্ষণ নির্ণয় করেন। দ্বিতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের বৈদ্যুতিক অভিঘাত এবং ওষুধপত্রর ব্যবহার ছাড়াও মনোবিজ্ঞানমূলক ৎসা (Psychotherapy) নামের কয়েকটি কৌশলের সহায়তা প্রয়োজন হয় এগুলির জন্যও আরোগ্য-সহায়ক মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। াবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানসিক রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে।

ব্যক্তি-জীবনে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উপকারিতা হল পরামর্শমূলক। উন্মাদ রোগ প্রভৃতি প্রকট মনোবিকারের ক্ষেত্রে মনোরোগ-চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন হয়; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এ-জাতীয় প্রকট মনোবিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট না-হলেও ব্যক্তিবিশেষ অত্যন্ত কঠিন মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধানকল্পে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের সাহায্য। পরামর্শদাতা মনোবিজ্ঞানী সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু তাঁর কাজ শুধুমাত্র কঠিন মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া নয়; বুদ্ধি, প্রবণতা (Aptitude), ব্যক্তিত্ব (Personality) প্রভৃতি নির্ণয় করার মনোবিজ্ঞান-মূলক অভীক্ষার (Psychological Tests) সাহায্যে মনোবিজ্ঞানী নানাভাবে ব্যক্তি-বিশেষের বিবিধ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে তাকে বিবিধভাবে পরামর্শ দিতে পারেন। শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীর এ-জাতীয় পরামর্শের বিশেষ উপকারিতা দেখা যায়; এই পরামর্শের উপর নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের জীবিকাবৃত্তি প্রভৃতি নির্ণয় করার নানা সহায়তা হয়। তাই আজকাল অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে—মনোবিজ্ঞানমূলক পরামর্শের জন্য বিশেষ বিভাগ স্থাপনের আয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় পরামর্শদাতা মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসার (Psychotherapy) দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই চিকিৎসাকৌশলের সাহায্যে নানাবিধ ব্যক্তিগত সমস্যাসমাধানের সহায়ক হন।

১০ ॥ খ ॥ সমাজজীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা

সমাজজীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা বলতে প্রধানত চার রকম: (১) শিক্ষাক্ষেত্রে, (২) শিল্পক্ষেত্রে, (৩) রাষ্ট্রক্ষেত্রে, এবং (৪) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে উপকারিতা।

দীর্ঘ দিন থেকেই শিক্ষকেরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শিশুর বিকাশ পরিদর্শন করে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ে তার সামর্থ্য ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে চান এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে শিক্ষকদের পক্ষে এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই ঠিক করা বাঞ্ছনীয় কোন্ বয়সে—বা শিশুর বিকাশের কোন্ পর্যায়ে—কোন্ বিষয়ে এবং কী ভাবে শিশুকে শিক্ষাদান করা হবে। আধুনিক কালে শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ভিত্তিতে পাঠ্য পুস্তকাদি রচনা এবং শিক্ষায়তন পরিচালনার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে

ভর্তি করার জন্য ছাত্র-নির্বাচনের উদ্দেশ্যেও নানা রকম মনোবিজ্ঞানমূলক অভীক্ষার (Psychological Tests) উপর নির্ভর করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা দিনের পর দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে স্বীকৃত হচ্ছে।

আধুনিক শিল্পায়তন পরিকল্পনা ও পরিচালার উদ্দেশ্যেও মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা আজ স্বীকৃত হয়েছে এবং মনোবিজ্ঞানীরা আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে শিল্পক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। আজকাল প্রধানত শিল্প ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগেব কর্মী নির্বাচনের উদ্দেশ্যেই নানারকম মনোবিজ্ঞান-মূলক অভীক্ষার উপর নির্ভর করা হয়; এই পরীক্ষাগুলির সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রবণতা, সামর্থ্য প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের আরো নানা সমস্যাসমাধানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভব, বস্তুত এ জাতীয় সম্ভাবনা সার্থক করার উদ্দেশ্যেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখায় —শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানে—নানাপ্রকার গবেষণার আয়োজন দেখা যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপযোগীতা এখনো প্রধানতই সামরিক বিভাগগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ: বুদ্ধির অভীক্ষা, প্রবণতার অভীক্ষা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সামরিক বিভাগেব বিভিন্ন কাজের জন্য সেনা-সংগ্রহের আয়োজন আজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু আশা করা যায়, পৃথিবীতে যুদ্ধের সম্ভাবনা যত কমবে ততই গঠনমূলক রাষ্ট্র কার্যেও মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়ে চলবে।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নানা সামাজিক সমস্যার সমাধানেও মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ-সম্ভাবনা প্রায় অপরিসীম। এ-জাতীয় সামাজিক সমস্যা বলতে কুসংস্কার-অপসারণ, অপরাধ-পরায়ণতার প্রশমন, মানুষে-মানুষে সুস্থ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। অবশ্যই এ-জাতীয় সামাজিক সমস্যার সমাধান-দায়িত্ব শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানীর উপর অর্পণ করা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। সমস্যাগুলি জটিল এবং এগুলির মূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণ বর্তমান। অতএব এগুলির সমাধানকল্পে বহুমুখী প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই বহুমুখী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানমূলক প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্নায়ুতন্ত্র

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আচরণ (Behaviour)। আচরণের মূল কথা : উদ্দীপক→প্রতিবেদন। প্রাণীজগতের সর্বস্তরেই অবশ্য এই উদ্দীপক→প্রতিবেদনমূলক প্রক্রিয়া বা আচরণ পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানে আমরা বিশেষ করে মানব-আচরণের আলোচনা করব। এবং মানব-আচরণ বোঝবার জন্য সর্বপ্রথম জানা দরকার উদ্দীপক→প্রতিবেদন মূলক এই প্রক্রিয়াটির জন্য মানব-শরীরের অভ্যন্তরে ঠিক কী ঘটনা ঘটে, শরীরের কোন্ অঙ্গগুলি কী ভাবে কাজ করে। এ-বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বভাবতই আমরা শরীরবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অতএব আচরণ-প্রসঙ্গে শরীরবিজ্ঞানের আলোচনা অরিহার্য।

১॥ শরীরের গড়ন : জীবকোষ (Cell), অঙ্গ (Organ) ও তন্ত্র (System)

উদ্ভিদ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত জীব-দেহেরই সর্বসূক্ষ্ম অংশকে বলা হয় জীবকোষ (Cell)। প্রতিটি জীবকোষই জীবন্ত বস্তু, কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে শুধু চোখে দেখা যায় না—অণুবীক্ষণের সাহায্যে অনেক বড করে দেখতে হয়। পৃথিবীতে অবশ্য এমন জীব আছে যার পুরো শরীর বলতে শুধুমাত্র একটি জীবকোষ। মানুষের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই জীবকোষ দ্বারা গঠিত ; স্বভাবতই তার জন্য কোটি কোটি জীবকোষের প্রয়োজন। কিন্তু যেসব কোটি কোটি জীবকোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত সেগুলি সবই একজাতের নয়। হাড়ের উপাদান বলতে প্রধানত একরকমের জীবকোষ, মাংস-পেশীর উপাদান বলতে প্রধানত আর একরকমের—তেমনি চর্বি, রক্ত, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের জীবকোষ দ্বারা গঠিত।

এতো ধরণের এবং প্রায় অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা পুরো শরীরটি কী ভাবে গঠিত হয়েছে ? প্রথমত, একই জাতের বহু জীবকোষ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একভাবে সংগঠিত ; এই সংগঠনকে বলে টিস্যু (Tissue)। আবার নানান টিস্যু একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আরো উন্নতভাবে সংগঠিত হয় ; সেই উন্নততর সংগঠনকে বলে অঙ্গ (Organ)। যেমন, শরীরের একটি অঙ্গ বলতে হৃদযন্ত্র (Heart) ;

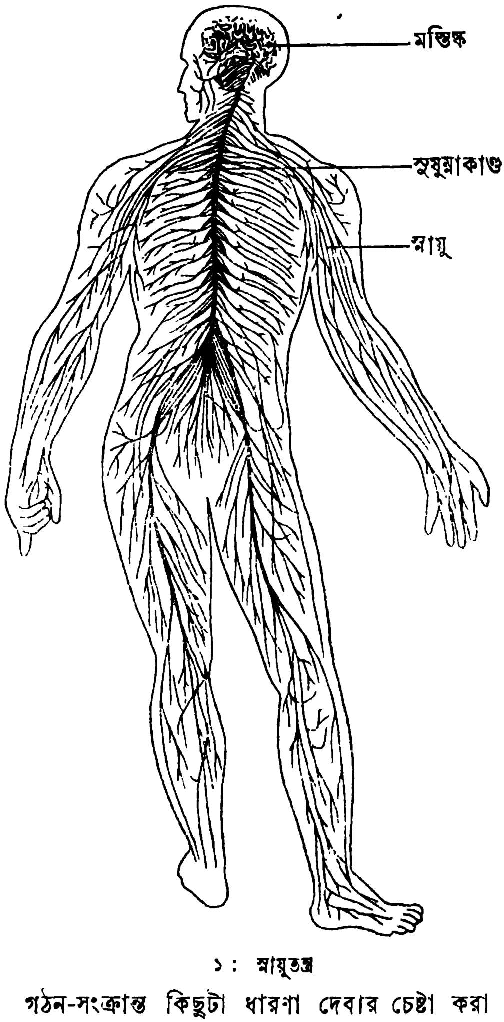
াই অঙ্গটির উপর শরীরের অভ্যন্তরে রক্তচলাচল চালু রাখার প্রধানতম দায়িত্ব। াঙ্গটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে অনেকগুলি টিস্যু (Tissue), আবার প্রতিটি টস্যুকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে প্রধানত একই জাতের বহু জীবকোষ। কন্তু শরীরের মধ্যে রক্তচলাচল-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য শুধুমাত্র হৃদযন্ত্র লে অঙ্গই যথেষ্ট নয়; তাছাড়াও আরো অনেকগুলি অঙ্গের প্রয়োজন। এই বগুলি অঙ্গ মিলে—অর্থাৎ, সংগঠিতভাবে—রক্তচলাচলের ব্যবস্থা বজায় রাখে। ামগ্রিকভাবে সেই অঙ্গগুলির সংগঠনকে বলা হয় রক্তচলাচল তন্ত্র (Circulatory ystem)। একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনেকগুলি অঙ্গের যে-উন্নততর সংগঠন তাকে লে তন্ত্র (System)। জীবনধারণের পক্ষে একটি প্রধান প্রয়োজন হল রক্তচলাচল-ব্যবস্থা; শরীরের একটি তন্ত্রের (System) উপর তার দায়িত্ব। জীবনধারণের ন্য এ-জাতীয় আরো কয়েকটি মূল ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে; যেমন, খাদ্যদ্রব্য হজম Digestion), শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration), ইত্যাদি। এক-একটি ব্যবস্থার দায়িত্ব রীরের এক-একটি তন্ত্রের (System) উপর: হজমের দায়িত্ব পচন-তন্ত্রর (Digestive ystem) উপর, শ্বাসপ্রশ্বাসের দায়িত্ব শ্বাসপ্রশ্বাস-তন্ত্রের (Respiratory ystem) উপর; ইত্যাদি ইত্যাদি। সবগুলি তন্ত্র মিলে সামগ্রিকভাবে আমাদের রীর; এক-একটি তন্ত্র জীবনধারণের এক-একটি মৌলিক প্রয়োজন সাধন রে।

এ-জাতীয় একটি মৌলিক প্রয়োজন বলতে আচরণ (Behaviour)। অতএব ই প্রয়োজন-সাধনের দায়িত্বও শরীরের একটি নির্দিষ্ট তন্ত্রর উপর। তারই নাম য়ুতন্ত্র (Nervous System)। শরীরের অন্যান্য তন্ত্রর মতই স্নায়ুতন্ত্রও কয়েকটি ঙ্গের (Organ) সংগঠন। এই অঙ্গগুলি হল: (১) মস্তিষ্ক (Brain), (২) সুষুম্না-ণ্ড (Spinal Cord) এবং (৩) বহুসংখ্যক স্নায়ু (Nerve)। প্রতিটি অঙ্গকে শ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত প্রধানত একজাতীয় জীবকোষ পাওয়া যায়। যে-তের জীবকোষ স্নায়ুতন্ত্রর প্রধানতম উপাদান সেগুলিকে বলা হয় নিউরন eurone)।

স্নায়ুতন্ত্রর গঠন ও কার্য (Structure and function of the rvous System)

পারিপার্শ্বিক পৃথিবী এবং শরীরবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ । এই আচরণ নির্ভর করে আমাদের দেহের গ্রাহক (Receptor) এবং ক (Effector)-এর উপর: গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগৎ থেকে

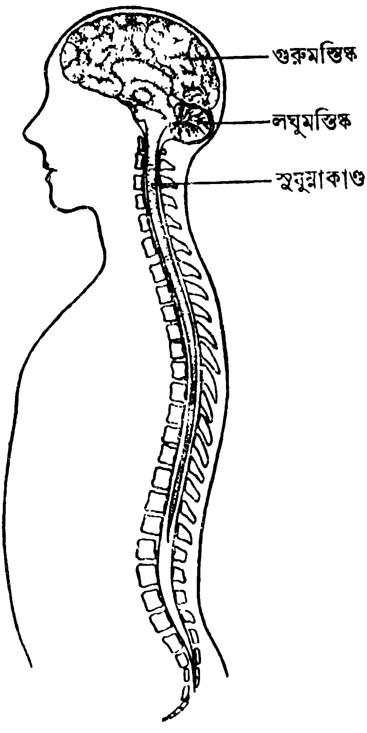
উদ্দীপক (Stimulus) গ্রহণ করি এবং কারকের—বিশেষত পেশীর—সাহায্যে আমরা বহির্জগতে পরিবর্তন সৃষ্টি করি। আমাদের শরীরের কোটি কোটি জীবকোষ গ্রাহকের দায়িত্ব সম্পাদন করে; দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় শুধুমাত্র চোখের মধ্যেই কয়েক কোটি গ্রাহক-জীবকোষ বর্তমান। পেশী প্রভৃতি কারক-গুলিও বহু জীবকোষের সংগঠন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র গ্রাহক ও কারকই যথেষ্ট নয়; গ্রাহক ও কারকগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কেননা গ্রাহক যে-উদ্দীপক গ্রহণ করছে তারই উত্তরে কারকগুলি সক্রিয় হয় —অর্থাৎ, সম্ভব হয় প্রতিবেদন (Response)। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব স্নায়ুতন্ত্রের উপর।



১: স্নায়ুতন্ত্র

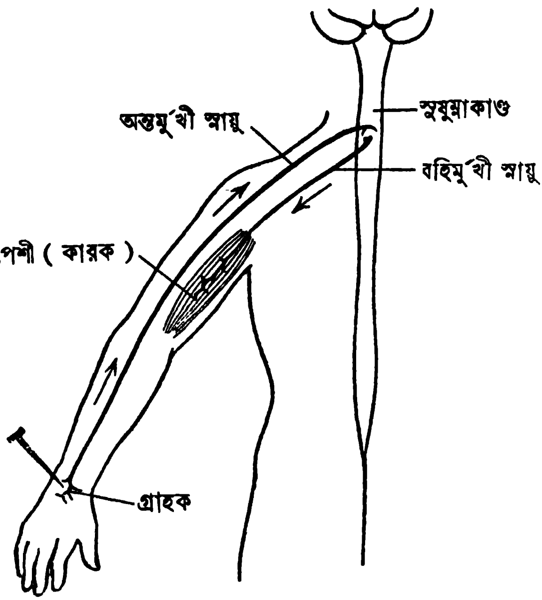
এখানে ১নং চিত্রে স্নায়ুতন্ত্রের গঠন-সংক্রান্ত কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হল। ছবিটিতে দেখা যায় অজস্র স্নায়ু শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গে যেন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে। কিন্তু ছবিতে মাত্র যে-কয়টি স্নায়ুর পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে; আমাদের শরীরের মধ্যে তার তুলনায় প্রকৃতপক্ষে বহুগুণ বেশি স্নায়ু বর্তমান এবং সেগুলি অনেক বেশি ও সূক্ষ্মতর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। বস্তুত, শরীরের প্রতিটি গ্রাহক এবং প্রতিটি কারকের সঙ্গে কোন-না-কোন স্নায়ু—বা স্নায়ুর শাখাপ্রশাখা—সংযুক্ত আছে।

কিন্তু ছবিটিকে ভাল করে পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে স্নায়ুগুলি সরাসরিভাবে গ্রাহক ও কারকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে না। স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে রয়েছে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক থেকে কোমরের দিকে নেমে-আসা শিকড়ের মত একটি অঙ্গ। মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডকে স্বতন্ত্রভাবে দেখাবার জন্য এখানে আর একটি ছবি দেওয়া গেল। মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলি বা করোটির মধ্যে ; ছবিতে মস্তিষ্কের দুটি প্রধান অংশ—গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum) দেখানো হয়েছে। এগুলির বিস্তৃত পরিচয় পরে দেখা যাবে। করোটির নিচের দিকের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এবং আমাদের পিঠের মেরুদণ্ড (Vertebral Column) নামের অস্থিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে কোমরের তলা পর্যন্ত মস্তিষ্কেরই যেন একটি সরু শিকড় নেমে এসেছে। এরই নাম সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)। পিঠের এই মেরুদণ্ডটি আসলে উপর-উপর সাজানো অনেকগুলি হাড় বা অস্থির যেন এক মালা ; সেগুলির প্রতিটির মাঝখানে গর্ত আছে এবং হাড়গুলি এমনভাবে সাজানো যে পরের পর সেগুলির গর্ত মিলে যেন এক সরু সুড়ঙ্গ-পথ রচনা করেছে। এই সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে দিয়েই সুষুম্নাকাণ্ড কোমরের দিকে নেমে গিয়েছে। শরীরের সমস্ত স্নায়ুই মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমেই গ্রাহক ও কারকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। স্নায়ুগুলিকে আসলে দুই জাতে বিভক্ত করা হয় : (১) এক-জাতীয় স্নায়ু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে কোন-না-কোন গ্রাহকের সঙ্গে সংযুক্ত করে ; (২) অপর জাতীয় স্নায়ু মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে কোন-না-কোন কারকের সঙ্গে সংযুক্ত করে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে প্রথম জাতীয় স্নায়ুকে বলা হয় অন্তর্মুখী (Afferent) বা সংবেদনবাহী (Sensory), দ্বিতীয় জাতীয় স্নায়ুকে বলা হয় বহির্মুখী (Efferent) বা চালক



২ : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড

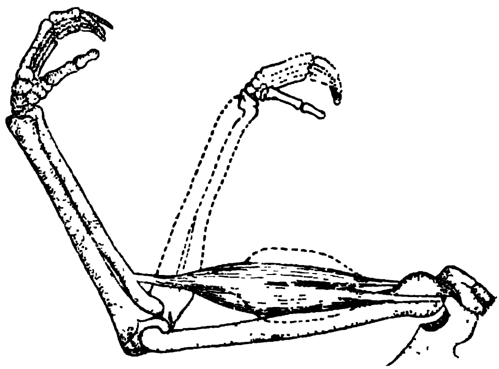
(Motor)। অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলির কাজ হল শরীরের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রে—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে—স্নায়বিক শক্তি (Nervous Impulse) পরিবহণ করা; বহির্মুখী স্নায়ুগুলির কাজ হল স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রের মধ্য থেকে কোন-না-কোন কারক পর্যন্ত—অর্থাৎ কোন পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত—স্নায়বিক শক্তি পরিবহণ করা। স্নায়বিক শক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায় তা একটু পরেই দেখা যাবে। আপাতত উপমার সাহায্যে বলা যায়, অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলির দায়িত্ব হল গ্রাহক থেকে স্নায়ুতন্ত্রর ভিতর দিকে—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডে—সংবাদ



৩: অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ু

পরিবহণ করা; অপরপক্ষে বহির্মুখী স্নায়ুগুলির দায়িত্ব হল স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্র থেকে—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে—কার্য-নির্দেশ পরিবহণ করা পেশী প্রভৃতি কারকের কাছে। এইভাবে সম্ভব হয় গ্রাহক ও কারকের মধ্যে যোগাযোগ, উদ্দীপকের উত্তরে প্রতিবেদন। একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেখা যাক: আমার হাতের পিছন দিকে একটি আলপিন ফোটানো হল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি হাতটা টেনে নিলাম। শরীরের মধ্যে ঠিক কী ঘটনা ঘটল? হাতের যে-জায়গায় আলপিন ফুটলো সেখানে আছে গ্রাহক জীবকোষ (Receptor Cell)। অতএব আলপিন ফোটার ফলে বাইরের পৃথিবী থেকে উদ্দীপক এল গ্রাহক জীবকোষের কাছে। উদ্দীপক পাবার

গ্রাহক জীবকোষে সৃষ্টি হল স্নায়বিক শক্তি। হাতের ঐ জায়গার গ্রাহককে
াকাণ্ডর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে কোন একটি স্নায়ু (Nerve)। স্বভাবতই
ায়ুকে অন্তর্মুখী (Afferent বা Sensory) বলা হবে। অন্তর্মুখী স্নায়ুটি
ক জীবকোষ থেকে স্নায়বিক শক্তিকে পরিবহণ করে নিয়ে গেল সুষুম্নাকাণ্ডের
ন্তরে কোন নিউরন পর্যন্ত। এই নিউরনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে এক বহির্মুখী
; সেই স্নায়ুটি সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরকার উক্ত নিউরনকে হাতের পেশীর সঙ্গে
ক্ত করেছে। অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডর ভিতরকার নিউরনে স্নায়বিক
 এসে পৌঁছোনোর ফলে সুষুম্নাকাণ্ডের ঐ নিউরনেও স্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন
এবং ঐ নিউরনের সঙ্গে সংযুক্ত বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি
বাহিত জল হাতের পেশী
ষ্ঠ। বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে
ভাবে হাতের পেশী পর্যন্ত
য় বি ক শ ক্তি এ সে
ছোনোর ফলে সংকুচিত
হাতের পেশী, অতএব
পড়ল পেশী-সংলগ্ন হাতের
হ্ বা হাড়েও। ফলে সরে
গা আমার হাতও।
অতএব বোঝা যাচ্ছে, যদি



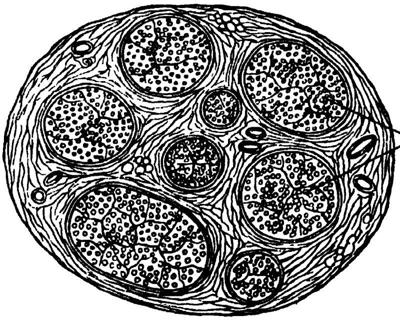
৪ : অস্থিসংলগ্ন পেশী-সংকোচনের ফলে অবয়ব-সঞ্চালন

থ-বিসুখ বা দুর্ঘটনায় শরারের কোন বহির্মুখী স্নায়ু ছিঁড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়
হলে সেই স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের যে-পেশীর সঙ্গে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের
গাযোগ সেই পেশীটিরও আর কর্মক্ষমতা থাকবে না, কেননা পেশীটিকে কাজ
াবার জন্য স্নায়বিক শক্তির যোগান বন্ধ হবে। অর্থাৎ, পেশীটি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত
। অপরপক্ষে যে-অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক
সুষুম্নাকাণ্ডের যোগাযোগ সেই স্নায়ু ব্যাধিগ্রস্ত হলে বা নষ্ট হলে ইন্দ্রিয়টিও
কজো হয়ে যাবে ; কেননা সেই ইন্দ্রিয় বা গ্রাহকের কাছে বহির্জগতের উদ্দীপক
াও ইন্দ্রিয় থেকে সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের
স্থা ব্যাহত হবে। যেমন, চোখের সঙ্গে যে-স্নায়ু মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে
ট নষ্ট হয়ে গেলে চোখ থাকা সত্ত্বেও মানুষ দেখতে পাবে না—চোখ থেকে
ষ্ক পর্যন্ত সংবাদ-সরবরাহের পথ নষ্ট হয়ে যাবে। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায়,
ষুষ সংবেদন (Visual Sensation) আর সম্ভব হবে না। চোখে দেখা, কানে

শোনা প্রভৃতিকে সংবেদন (Sensation) বলে। সংবেদনের কারণ কী? শরীরে কোন গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ে উদ্দীপক এলে উদ্বুদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি, এই শক্তি গ্রাহক থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে পরিচালিত হয় সুষুম্নাকাণ্ডর কোন কেন্দ্রে এবং সেখান থেকে পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে স্নায়বিক শক্তি পৌঁছুলে সৃষ্টি হয় সংবেদন।

৩॥ নিউরনের গঠন ও কার্য (Structure and function of the Neurone)

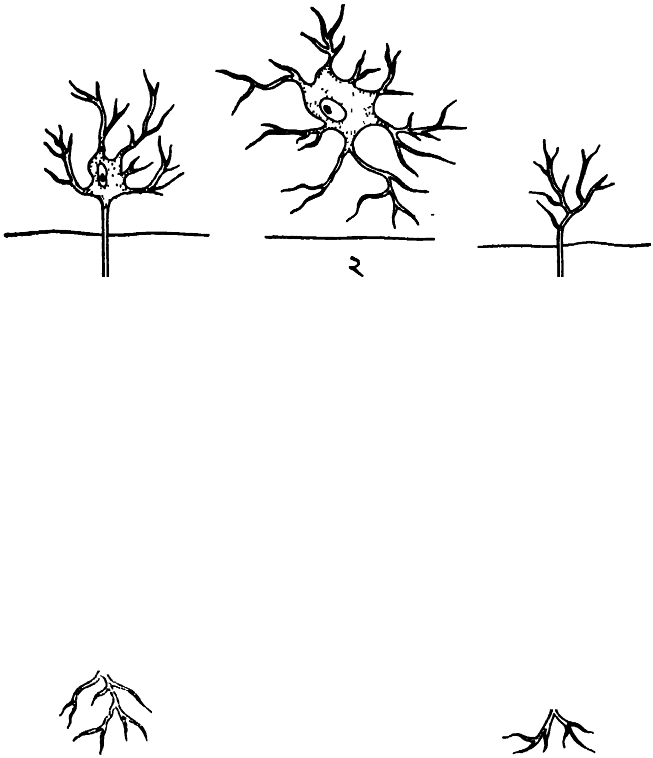
এ-পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের যেটুকু পরিচয় দেখা গেল প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত স্থূল ও বাহ্য পরিচয় মাত্র। যেমন কোন শহরের টেলিফোন-ব্যবস্থা বোঝবার জন্য আমরা যদি শুধুমাত্র বাইরে থেকে টেলিফোন-অফিসের বড় বড় বাড়ি এবং রাস্তার টেলিফোন লাইনগুলি দেখে বেড়াই তাহলে টেলিফোন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সামান্য



৫ : স্নায়ুর প্রস্থচ্ছেদ-চিত্র

কিছু স্থূল ধারণা হবে; তেমনি শুধুমাত্র মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও স্নায়ুগুলির বাহ্য পরিচয় থেকে স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত সামান্যমাত্র ধারণা পাওয়া সম্ভব। স্নায়ুতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্য এই অঙ্গগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন প্রভৃতি বোঝা দরকার। আসলে মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও স্নায়ুগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। একটি দৃষ্টান্ত থেকেই এই সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি স্নায়ুকে মাঝখান থেকে কেটে ফেলে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে বহু অংশু (Fibre) বর্তমান। যে-অন্তর্মুখী স্নায়ু চোখ এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আমাদের শরীরের মধ্যে সেইটি খুব বড় স্নায়ু এবং অণুবীক্ষণের সাহায্যে তার মধ্যে ৪০০,০০০ অংশু দেখা যায়। অংশুগুলি অবশ্যই অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু কোন কোন

ংশুর দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশি। উড্ওয়ার্থ স্নায়ুগুলিকে টেলিফোন-তারের সঙ্গে তুলনা

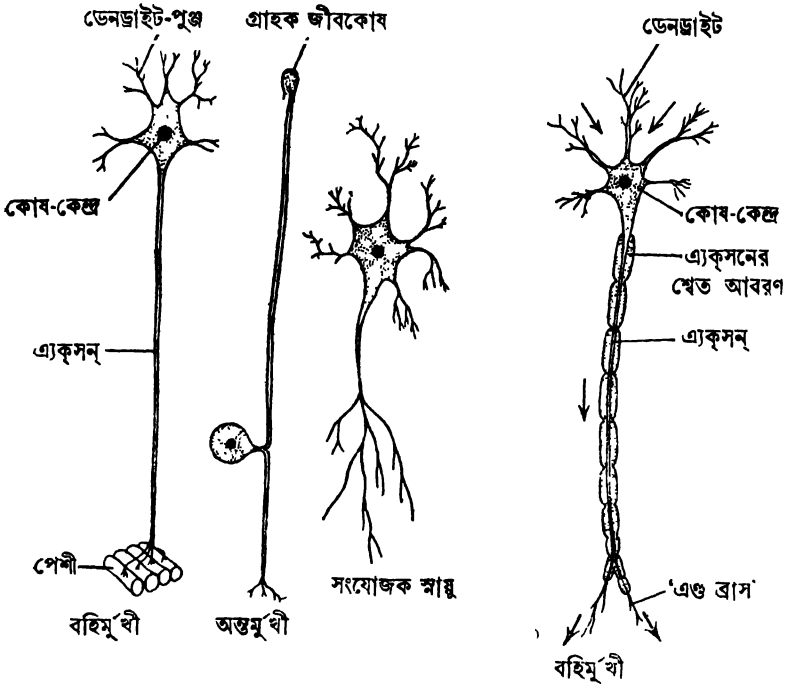


৬ : বিভিন্ন প্রকারের নিউরন বা স্নায়ুকোষ :
(১) বহির্মুখী, (২) সংযোজক এবং (৩) অন্তর্মুখী

রেছেন : টেলিফোনের তারের মধ্যে ধাতুনির্মিত অনেকগুলি সূক্ষ্ম তারের গুচ্ছ াকে, তেমনি একটি স্নায়ুকে কাটলেও দেখা যায় সেটির মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ংশু-গুচ্ছ আছে। বস্তুত স্নায়ুর অন্তর্ভুক্ত অংশুর সাহায্যেই স্নায়ুটি কোন গ্রাহক া কোন কারকের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করে—অর্থাৎ, ংশুগুলি কোন-না-কোন গ্রাহক থেকে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্র পর্যন্ত কিংবা স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্র থকে কোন-না-কোন কারক পর্যন্ত প্রসারিত এবং এই অংশুগুলির মাধ্যমেই ায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয়।

স্নায়ুর আভ্যন্তরীণ এই অংশগুলি আসলে কী? তা বোঝবার জন্য প্রথমে াধারণভাবে নিউরনের পরিচয় দেখা দরকার। প্রধানত যে-জাতীয় জীবকোষ দ্বারা

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাকে নিউরন বলে। নিউরনগুলিকে মোটের উপর তি

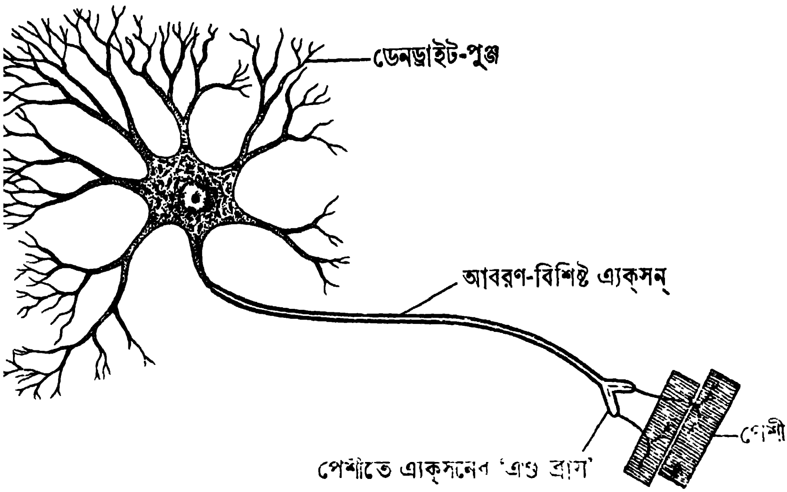


৭ : বিভিন্ন প্রকারের নিউরন এবং সেগুলির বিভিন্ন অংশ

জাতে ভাগ করা হয় : (১) অন্তর্মুখী, (২) বহির্মুখী এবং (৩) সংযোজক। এই তিন জাতের নিউরনের কাজের পার্থক্য আছে, গড়নেরও পার্থক্য আছে। তবুও মোটের উপর বলা যায় সমস্ত নিউরনেরই তিনটি অংশ আছে। একটি অংশকে বলা হয় কোষ-কেন্দ্র (Call Body), বাকি দুটি অংশ বলতে দু'রকমের শাখা। এক ধরণের শাখার নাম দেওয়া হয় ডেনড্রাইট (Dendrite), আর একরকম শাখার নাম দেওয়া হয় এ্যাক্‌সন্ (Axon)। স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের ব্যাপারে কোষ-কেন্দ্রের অবদান অত্যন্ত গৌণ; প্রধান অবদান বলতে নিউরনের শাখাগুলির। তবুও দেহের সমস্ত কোষের মতই নিউরন নামের কোষগুলিও জীবন্ত বস্তু; তাই এগুলির জীবনধারণের জন্য পুষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। নিউরনের কোষ-কেন্দ্রই এ-জাতীয় প্রয়োজন সমাধা করে।

সমস্ত জাতীয় নিউরনের যদিও কোষ-কেন্দ্র, ডেনড্রাইট এবং এ্যাক্‌সন্ নামের তিনটি প্রধান অংশ আছে তবুও গঠনের দিক থেকে নিউরনগুলির মধ্যে পার্থক্যও

র্তমান। মোটের উপর বলা যায়, উপরোক্ত তিন জাতের নিউরনের মধ্যে এক-

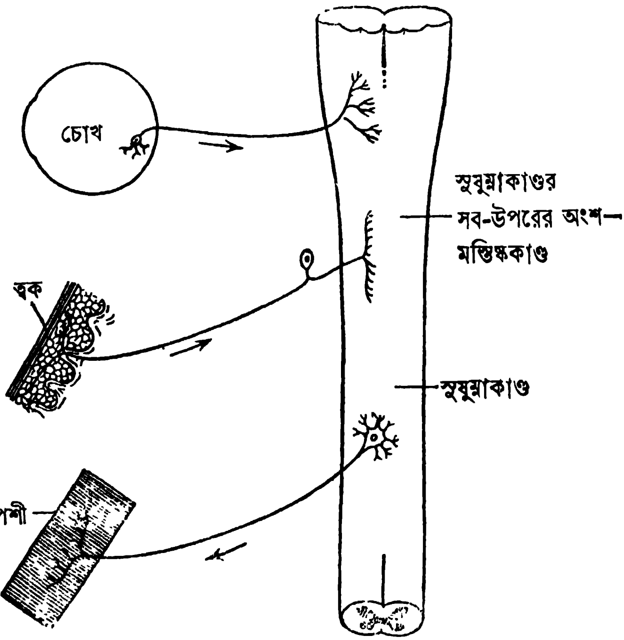


৮ : একটি বহির্মুখী নিউরন

মের গড়ন হল অন্তর্মুখী নিউরনের এবং আর একরকম গড়ন হল বহির্মুখী ও যাজক নিউরনের।

বহির্মুখী ও সংযোজক নিউরনের ক্ষেত্রে কোষ-কেন্দ্রের একদিকে প্রসারিত আছে নক অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব শাখাপ্রশাখা; এই শাখাপ্রশাখাগুলিই নিউরনটির ড্রাইট এবং নিউরনটির কোষ-কেন্দ্র যেন ডেনড্রাইট-পুঞ্জ দ্বারা পরিবৃত। জাতীয় নিউরনের কোষ-কেন্দ্রের অপরদিক থেকে প্রসারিত হয় একটি ন্ত সরু ও সুদীর্ঘ শাখা; এই শাখাটিই নিউরনের এ্যাক্সন্। এ্যাক্সনের শেষ ন্তটি সাধারণত একজাতীয় প্রান্ত-উপশাখায় বিভক্ত, সেই প্রান্ত-উপশাখাকে ও ব্রাস' (End Brush) বলা হয়। সব এ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য সমান নয়: ন নিউরনের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত ছোট, আবার কোন নিউরনের ক্ষেত্রে তা নকি এক মিটারের চেয়েও বেশি দীর্ঘ হতে পারে। মনে রাখা দরকার, পুরো উরন বলতে একটি জীবকোষ-মাত্র এবং তা আকারে এত ছোট যে অণুবীক্ষণের হায্য ছাড়া তাকে দেখা সম্ভব নয়; অতএব তারই এ্যাক্সনের এ-জাতীয় দৈর্ঘ্য খুই আশ্চর্যজনক বিবেচিত হবে। বলাই বাহুল্য, অসামান্য দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ক্সন্‌টি অতি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম রেশমের সুতোর চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম। এ্যাক্সনের রে সাধারণত একরকম বহিরাবরণ (Sheath বা Insulating Material) ক।

অন্তর্মুখী নিউরনের গড়ন কিছুটা অন্য রকম। তার কোষ-কেন্দ্র ডেনড্রাইট-পুঞ্জ দ্বারা পরিবৃত নয়। অন্তর্মুখী নিউরনের ডেনড্রাইট বলতে মাত্র একটি দীর্ঘ শাখা এবং এই শাখাটি অনেকাংশে বহির্মুখী নিউরনের এ্যাক্‌সনের মতই। অন্তর্মুখী নিউরনেরও অপরদিকে এ্যাক্‌সন্ নামের একটি শাখা প্রসারিত এবং এই এ্যাক্‌সনের শেষ প্রান্তও 'এণ্ড ব্রাস' নামের সূক্ষ্ম উপশাখায় বিভক্ত। অন্তর্মুখী নিউরনের যেখানে ডেনড্রাইটের শেষ এবং এ্যাক্‌সনের শুরু সেইখানে একটু পাশের দিকে বেরিয়ে থাকা অবস্থায় কোষ-কেন্দ্রটি এই উভয় শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। অতএব, ডেনড্রাইট দিয়ে স্নায়বিক শক্তি এলে তা খুব সম্ভব সরাসরি এ্যাক্‌সনের



৯ : অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ুর সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের যোগাযোগ

মধ্যে পরিবাহিত হয়—অর্থাৎ, স্নায়বিক শক্তি সম্ভবত কোষ-কেন্দ্রে প্রবেশই করে না। অন্তর্মুখী নিউরনের এ্যাক্‌সন্ এবং ডেনড্রাইট প্রায় একই রকম—অর্থাৎ উভয়ই হল বহির্মুখী নিউরনের এ্যাক্‌সনের মত। অবশ্য কোন কোন অন্তর্মুখী নিউরনের ডেনড্রাইট বলে শাখা নেই—অর্থাৎ, সেগুলির শুধুমাত্র এ্যাক্‌সন্ শাখা বর্তমান।

ইতিপূর্বে স্নায়ুর অন্তর্ভুক্ত যে অংশুগুলি (Fibres) উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির ত্যেকটিই আসলে এক-একটি এ্যাক্‌সন্‌, অবশ্য সেই এ্যাক্‌সনের উপর আবরণ sulating Sheath) আছে। বহির্মুখী নিউরনের ক্ষেত্রে কোষ-কেন্দ্রটি মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তার এ্যাক্‌সন্‌ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের ক—অর্থাৎ, কোন পেশী বা গ্রন্থির দিকে—প্রসারিত। এ-জাতীয় নিউরনের ধ্যে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রের ভিতর থেকে পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত । অন্তর্মুখী নিউরনের কোষ-কেন্দ্র মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডর বাইরে কোথাও স্থিত এবং তার এ্যাক্‌সনের শেষ প্রান্ত মস্তিষ্ক বা সুষুম্না-কাণ্ডর অভ্যন্তর পর্যন্ত ারিত। অতএব স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রের বাইরে থেকে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রর অভ্যন্তরে ায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয় অন্তর্মুখী নিউরনের ডেনড্রাইট এবং এ্যাক্‌সনের াস্থতায়। তবে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় জাতীয় নিউরনের পক্ষে স্নায়বিক ক্তি পরিবহণের কথা বোঝার জন্য দুটি নিউরনের যোগস্থল বা প্রান্ত-সন্নিকর্ষর ynapse) আলোচনা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে বলেছি, গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়র জীবকোষে উদ্দীপক এলে উদ্বুদ্ধ হয় ায়বিক শক্তি। এখানে উল্লেখ করা দরকার, গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়র ভিতরকার যে- বকোষগুলি এভাবে উদ্দীপিত হয় সেগুলিও আসলে নিউরনই। এ-জাতীয় উরনকে স্বভাবতই আমরা অন্তর্মুখী বলব; কেননা এগুলিতে উদ্বুদ্ধ স্নায়বিক ক্তি স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্র-অভিমুখে (অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক অভিমুখে) াহিত হয়।

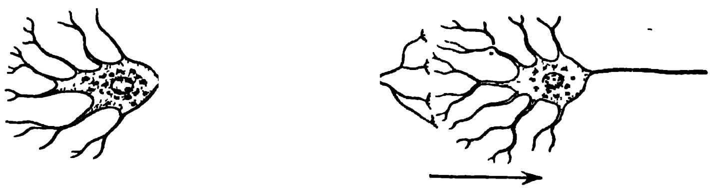
॥ প্রান্ত-সন্নিকর্ষ (Synapse)

সাধারণত শরীরের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন অন্তর্মুখী নিউরনের ডেনড্রাইট ুক্ত থাকে; বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ে উদ্দীপক এলে ইন্দ্রিয়স্থ গ্রাহক নিউরোন-এ ায়বিক শক্তি সৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত অন্তর্মুখী নিউরনের ডেনড্রাইটের ধ্য তা প্রবাহিত হয়। তারপর স্নায়বিক শক্তি সেই নিউরনের ডেনড্রাইট ক এ্যাক্‌সনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। সাধারণত এই প্রথম নিউরনটির এ্যাক্‌সন- ন্তর সঙ্গে পরবর্তী এক বা একাধিক নিউরনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের একজাতীয় ত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যমূলক সম্পর্ক থাকে; এ-জাতীয় সম্পর্ককে বলা হয় প্রান্ত- কর্ষ (Synapse)।

প্রান্ত-সন্নিকর্ষ বলতে কী বোঝায়? ভ্রূণাবস্থায়—জন্মের বহু পূর্বে—আমাদের রের প্রতিটি নিউরনের ইতিহাস শুরু হয় এক রকম গোলাকার জীবকোষ

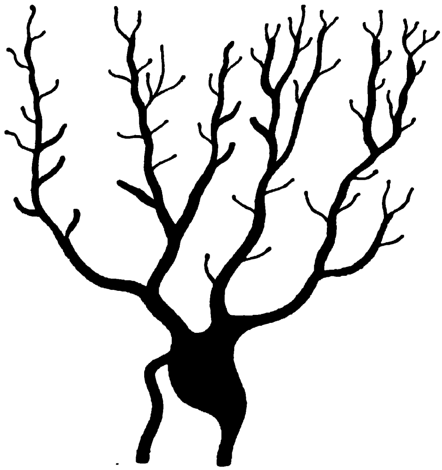
হিসাবে ; এ-জাতীয় প্রতিটি গোলাকার জীবকোষ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছি তার কিছু পরে ঐ গোলাকার জীবকোষগুলি থেকে ক্রমশ এ্যাক্‌সন ও ডেন্‌ড্রা নামের শাখা বেরোয় এবং জীবকোষগুলি ক্রমশ সুস্পষ্ট নিউরনের রূপ গ্রহণ ক কিন্তু তবুও প্রতিটি নিউরন শরীরের মধ্যে স্বতন্ত্র জীবকোষ হিসাবেই বর্তমান থা কিন্তু নিউরনগুলির এ-জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটির সঙ্গে অপর এক বা একা নিউরনের অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যমূলক একজাতীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে : সাধার পূর্ববর্তী নিউরনটির এ্যাক্‌সন-প্রান্ত পরবর্তী (এক বা একাধিক) নিউরনের ডেন্‌ড্রা গুলিকে এমন ঘেঁষাঘেঁষিভাবে জড়িয়ে রাখে যে উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকলেও পূর্ববর্তী নিউরনের এ্যাক্‌সন-প্রান্ত পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি এসে পৌ তারই প্রভাবে পরবর্তী নিউরনের মধ্যে স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয়। নিউর মধ্যে এ-জাতীয় ঘনিষ্ঠ বা ঘেঁষাঘেঁষি সম্পর্ককে বলে প্রান্ত-সন্নিকর্ষ।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে দুটি নিউরনের মধ্যে প্রান্ত-সন্নিকর্ষের প দেখা যাক। প্রথম নিউরনের এ্যাক্‌সন-প্রান্তে 'এণ্ড ব্রাস' বলে যে সরু সরু উপ সেগুলি দ্বিতীয় নিউরনের ডেনড্রাইটগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে এবং এ-জাতীয় নি



১০ : প্রান্ত-সন্নিকর্ষ (কাল্পনিক চিত্র)।
বর্তমান গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত দ্বিবর্ণ চিত্র দ্রষ্টব্য।

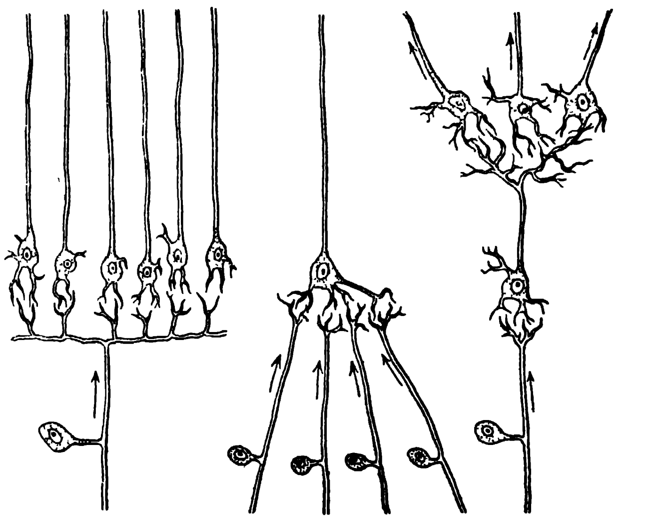
সংযোগের ফলে প্রথম নিউরনটির পক্ষে দ্বিতীয় নিউরনটিকে উদ্দীপিত করা স প্রান্ত-সন্নিকর্ষের মধ্যে দিয়ে স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের দিক (direction) অনি ভাবেই প্রথমটির এ্যাক্‌সন থেকে দ্বিতীয়টির ডেন্‌ড্রাইট অভিমুখে। সংক্ষে এ্যাক্‌সন→ডেন্‌ড্রাইট। এই নিয়মকে বলে **সম্মুখ পরিবহণমূলক নি** **(Law of forward conduction)**। তাহলে, পরপর একই সারিতে ক নিউরনের প্রান্ত-সন্নিকর্ষ কল্পনা করলে এই নিয়ম অনুসারে স্নায়বিক শক্তি কী সম্মুখের দিকে পরিবাহিত হবে ? প্রথম নিউরনের ডেন্‌ড্রাইট→প্রথম নিউ এ্যাক্‌সন→দ্বিতীয় নিউরনের ডেন্‌ড্রাইট→দ্বিতীয় নিউরনের এ্যাক্‌সন→তৃ নিউরনের ডেন্‌ড্রাইট→তৃতীয় নিউরনের এ্যাক্‌সন→চতুর্থ নিউরনের ডেন্‌ড্রাই



প্রান্ত-সন্নিকর্ষ (Synapse) : পৃষ্ঠা ৪৯-৫২ দ্রষ্টব্য। উপরের ছবিতে কালো রঙ-এ প্রথম নিউরোণের এক্‌সনের শেষ প্রান্ত (End-brush) দেখানো হয়েছে। লাল রঙ-এ দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় নিউরোণের কেন্দ্র এবং ডেন্‌ড্রাইড্‌।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, একই নিউরনের মধ্যে স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের অভিমুখ যদিও ডেন্‌ড্রাইট থেকে এ্যক্‌সনের দিকে, তবুও এক নিউরন থেকে অপর নিউরনের মধ্যে স্নায়বিক শক্তি পারবহণের অভিমুখ আসলে এ্যক্‌সন থেকে ডেন্‌ড্রাইটের দিকে।

এই প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। যদিও সাধারণত বলা হয় প্রান্ত-সন্নিকর্ষ পেরিয়ে একটি নিউরন থেকে অপর একটি নিউরনে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয় তবুও প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত প্রথম নিউরনটির এ্যক্‌সন প্রান্ত দ্বিতীয়টির ডেন্‌ড্রাইট প্রান্তকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে দ্বিতীয়টির মধ্যে তার নিজস্ব স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয়। উপমা হিসাবে বলা যায়: পর পর কয়েকটি আতসবাজি সাজিয়ে রাখলে যেমন প্রথমটিতে অগ্নিসংযোগের ফলে একের পর এক আতস বাজিগুলি জ্বলে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আগুন পৌঁছুবে আতসবাজিগুলির সারির অপর প্রান্তে অনেকটা সেইভাবেই প্রান্ত-সন্নিকর্ষমূলক সংযোগ-সম্পন্ন নিউরনগুলির ক্ষেত্রেও প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করবে, যদিও চলতি কথায় বলা হয় স্নায়বিক শক্তি প্রান্ত-সন্নিকর্ষ পেরিয়ে এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে প্রবাহিত হয়।



১১ : প্রান্ত-সন্নিকর্ষের জটিলতা

দ্বিতীয়ত, স্নায়ুতন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে নিউরনগুলির মধ্যে প্রান্ত-সন্নিকর্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। আসলে নিউরনগুলি মালার মত একই সারিতে পর পর সাজানো নয়।

সাধারণত একই নিউরনের এ্যক্‌সন-প্রান্তের সঙ্গে অন্যান্য বহু নিউরনের ডেন্‌ড্রাইট্‌-প্রান্তের প্রান্ত-সন্নিকর্ষ বর্তমান এবং ঐ নিউরনটি অন্যান্য নিউরনের যে-কোনটিকে বা একাধারে সবগুলিকেই একসঙ্গে উদ্দীপিত করতে পারে। প্রান্ত-সন্নিকর্ষের এখানে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সরল দৃষ্টান্তের চিত্র দেওয়া গেল। কিন্তু নিউরনগুলির মধ্যে এ-জাতীয় জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে এমন সামগ্রিক সংহতি বর্তমান যার ফলে আমাদের আচরণ সুসংহত হতে পারে।

৫ ॥ স্নায়বিক শক্তি (Nervous Impulse)

আমরা দেখেছি, বহির্জগৎ থেকে কোন উদ্দীপক শরীরের কোন ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক পর্যন্ত এলে সেই ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী নিউরন উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে কোন একপ্রকার 'উদ্দীপনা' সুষুম্নাকাণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছোয়। আবার মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডর বহির্মুখী নিউরন উদ্দীপিত হলে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে কোন একরকম 'উদ্দীপনা' মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডর ভিতর থেকে শেষ পর্যন্ত শরীরের কোন পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু এই 'উদ্দীপনা' বলতে ঠিক কী বোঝায়? অন্তর্মুখী নিউরন বা বহির্মুখী নিউরন ঠিক কী পরিবহণ করে? উত্তরে বলা হয়, স্নায়বিক শক্তি (Nervous Impulse)। কিন্তু এই স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ কী? একজাতীয় পরীক্ষার ফলে মনে হয় স্নায়বিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির মত; আর একজাতীয় পরীক্ষার ফলে মনে হয় তার স্বরূপ বহুলাংশে রাসায়নিক। অতএব সিদ্ধান্ত করা হয়, এখন পর্যন্ত আমরা স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে জানতে পারিনি; বর্তমান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে একে কোনরকম বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক (Electro-Chemical) শক্তি মনে করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, বহির্জগৎ থেকে আসা উদ্দীপকের স্পর্শে নিউরনের মধ্যে এই শক্তি উদ্দীপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বহির্জগৎ থেকে শক্তিটি নিউরনের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না, শক্তিটির প্রকৃত উৎস বলতে নিউরনই। দ্বিতীয়ত, এই শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হলেও তার প্রভাবে পেশী বা কেন্দ্রীয় নিউরন সক্রিয় হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, এই শক্তি পরিবাহিত হবার গতি সবসময় সমান নয়; তবুও সাধারণভাবে বলা যায় তা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫ মিটার। স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের এ-জাতীয় দ্রুতগতির ফলেই আমাদের আচরণ অনেক সময় অত্যন্ত ক্ষিপ্র হতে পারে।

স্নায়বিক শক্তি প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক নিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। তাকে বলা

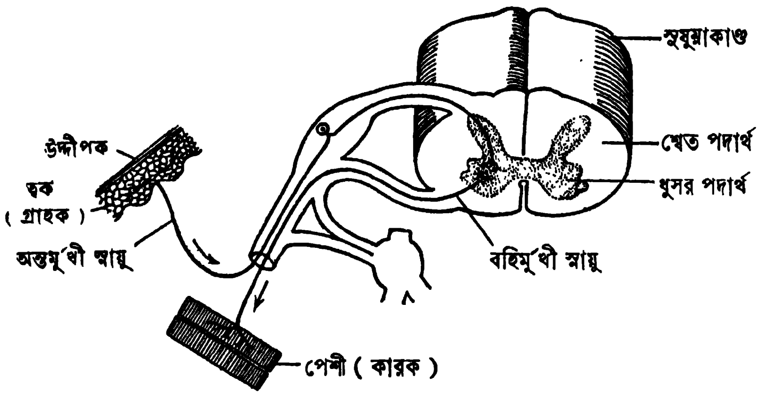
হয় **স্নায়ু ও পেশীতে পূর্ণ-বা-ব্যর্থ-নিয়ম** (**All-or-None Law in Nerve and Muscle**)। নিয়মটির ব্যাখ্যায় উড্‌ওয়ার্থ বোমা বিস্ফোরণের উপমা ব্যবহার করেছেন। বোমার সলতেয় আগুন দিলে বোমা ফাটবে; কিন্তু তার মানে এই নয় যে সলতেয় বেশি আগুন দিলে বিস্ফোরণ বেশি প্রচণ্ড হবে, সলতেয় কম আগুন দিলে বিস্ফোরণ কম হবে। সলতে যদি না-ধরে তাহলে বিস্ফোরণ হবেই না; সলতে যদি ধরে তাহলে বিস্ফোরণ হবে এবং বিস্ফোরণ যদি হয় তাহলে সলতের আগুনের উপর তার প্রচণ্ডতা নির্ভর করবে না; নির্ভর করবে বোমার ভিতরকার বারুদের উপর বা বোমার উপর। অর্থাৎ, একই বোমায় কম বা বেশি অগ্নিপ্রয়োগ করে বিস্ফোরণকে কমানো বা বাড়ানো সম্ভব নয়: হয় বিস্ফোরণ হবে, নইলে হবে না, কিন্তু যদি হয় তাহলে তা সমানই হবে। একটি নির্দিষ্ট পেশীর এবং নির্দিষ্ট স্নায়ুর অংশুর ক্ষেত্রেও একই ধরনের নিয়ম: স্নায়ুর অংশুটি হয় কোন স্নায়বিক শক্তি পরিবহণ করবে আর না-হয় ত করবে না; কিন্তু যদি একান্তই কোন স্নায়বিক শক্তি পরিবহণ করে তাহলে তার পক্ষে ঠিক যে-নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পরিবহণের কথা সেই পরিমাণ শক্তিই পরিবহণ করবে; কোন অবস্থাতেই কমও নয়, বেশিও নয়। এমন হতে পারে যে তার প্রভাবে অন্তর্মুখী একটি নিউরন উদ্দীপিতই হল না; কিন্তু নিউরনটি যদি একান্তই উদ্দীপিত হয় তাহলে তার মধ্যে যে-পরিমাণ স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে তা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট; উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর এই স্নায়বিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে না। একটি নির্দিষ্ট পেশী বা পেশীর অংশুর (Muscle fibre) বেলাতেও একই কথা: যদি একান্তই তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে তারও নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির পরিচায়ক প্রতিক্রিয়াই হবে—কমও নয়, বেশিও নয়।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই পূর্ণ-বা-ব্যর্থ নিয়মটির বিরুদ্ধে সংশয় জাগতে পারে। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা হল উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রতিক্রিয়ারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, আলো যত তীব্র হয় ততই বাড়ে সংবেদনার তীব্রতাও, কিংবা প্রয়াস-বৃদ্ধির ফলে পেশীর কর্মশক্তিও বৃদ্ধি পায়। আসলে পূর্ণ-বা-ব্যর্থ নিয়ম সত্ত্বেও দুটি কারণে এ-জাতীয় ঘটনা সম্ভব। প্রথমত, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের বেশি সংখ্যক নিউরন উদ্দীপিত হয়; ফলে প্রতিটি নিউরনে তার নিজস্ব বা নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হলেও মোট স্নায়বিক শক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়। তেমনি, দুর্বল স্নায়বিক শক্তি পেশীতে পৌঁছুলে পেশীর অংশুগুলির (Muscle fibres) মধ্যে মাত্র স্বল্পসংখ্যক সক্রিয় হয়; বেশি পরিরাণ স্নায়বিক শক্তি এলে সক্রিয় হয় বেশি সংখ্যক অংশু। দ্বিতীয়ত, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে একই নিউরনে প্রতি সেকেণ্ডে

বেশি বার করে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হতে পারে ; তেমনি পেশীর প্রতিটি অংশুও বেশি বার করে সক্রিয় হতে পারে।

৬॥ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc)

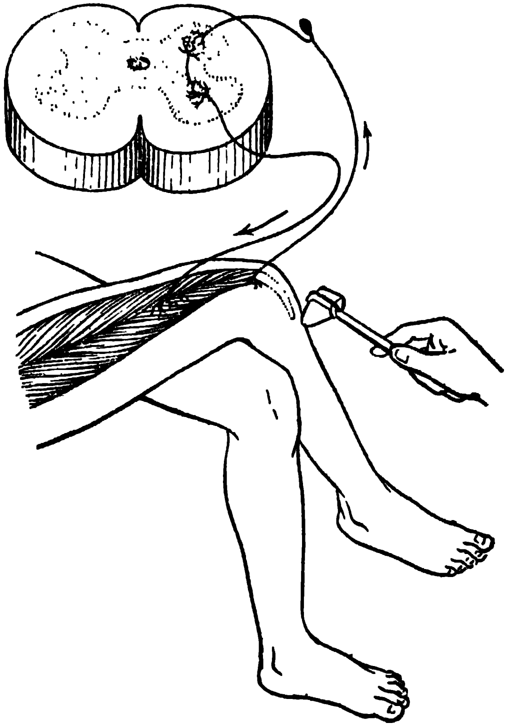
অনেক সময় উদ্দীপক আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেহ যেন যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে। যেমন, হাতে আগুনের ছেঁকা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রচালিতের মত হাতটা সরিয়েনি। এ-জাতীয় আচরণকে বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)। কোন গ্রাহক ও কারকের মধ্যে জন্মগত ও সরাসরি (Direct) স্নায়বিক



১২ : প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (ক)

যোগাযোগের ফলেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে। সরাসরি স্নায়বিক যোগাযোগের সবচেয়ে সরল দৃষ্টান্ত হবে, কোন গ্রাহক থেকে আসা একটি অন্তর্মুখী স্নায়ুর সঙ্গে (বা স্নায়ুর অংশুর সঙ্গে) অপর একটি বহির্মুখী স্নায়ুর (বা স্নায়ুর অংশুর) প্রান্ত-সন্নিকর্ষ ; এই প্রান্ত-সন্নিকর্ষ সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ, গ্রাহক থেকে আসা একটি অন্তর্মুখী স্নায়ুর এ্যক্সন-প্রান্ত সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরে অপর একটি বহির্মুখী স্নায়ুর ডেনড্রাইট-প্রান্তের সঙ্গে প্রান্ত-সন্নিকর্ষমূলক সংযোগ স্থাপন করলে গ্রাহকের নিউরন উদ্দীপিত হলে অন্তর্মুখী স্নায়ুটি দিয়ে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হবে বহির্মুখী স্নায়ুটি পর্যন্ত এবং তারই ফলে বহির্মুখী স্নায়ুটি দিয়ে স্নায়বিক শক্তি কোন কারক পর্যন্ত পৌঁছুবে ; অতএব গ্রাহক উদ্দীপিত হবার ফলে প্রায় যন্ত্রচালিতের মত কারকটি সক্রিয় হবে। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে গ্রাহক থেকে কারক পর্যন্ত যে সরাসরি স্নায়বিক পথ—অর্থাৎ, যার ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্ভব হয়—তাকে বলে **প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc)**। অবশ্যই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ শুধুমাত্র দুটি স্নায়ু (বা

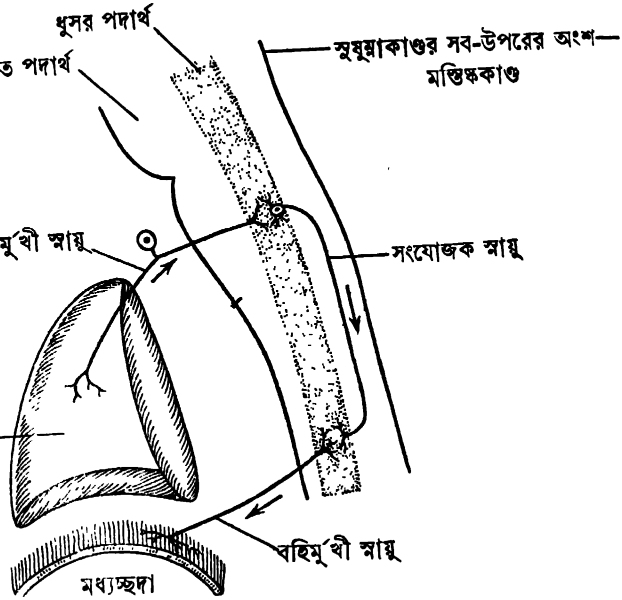
স্নায়ুর অংশ) দিয়ে গঠিত হতে বাধ্য নয়। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশে অন্তর্মুখী নিউরন এবং বহির্মুখী নিউরনের মধ্যে সংযোজক নিউরন



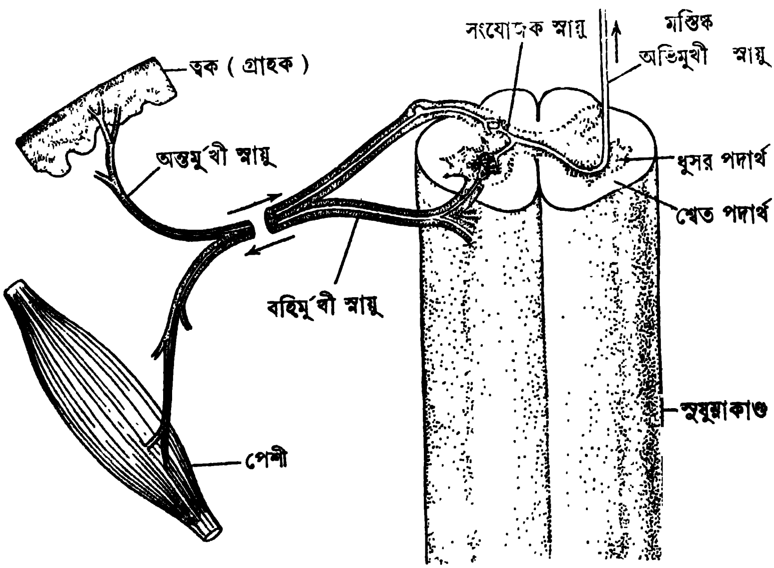
১৩ : প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (খ) : এই জাতীয় স্নায়বিক যোগাযোগের ফলে হাঁটুর কাছে ঠোকা দিলে প্রায় যন্ত্রচালিতের মত পায়ে ঝাঁকুনী দেখা দেয়

বর্তমান থাকে—অর্থাৎ, সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে অন্তর্মুখী নিউরনের সঙ্গে সংযোজক নিউরনের প্রান্ত-সন্নিকর্ষ থাকে আবার এই সংযোজক নিউরনটির সঙ্গে প্রান্ত-সন্নিকর্ষ থাকে বহির্মুখী নিউরনের। তাই সাধারণ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের গডন হল : গ্রাহক→অন্তর্মুখী নিউরন→সংযোজক নিউরন→কারক।

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের এই সরল বর্ণনাটি সম্পূর্ণ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করায় অতিসারল্যের আশঙ্কা থাকে। কেননা, বাস্তবভাবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন অত্যন্ত জটিল এবং এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ



১৪ : প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (গ) : এই জাতীয় স্নায়বিক যোগাযোগের ফলে আমরা প্রায় যন্ত্রচালিতের মত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করি



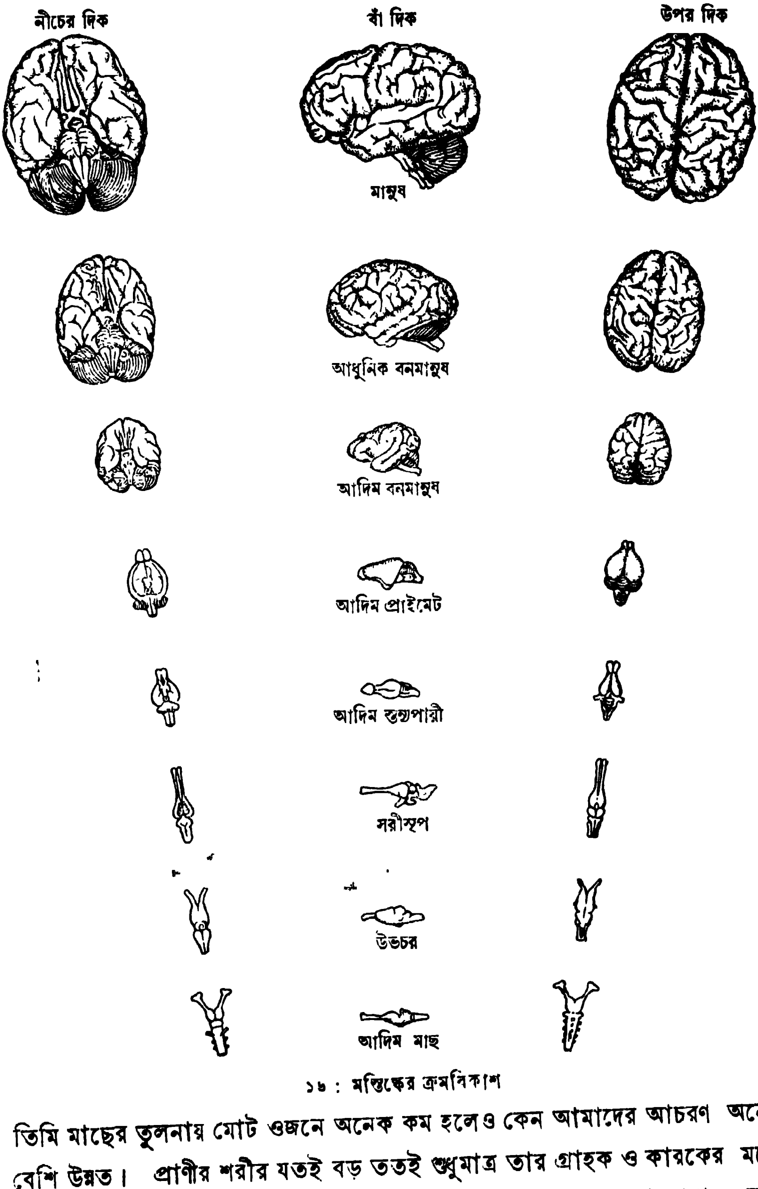
১৫ : প্রতিবৃত্ত বৃত্তাংশ (ঘ) : এই চিত্রে মস্তিষ্কের সঙ্গে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশর যোগাযোগ নির্দিষ্ট হয়েছে

বলতে কোন এক স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন বোঝায় না—সামগ্রিক স্নায়ুতন্ত্রটি তার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়বিক যোগাযোগ আছে এবং এইভাবে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশটি অন্যান্য নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কর সঙ্গেও সংযুক্ত। ফলে, প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের অন্তর্মুখী নিউরন দিয়ে আসা স্নায়বিক শক্তি ঐ মস্তিষ্কমুখী নিউরনেও স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করে এবং তারই ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রও উদ্বুদ্ধ হয়; অতএব, মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র থেকে বহির্মুখী নিউরনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্নায়বিক শক্তি প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের নিউরনকেও এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যার ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়াটিই অবরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন, হাতে আগুনের ছেঁকা লাগা সত্ত্বেও আমি ইচ্ছে করেই হাত সরিয়ে নিলাম না। অবশ্য সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়বিক যোগাযোগ কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

৭ ॥ মস্তিষ্ক (Brain)

প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে আচরণের সরলতম নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বাস্তবভাবে আমাদের সাধারণ আচরণ অনেক বেশি জটিল। কিন্তু সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও সামগ্রিক আচরণের মধ্যে সংহতি আছে। এবং এই সংহতি রক্ষার প্রধানতম দায়িত্ব আমাদের মস্তিষ্কের উপর। বস্তুত সমগ্র জীবরাজ্যে মানব-আচরণই যে সর্বোন্নত তার প্রধান কারণ হল মানুষের উন্নততম মস্তিষ্ক। পোকামাকড় থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে মস্তিষ্কের এই ক্রমোন্নতি স্পষ্টই দেখা যায়। অবশ্যই প্রাণীর শরীর যত বড় ততই বেশি প্রয়োজন হয় গ্রাহক ও কারকের উন্নতি এবং এগুলির মধ্যে সংহতি রক্ষার জন্য তুলনায় বড় আকারের মস্তিষ্ক। কিন্তু শুধুমাত্র বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণ এবং তারই সঙ্গে সংহতি রক্ষা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনার জন্য বৃহত্তর শরীরের পক্ষে আকারে বৃহত্তর মস্তিষ্কের প্রয়োজন হলেও, মস্তিষ্কের এই বৃহত্তর আকারের উপরই উন্নততর আচরণের যোগ্যতা নির্ভর করে না। আকারের দিক থেকে কোন কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক মানুষের চেয়ে অনেক বড়: গড়পড়তা হিসাবে মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড; তুলনায় হাতির মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দশ পাউণ্ড, তিমি মাছের প্রায় চৌদ্দ পাউণ্ড। কিন্তু হাতি ও তিমি মাছের পক্ষে তুলনায় অনেক বেশি বিশালকায় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে হয়। সমগ্র দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের ওজনের আনুপাতিক সম্পর্কই উন্নততর আচরণের জন্য দায়ী: মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হল ১।৫০, হাতির ক্ষেত্রে ১।৫০০, তিমি মাছের ক্ষেত্রে ১।১০০০। অতএব মানুষের

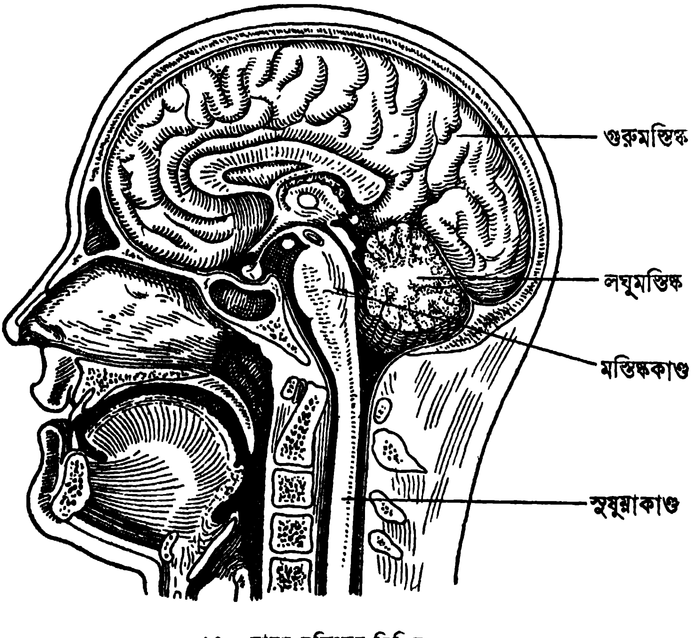
শরীরের অনুপাতে তার মস্তিষ্ক হাতি বা তিমি মাছের শরীরের অনুপাতে তাদের মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক বড়। এইদিক থেকে বোঝা যায় আমাদের মস্তিষ্ক হাতি বা



১৬ : মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ

তিমি মাছের তুলনায় মোট ওজনে অনেক কম হলেও কেন আমাদের আচরণ অনেক বেশি উন্নত। প্রাণীর শরীর যতই বড় ততই শুধুমাত্র তার গ্রাহক ও কারকের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার জন্য এবং জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন শ্বাসপ্রশ্বাস, হজম

প্রভৃতি দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জন্য বেশি পরিমাণে মস্তিষ্ক-টিস্যুর (Brain tissue) প্রয়োজন হয়। অতএব তুলনায় ছোট আকারের দেহের সঙ্গে ছোট আকারের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় আকারের দেহের সঙ্গে বড আকারের মস্তিষ্কের বিশেষ কোন সুবিধা নেই। নিছক জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন ছোট শরীরের আচরণ-পরিচালনার জন্য ছোট মস্তিষ্ক এবং বড় শরীরের আচরণ-পরিচালনার জন্য বড মস্তিষ্ক সমান উপযোগী ; এই কারণে হাতি ও তিমি মাছের অমন বিরাটাকার মস্তিষ্কও তাদের শুধুমাত্র সরল ও বাঁধাধরা আচরণেরই উপযোগী করে ; কিন্তু শরীরের অনুপাতে বড় মস্তিষ্কের ফলে এ-জাতীয় সরল ও বাঁধাধরা আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্ক-টিস্যু ছাড়াও মানুষের মস্তিষ্কের বৃহত্তম বাকি অংশ তাকে উপযোগী করে শিক্ষা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি অনেক জটিল ও উন্নত আচরণের জন্য। স্বভাবতই গড়নের দিক থেকেও মানুষের এ-জাতীয় মস্তিষ্ক অনেক উন্নত রূপ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। আদিম মাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণীজগতে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলে মস্তিষ্কের আকার ও গডন উভয়েরই উন্নতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অতএব



১৭ : মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

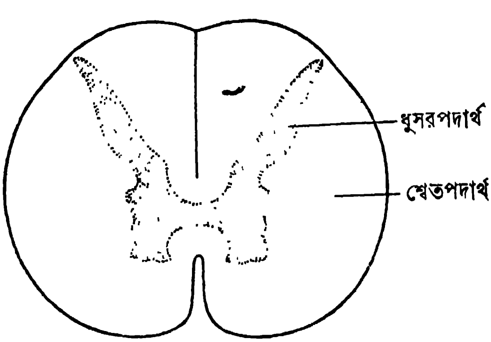
উন্নততর মানব-আচরণ বোঝবার জন্য তার এই উন্নততর মস্তিষ্কের কথাও বোঝা দরকার।

মানব-আচরণকে বোঝবার জন্য মস্তিষ্কের নিম্নোক্ত প্রধান বিভাগের আলোচনা প্রয়োজন। এগুলির নাম হল : (১) মস্তিষ্ককাণ্ড (Brain Stem), অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ডের উপরদিককার যে-অংশটি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে মধ্য-মস্তিষ্ক (Interbrain) পর্যন্ত পৌঁছেছে ; এই মস্তিষ্ককাণ্ডকে সুষুম্নাকাণ্ডরই সব-উপরকার অংশ বলে গ্রহণ করা যায়। (২) গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)। (৩) লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)।

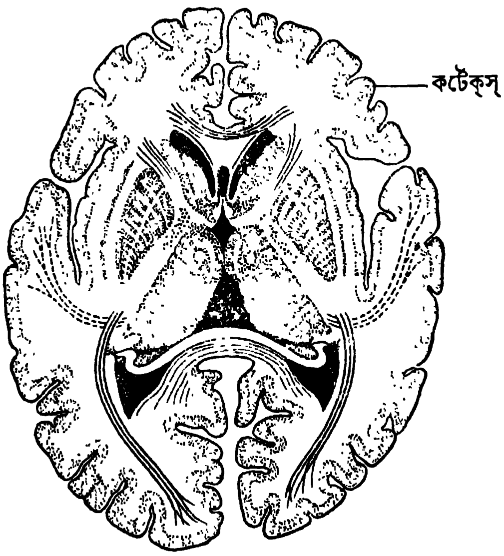
আমরা একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে দেখবো, মস্তিষ্কের এই অংশগুলির মধ্যে গুরুমস্তিষ্কের উপরই আমাদের আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বুদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নততম মানব-আচরণগুলির কথা ছাড়াও এমন কি গ্রাহকের কাছ থেকে সংবেদন-গ্রহণ এবং শরীরের কারক (পেশী ও গ্রন্থি) পরিচালনের মত অপেক্ষাকৃত সরল কার্যেরও চূড়ান্ত দায়িত্ব গুরুমস্তিষ্কের উপর। কিন্তু গুরুমস্তিষ্ক সরাসরিভাবে গ্রাহক বা কারকের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। গ্রাহক বা কারকগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের (বিশেষত সুষুম্নাকাণ্ডের সর্বোচ্চ অংশ বা মস্তিষ্ককাণ্ডের) সঙ্গে সংযুক্ত। সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্ক-কাণ্ড আবার গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। সুষুম্নাকাণ্ড (বিশেষত মস্তিষ্ককাণ্ডের) যে-কেন্দ্র-গুলি সরাসরি ভাবে গ্রাহক বা কারকের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলিকে ঐ গ্রাহক বা কারকের 'নিম্নতর কেন্দ্র' (Lower Centre) বলা হয়। আবার গুরুমস্তিষ্কের বিবিধ কেন্দ্র উক্ত 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির সঙ্গে সংযুক্ত : গুরুমস্তিষ্কের ঐ কেন্দ্রগুলিকে গ্রাহক ও কারকের 'উচ্চতর কেন্দ্র' (Higher Centre) বলা হয়। উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি যেন 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলির অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করে : গ্রাহক থেকে কোন 'সংবাদ' পেলে 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি সে-সংবাদ গুরুমস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্র' পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবে এবং এই 'উচ্চতর কেন্দ্রে'ই সংবাদটি সংবেদনের (Sensation) রূপ গ্রহণ করবে ; আবার 'উচ্চতর কেন্দ্র' থেকে কোন 'নির্দেশ' পেলে 'নিম্নতর কেন্দ্র' সে-নির্দেশ শরীরের কোন কারকের (পেশী বা গ্রন্থির) কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং তারই ফলে সক্রিয় হবে কারকটি।

হাত, পা এবং অধিকাংশ দেহকাণ্ডের (অর্থাৎ মাথা ও হাত-পা বাদে শরীরের বাকি অংশের) সরাসরি স্নায়ু-সংযোগ সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে ; সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যেই এই অঙ্গগুলির 'নিম্নতর কেন্দ্র' (Lower Centres) বর্তমান। হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী, মাথা এবং মুখের স্নায়ু-সংযোগ মস্তিষ্ককাণ্ডের সঙ্গে ; মস্তিষ্ককাণ্ডের মধ্যেই এই অঙ্গ-গুলির 'নিম্নতর কেন্দ্র' বর্তমান। স্নায়ুতন্ত্রের 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি (Higher Centres) গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত ; 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলির সঙ্গে 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির সাক্ষাৎ যোগাযোগ বর্তমান এবং এই 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির মাধ্যমেই মস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি শরীরের গ্রাহক ও কারকের সঙ্গে সম্পর্কিত।

নিম্নতর ও উচ্চতর কেন্দ্রগুলির সুস্পষ্ট পরিচয়ের জন্য প্রথমে সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কর 'শ্বেতপদার্থ' (White Matter) এবং 'ধূসরপদার্থে'র (Grey Matter) পার্থক্য দেখা প্রয়োজন। সুষুম্নাকাণ্ডকে যদি মাঝখান থেকে কেটে ফেলা হয়—অর্থাৎ, প্রস্থচ্ছেদ (Cross-section) করে দেখা হয়—তাহলে দেখা যাবে তার বাইরের দিকের অংশ শ্বেতবর্ণ, মাঝখানে অনেকটা ইংরেজী H হরফের মত ধূসরবর্ণের অংশ। তেমনি, মস্তিষ্কেরও প্রস্থচ্ছেদ করলে শ্বেতবর্ণ অংশ ও ধূসরবর্ণ অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে। মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণ অংশ বলতে প্রধানতই গুরুমস্তিষ্কের বাইরের দিকের একটি খোসার মত---এই খোসার মত বাইরের দিকের ধূসর অংশকে বলা হয় কর্টেক্স্ (Cortex)। তাছাড়াও অবশ্য মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে নানা জায়গায় কম বেশি ধূসরবর্ণ অংশ আছে। সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের শ্বেতবর্ণ বস্তুকে বলা হয় 'শ্বেতপদার্থ', ধূসরবর্ণ বস্তুকে বলে 'ধূসরপদার্থ'। আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকাণ্ডের প্রায় অর্ধেকটা ধূসর পদার্থ, বাকি অর্ধেকটা শ্বেতপদার্থ।



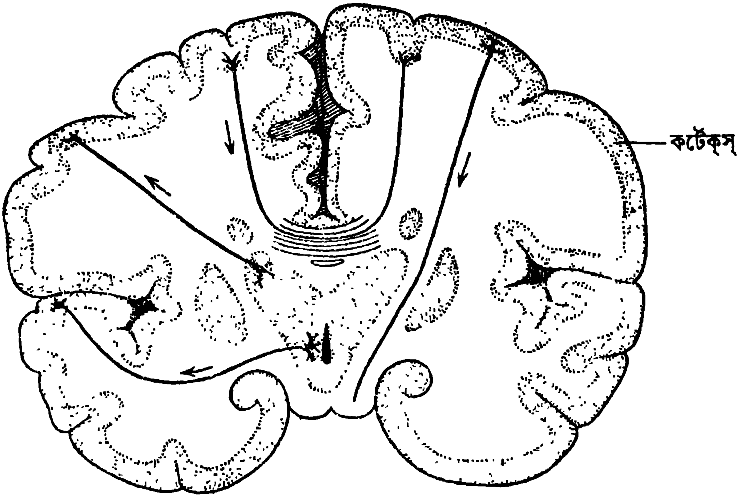
১৮ : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র



১৯ মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র (ক) : সমান্তরালভাবে কাটা
(Horizontal Section)

অনুবীক্ষণের সাহায্যে উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের শ্বেতপদার্থ স্নায়ু-অংশু (Nerve fibres) দ্বারা গঠিত—অংশুগুলি অত্যন্ত জটিল পথে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত এবং পরস্পরের সঙ্গে

সম্পর্কিত। ধূসরপদার্থ মূলতই বহু নিউরনের কোষ-কেন্দ্র ও ডেন্‌ড্রাইট্‌ দ্বারা গঠিত, এবং অবশ্য এই ডেন্‌ড্রাইটের সঙ্গে অন্যান্য নিউরনের এ্যক্‌সনের শেষভাগও।



২০ : মস্তিষ্কের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র (খ) : আড়াআড়িভাবে কাটা (Transverse Section)

সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ককাণ্ডর (Brain Stem) অভ্যন্তরের ধূসরপদার্থেই স্নায়ুতন্ত্রের 'নিম্নতর কেন্দ্র' (Lower Centres) বর্তমান এবং 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি প্রধানতই গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্‌স নামের ধূসর পদার্থে বর্তমান। যে-ভাবে শরীরের বিভিন্ন গ্রাহক ও কারকগুলি স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রের—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের—সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকটা সেইভাবেই মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরেও শ্বেত পদার্থের স্নায়ু-অংশু-গুলির সাহায্যে ধূসরপদার্থের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয়।

৮ ॥ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য নিরূপণের পদ্ধতি

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্য বিভিন্ন কী না—এ-বিষয়ে আধুনিককালে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। প্রথমাবস্থায় অবশ্য গল (Gall) মানুষের মাথার খুলি বা করোটির বৈশিষ্ট্য থেকেই কাল্পনিকভাবে মানসিক বৈশিষ্ট্যও অনুমান করতে চান; কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টার বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না। এ-বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার শুরু বলতে শরীরবিজ্ঞানীদের পক্ষে 'অপসারণ পদ্ধতি' (Method of Extirpation) অনুসারে পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হবার প্রয়াস। পায়রা বা বেড়াল জাতীয় প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে কোন একটি অংশ অপসারণ করে

(অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কেটে বাদ দিয়ে) তাঁরা প্রাণীটির আচরণ লক্ষ্য করতে থাকেন। ১৮২৫ সালে ফ্লোরেন্স (Flourens) এ-জাতীয় পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বলেন, প্রাণীটির লঘুমস্তিষ্ক বাদ দিলে তার দেহভঙ্গি রক্ষার এবং বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংহতি রক্ষার ক্ষমতা ব্যাহত হয়; মস্তিষ্ককাণ্ডের অংশবিশেষ বাদ দিলে তার শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য এবং শরীরের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ কার্য ব্যাহত হয়; গুরুমস্তিষ্ক আহত হলে হ্রাস পায় প্রচেষ্টামূলক ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি। এ-জাতীয় পরীক্ষা সত্ত্বেও ফ্লোরেন্স মনে করেন গুরুমস্তিষ্ক একটি অখণ্ড অঙ্গ হিসাবেই—অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবেই—কাজ করে। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণীর আচরণে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন ঘটে—অর্থাৎ, গুরুমস্তিষ্কও প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে কাজ করেনা, এই অঙ্গটির বিভিন্ন অংশের উপর আচরণের বিভিন্ন দিক নির্ভরশীল।

কিন্তু শুধুমাত্র পশুপাখী নিয়ে পরীক্ষা করেই আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য-নিরূপণের প্রয়াস করেন না; এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মানব-আচরণের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পরিদর্শনের উপরও নির্ভর করেন। অবশ্যই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন অংশ কেটে বাদ দিয়ে তার আচরণের তারতম্য দেখা সম্ভব নয়; কিন্তু তবুও টিউমার (tumour), গুলির আঘাত প্রভৃতি নানা কারণে মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার আচরণেরও বিবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়; এ-জাতীয় দৃষ্টান্তবলী থেকেও মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার আচরণের বিকার লক্ষ্য করার পর ব্যক্তিটির মৃত্যু হলে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যেতে পারে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে এ-জাতীয় আচরণ-বিকার দেখা দিয়েছিল।

সাম্প্রতিক কালে মোটের উপর চার রকম পদ্ধতি অনুসরণ করে শরীরবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই চারটি পদ্ধতি হল :—

(১) অপসারণ পদ্ধতি (Method of Extirpation)—অর্থাৎ পশু পাখীর মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অপসারণ করে তার আচরণের তারতম্য লক্ষ্য করা।

(২) রোগসংক্রান্ত পদ্ধতি (Pathological Method)—কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার আচরণে রোগলক্ষণ পরিলক্ষিত হলে অনেক সময় তার মৃত্যুর পর শব-ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে আঘাত বা অন্য কোন ক্ষতির লক্ষণ দেখা

যায় ; অতএব এই পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে আচরণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

(৩) উদ্দীপন পদ্ধতি (Method of Stimulation)—মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে দুর্বল বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ উদ্দীপিত হলে প্রাণীদেহে ঠিক কী ক্রিয়া ঘটে ; অতএব এই পদ্ধতির সাহায্যে শরীরের নির্দিষ্ট ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশের দায়িত্ব সনাক্ত করা সম্ভব।

(৪) স্নায়ু-অংশু অনুসরণ পদ্ধতি (Fibre Tracing Method)—শরীরের ভিতরকার স্নায়ুর অংশু (Nerve fibre) অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে মস্তিষ্কের কোন্ অংশের উপর ঠিক কোন্ ধরনের আচরণের দায়িত্ব। যেমন : হাতের পেশীর সঙ্গে যে বহির্মুখী স্নায়ুর সংযোগ তার আভ্যন্তরীণ অংশগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে সেগুলি কাঁধের কাছে সুষুম্নাকাণ্ডের কোন-এক নির্দিষ্ট স্থানে এসে পড়েছে ; অতএব আমরা বুঝতে পারি হাতের পেশী পরিচালনার জন্য 'নিম্নতর কেন্দ্র' (Lower Centre) বলতে সুষুম্নাকাণ্ডের ঐ নির্দিষ্ট অংশটি। আবার দেখা যায়, সুষুম্না কাণ্ডের এই 'নিম্নতর কেন্দ্র'টির সঙ্গে স্নায়ু-অংশুর সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট অংশ সংযুক্ত ; স্নায়ুর অংশু অনুসরণ করে মস্তিষ্কের এই নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত দেখবার পর আমরা বুঝতে পারি সেই নির্দিষ্ট অংশটিই হাতের পেশী পরিচালনার 'উচ্চতর কেন্দ্র' (Higher Centre) : অর্থাৎ মস্তিষ্কের এই 'উচ্চতর কেন্দ্র' থেকে স্নায়বিক শক্তি স্নায়ু-অংশুর মাধ্যমে এসে সুষুম্নাকাণ্ডের 'নিম্নতর কেন্দ্র'-কে উদ্দীপিত করে ; ফলে 'নিম্নতর কেন্দ্রটি' থেকে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাতের পেশীকে পরিচালনা করে। এইভাবে শরীরের বিভিন্ন গ্রাহক ও বিভিন্ন কারকের 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলির প্রত্যক্ষ স্নায়বিক যোগাযোগ আবিষ্কার করলে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি শরীরের কোন্ গ্রাহক বা কোন্ কারকের কার্যাবলী মস্তিষ্কের কোন অংশর উপর নির্ভরশীল।

এই জাতীয় নানা পদ্ধতির সাহায্যে শরীরবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চরম দায়িত্ব কর্টেক্স্-এর বিভিন্ন এলাকার উপর। স্বভাবতই মস্তিষ্কের এলাকাগুলিকে প্রধানত দু'ভাবে ভাগ করা হয় : (১) 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' (Motor Area) এবং (২) 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা' (Sensory Area)।

কর্টেক্স্-এর 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' বলতে কী বোঝায় ? কর্টেক্স্-এর যে-এলাকা থেকে শরীরের পেশী ও গ্রন্থি নামের কারকগুলি পরিচালনার 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, কর্টেক্স্-এর 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' থেকে এই 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনার ফলেই এই 'নিম্নতর

কেন্দ্র'গুলি শরীরের বিভিন্ন কারককে পরিচালিত করে। স্বভাবতই বহির্মুখী নিউরনের (Efferent বা Motor Neurone) সাহায্যেই কর্টেক্‌স্‌-এর এই 'কারক সংক্রান্ত এলাকার' সঙ্গে কারকগুলির 'নিম্নতর কেন্দ্র' সংযুক্ত, যেমন বহির্মুখী নিউরনের সাহায্যেই ওই 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন কারক সংযুক্ত।

অপরপক্ষে, শরীরের গ্রাহকগুলির সঙ্গে অন্তর্মুখী নিউরনের সাহায্যে 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি সংযুক্ত এবং কর্টেক্‌স্‌-এর যে-এলাকার সঙ্গে অন্তর্মুখী নিউরনের সাহায্যে গ্রাহকগুলির এই 'নিম্নতর কেন্দ্র' সংযুক্ত সেই এলাকাকে কর্টেক্‌স্‌-এর 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা' বলা হয়। অতএব শরীরের কোন গ্রাহকে উদ্দীপক এলে যে-স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে তা প্রথমত উদ্দীপিত করবে গ্রাহকগুলির 'নিম্নতর কেন্দ্র'কে; এবং অন্তর্মুখী নিউরনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে স্নায়বিক শক্তি কর্টেক্‌স্‌-এর 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা'কে উদ্দীপিত করবে। কর্টেক্‌স্‌-এর 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা' উদ্দীপিত হলে পাওয়া যায় সংবেদন (Sensation)। যেমন হাতে আগুনের ছেঁকা লাগল। ফলে হাতের সেই জায়গার গ্রাহক থেকে স্নায়বিক শক্তি প্রথমে গেল সুষুম্নাকাণ্ডর আভ্যন্তরীণ কোন 'নিম্নতর কেন্দ্র' পর্যন্ত এবং এই 'নিম্নতর কেন্দ্র' থেকে স্নায়বিক শক্তি কর্টেক্‌স্‌-এর কোন 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা' পর্যন্ত পরিচালিত হল। এবং 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা'র 'উচ্চতর কেন্দ্র' উদ্দীপিত হবার ফলে আমরা 'জ্বালা' বলে সংবেদন অনুভব করলাম।

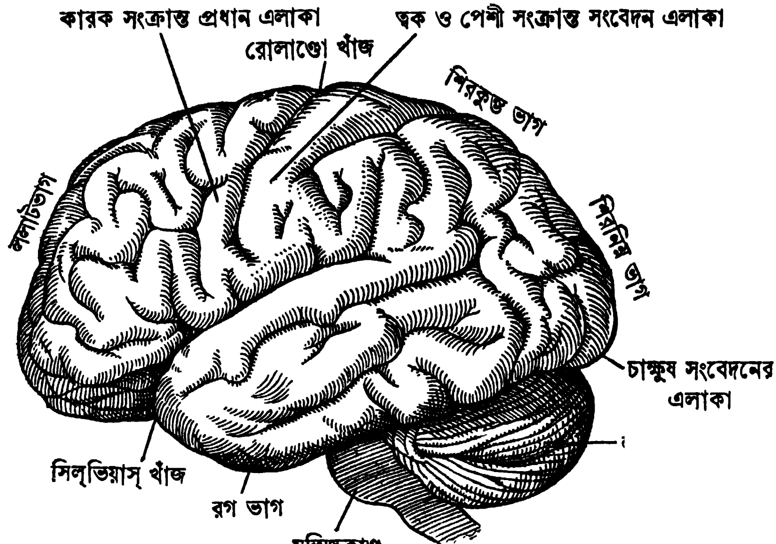
এবারে দেখা যাক, উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির উপর নির্ভর করে মস্তিষ্কর কোন্ কোন্ অংশর কোন্ ধরনের কার্যাবলী প্রমাণিত হয়েছে।

৯॥ মস্তিষ্কর বিভিন্ন অংশর বিভিন্ন কার্য

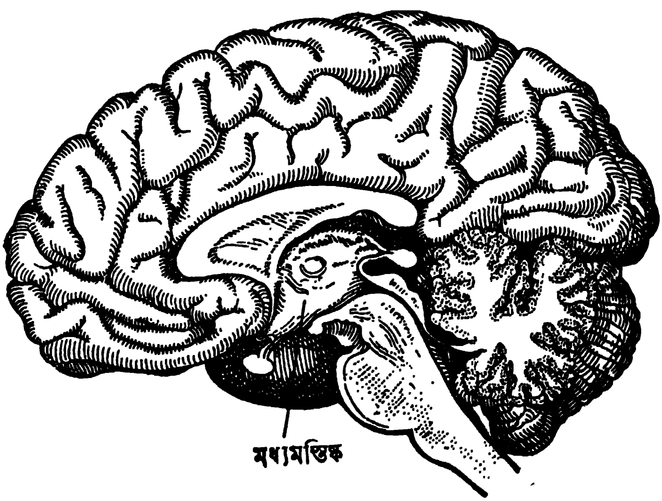
আমাদের মস্তিষ্কর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলতে গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)। আয়তনের দিক থেকে এই গুরুমস্তিষ্কটি বাকি স্নায়ুতন্ত্রর মিলিত আয়তনের চেয়ে বেশি। মানুষের করোটির অভ্যন্তরে গুরুমস্তিষ্কই অধিকাংশ স্থান দখল করেছে।

বাইরে থেকে দেখলে গুরুমস্তিষ্কর উপরিভাগকে খাঁজ-কাটা এবং কোঁচকানো-কোঁচকানো মত দেখায়। গুরুমস্তিষ্কর গড়ন এ-জাতীয় বলেই তার উপরের স্তরটির—অর্থাৎ কর্টেক্‌স্‌টির—আয়তন অনেক বেশি হওয়া সম্ভব হয়েছে; অন্যান্য জীবজন্তুর মস্তিষ্কের উপরিভাগ তুলনায় সমতল বা মসৃণ; মানুষের গুরুমস্তিষ্কর উপরিভাগও সমতল হলে আমাদের কর্টেক্‌স্‌-এর মোট আয়তন অনেক কম হত। গুরুমস্তিষ্কর উপরিভাগের এই খাঁজগুলিকে বলে 'ফিসার' (Fissure) এবং খাঁজ দিয়ে পৃথক্

করা উঁচু-উঁচু অংশ বা স্ফীতিকে বলে 'কন্‌ভলিউসন্' (Convolution) বা জাইয়ার (Gyre): অবশ্যই খাঁজগুলি অগভীর। তাই গুরুমস্তিষ্কর সবচেয়ে বাইরের দিকটিতে স্ফীতিগুলি (Convolutions) পরস্পর থেকে পৃথক হলেও একটু গভীর



২১ : গুরুমস্তিষ্কর বিভিন্ন অংশ এবং লঘুমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ককাণ্ড



২২ : মধ্যমস্তিষ্ক

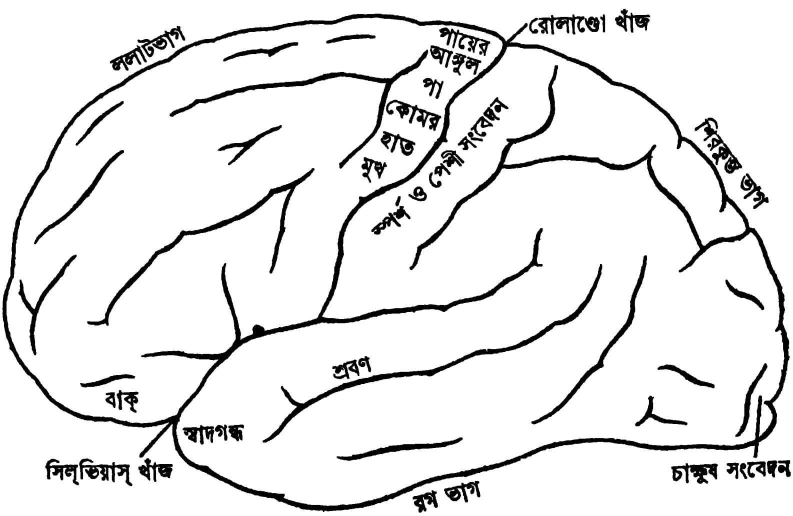
স্তরে মস্তিষ্কবস্তু নিরেট তালের মত। খাঁজগুলির মধ্যে প্রধানতম বলতে দুটি। একটির নাম দেওয়া হয় 'রোলাণ্ডো খাঁজ' (Fissure of Rolando), অপরটিকে বলা হয় 'সিল্‌ভিয়াস্ খাঁজ' (Fissure of Sylvius)।

গুরুমস্তিষ্ক কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলিকে বলা হয় 'লোব' (Lobe)। যথা: (১) ললাট ভাগ (Frontal Lobe), (২) শিরকুম্ভ ভাগ (Parietal Lobe), (৩) শিরনিম্ন ভাগ (Occipital Lobe), (৪) রগ ভাগ (Temporal Lobe)। ভাগগুলি অবশ্য স্বতন্ত্র অঙ্গ নয়; কেননা আগেই বলেছি একটু গভীরেই মস্তিষ্কবস্তু আসলে অখণ্ড তালের মত। কপালের দিক থেকে শুরু হয়ে ললাট ভাগটি (Frontal Lobe) রোলাণ্ডো খাঁজ পর্যন্ত গিয়েছে; রোলাণ্ডো-খাঁজের পর শুরু হয়েছে শিরকুম্ভ ভাগ (Parietal Lobe), তারপর মাথার পিছন-দিকটায় শিরনিম্ন ভাগ (Occipital Lobe); গুরুমস্তিষ্কর নিচের দিকটায় সিল্‌ভিয়াস্ খাঁজ দ্বারা ললাট ভাগ ও রগ ভাগ বিভক্ত।

রোলাণ্ডো খাঁজের ঠিক সামনের দিকে (অর্থাৎ ললাট অঞ্চলের দিকে) প্রথম কন্‌ভলিউসন্ বা স্ফীতিটিকে বলে 'প্রি-সেণ্ট্রাল জাইয়ার' (Pre-central Gyre)। গুরুমস্তিষ্কর কর্টেক্স্-এর এই অংশটিকে 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' (Motor Area) বলা হয়; কেননা এই অংশর নিউরনগুলির উপরই শরীরের পেশীগুলিকে পরিচালনা করার ভার। এখানে অনেকগুলি তুলনায় বড নিউরন আছে; সেগুলিকে বলা হয় 'বৃহদাকার কোষ' (Giant Cells)। এই নিউরনগুলির এ্যাক্সন্-প্রান্ত সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) এবং মস্তিষ্ককাণ্ডর (Brain Stem) আভ্যন্তরীণ 'নিম্নতর কারক কেন্দ্র'র (Lower Motor Centres) সঙ্গে সংযুক্ত: নিম্নতর কারক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বহির্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে শরীরের নানা কারক (প্রধানত পেশী) সংযুক্ত। অতএব, গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স্-এর এই অংশ উদ্দীপিত হলে স্নায়ুতন্ত্র মারফত স্নায়বিক শক্তি এসে সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ককাণ্ডর নিম্নতর কারক কেন্দ্রগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং এই নিম্নতর কেন্দ্রগুলি থেকে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি শরীরের নানা কারক পর্যন্ত পৌঁছোয়, ফলে সক্রিয় হয় কারকগুলি।

অবশ্যই গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স্-এর এই অংশটুকুর (Pre-central Gyre) আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্র শরীরের বিভিন্ন কারককে সক্রিয় করে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই অংশর বিভিন্ন স্থানে দুর্বল বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করলে শরীরের বিভিন্ন পেশী সক্রিয় হয়। যেমন, অংশটির একেবারে মাথার দিকে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করলে পদদ্বয় সক্রিয় হয়, আরো একটু নিচের দিকে প্রয়োগ করলে সক্রিয় হয় উদর এবং বুকপিঠের পেশী, আরো একটু নিচের দিকে প্রয়োগ করলে সক্রিয় হয়

হাতের পেশী—এইভাবে অংশটির নিম্নতম স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে তার ফলে সক্রিয় হয়েছে মুখাবয়বের পেশীগুলি। অর্থাৎ আমাদের শরীরে



২৩: গুরুমস্তিষ্কর গ্রাহক এবং কারক সংক্রান্ত এলাকা

পায়ের থেকে মুখ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গর পেশীগুলিকে পরিচালনা করার উচ্চতর কেন্দ্রগুলি গুরুমস্তিষ্কর কর্টেক্স-এর এই অংশটিতে ঠিক উল্‌টোভাবে অবস্থিত—সবচেয়ে তলার অঙ্গ পরিচালনার দায়িত্ব এই অংশর সবচেয়ে উপরের দিকের কেন্দ্রর, সবচেয়ে উপরের অঙ্গ পরিচালনার দায়িত্ব এই অংশর সবচেয়ে নিচের দিকের কেন্দ্রর। দুর্বল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগমূলক পরীক্ষা ছাড়াও দেখা গিয়েছে গুরুমস্তিষ্কর ওই অংশটির বিভিন্ন কেন্দ্র যখম হলে সেগুলি দ্বারা পরিচালিত পেশীগুলিতেও পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

অবশ্য গুরুমস্তিষ্কর এই অংশটিকেই সাধারণত 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' (Motor Area) বলে উল্লেখ করা হলেও গুরুমস্তিষ্কর ললাট অংশর (Frontal Lobe) দিকে এর ঠিক সামনের অংশটিও নানা প্রকার জটিল শারীরিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রকৃতপক্ষে 'কারক সংক্রান্ত এলাকা'র পূর্ণতর বিবরণে এই সামনের দিকের অংশটিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, যদিও সাধারণত এই সামনের অংশটিকে 'প্রাক্-কারক সংক্রান্ত এলাকা' (Pre-motor Area) বলে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া মনে রাখা দরকার, গুরুমস্তিষ্কর অন্যান্য অংশ থেকেও—যেমন শিরনিম্ন ভাগ (Occipital Lobe), রগ ভাগ (Temporal Lobe) এবং ললাট ভাগের (Frontal lobe)

অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও চোখ এবং মাথা নড়াবার জন্য দায়ি নানা পেশীকে পরিচালিত করা হয়।

গুরুমস্তিষ্কর 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। গুরুমস্তিষ্কর নানা অংশই অনেক বহির্মুখী স্নায়ু-অংশু (Nerve Fibre) দ্বারা মস্তিষ্ককাণ্ডর (Brain Stem) সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই মস্তিষ্ককাণ্ডর মাধ্যমেই গুরুমস্তিষ্ক এবং লঘুমস্তিষ্কও (Cerebellum) পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শরীরবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল দেহভঙ্গি এবং দেহের ভারসাম্য প্রভৃতি (posture, equilibrium and muscular steadiness) রক্ষার একমাত্র কেন্দ্র হল এই লঘুমস্তিষ্ক। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে বোঝা গিয়েছে, এ-জাতীয় কার্যাবলীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শুধুমাত্র লঘুমস্তিষ্কেরই নয়। বস্তুত গুরুমস্তিষ্কের সহযোগিতায় বা গুরুমস্তিষ্কর সঙ্গে মিলিতভ'বেই লঘুমস্তিষ্ক দেহের ভারসাম্য, দেহভঙ্গি প্রভৃতি রক্ষার কাজ করে, যদিও তুলনায় এ-ব্যাপারে লঘুমস্তিষ্কর দায়িত্ব মুখ্য।

এবারে গুরুমস্তিষ্কের 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা'-র বা 'সংবেদন এলাকা'র (Sensory Area) পরিচয় দেখা যাক—অর্থাৎ মস্তিষ্কের সেই কেন্দ্রগুলির পরিচয় দেখা যাক যেখানে গ্রাহক থেকে স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হলে সংবেদনের (Sensation) উদ্ভব হয়। অবশ্যই গুরুমস্তিষ্কর কর্টেক্স্-এর কোন অংশই সরাসরিভাবে শরীরের গ্রাহকগুলির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এই সংযোগ ঘটে মধ্যমস্তিষ্কর (Interbrain) মারফত। গুরুমস্তিষ্কর তলার দিকে এবং মস্তিষ্ককাণ্ডর (Brain Stem) মাথার উপরে এই মধ্যমস্তিষ্ক বর্তমান—মধ্যমস্তিষ্ককে বস্তুত মস্তিষ্ক-কাণ্ডরই উপরদিকের শেষ প্রান্ত বলা যায়। এখানে সংবেদন গ্রহণের 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলি বর্তমান। বিভিন্ন গ্রাহকের সঙ্গে অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে এই 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলিরই সরাসরি যোগাযোগ। এবং এই 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির সঙ্গে কর্টেক্স-এর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 'উচ্চতর কেন্দ্র'-র যোগাযোগ। অর্থাৎ, কোন গ্রাহক উদ্দীপিত হলে তার সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি প্রথমে মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত 'নিম্নতর কেন্দ্রে' পৌঁছোয়, সেখান থেকে আবার স্নায়বিক যোগাযোগের ফলে কর্টেক্স্-এর কোন 'উচ্চতর কেন্দ্রে' পরিচালিত হয় : এইভাবে স্নায়বিক শক্তি এসে কর্টেক্স্ এর 'উচ্চতর কেন্দ্র'-কে উদ্দীপিত করলে উদ্ভব হয় সংবেদন (Sensation)। অবশ্যই মধ্যমস্তিষ্ক খুব সম্ভব সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় কোন অঙ্গ নয়—অর্থাৎ তার কাজ বলতে সম্ভবত শুধু এই নয় যে গ্রাহক থেকে আসা স্নায়বিক শক্তিকে কর্টেক্স্-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া। সম্ভবত, এই মধ্যমস্তিষ্কেই সংবেদনের

পক্ষে নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিক কার্য সমাধা হয়। কিন্তু গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-বিষয়ে খুব সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলেও মোটের উপর সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, মধ্যমস্তিষ্কের 'নিম্নতর কেন্দ্র'গুলির মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত কর্টেক্স-এর নানা কেন্দ্রে স্নায়বিক শক্তি পৌঁছোয় এবং সংবেদনের উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনের 'উচ্চতর কেন্দ্র' কর্টেক্স্-এর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ২৩নং চিত্রে দেখা যাবে 'কারক সংক্রান্ত এলাকা'র ঠিক পিছনে রোলাণ্ডো খাঁজ। এই রোলাণ্ডো খাঁজের ঠিক পিছনে কর্টেক্স্-এর এক-ফালি অংশকে বলে 'পোষ্ট-সেণ্ট্রাল-জাইয়ার' (Post-central Gyre); ত্বক ও পেশী সংক্রান্ত সংবেদনের 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি কর্টেক্স্-এর এই অংশে অবস্থিত। কর্টেক্স্-এর এই অংশ আহত হলে আমরা স্পর্শ-সংবেদন (Touch Sensation) এবং শরীরের পেশী-সঞ্চালন সংক্রান্ত সংবেদন থেকে বঞ্চিত হব। স্পর্শ ও পেশী-সঞ্চালনের সংবেদন সংক্রান্ত গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়কে বলা হয় 'সোমেস্থেসিস্' (Somesthesis); অতএব গুরু-মস্তিষ্কর কর্টেক্স্-এর আলোচ্য ফালিটিকে বলা হয় 'সোমেস্থেটিক্ এলাকা' (Somesthetic Area)।

গুরুমস্তিষ্কর রগ ভাগে (Temporal Lobe) একটি ক্ষুদ্র অংশে শ্রবণ-সংবেদনের (Auditory Sensation) 'উচ্চতর কেন্দ্র': অর্থাৎ কান (শ্রবণেন্দ্রিয়) থেকে স্নায়বিক শক্তি প্রথমে আসে মধ্যমস্তিষ্কর 'নিম্নতর কেন্দ্রে' এবং সেখান থেকে কর্টেক্স্-এর এই অংশে অবস্থিত 'উচ্চতর কেন্দ্র'-কে উদ্দীপিত করলে শ্রবণ-সংবেদনের উদ্ভব হয়। গুরুমস্তিষ্কর শিরনিম্ন ভাগের (Occipital Lobe) একটি ক্ষুদ্র অংশকে 'দর্শন এলাকা' (Visual Area) বলা হয়; কেননা দর্শন সংবেদনের 'উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি প্রধানত কর্টেক্স্-এর এই অংশে অবস্থিত। অর্থাৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয় থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি মধ্যমস্তিষ্কর 'নিম্নতর কেন্দ্রে' পরিচালিত হয় এবং সেখান থেকে স্নায়বিক শক্তি কর্টেক্স্-এর উক্ত অংশটিতে পরিচালিত হয়ে আমাদের দর্শন সংবেদন দেয়। তেমনি, গুরুমস্তিষ্কর তলার দিকে 'সিলভিয়াস্' খাঁজের ঠিক পরে 'হিপোক্যাম্পাল'-নামক ভাগে (Hippocampal Lobe) ঘ্রাণ ও স্বাদ সংবেদনের কেন্দ্র প্রমাণিত হয়েছে।

গুরুমস্তিষ্কর বিভিন্ন অংশর বিভিন্ন কার্য সম্বন্ধে পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'কারক সংক্রান্ত এলাকা' (Motor Area) এবং 'গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা' বা 'সংবেদন এলাকা' (Sensory Area) হিসেবে প্রমাণিত কর্টেক্স্-এর অংশগুলি কর্টেক্স্-এর মোট আয়তনের তুলনায় প্রায় যৎসামান্য। অর্থাৎ, কর্টেক্স্-এর

অধিকাংশ অংশই সংবেদন-গ্রহণের বা পেশী (ও গ্রন্থি) পরিচালনের কাজে লিপ্ত নয়। তাহলে কর্টেক্স্-এর এই বেশির ভাগ বাকি অংশর কাজ কী? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে বহু নিউরন এবং মস্তিষ্কর বিভিন্ন অংশর মধ্যে অত্যন্ত জটিলভাবে সংযোগ-স্থাপক বহু স্নায়ু-অংশু বর্তমান। অনুমান হয় কর্টেক্স্-এর এই বাকি অংশ স্নায়ুতন্ত্রর কার্যে সুউন্নত সংহতিসাধন করে, ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয় আমাদের আচরণ। বস্তুত, পশু-আচরণের তুলনায় বুদ্ধি, চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি মানব-আচরণের প্রকৃত উন্নততর দিকগুলি মানব কর্টেক্স্-এর এই বৃহত্তর আয়তনের উপর নির্ভরশীল বলেই অনুমিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংবেদন

১॥ সংবেদনের অর্থ (Meaning of Sensation)

মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম বিষয়বস্তু মানব-আচরণ, অর্থাৎ বহির্জগৎ ও মানুষের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ইতিপূর্বে আচরণের একটি সরল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি: চোখে দেখলাম সামনে সাপ রয়েছে, লাঠি এনে সাপটা মেরে ফেললাম। এই দৃষ্টান্তর প্রথমাংশকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হবে: চক্ষু-ইন্দ্রিয়র সাহায্যে সাপ নামের সম্মুখস্থ বস্তুটির প্রত্যক্ষ (Perception) ঘটল। স্বভাবতই এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ থেকেই আচরণের বিচার শুরু হতে পারে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানে যে-মতের বিশেষ প্রাধান্য ছিল তার নাম অবয়ববাদ (Structuralism); ভুণ্ড্ট (Wundt), টিচেনার (Titchener) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এই মতের সমর্থক ছিলেন। এঁদের প্রধানতম প্রচেষ্টা ছিল, বিশ্লেষণের সাহায্যে জটিল মানসিক অবস্থার সরল উপাদান নির্ণয় করা। এই মতে প্রত্যক্ষও একটি অপেক্ষাকৃত জটিল মানসিক অবস্থা; অতএব অবয়ববাদীরা প্রত্যক্ষকেও বিচার করে তার সরলতম উপাদান নির্ণয় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছেন এবং এই সরলতম উপাদানেরই আখ্যা দেওয়া হয়েছে সংবেদন (Sensation)। অতএব সংবেদনের অর্থ অবগতির জন্য প্রত্যক্ষর উক্ত দৃষ্টান্তটিই বিশ্লেষণ করা যাক।

চোখে দেখলাম সামনে সাপ রয়েছে। প্রথমত, সূর্যের আলো সাপের উপর থেকে আমার চোখ পর্যন্ত ফিরে এসেছে। এই আলোকে বলা হয় উদ্দীপক। দ্বিতীয়ত, বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের জন্য আমার শরীরে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় রয়েছে। উদ্দীপকের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরীণ নিউরনে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় এবং অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে গুরুমস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্রে' স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হলে গুরুমস্তিষ্কে যে-প্রক্রিয়া ঘটে তারই চরম পরিণাম হল প্রত্যক্ষ। গুরুমস্তিষ্কের এই প্রক্রিয়া অবশ্যই জটিল; কিন্তু অনুমান করা যায় যে তা মোটের উপর দু' অবস্থায় বিভক্ত। প্রথম অবস্থাকে বলা যায় গ্রহণমূলক, দ্বিতীয়কে বলা যায় ব্যাখ্যা-মূলক। অর্থাৎ, গুরুমস্তিষ্কর 'উচ্চতর কেন্দ্র' স্নায়বিক শক্তি শুধু গ্রহণই করে না;

তাছাড়াও উচ্চতর প্রক্রিয়া হিসাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেন তার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও উদ্ভাবন করে। যেমন সামনের বস্তুটিকে সাপ বলে প্রত্যক্ষ করা মানেই অন্যান্য বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য, সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য, সম্মুখের কোন নির্দিষ্ট স্থানে বস্তুটির অবস্থিতি সংক্রান্ত বিবিধ বিচার বা ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া প্রয়োজন। অবশ্যই এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বা বিচার মূলক প্রক্রিয়াগুলি প্রকটভাবে বর্তমান নয়। কিন্তু অনুমানমূলকভাবে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে গুরুমস্তিষ্কর পক্ষে স্নায়বিক শক্তি গ্রহণ করা ছাড়াও এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বা বিচার মূলক প্রক্রিয়া অন্তর্নিহিত থাকতে বাধ্য। অতএব অন্তত তত্ত্বগতভাবে প্রত্যক্ষ নামের অপেক্ষাকৃত জটিল অভিজ্ঞাকে গ্রহণমূলক এবং বিচার-ব্যাখ্যা মূলক দ্বিবিধ উপাদানে বিশ্লেষণ করা যায়। এবং এ-জাতীয় তত্ত্বগত বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে প্রত্যক্ষর প্রথম—অর্থাৎ নিছক গ্রহণাত্মক—উপাদানটিকে সংবেদন আখ্যা দেওয়া হয়। বিচার-ব্যাখ্যার সাহায্যে সংবেদন পরিণত হয় প্রত্যক্ষে। অবশ্যই আমাদের পরিণত বয়সের বাস্তব প্রত্যক্ষ একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বিশেষ; তার মধ্যে বিশুদ্ধ গ্রহণাত্মক কোন স্বতন্ত্র উপাদান সুস্পষ্ট নয়। হয়ত নবজাত শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বিশুদ্ধ সংবেদনের মূর্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে; কেননা উপরোক্ত বিচার-ব্যাখ্যার জন্য যে-পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নবজাতকের পক্ষে তার প্রশ্ন ওঠে না। তবে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী দাবি করেছেন, আমাদের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাতেও বিশুদ্ধ সংবেদনের মূর্ত দৃষ্টান্ত স্বীকারযোগ্য: যেমন, বিস্ফোরণের শব্দে গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে প্রথম মুহূর্তে শব্দের নিছক সংবেদনই হয়, যদিও অচিরে আমরা সংবেদনটিকে প্রত্যক্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকি। এ-জাতীয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মানতে হবে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ-জাতীয়ই; অর্থাৎ সংবেদনের অস্তিত্ব প্রধানতই অনুমানমূলক। অনুমানের সাহায্যেই বলা যায়, প্রত্যক্ষর সরলতম উপাদান হল সংবেদন: উদ্দীপকের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের নিউরনে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় এবং অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি গুরুমস্তিষ্কে পরিচালিত হলে গুরুমস্তিষ্ক প্রথমত শুধু তা গ্রহণই করে এবং নিছক গ্রহণাত্মক এই প্রক্রিয়াটিকেই সংবেদন বলা হয়।

সংবেদন নিছক গ্রহণাত্মক বলেই তাকে বস্তুকেন্দ্রিক (Objective) বলে বর্ণনা করা হয়; অর্থাৎ বহির্বস্তু থেকে আসা উদ্দীপকের উপরই—অতএব বহির্বস্তুর উপরই—আমাদের অধিকাংশ সংবেদন নির্ভরশীল। এই কারণে আরো বলা হয়, সংবেদনের ক্ষেত্রে বহির্জগতের দিক থেকে আমাদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার উপর

এক জাতীয় বাধ্য-বাধকতা (Objective Coercion) বর্তমান : চোখে নীল আলো এলে আমরা নীলের সংবেদন পেতে বাধ্য, লাল আলো এলে আমরা বাধ্য লালের অভিজ্ঞতা পেতে। এবং সংবেদনের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বহির্বস্তুর মুখাপেক্ষী বলেই অভিজ্ঞতা হিসাবে সংবেদনকে নিষ্ক্রিয় (Passive) বলা হয়, অর্থাৎ সংবেদনের ক্ষেত্রে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে উদ্দীপক শুধুমাত্র গ্রহণই করি।

২ ॥ **সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation)**

টিচেনারের মতে সংবেদনের ধর্ম প্রধানত চার রকম : (১) গুণ (Quality), (২) তীব্রতা (Intensity), (৩) স্বচ্ছতা (Clearness) এবং (৪) স্থায়িত্ব (Duration)।

(১) সংবেদনের গুণ : যে-ধর্মের দরুণ এক-জাতীয় সংবেদনের সঙ্গে অপর জাতীয় সংবেদনের পার্থক্য তাকে সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন, গুণের দিক থেকে কোন সংবেদন চাক্ষুষ (Visual), কোন সংবেদন শ্রৌত (Auditory), ইত্যাদি। আলোক তরঙ্গর সাহায্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে চাক্ষুষ সংবেদন হয়, বায়ু-তরঙ্গর সাহায্যে শ্রবণেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে শ্রৌত সংবেদন হয়।

বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনের বিশিষ্ট গুণের ব্যাখ্যায় মুয়েলার (Müller) **বিশিষ্ট স্নায়বিক শক্তি সংক্রান্ত মতবাদ (Theory of Specific Energy)** প্রস্তাব করেছেন। এই মতে প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারাই এবং নিজস্ব নির্দিষ্ট-ভাবেই উদ্দীপিত হয় এবং সেই ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুও শুধুমাত্র এক জাতীয় নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তিই পরিবহণ করতে পারে। যেমন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়র নির্দিষ্ট উদ্দীপক হল আলোক-তরঙ্গ ; (সাধারণ ক্ষেত্রে) শুধুমাত্র আলোক-তরঙ্গ দ্বারাই ইন্দ্রিয়টি উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে উদ্বুদ্ধ হয় এক নির্দিষ্ট জাতের স্নায়বিক শক্তিই। যদিই বা এই নিয়মের প্রথমাংশের ব্যতিক্রম হিসাবে ইন্দ্রিয়টি অপর কোন উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয়ও তাহলেও কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়র নিউরনে উপরোক্ত নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তিই উদ্বুদ্ধ হবে এবং সেই ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পরিবাহিত হয়ে সুনির্দিষ্ট সংবেদনই সৃষ্টি করবে। যেমন, মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চক্ষু-ইন্দ্রিয়র আভ্যন্তরীণ নিউরন অকস্মাৎ রক্ত চলাচল বৃদ্ধিজনিত এক প্রকারের উদ্দীপক পায় ; এ-উদ্দীপক বলতে আলোক-তরঙ্গ নয়। কিন্তু তবুও তার ফলে আমরা এক জাতীয় আলোকেরই সংবেদন হয়—চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'সর্ষের ফুল দেখা'। চক্ষু সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুও নির্দিষ্ট এক

জাতীয় স্নায়বিক শক্তিরই পরিবাহক; মুয়েলার-এর মতে ইন্দ্রিয় সংলগ্ন একটি অন্তর্মুখী স্নায়ুর ভিতরকার বিভিন্ন স্নায়ু-অংশুও (Nerve Fibres) বিভিন্ন জাতীয় এবং নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তির পরিবাহক। যেমন চক্ষু সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুর ভিতরকার কোন অংশু শুধুমাত্র লাল রং সংক্রান্ত সংবেদনের স্নায়বিক শক্তিই পরিবহণ করে, কোন অংশু আবার পরিবহণ করে শুধুমাত্র নীল রং সংক্রান্ত সংবেদনের স্নায়বিক শক্তিই।

(২) সংবেদনের তীব্রতা : চোখে যত বেশি তীব্র আলো পড়ে আলোকের সংবেদনও তত তীব্র হয়; যতো দুর্বল আলো পড়ে আলোকের সংবেদনও তত ম্লান হয়। তেমনি স্পর্শ সংবেদন, শ্রৌত সংবেদন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও মূলত উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেই সংবেদনের তীব্রতায় তারতম্য দেখা যায়। অতএব বলা হয়েছে, সংবেদনের দ্বিতীয় ধর্ম এই তীব্রতাই।

(৩) সংবেদনের স্বচ্ছতা : স্বচ্ছতার দিক থেকেও বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। কোন সংবেদন সুস্পষ্ট, কোন সংবেদন অস্পষ্ট; কোনটি স্বচ্ছ, কোনটি ম্লান। অতএব বলা হয়েছে, সংবেদনের তৃতীয় ধর্ম তার স্বচ্ছতা।

(৪) সংবেদনের স্থায়িত্ব : স্থায়িত্বর দিক থেকেও বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে তারতম্য আছে। কোন সংবেদন মুহূর্ত মাত্র বর্তমান থাকে, আবার কোন সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী। যেমন, দ্রুতগামী ট্রেণ থেকে বাইরের গাছপালা সংক্রান্ত চাক্ষুষ সংবেদন ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু রাত্রে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্র-পরিদর্শনের সময় চাক্ষুষ সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী। অতএব সংবেদনের চতুর্থ ধর্ম হিসাবে স্থায়িত্বর উল্লেখ করা হয়।

এ-ছাড়াও বিশেষত স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে সংবেদনের আর একটি ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। তার নাম **বিস্তৃতি (Extensity)**। ইন্দ্রিয়ের কতখানি অংশ উদ্দীপিত হয়েছে তার উপর সংবেদনের বিস্তৃতি নির্ভর করে। যেমন, আঙুলের ডগায় ছেঁকা লাগলে স্পর্শ-সংবেদনের বিস্তৃতি কম হবে, কিন্তু পুরো হাত পুড়ে গেলে তুলনায় স্পর্শ-সংবেদন হবে অনেক বেশি বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়র অংশ-বিশেষ উদ্দীপিত হবার ফলে সংবেদনের যে-বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তাকে বলে সংবেদনের **দেশাভিজ্ঞান (Local Sign বা Local Character)**। বিশেষত স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রকট। যেমন, টেবিলের উপর হাতের চেটো রাখলে চেটোর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সংবেদন পাওয়া যায় এবং প্রতিটিরই বিশিষ্ট দেশাভিজ্ঞান বর্তমান।

৩ ॥ সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensation)

সংবেদনগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রথা আছে। যথা :— (ক) বিশিষ্ট সংবেদন (Special Sensation), (খ) অঙ্গীয় সংবেদন (Organic Sensation) এবং (গ) পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation)।

(ক) বিশিষ্ট সংবেদন (Special Sensation) :

আমাদের শরীরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক নামের পাঁচটি সুনির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় বর্তমান। বহির্জগৎ থেকে এগুলির যে-কোনটিতে উদ্দীপক এলে ইন্দ্রিয়র আভ্যন্তরীণ নিউরনে উদ্বুদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি এবং অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে সেই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছুলে যে-সংবেদন জন্মায় তাকে বলে বিশিষ্ট সংবেদন। আমাদের অধিকাংশ সংবেদনই এ-জাতীয় বিশিষ্ট সংবেদন। বিশিষ্ট সংবেদনের লক্ষণ হল : (১) বহির্জগৎ থেকে কোন একরকম সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক গ্রহণ করা, (২) একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে তা গ্রহণ করা, (৩) ইন্দ্রিয়টিতে এক জাতীয় নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া, (৪) এই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পরিবাহিত হওয়া। এই চারটি লক্ষণের মধ্যে অবশ্য তৃতীয় এবং চতুর্থ লক্ষণ অন্যান্য সংবেদনের ক্ষেত্রেও বর্তমান ; কিন্তু প্রথম দুটি লক্ষণ শুধুমাত্র বিশিষ্ট সংবেদনেরই বৈশিষ্ট্য। পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুসারে বিশিষ্ট সংবেদনগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় ; সে-বিভাগের পরিচয় আমরা একটু পরে দেখবো।

(খ) অঙ্গীয় সংবেদন (Organic Sensation) :

আমাদের দেহের অভ্যন্তরেও নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং সেই পরিবর্তনের ফলে নানা প্রকার উদ্দীপকের উদ্ভবও হচ্ছে। অর্থাৎ, এই উদ্দীপকগুলি বহির্জগৎ থেকে আসে না ; শরীরেরই অভ্যন্তরে এগুলির উৎস। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দীপককে গ্রহণ করার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জাতীয় কোন সুনির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়র প্রয়োজন নেই। তবুও শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবর্তনের ফলে যে-উদ্দীপক সৃষ্ট হয় তা ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংলগ্ন অন্তর্মুখী নিউরনে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে এই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পরিচালিত হলে আমরা একরকম সংবেদন পাই। এই সংবেদনকে অঙ্গীয় আখ্যা দেওয়া হয়।

অঙ্গীয় সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা :—

(১) এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উৎস হিসাবে শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে সনাক্ত করা যায়। যেমন শরীরের কোথাও ফোঁড়া হলে আমরা যন্ত্রণা পাই

এবং যন্ত্রণা ঠিক কোথায় হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। এ-জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনকে দেশাভিজ্ঞান-সম্পন্ন (Localizable) আখ্যা দেওয়া হয়।

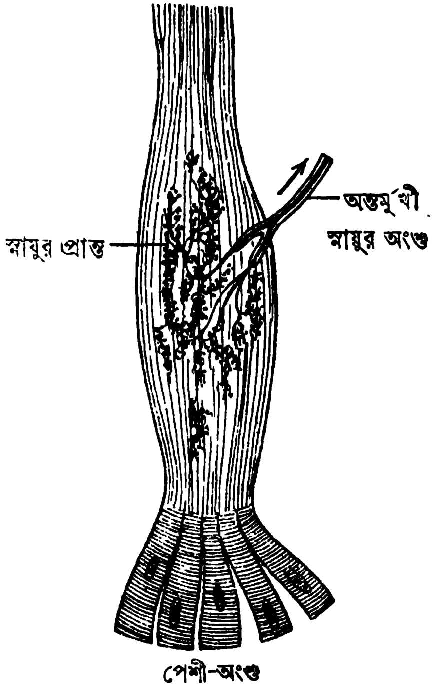
(২) আর এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উৎসস্থল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব না হলেও তুলনায় অস্পষ্টভাবে শরীরের কোন একটি এলাকায় সেগুলির উৎস অনুভূত হয়। যেমন, অনেক সময় পেটে ব্যথা হলে ঠিক কোন খানে এই ব্যথা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা সম্ভব না হলেও আমরা বুঝতে পারি শরীরের একটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এলাকার মধ্যেই এই ব্যথার উৎস সীমাবদ্ধ—হাত নয়, মাথা নয়, বুক নয়, পা নয় ; তার বদলে পেটেরই কোন এক জায়গায় ব্যথা করছে, তবে পেটের ঠিক কোন যায়গায় ব্যথা করছে তা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ-জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনকে অস্পষ্ট দেশাভিজ্ঞান-সম্পন্ন (Vaguely Localizable) আখ্যা দেওয়া হয়।

(৩) আর এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উৎস হিসাবে এমনকি শরীরের কোন এলাকাকে অস্পষ্টভাবেও সনাক্ত করা সম্ভব নয়। যেমন, চলতি কথায় বলি, 'শরীরটা আন্‌চান করছে' ; এক্ষেত্রে শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে উক্ত অস্বস্তিজনক সংবেদনের উৎস বলে নির্ণয় করা দূরের কথা এমনকি আমরা অস্পষ্টভাবেও পেট, বুক, মাথা জাতীয় শরীরের কোন একটি বৃহত্তর এলাকাকে এই সংবেদনের উৎসস্থল বলতে পারি না। এ-জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনকে দেশাভিজ্ঞান বিহীন (Not Localizable) আখ্যা দেওয়া হয়।

(গ) পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation) : চেষ্টা-বেদন (Kinaesthesis) :

শরীরের পেশীগুলি ইতিপূর্বে শুধুমাত্র কারক (Effector) হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, গুরুমস্তিষ্কর উচ্চতর কেন্দ্র থেকে সুষুম্নাকাণ্ডর নিম্নতর কেন্দ্র হয়ে স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত পেশীতে পরিবাহিত হলে পেশী সক্রিয় হয়, ফলে আমরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি। কিন্তু পেশীগুলির মধ্যে এক জাতীয় গ্রাহক নিউরন-ও (Receptor Neurone) বর্তমান এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত আছে অন্তর্মুখী স্নায়ুও। পেশীগুলি সক্রিয় হলে এক জাতীয় আভ্যন্তরাণ উদ্দীপক সৃষ্ট হয়, এবং তার ফলে পেশীর গ্রাহক নিউরনে উদ্বুদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি : পেশী সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে এই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পরিবাহিত হলে আমরা যে-সংবেদন পাই তার নাম দেওয়া হয় পেশীয় সংবেদন (Muscular Sensation) ।

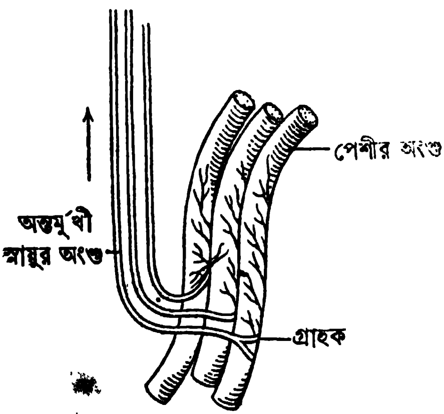
পেশীয় সংবেদনের ফলে আমরা আমাদের হাত পা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়বের অবস্থিতি (Position) ও পরিচালনা (Movement) সম্বন্ধে অবগত হই। চোখে না দেখেও আমরা আমাদের অবয়বের পরিচালনা, অবস্থিতি প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সংবেদন পাই তাকে বলা হয় চেষ্টা-বেদন (Kinaes-thesis)। চেষ্টা-বেদনের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় (Kinaesthetic Receptors) পেশীর ভিতর ছাড়াও কণ্ডরা (Tendon, অর্থাৎ পেশী ও হাড়ের সংযোগস্থল) এবং শরীরের বিভিন্ন জোড়-এ (Joint) অবস্থিত। এ-জাতীয় গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়র অবস্থিতি ও গুরুত্বর কথা আমরা সচরাচর মনে রাখি না। অতএব এরই সাহায্যে আমাদের কত রকম আচরণ সম্ভব



পেশী সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু (ক)

হয় সে-বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

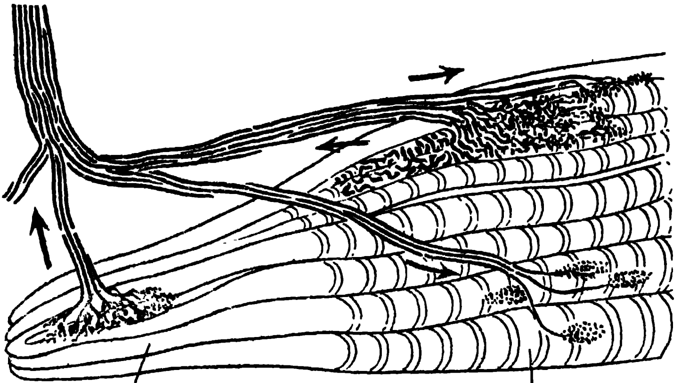
সাধারণ সুস্থ লোক চোখ বন্ধ করেই নিজের নাক, কান বা শরীরের যে-কোন অংশ প্রায় নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে স্পর্শ করতে পারে। নানাভাবে হাত পা প্রভৃতি পরিচালন করার সময় প্রতি মুহূর্তেই অঙ্গগুলির অবস্থিতি সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান হয়। বিভিন্ন বস্তু টেনে তোলবার



২: পেশী সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু (খ)

সময় বস্তুগুলি কতখানি ভারি সে-বিষয়েও আমাদের হুঁস হয়। অন্ধকার ঘরে

ঢুকে আমি সোজা আলোর পরিচিত সুইচ এ হাত দিয়ে আলো জ্বালাতে পারি, টাইপিষ্ট টাইপরাইটারের দিকে না-চেয়েই টাইপ করে যেতে পারেন, বোনার কাঁটার দিকে না-চেয়েই পশম বা 'উল' বুনে যাওয়া যায়। চোখে না-দেখেও



৩ : কণ্ডরা সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু এবং পেশী সংলগ্ন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী স্নায়ু

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত এ-জাতীয় অঙ্গ-পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তার কারণ আমাদের পেশী, কণ্ডরা (Tendon) এবং জোড়-এ (Joint) অবস্থিত চেষ্টা-বেদনের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় (Kinaesthetic Receptors) হাত, পা, আঙুল প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গর অবস্থিতি এবং পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদ দেয়। চেষ্টা-বেদনের গ্রাহক থেকে স্নায়বিক শক্তি অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছোবার পর গুরুমস্তিষ্ক থেকে আবার বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি পেশী প্রভৃতি পর্যন্ত এসে সেগুলিকে নূতনভাবে পরিচালিত করে। এইভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গর পরিচালনা থেকেই সৃষ্ট হয় এই পরিচালনারই উদ্দীপক। তারই ফলে চেষ্টা-বেদন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস অমন যন্ত্রচালিতের মতো হতে পারে।

৪ ॥ সংবেদনের তীক্ষ্ণতা-বৃদ্ধি : ভেবের-ফেক্‌নের নিয়ম (Weber-Fechner Law)

১৯০৭ সালে প্রকাশিত মনোবিজ্ঞানের এক গ্রন্থে (*'Thinking, Feeling and Doing'* by E. W. Scripture) ব্যাঙ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার বর্ণনা আছে। জলে একটা ব্যাঙ রেখে জলের তাপ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাওয়া হল এবং এই জল শেষ পর্যন্ত ফুটতে শুরু করল। তবুও তার মধ্যে ব্যাঙটা নড়াচড়া

করল না—জীবন্ত ব্যাঙটা জল থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা না করেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে মরে গেল। এই অদ্ভুত ঘটনাটির ব্যাখ্যা হিসাবে অনুমান করা প্রয়োজন যে জলের তাপ এমনই ধীরে ধীরে বেড়েছে যে কোন অবস্থাতেই ব্যাঙটা ঐ তাপ-বৃদ্ধির কথা টের পায়নি—তাপবৃদ্ধি সম্বন্ধে তার হুঁস হয়নি। অথচ, প্রতি ক্ষণেই জলের তাপ বেড়ে চলেছে; অতএব নিশ্চয়ই উত্তাপের সংবেদনও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রতি অবস্থাতেই পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় সংবেদনের তীব্রতা এমনই যৎসামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোন অবস্থাতেই ব্যাঙটা এই তীব্রতার বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু যদি একটা ব্যাঙকে হঠাৎ ঠাণ্ডা জল থেকে গরম জলে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় পরবর্তী অবস্থায় উত্তাপ-সংবেদনের তীব্রতা এতোখানি বেড়ে যাবে যে সে-বিষয়ে ব্যাঙের হুঁস না-হওয়া

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিমাণের দিক থেকে উদ্দীপক বাড়লে সংবেদনের তীব্রতাও অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পর পর দুটি অবস্থার মধ্যে যৎসামান্য উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের তীব্রতা এমন যৎসামান্যভাবে বাড়তে পারে যে সে-বিষয়ে কোন বোধই হবে না; অপরপক্ষে, পর পর দুটি অবস্থার মধ্যে উদ্দীপকের যথেষ্ট তারতম্যের ফলে সংবেদনের তীব্রতায় যথেষ্ট তারতম্য ঘটলে সে-বিষয়ে অবশ্যই বোধও জন্মায়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেও এই নিয়মটির বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়:

ঘরে মাত্র একটা মোমবাতি জ্বলছে, সেই সঙ্গে আরো একটা মোমবাতি জ্বালালাম। উদ্দীপক দ্বিগুণ হল, আলোর সংবেদনও তুলনায় এতো বেশি তীব্র হল যে এই তীব্রতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত বোধও সুস্পষ্ট হল। কিন্তু ঘরে যদি দুশো মোমবাতি জ্বলার সমান আলো থাকে এবং সেই অবস্থায় মাত্র একটি মোমবাতির আলো বাড়ানো যায় তাহলে আলোক-সংবেদনের তীব্রতা এমন যৎসামান্য বাড়বে যে চেষ্টা করেও আমরা এই বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন বোধ পাব না। কিংবা, হাতের উপর দুশো কিলো ওজনের বস্তু চাপানো ছিল; তার উপর যদি আরো মাত্র এক কিলো ওজন চাপানো হয় তাহলে চাপ-সংবেদনের (Pressure Sensation) তীব্রতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত হুঁস হবে না; কিন্তু হাতের উপর যখন মাত্র এক কিলো ওজন রয়েছে সেই অবস্থায় আরো এক কিলো ওজন বাড়লে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারবো যে চাপ-সংবেদন তীব্রতর হয়েছে। অতএব, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের তীব্রতা-বৃদ্ধি সংক্রান্ত বোধ হবে কিনা তা নির্ভর করছে পূর্ববর্তী উদ্দীপকের সঙ্গে পরবর্তী উদ্দীপকের অনুপাত-এর (Ratio) উপর।

উদ্দীপক বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের তীব্রতা বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে ভেবের (Weber) বহু

পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষাগুলির ভিত্তিতে একটি নিয়মে উপনীত হতে চান। তারপর ফেকনের (Fechner) এই নিয়মকে সংশোধিত রূপ দেবার প্রয়াস করেন। ফলে নিয়মটি ভেবের-ফেকনের নিয়ম (Weber-Fechner Law) নামে খ্যাত হয়েছে।

প্রথমত মনে রাখা দরকার, উদ্দীপক বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদন বৃদ্ধির সম্পর্ক শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পরিধির পরিচয়ের জন্য দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। এক : উদ্দীপক এমন মৃদু বা দুর্বল হতে পারে যে তার ফলে কোন সংবেদনই হবে না। যেমন, অতি-ক্ষীণ আলোয় আমরা দেখতে পাই না, অতি-ক্ষীণ শব্দ আমরা শুনতে পাই না, বা, আমার হাতের উপর অত্যন্ত তুচ্ছ ওজনের কোন বস্তু রাখলে আমি কোন চাপ-সংবেদন (Pressure Sensation) পাব না। অতএব, একান্তই কোন সংবেদন সৃষ্টি করার জন্য উদ্দীপকের পরিমাণের একটি 'নিম্ন-সীমা' (Lower Limit) বর্তমান ; অর্থাৎ, উদ্দীপক পরিমাণের দিক থেকে তার চেয়ে কম হলে আমরা কোন সংবেদনই বোধ করতে পারব না। নিছক বোধগম্য সংবেদন (Just Perceptible Sensation) পাবার জন্য এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের উদ্দীপক প্রয়োজন। নিছক বোধগম্য সংবেদন বলতে বোঝায় সংবেদনের এমন সামান্যতম তীব্রতা যার চেয়ে কম হলে সংবেদন সংক্রান্ত আমাদের কোন বোধই হয় না। দুই : উদ্দীপক বাড়াতে বাড়াতে আবার এমন এক অবস্থায় পৌঁছোনো যায় যার পর উদ্দীপককে আরো বেশি বাড়ালে সংবেদনও যে তীব্রতর হচ্ছে এ-জাতীয় কোন বোধই আমাদের হয় না। অর্থাৎ, সংবেদনের তীব্রতাবৃদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করবার একটি 'উচ্চ-সীমা'ও (Upper Limit) বর্তমান। এ-সীমা উত্তীর্ণ হলে উদ্দীপক আরো যে-ভাবেই বাড়ানো হোক না কেন তার ফলে সংবেদনও যে তীব্রতর হচ্ছে এ-জাতীয় কোন বোধ হবে না। অতএব, উদ্দীপকের পরিমাণ বাড়লে সংবেদনও তীব্রতর হয়—এই ঘটনা উপরোক্ত নিম্নসীমা এবং উচ্চসীমার মধ্যে আবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, এই নির্দিষ্ট সীমা বা পরিধির মধ্যেও যে-কোন ভাবে উদ্দীপক বাড়লেই তার ফলে সংবেদনের তীব্রতা বাড়বে না। পরীক্ষামূলকভাবে ভেবের দেখেন, উদ্দীপকের যৎসামান্য বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের তীব্রতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন বোধ না-হতেও পারে। অর্থাৎ, সংবেদনের তীব্রতায় 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য' (Just Noticeable Difference—সংক্ষেপে বলা হয় j. n. d.) সৃষ্টির জন্য উদ্দীপকেরও এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিবর্তন প্রয়োজন। সংবেদনের তীব্রতায় 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য' বলতে বোঝায় এমন ন্যূনতম পার্থক্য যার চেয়ে কম হলে এই পার্থক্য-বিষয়ে

আমাদের কোন বোধ হয় না। ভেবের দেখেন, সংবেদনের তীব্রতায় এ-জাতীয় ন্যূনতম পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে উদ্দীপককে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ধরা যাক, বর্তমানে আমি X পরিমাণ উদ্দীপক থেকে সংবেদন পাচ্ছি ; X-কে পরিবর্তন করে উদ্দীপকের পরিমাণ Y করলে সংবেদনের তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য সূচিত হবে : এখানে X এবং Y-এর মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট অনুপাত (Ratio) রক্ষা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সংবেদনের তীব্রতায় নিছ বোধগম্য পার্থক্য নির্ভর করে বর্তমান উদ্দীপক ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্দীপকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের উপর।

ভেবের-এর নিয়ম নিয়ে পরীক্ষা করার সময় উদ্দীপকের কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণকে মান (Standard) হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং দেখা হয় এই মানকে ঠিক কোন্ অনুপাতে পরিবর্তন করলে সংবেদনের তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য সূচিত হবে। দেখা যায়, মান হিসাবে গৃহীত উদ্দীপককে এক নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে পরিবর্তিত করলে এই পরিবর্তিত উদ্দীপক থেকে সংবেদনেও নিছক বোধগম্য পার্থক্য সূচিত হয়। এখানে পূর্ববর্তী উদ্দীপক এবং পরবর্তী উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্যকে বলা হবে 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (Difference Limen, সংক্ষেপে D.L.)। এবং পরীক্ষায় দেখা যায়, এই ন্যূনতম পার্থক্য হল মান হিসাবে গৃহীত উদ্দীপকের সঙ্গে একটি ভগ্নাংশর গুণফল। একই জাতীয় উদ্দীপকের ক্ষেত্রে উক্ত ভগ্নাংশ অপরিবর্তিত থাকে ; তাই এই ভগ্নাংশকে বলা হয় অপরিবর্তিত (Constant, সংক্ষেপে *C*)।

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় ১০০ মোমবাতি-শক্তির আলো-কে বাড়িয়ে ১০১ মোমবাতি-শক্তির আলো করলে আলোক-সংবেদনের তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য সূচিত হচ্ছে তাহলে বলা হবে এই দৃষ্টান্তে মান (Standard) হল ১০০ ; 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (D.L.) হল ১, এবং অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ (*C*) হল ১/১০০। মান (১০০)-কে এই অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ (১/১০০) দিয়ে গুণ করলে 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (১) পাওয়া যাবে : ১০০ × ১/১০০ = ১। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক : মান যদি হয় ৫০০ মোমবাতি-শক্তির আলো তাহলে তাকে কতখানি বাড়ালে আলোক-সংবেদনের তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য সূচিত হবে ? অর্থাৎ, এখানে 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (D.L.) কী হবে ? মানকে ঐ নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ ১/১০০ দিয়ে গুণ করলে তা পাওয়া যাবে। ৫০০ × ১/১০০ = ৫। অতএব এই দৃষ্টান্তে 'ন্যূনতম গ্রাহ্য পার্থক্য' (D.L.) হবে ৫। অর্থাৎ, ৫০০ মোমবাতি-শক্তির আলো বাড়িয়ে ৫০৫ মোমবাতি-শক্তির আলোতে পরিণত করলে

আলোক-সংবেদনের তীব্রতায় 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য' (j. n. d.) পাওয়া যাবে।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয়র ক্ষেত্রে এই C বা 'অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ' বলতে বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। যথা—আলোর উজ্জ্বলতার (Brightness) ক্ষেত্রে এই ভগ্নাংশ ১/১০০ ; শব্দের উচ্চতার (Loudness) ক্ষেত্রে ১/৫ ; তাপের (Temperature) ক্ষেত্রে ১/৩ ; আঘ্রাণের তীব্রতার ক্ষেত্রে ১/৫।

ভেবের-এর এই নিয়মটিকে ফেক্‌নের (Fechner) আরো মার্জিত করার প্রয়াস করেন। তিনি ধরে নেন, 'নিছক বোধগম্য সংবেদন' যেন সংবেদনের একটি ক্ষুদ্রাংশ ; অতএব কোন সংবেদন যদি পরপর 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য' (j. n. d.) অনুসারে বেড়ে যায় তাহলে এই ঘটনাকে সংবেদনটির সঙ্গে পরপর একই ক্ষুদ্রাংশ সংবেদনের যোগ বলে মনে করা যেতে পারে। যথা, একটি সংবেদন ছিল S ; তা পরপর এইভাবে বেড়ে যাবে—

S
S + j. n. d.
S + j. n. d. + j. n. d.
S + j. n. d. + j. n. d. + j. n. d.
ইত্যাদি।

গণিতের পরিভাষায় এ-জাতীয় পরপর বৃদ্ধিকে বলা হয় Arithmetical Progression বা A. P.। ফেক্‌নের বলেন, সংবেদনকে এ-ভাবে বাড়িয়ে যাবার জন্য উদ্দীপককে পরপর কোন একটি বিশেষ ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। যেমন, প্রথম উদ্দীপককে যদি বলা হয় R এবং সংবেদনকে উপরোক্তভাবে বাড়াবার জন্য পরপর যে-নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে এই উদ্দীপককে গুণ করে যেতে হবে সেই ভগ্নাংশকে যদি বলা হয় p, তাহলে উদ্দীপককে নিম্নোক্তভাবে বাড়াতে হবে :

R
R × p
R × p × p
R × p × p × p···
ইত্যাদি।

গণিতের পরিভাষায় এ-জাতীয় পরপর বৃদ্ধিকে বলা হয় Geometrical Progression বা G.P.।

অতএব, ফেক্‌নের সিদ্ধান্ত করতে চান, আলোচ্য উদ্দীপককে যদি পরপর একই

নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে—অর্থাৎ G.P. অনুসারে বাড়িয়ে—যাওয়া হয় তাহলে সংবেদনও A.P. অনুসারে বেড়ে চলবে। যথা :

উদ্দীপক	**সংবেদন**
R	S
R × p	S + j. n. d.
R × p × p	S + j. n. d. + j. n. d.
R × p × p × p	S + j. n. d. + j. n. d. + j. n. d.

ইত্যাদি।

কিন্তু এইভাবে ভেবের-এর নীতিকে পরিমার্জিত করবার প্রস্তাব করে ফেক্‌নের বস্তুত কিছু ভ্রান্তিরই সৃষ্টি করেছেন। কেননা, প্রথমত, সংবেদনের তীব্রতায় হ্রাসবৃদ্ধি বোধগম্য বা হৃদয়ঙ্গম-সাপেক্ষ হলেও জড়বস্তুর মত এই হ্রাসবৃদ্ধির কোন পরিমাণগত বা গাণিতিক হিসাব সম্ভব নয়। সংবেদনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া মানে সংবেদনের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদনাংশর যোগ হয়ে যাওয়া নয়। দ্বিতীয়ত, 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য' বা j. n. d. বলতে সংবেদনের কোন স্থির বা নির্দিষ্ট একক বোঝায় না ; বস্তুত সংবেদনের তীব্রতা যত বেড়ে যায় ততই তার চেয়ে তীব্রতর সংবেদন পাবার জন্য অনেক বেশি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

অতএব, ফেক্‌নের-এর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। অপরপক্ষে ভেবের যে-ভাবে নিয়মটির ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই উপর নির্ভর করে উত্তরকালে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে বহু মূল্যবান গবেষণা সম্ভব হয়েছে।

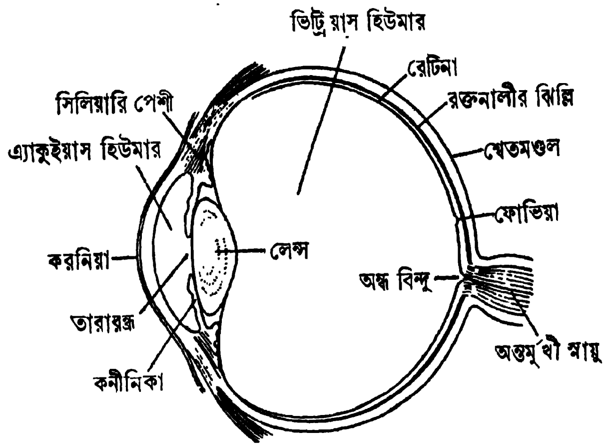
৫ ॥ বিশিষ্ট সংবেদন (Special Sensations)

ইতিপূর্বে দেখেছি, আমাদের সংবেদনকে মোটের উপর তিনভাগে ভাগ করা হয়। স্বভাবতই আমাদের আচরণের—বা বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার—দিক থেকে এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সংবেদনই (Special Sensations) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়র সাহায্যে বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের ফলে বিশিষ্ট সংবেদনের উদ্ভব হয়। ইন্দ্রিয় বলতে প্রধানত পাঁচটি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। অতএব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুসারে বিশিষ্ট সংবেদনও পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। একে একে সেগুলির পরিচয় দেখা যাক।

৬॥ চাক্ষুষ সংবেদন (Visual Sensation)

ক॥ চোখ

মোটামুটিভাবে চক্ষুগোলকের গঠন বোঝার জন্য এখানে তার একটি প্রস্থচ্ছেদ চিত্র দেওয়া হল। একটি ফুটবলের যেরকম সবচেয়ে বাইরে চামড়ার স্তর এবং তারপর রবার-এর (ব্লাডার) স্তর থাকে অনেকটা সেইভাবেই চক্ষুগোলকের ক্ষেত্রেও



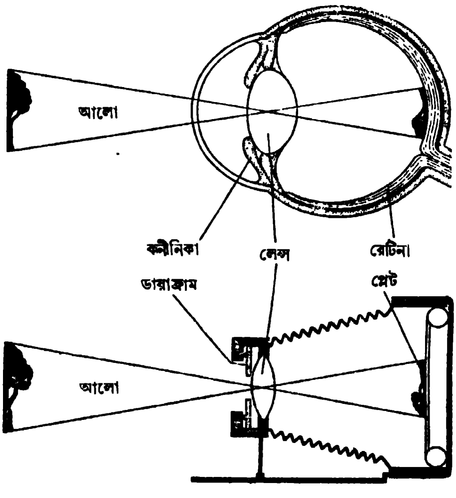
৪ : চক্ষুগোলকের বিভিন্ন অংশ (প্রস্থচ্ছেদ চিত্র)

পরপর তিনটি স্তর বর্তমান ; আবার ভিতরে হাওয়া ভর্তি থাকে বলেই ফুটবলের আকারটি গোল থাকে, চক্ষুর অভ্যন্তরেও তরল পদার্থ ভর্তি আছে বলেই তার আকারটি গোল থাকে। অতএব, চক্ষুর গড়ন বোঝবার জন্য তার গায়ের তিনটি স্তর এবং ভিতরকার তরল পদার্থের পরিচয় থেকে শুরু করা যাক।

চক্ষুগোলকের প্রথম বা সবচেয়ে বাইরের স্তরটিকে বলা হয় শ্বেতমণ্ডল (Sclerotic coat) ; এই স্তরটি অস্বচ্ছ, কিন্তু এর সামনের দিকের অংশ স্বচ্ছ—সেই স্বচ্ছ অংশর নাম করনিয়া (Cornea)। শ্বেতমণ্ডলের পর (অর্থাৎ চক্ষুগোলকের ভিতরদিকে) যে-দ্বিতীয় স্তর আছে তাকে বলে রক্তনালীর ঝিল্লি (Choroid Coat)। এর পর তৃতীয় স্তর, নাম রেটিনা (Retina)। রেটিনা নামের এই তৃতীয় স্তরটি স্নায়ু-অংশু ও নিউরন দ্বারা গঠিত এবং এরই উপর আলো (উদ্দীপক) এসে পৌঁছুলে যে-স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় সেই স্নায়বিক শক্তি অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কর উচ্চতর কেন্দ্রে পৌঁছুঁলে সৃষ্ট হয় চাক্ষুষ সংবেদন। চক্ষুগোলকের মধ্যে মোটের উপর দু'রকম তরল বা প্রায়-তরল পদার্থ আছে, যার ফলে চোখের গোল

আকারটি বর্তমান থাকে। এক-জাতীয় তরল পদার্থকে বলে এ্যাকুইয়াস হিউমার (Aqueous Humour) ; আর এক-জাতীয় তুলনায় গাঢ় (জেলির মত) পদার্থকে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিউমার (Vitreous Humour)। এই তরল ও প্রায়-তরল পদার্থগুলির অবস্থিতি বোঝার জন্য সামনের দিক থেকে চোখের অংশগুলির পরিচয় দেখা যাক।

চোখের সবচেয়ে সামনের স্বচ্ছ অংশ অর্থাৎ করনিয়ার ঠিক পরেই এ্যাকুইয়াস হিউমার নামের জলীয় পদার্থ বর্তমান। এই জলীয় পদার্থের পর আছে পেশী-গঠিত একটি কালো চাকতির মত বস্তু ; তার নাম কনীনিকা (Iris)। কনীনিকার মাঝখানে একটি ফুটো আছে ; তার নাম তারারন্ধ্র (Pupil)। চোখে আলো-আসার উপর নির্ভর করে তারারন্ধ্র নামের এই ছিদ্র বাড়ে-কমে : আলো বেশী এলে ছিদ্রটি ছোট হয়ে যায়, আলো কম এলে ছিদ্রটি বড় হয়। কনীনিকার পর আছে লেন্স (Lens) : এক জাতীয় স্বচ্ছ তরল পদার্থ জমাট বেঁধে প্রায় কাচের মত (যদিও কাচের মত শক্ত নয়, অপেক্ষাকৃত নরম) বস্তুতে পরিণত হয়েছে। উপর এবং নীচ দু'দিক থেকে লেন্স-এর সঙ্গে সংযুক্ত আছে একজাতীয় পেশী ; সেগুলিকে বলে সিলিয়ারি পেশী (Ciliary Muscles)। উপর-নিচ দু'দিক থেকে চাপ দিয়ে এই পেশীগুলিই লেন্স-এর আকার প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে। লেন্স-এর পর আছে ভিট্রিয়াস হিউমার নামের প্রায়-তরল (জেলির মত) স্বচ্ছ পদার্থ। তারপর রেটিনা, তারপর রক্তনালীর ঝিল্লি, তারপর সবচেয়ে বাইরের শ্বেতমণ্ডল।

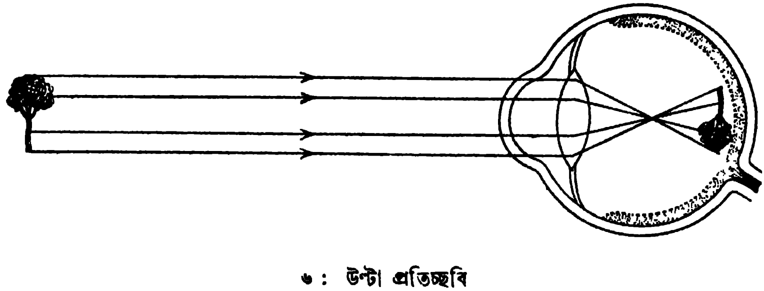


চোখ ও ক্যামেরা

চক্ষুগোলককে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সামনের খোলা-মুখ ছাড়া আর কোন দিক থেকে ক্যামেরার মধ্যে আলো ঢুকতে পারেনা ; যে-আলো ঢুকবে তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় সামনের 'ডায়াফ্রাম' (Diaphragm) বলে একটি পর্দার 'ফুটো' (Aperture) বাড়িয়ে-কমিয়ে—অর্থাৎ, বেশি আলো থাকলে এই ফুটো ছোট করে নেওয়া হয়, কম আলো থাকলে বাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর লেন্স—এই লেন্স-এর

সাহায্যে আলো-কে সংহত করে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আলো গিয়ে পড়ে পিছনের প্লেট বা ফিল্ম-এর রাসায়নিক পদার্থের উপর ; রাসায়নিক পদার্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে তার উপর আলো পড়লে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটে।

সামনের করনিয়া নামের স্বচ্ছ অংশ ছাড়া চক্ষুগোলকের মধ্যেও আর কোন পথে আলো প্রবেশ করতে পারে না ; সবচেয়ে বাইরের শ্বেতমণ্ডল এবং তারপরের স্তর রক্তনালীর ঝিল্লি আলোর পথরোধ করে। ক্যামেরার 'ডায়াফ্রাম'-এর সঙ্গে কনীনিকার, ডায়াফ্রামের ফুটোর সঙ্গে তারারন্ধ্রর, লেন্স-এর সঙ্গে লেন্স-এর এবং প্লেট বা ফিল্ম-এর সঙ্গে রেটিনার তুলনা করা যেতে পারে। করনিয়া দিয়ে যে-আলো চক্ষুগোলকে প্রবেশ করে তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কনীনিকা। বাইরে আলো বেশি থাকলে কনীনিকার ছিদ্রপথ বা তারারন্ধ্র ছোট হয়ে গিয়ে বাড়তি আলোর প্রবেশ বন্ধ করে দেবে, বাইরে আলো কম থাকলে তারারন্ধ্র বড় হয়ে যথাসম্ভব বেশি আলোর প্রবেশ-ব্যবস্থা করবে। ক্যামেরায় সাধারণত লেন্স-কে ঘুরিয়ে বা এগিয়ে-পেছিয়ে নিয়ে আলো 'ফোকাস' করা হয় ; চোখের লেন্স-ও আলো ফোকাস করে, কিন্তু তার ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার : লেন্স-সংলগ্ন সিলিয়ারি পেশীগুলি উপর এবং নিচ থেকে চাপ দিয়ে লেন্স-এর গড়ন পরিবর্তন করে। এইভাবে লেন্স-এর মধ্যে দিয়ে আলো 'ফোকাস' হবার পর তা গিয়ে রেটিনার উপরে পড়ে। রেটিনায় আসলে নানা স্তরে বহু নিউরন বা স্নায়ুকোষ বর্তমান ; একটু পরেই তার অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় দেখা যাবে। আপাতত মনে রাখা দরকার, আলোর সংস্পর্শে রেটিনার ভিতরকার নিউরনে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় এবং রেটিনা থেকে বহু স্নায়ু-অংশু বেরিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা অন্তর্মুখী স্নায়ু (Optic Nerve) গঠন করেছে ; এই অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক



৬ : উল্টা প্রতিচ্ছবি

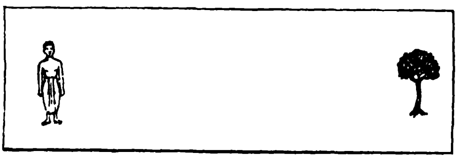
শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্রে' পৌঁছুলে দৃশ্য-সংবেদন (Visual Sensation) ঘটে।

এখানে একটি চিত্তাকর্ষক কথা মনে রাখা দরকার। আলোর গতিপথ সরল রেখায়

হলেও লেন্স-এ ঢুকলে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে যায়। ফলে ক্যামেরা আর চোখ উভয়ের মধ্যেই সামনের বস্তুটির প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে পড়ে : বস্তুটির মাথার দিক থেকে যে-আলো আসে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে নিচের দিকে চলে যায়, নিচের দিক থেকে যে-আলো আসে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে মাথার দিকে চলে যায়। কিন্তু চোখের মধ্যে বস্তুর প্রতিচ্ছবি এই রকম উল্টোভাবে পড়লেও আমরা বাস্তবিকই বস্তুটিকে উল্টোভাবে দেখি না, সোজাভাবেই দেখি। কী করে তা সম্ভব হয় এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

চক্ষুগোলকের সব-ভিতরকার স্তর রেটিনা-ই প্রকৃতপক্ষে চোখের সংবেদনশীল অংশ। ফুটবলের ভিতর যেমনভাবে ব্লাডারটি থাকে অনেকটা সেইভাবে চক্ষু-গোলকের ভিতরকার গা জুড়ে রয়েছে রেটিনা। কিন্তু রেটিনার সর্বাংশ সমান সংবেদনশীল নয়। যে-অন্তর্মুখী স্নায়ু চোখ থেকে বেরিয়েছে তাকে বলে 'অপ্‌টিক্ নার্ভ' (Optic Nerve); রেটিনার ঠিক যেখান থেকে এই 'অপ্‌টিক্ নার্ভ' শুরু সেই জায়গাটিকে বলে 'অন্ধ-বিন্দু' (Blind spot)। এই জায়গাটিতে আলো এলে কোনরকম সংবেদনই হবে না। তার কিছুটা পাশে আর একটি কেন্দ্রর নাম 'ফোভিয়া' (Fovea) ; সমগ্র রেটিনার মধ্যে এই কেন্দ্রই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। এখানে আলো পৌঁছুলে সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলোক-সংবেদন হয়।

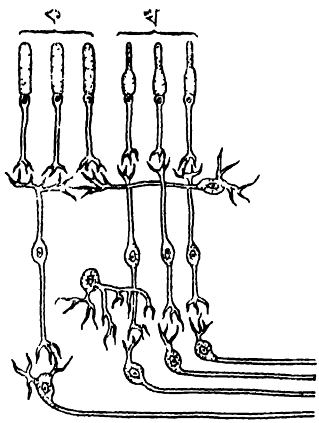
একটি সহজ পরীক্ষা করলেই নিজের চোখের 'অন্ধ-বিন্দু'র অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাবে। নিচের ছবিতে ডানদিকে একটি গাছ এবং বাঁদিকে একটি মনুষ্যমূর্তি আঁকা হল। বইটিকে চোখ থেকে দশ-বারো ইঞ্চি দূরে রেখে বাঁ-চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র ডান-চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের ছবিটির দিকে চেয়ে থাকো ;



৭ : রেটিনার অন্ধ-বিন্দু সংক্রান্ত পরীক্ষা

এ-অবস্থায় গাছ ও মানুষ উভয়ের ছবিই দৃষ্টিগোচর হবে। তারপর ধীরে ধীরে বইটি চোখের দিকে সরিয়ে আনো ; এইভাবে সরিয়ে আনতে আনতে বইটি চোখের খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় পৌঁছুলে দেখবে গাছের ছবিটি হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হল ; তার কারণ এই অবস্থায় গাছের ছবিটি থেকে আলো ডান-চোখের 'অন্ধ-কেন্দ্রে' গিয়ে পড়েছে, ফলে কোন সংবেদনই হচ্ছে না।

রেটিনাটি বস্তুতপক্ষে মস্তিষ্কেরই একটি যেন বাড়তি অংশ হিসাবে আমাদের শরীরে দেখা দিয়েছে। ভ্রূণাবস্থার প্রথম দিকে মস্তিষ্কের টিস্যু (Brain Tissue) থেকেই ক্রমশ এই রেটিনা গজাতে থাকে। প্রস্থচ্ছেদ করে অনুবীক্ষণের সাহায্যে রেটিনাকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যে তার মধ্যে নানা স্তর বর্তমান ; এ-জাতীয় একটি নির্দিষ্ট স্তরে দণ্ডকোষ (Rod Cells) এবং চূড়াকৃতি কোষ (Cone Cells) নামের দু'রকম জীবকোষ (Cells) দেখা যায়। এই কোষগুলি আসলে নিউরনই এবং চাক্ষুষ সংবেদনের গ্রাহক বলতে প্রকৃতপক্ষে এই দু' জাতীয় কোষই। অর্থাৎ, এই দু' জাতের কোষ উদ্দীপিত হলেই চাক্ষুষ সংবেদনের স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। সংখ্যার দিক থেকে চূড়াকৃতি কোষ (Cone Cells) তুলনায় অনেক কম ; সমগ্র রেটিনায় এ-জাতীয় কোষের মোট সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ। দণ্ডকোষ (Rod Cells) সংখ্যায় অনেক বেশি ; সমগ্র রেটিনায় মোট প্রায় দশ কোটি। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ইতিপূর্বে 'ফোভিয়া' (Fovea) বলে রেটিনার যে-কেন্দ্র উল্লিখিত হয়েছে চূড়াকৃতি কোষগুলি সেখানে এবং তার আশেপাশেই অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষিভাবে অবস্থিত এবং এই 'ফোভিয়া'য় কোন দণ্ডকোষ নেই। 'ফোভিয়া' থেকে রেটিনার যতই দূরের অংশ পরীক্ষা করা হয় ততই দেখা যায় চূড়াকৃতি কোষের সংখ্যা কমছে এবং দণ্ডাকৃতি কোষের সংখ্যা বাড়ছে ; এইভাবে 'ফোভিয়া'কে কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করলে দেখা যাবে রেটিনার কিনারার দিকে চূড়াকৃতি কোষ একেবারেই নেই ; সেখানে শুধুমাত্র দণ্ডাকৃতি কোষই বর্তমান। আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, চূড়াকৃতি কোষগুলিই আমাদের বর্ণ-সংবেদনের (Chromatic Sensation) জন্য দায়ী ; দণ্ডকোষগুলি থেকে আমরা শুধুমাত্র বর্ণবিহীন (Achromatic Sensation) পেয়ে থাকি। অর্থাৎ, আমাদের রেটিনায় যদি এই চূড়াকৃতি কোষগুলি না থাকত তাহলে আমরা কোন রঙীন বস্তুকে রঙীন বলে দেখতে পেতাম না ; পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আমাদের চোখে সাদা-কালো এবং ধূসর মনে হত—একটি সাধারণ সাদা-কালো চলচ্চিত্র (অর্থাৎ যে-চলচ্চিত্র রঙীন বা Technicolour নয়) দেখবার সময় আমাদের যে-রকম চাক্ষুষ সংবেদন হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনুমান

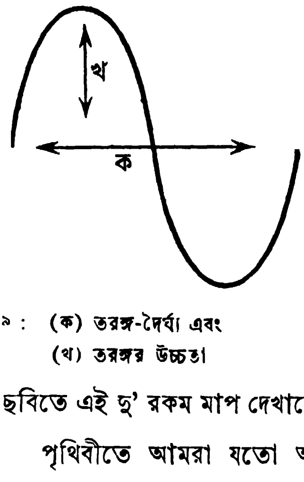


৮ : রেটিনার দ্বিবিধ নিউরন
(ক) দণ্ডকোষ, (খ) চূড়াকৃতি কোষ

করেন যে জীবজগতে ক্রমবিকাশের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়েই চোখের মধ্যে এই জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ গড়ে উঠেছে। তুলনায় নিম্নতর প্রাণীদের রেটিনায় চূড়াকৃতি কোষ নেই ; ফলে সমস্ত পৃথিবীই তাদের চোখে বর্ণবিহীন। এই বর্ণ-সংবেদনের আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করব।

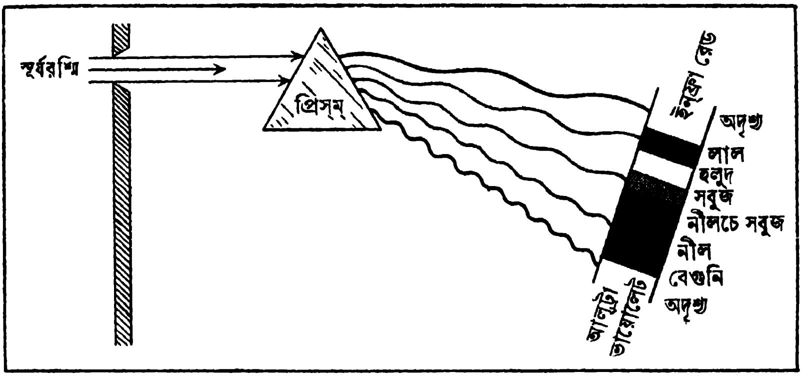
খ ॥ চাক্ষুষ সংবেদনের উদ্দীপক : আলো

চাক্ষুষ সংবেদনের উদ্দীপক হল আলো। আলোর স্বরূপ সংক্রান্ত আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল ও কঠিন আলোচনায় প্রবেশ না করেও আমরা এখানে আলো-কে মোটের উপর এক জাতীয় তরঙ্গ (Wave) বলে ধরে নিতে পারি। মাপের দিক থেকে বিভিন্ন তরঙ্গর মধ্যে তারতম্য আছে। কোন তরঙ্গ তুলনায় দীর্ঘ, কোন তরঙ্গ হ্রস্ব ; আবার কোন তরঙ্গর চূড়া তুলনায় বেশি উঁচু, কোন তরঙ্গর চূড়া কম উঁচু। অর্থাৎ, তরঙ্গগুলিকে দু' দিক থেকে মাপা যায়। এই দু' রকম মাপকে বলা হয় (ক) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length), (খ) উচ্চতা (Amplitude)। ছবিতে এই দু' রকম মাপ দেখানো হল।



৯ : (ক) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং
(খ) তরঙ্গর উচ্চতা

পৃথিবীতে আমরা যতো আলো পাই তার চরম উৎস হল সূর্য। যেমন, সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির উপর নির্ভর করেই গাছে সর্ষে হয় ; অতএব প্রদীপে সর্ষের তেল পুড়িয়ে যে-আলো পাই তাও শেষ পর্যন্ত সূর্যর কাছ থেকে পাওয়াই। চলতি কথায় আমরা বলি সূর্যের আলো হল সাদা। আসলে এই সূর্যালোকের মধ্যে অনেক রকম রঙিন আলো মিশ্রিত হয়ে আছে। 'প্রিস্‌ম্' বা ত্রিপার্শ-কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো গেলে তার মধ্যেকার রঙিন আলোগুলির মিশ্রাবস্থা ভেঙে যায় ; অর্থাৎ রঙিন আলোগুলি আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। তখন আমরা দেখি, বিভিন্ন রঙের আলো যেন পরপর সাজানো রয়েছে—রামধনুর মত। তার এক প্রান্তে বেগুনি, অপর প্রান্তে লাল, মাঝে গাঢ়-নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা। অর্থাৎ, আমরা পরপর নিম্নোক্ত রঙ দেখতে পাই : বেগুনি (Violet), গাঢ়-নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। রঙের এই তালিকা সহজে মনে রাখার জন্য এগুলির ইংরেজী আদ্যঅক্ষর পর পর বসিয়ে VIBGYOR শব্দ ব্যবহারের প্রথা আছে। সূর্যর আলো ভেঙে পাওয়া রঙিন



পৃষ্ঠা ৯০-৯১ দ্রষ্টব্য। প্রিস্‌মের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে সূর্যের আলোর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রঙ-এর আলোগুলির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কারণ, বিভিন্ন রঙ-এর আলোগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন এবং প্রিস্‌মের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বিভিন্ন "কোণ" বা angle-এ বেঁকে যায়। বেগুনির চেয়ে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো বা লালের চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো আমরা চোখে দেখতে পাই না।

আলোর এই সারিকে বলা হয় বর্ণালী (Spectrum)। আসলে বর্ণালীতে আমরা যে-আলোগুলি দেখতে পাই সূর্যের আলোর মধ্যে তাছাড়াও আরো অনেক আলো আছে। কিন্তু বাকিগুলি আমাদের চোখের কাছে অদৃশ্য।

বর্ণালীর অন্তর্ভুক্ত এই বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length) বিভিন্ন ; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তারতম্যর জন্যই আলোগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য। বর্ণালীতে যে-আলোগুলি দেখতে পাই সেগুলির মধ্যে লালের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, বেগুনির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম ; বেগুনির চেয়ে গাঢ়-নীলের (Indigo) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কিছু বেশি, গাঢ়-নীলের চেয়ে নীলের (Blue) আরো কিছু বেশি, নীলের চেয়ে সবুজের আরো কিছু বেশি—এইভাবে পর পর বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে চলেছে। যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লালের চেয়ে বেশি তাকে বলে 'ইন্‌ফ্রা-রেড' ; যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনির চেয়ে কম তাকে বলে 'আল্‌ট্রা-ভায়োলেট' ; উভয়ই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

'প্রিস্‌ম্‌'-এর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলোর ভিতরকার বিভিন্ন আলোগুলির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কেননা বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো বিভিন্ন ভাবে (অর্থাৎ, বিভিন্ন 'কোণ' বা angle-এ) বেঁকে যায়। যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বেশি সে-আলো বেঁকে তত কম ; যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম সে-আলো বেঁকে তত বেশি। এইভাবে বিভিন্ন আলোর মধ্যে যেন দল-ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। (ক্রোড়পত্রের রঙিন ছবি দ্রষ্টব্য।)

আমরা একটি বস্তুকে দেখতে পাই কী করে ? সূর্যের আলো বস্তুটির উপর পড়ে আবার বস্তুটি থেকে আমাদের চোখ পর্যন্ত ঠিকরে ফিরে আসে। কিন্তু সূর্যের আলোর ভিতরকার সমস্ত আলোই সমস্ত বস্তু থেকে এভাবে ঠিকরে ফিরে আসে না। যে-জাতীয় বস্তু থেকে সূর্যালোকের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আলোই আমাদের চোখে ফিরে আসে সে-জাতীয় বস্তু আমাদের চোখে সাদা বলে প্রতীত হয়। অন্যান্য বিভিন্ন বস্তু সূর্যালোকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আলোর মধ্যে কোন কোন আলো যেন আত্মসাৎ করে, বাকি আলো চোখের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে যে-বস্তু থেকে যে-আলো চোখের দিকে ফিরে আসে সেই আলো অনুসারেই বস্তুটির রঙ প্রতিভাত হয়। চুনি থেকে ফিরে আসে শুধু লাল আলো, চুনি তাই আমাদের চোখে লাল ; পান্না থেকে ফিরে আসে শুধু সবুজ আলো, আমাদের চোখে তাই পান্না সবুজ। যে-বস্তু থেকে কোন আলোই আমাদের চোখে আসে না সে-বস্তুকে আমরা কালো দেখি ; অর্থাৎ, নির্ভুলভাবে বললে বলা উচিত, সেখানে আমরা কিছুই দেখতে পাই না।

গ ॥ চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য

এক : বর্ণযুক্ত ও বর্ণবিহীন সংবেদন

চাক্ষুষ সংবেদনকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা হয় : বর্ণযুক্ত (Chromatic) এবং বর্ণবিহীন (Achromatic) সংবেদন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, বর্ণযুক্ত চাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে রেটিনার চূড়াকৃতি কোষগুলির উপর এবং বর্ণবিহীন চাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে রেটিনার দণ্ডকোষগুলির উপর। দিনের উজ্জ্বল আলোয় 'ফোভিয়া' ও তার কাছাকাছি অবস্থিত চূড়াকৃতি কোষগুলি বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় ; ফলে আমরা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রঙ স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান আলোয় চূড়াকৃতি কোষগুলি উদ্দীপিত হয় না ; সে-অবস্থায় চাক্ষুষ সংবেদন প্রধানত নির্ভর করে রেটিনার দণ্ডকোষগুলির উপর ; ফলে আমাদের সংবেদন বর্ণবিহীন হয়ে যায়—সন্ধ্যার ম্লান আলোয় সমস্ত পৃথিবীই আমাদের চোখে সাদা-কালো-ধূসর, অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বর্ণ চোখে পড়ে না।

দুই : মুখ্য রঙ (Primary Colours)

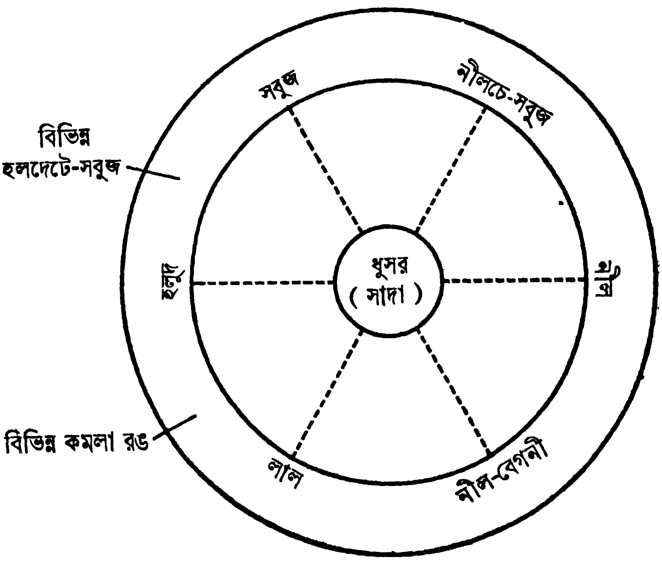
আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বহু বিচিত্র রঙ অনুভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ভাবে অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রায় অসংখ্য রঙের মধ্যে কোন্‌গুলি মুখ্য (Primary)? বর্ণালীতে মোটের উপর সাতটি রঙ চোখে পড়ে। কিন্তু এই সাতটিকেও সমান মুখ্য বলা হয় না। বস্তুত, মুখ্য রঙের তালিকা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একটি মতে, মুখ্য বা প্রধান রঙ হল মাত্র চারটি : লাল, হলুদ, সবুজ এবং নীল—এই চারটি বা এগুলির মধ্যে যে-কোন দুটি বা যে-কোন তিনটিকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাকি সমস্ত রঙ-ই পাওয়া সম্ভব। মতান্তরে, মুখ্য রঙ বলতে মাত্র তিনটি : লাল, সবুজ এবং নীল—এমনকি হলুদ রঙকেও মুখ্য মনে করার কারণ নেই, কেননা নির্দিষ্ট অনুপাতে লাল ও সবুজ মিশিয়ে হলুদ রঙ পাওয়া যায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্য রঙের তালিকা সংক্রান্ত এ-জাতীয় বিতর্ক অনেকাংশেই অবাস্তর বলে বিবেচিত। কেননা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রতিটি রঙের অভিজ্ঞতারই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান ; অতএব এদিক থেকে প্রতিটি রঙকেই সমান মুখ্য বলা যায়। অপরপক্ষে, বিভিন্ন রঙের মিশ্রণের সাহায্যে উপরোক্ত উভয় মতেই স্বীকৃত তথাকথিত মুখ্য রঙগুলিও তৈরি করা যায়। যেমন, ঘোর-নীল (Indigo) এবং নীলচে-সবুজ (Blue-Green) মিশিয়ে তৈরি করা যায় নীল (Blue) রঙ ; কিংবা কমলা রঙ (Orange) এবং নীল-বেগনী (Purple)

মিশিয়ে তৈরি করা যায় লাল রঙ। অতএব আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে সমস্ত রঙ-ই সমান মুখ্য ; অপরপক্ষে মিশ্রণ-সম্ভাবনার দিক থেকে সমস্ত রঙ-ই সমান গৌণ।

তিন : বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক (Relations of colours)

বিভিন্ন রঙের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা-প্রসঙ্গে সাধারণত একাধিক রঙ একসঙ্গে গুলে দেখার বদলে একটি সাদা পর্দার উপর একাধিক রঙের আলো একসঙ্গে ফেলা হয়। অর্থাৎ, একাধিক রঙ মেশানোর বদলে একাধক রঙিন আলো মিশিয়ে দেখা হয়। তাছাড়া, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চোখের উপর পরপর



১০ : বর্ণ-সম্পর্ক

দু'রকম রঙের আলো এলেও প্রথম আলোর সংবেদনের রেশ দ্বিতীয় আলোর সংবেদনকে প্রভাবিত কোরে মিশ্র রঙের সংবেদন দেয় ; অতএব একটি চাকতিতে বিভিন্ন রঙ বসিয়ে চাকৃতিটি টেব্‌ল-পাখার (Table-fan) 'ব্লেডের' মত দ্রুতগতিতে ঘুরিয়েও বর্ণ সংমিশ্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা করা যায়। এ-জাতীয় পরীক্ষার ফলে দেখা যায় :—

বিভিন্ন অনুপাতে কালো এবং সাদা মিশিয়ে বিভিন্ন ছাই রঙের (অর্থাৎ, উজ্জ্বল সাদা এবং ঘন কালোর মধ্যে যত রকম ছাই রঙ হওয়া সম্ভব) সংবেদন

পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ লাল, নীল প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে সাদা এবং ধূসর মিশিয়ে রঙগুলির বিশুদ্ধতা কমিয়ে অপেক্ষাকৃত ফিকে রঙে পরিণত করা যায়। তেমনি বিভিন্ন বিশুদ্ধ রঙের সঙ্গে কম-বেশি কালো মিশিয়ে রঙগুলিকে কম-বেশি ম্লান করা যায়।

আবাব, বিভিন্ন অনুপাতে লাল ও হলুদ মিশিয়ে লাল ও হলুদের মধ্যবর্তী সমস্ত কমলা (Orange) রঙ পাওয়া যায়। তেমনি, বিভিন্ন অনুপাতে হলুদ ও সবুজ মিশিয়ে পাওয়া যায় সমস্ত রকম হলদেটে-সবুজ ; এইভাবে সবুজ ও নীল মিশিয়ে পাওয়া যায় সমস্ত রকম নীলচে-সবুজ। আবার লাল ও নীল মিশিয়ে পাওয়া যায় নানারকম বেগনী (Violet) এবং নীল-বেগনী (Purple) রঙ।

কিন্তু সাদা পর্দায় নীল আলোর সঙ্গে হলুদ আলো একসঙ্গে ফেললে (অর্থাৎ, তুলিতে নীল ও হলুদ রঙ গোলা নয়,—নীল আলোক তরঙ্গ ও হলুদ আলোক তরঙ্গর সংমিশ্রণ ঘটালে) কোন্ রঙের সংবেদন পাওয়া যাবে? আসলে কোন বর্ণ-সংবেদন পাওয়া যাবে না, কিংবা যা একই কথা, সংবেদন হবে ধূসর বা সাদা। এইভাবে যখন এক-জোড়া স্বতন্ত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো রেটিনাকে উদ্দীপিত করে আমাদের সাদা বা ধূসরের সংবেদন দেয় তখন উক্ত জুড়ির উভয়কেই পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ (Complementary Colours) বলা হয়। অতএব, হলুদ ও নীল পরস্পরের পরিপূরক। তেমনি লাল ও নীলচে সবুজ পরস্পরের পরিপূরক ; নীল-বেগনী (Purple) এবং সবুজ পরস্পরের পরিপূরক বর্ণ (Complementary Colours)।

চার : বর্ণান্ধতা (Colour Blindness)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রেটিনার চূড়াকৃতি কোষ (Cone cells) থেকে বর্ণ-সংবেদন পাওয়া যায়। দণ্ডকোষগুলি (Rod cells) আমাদের বর্ণবিহীন সংবেদন দেয়। অতএব আমাদের রেটিনার যে-অংশে চূড়াকৃতি কোষ নেই,—শুধুমাত্র দণ্ড-কোষ বর্তমান—সে-অংশকে বর্ণান্ধ বলতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের চোখে যদি শুধু দণ্ডকোষ থাকত তাহলে আমরা বর্ণান্ধ (Colour-Blind) প্রাণী হতাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে দণ্ডকোষ ছাড়াও চূড়াকৃতি কোষ বর্তমান, অতএব আমাদের বর্ণবিহীন সংবেদন ছাড়াও বর্ণ-সংবেদন হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তির বর্ণ-সংবেদন গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। তাদের বলা হয় বর্ণান্ধ (Colour-Blind)। এই বর্ণান্ধতা দু'রকমের হতে পারে : (১) সামগ্রিক বর্ণান্ধতা (Total Colour-Blindness) এবং (২) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red-Green Blindness)।

যে-ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে বর্ণান্ধ তার সমস্ত চাক্ষুষ সংবেদনই সাদা-কালো-ধূসর বলে প্রতীত হয়; অর্থাৎ, তার চোখে লাল-সবুজ-নীল-হলুদ প্রভৃতি কোন রঙ-ই ধরা পড়ে না। স্বভাবতই অনুমান হয়, এ-জাতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নির্ভর করে শুধুমাত্র রেটিনার দণ্ডকোষের (Rod Cells) উপর—অর্থাৎ, এদের রেটিনায় চূড়াকৃতি কোষের (Cone Cells) অভাব বা অক্ষমতাই এদের বর্ণান্ধতার কারণ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে বর্ণান্ধ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত খুব কম।

যে-ব্যক্তি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ (Red-Green Blind) সে সাদা-কালো-ধূসর ছাড়াও হলুদ এবং নীল বর্ণের সংবেদন পায়; কিন্তু তার চোখে লাল এবং সবুজ রঙ ধরা পড়ে না। সাধারণ সুস্থ চোখে যে-রঙ লাল বা সবুজ বলে প্রতীত হয় এ-জাতীয় ব্যক্তির চোখে তা প্রতীত হয় ম্লান হলুদ হিসাবে; আবার সাধারণ চোখে যে-রঙ সবুজ-ঘেঁষা নীল, বেগনী (Violet) এবং নীল-বেগনী (Purple)—এ-জাতীয় বর্ণান্ধ ব্যক্তির চোখে তা ম্লান নীল রঙের মনে হয়। মেয়েদের মধ্যে এ-জাতীয় বর্ণান্ধতার দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না; পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩ বা ৪ ভাগ লাল-সবুজ বর্ণান্ধ।

স্বভাবতই এঞ্জিন-চালক প্রভৃতির পক্ষে এ-জাতীয় বর্ণান্ধতা বিশেষ মারাত্মক হতে পারে। তাই বর্ণান্ধতা নিরূপণের জন্য নানারকম অভীক্ষা (Tests) উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ অভীক্ষাকে বলা হয় ইষিহর অভীক্ষা (Ishihara Test)। এই অভীক্ষায় নানা রঙ-এর ফোঁটা দিয়ে কয়েকটি ছবি আঁকা হয়—রঙ-এর ফোঁটা এমনভাবে সাজানো হয় যে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি একটি ছবিতে যে-সংখ্যা দেখবে বর্ণান্ধ ব্যক্তি সেই ছবিতেই দেখবে অন্য কোন সংখ্যা। যেমন : একটি ছবিতে বর্ণান্ধ ব্যক্তি 5 না-দেখে 2 দেখবে।

পাঁচ : অনু-সংবেদন (After Sensation)

কোন একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপক দ্বারা দীর্ঘক্ষণ উদ্দীপিত থাকার পর উক্ত উদ্দীপক অপসৃত হলেও সাময়িকভাবে সেই উদ্দীপক-জন্য সংবেদনের রেশ বর্তমান থাকতে পারে। সংবেদনের এ-জাতীয় রেশকে বলা হয় অনু-সংবেদন (After Sensation)। অনেক সময় একে অনু-প্রতিরূপ (After Image) বলা হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-প্রসঙ্গে অনু-সংবেদন ঘটলেও বিশেষত চক্ষু-ইন্দ্রিয়র অনু-সংবেদনই এখানে উল্লেখ করা যাক। চাক্ষুষ অনু-সংবেদনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative)। পূর্ববর্তী সংবেদন এবং পরবর্তী অনু-সংবেদন সমজাতীয় হলে অনু-সংবেদনকে ধনাত্মক (Positive) বলা হয়। যেমন, খোলা জানলার

দিকে বা উজ্জ্বল আলোর দিকে একটানা কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ সরিয়ে নিলেও সাময়িকভাবে চোখে পূর্বেকার আলোক-সংবেদনের রেশ যেন টিকে থাকে। অপরপক্ষে, কোন এক বর্ণ-সংক্রান্ত সংবেদনের পর অনু-সংবেদন যদি তারই পরিপূরক বর্ণের (Complementary Colour) হয় তাহলে এই অনু-সংবেদনকে ঋণাত্মক (Negative) বলা হয়। যেমন, দেয়ালের উপর উজ্জ্বল রক্তবর্ণের একটি বৃত্তাকার চিত্রের দিকে অনেকক্ষণ একটানা চেয়ে থাকার পর যদি চোখ সরিয়ে পাশের জায়গায় দৃষ্টি আবদ্ধ করা যায় তাহলে সেই পাশের জায়গায় সাময়িকভাবে নীলচে-সবুজ রঙ-এর—অর্থাৎ, রক্তবর্ণের পরিপূরক বর্ণের—সংবেদন পাওয়া যাবে।

ছয় : 'রেটিনার নিজের আলো' (Retina's Own Light)

মধ্যরাত্রে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে আমরা অনেক সময় একরকম ঝাপসা ধূসর আলোর সংবেদন পাই। সম্ভবত, মস্তিষ্কের চাক্ষুষ সংবেদনের কেন্দ্র রক্ত-চলাচলের ফলে কোন-একভাবে উদ্দীপিত হয় বলেই এ জাতীয় আলোক সংবেদন সম্ভব হয়। (ইতিপূর্বে আলোচিত 'মুয়েলারের বিশিষ্ট স্নায়বিক শক্তি সংক্রান্ত মতবাদ' দ্রষ্টব্য)। বাহ্য আলোকের অভাবেও এ-জাতীয় সংবেদন-বিষয় আলোককে অনেক সময় 'রেটিনার নিজের আলো' বলা হয়, যদিও মনে রাখা দরকার বস্তুত রেটিনার নিজস্ব আলো বলতে সত্যিই কিছু নেই ; এ-জাতীয় সংবেদনের উদ্দীপক প্রকৃতপক্ষে আলোকই নয়। অর্থাৎ, সংবেদন হিসাবে ঘটনাটি চিত্তাকর্ষক হলেও আলোচ্য নামটি প্রকৃতপক্ষে কাব্যমূলক বা কল্পনামূলক।

সাত : বৈষম্য-পরিণাম (Effects of Contrast)

চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি বর্ণের সংবেদন তার পার্শ্বস্থ স্থলের কিনারাকে নিজ বর্ণের পরিপূরক বর্ণ দ্বারা প্রভাবিত করতে চায়। এই ঘটনাকে বৈষম্য-পরিণাম (Effect of Contrast) বলে। যেমন, একটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণের বড় কাগজের উপর এক টুকরো ছোট ধূসর কাগজ রাখলে দেখা যায় উক্ত ধূসর কাগজের কিনারা নীলচে-সবুজ (লালের পরিপূরক) বর্ণ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

আট : অন্ধকার-প্রতিযোজন (Dark Adaptation) ও বর্ণ-প্রতিযোজন (Colour Adaptation)

আলো থেকে অস্পষ্ট আলোকে বা আধো-অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে

(যেমন, দুপুরবেলা সিনেমা-ঘরে ঢুকলে) প্রথমাবস্থায় ঘরের জিনিসপত্র চোখে পড়ে না ; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চোখে অন্ধকার 'সহ্য হয়ে আসে' (চলতি কথায় 'সয়ে আসে') ; তখন ঘরের জিনিসপত্র দেখতে অসুবিধা হয় না। এই ঘটনাকে বলা হয়, 'অন্ধকার-প্রতিযোজন' (Dark Adaptation)। তেমনি আধো-অন্ধকার ঘর থেকে আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল আলোকে এলে প্রথমাবস্থায় চোখে 'ধাঁধা' লাগে ; কিন্তু ক্রমশ উজ্জ্বল আলোক চোখে সহ্য হয়ে আসে। এই ঘটনাকে বলা হয়, 'আলোক-প্রতিযোজন' (Light Adaptation)। আবার, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কোন উজ্জ্বল রঙিন আলো জ্বালালে প্রথমাবস্থায় মনে হয় ঘরের সমস্ত কিছুই উক্ত রঙিন আলোর রঙ দ্বারা রঞ্জিত ; এ-অবস্থায় বিভিন্ন বস্তুর রঙের পার্থক্য স্পষ্ট নয় ; কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যে ঘরের রঙিন আলোর প্রভাব চোখে সহ্য হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বস্তুর বর্ণ-পার্থক্য তখন চোখে পড়ে। এই ঘটনাকে বলা হয় বর্ণ-প্রতিযোজন (Colour Adaptation)।

নয় : পুর্‌কিন্‌য়ী ঘটনা (Purkinje Phenomenon)

ইতিপূর্বে দেখেছি, গোধূলিলগ্নে—অর্থাৎ দিনের আলো ম্লান হয়ে এলে—রেটিনার চূড়াকৃতি কোষগুলি (Cone Cells) ক্রমশই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ; এ-অবস্থায় চাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে রেটিনার দণ্ডকোষের (Rod Cells) উপর। অতএব আমাদের সংবেদনও বর্ণবিহীন (Achromatic) হয়ে আসে, কেননা দণ্ডকোষগুলি থেকে বর্ণ সংবেদন পাওয়া যায় না। অতএব, আলোক-প্রতিযোজনের অবস্থায় চূড়াকৃতি কোষগুলি সবিশেষ সংবেদনশীল থাকে ; অন্ধকার-প্রতিযোজনের অবস্থায় সেগুলির সংবেদনশীলতা হ্রাস প্রায়, বিশেষভাবে সংবেদনশীল থাকে দণ্ডকোষগুলি। ফলে অন্ধকার-প্রতিযোজনের অবস্থায় রঙের সংবেদন হয় না। এইভাবে, যখন দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে—অর্থাৎ, চাক্ষুষ সংবেদন যখন চূড়াকৃতি কোষগুলির পরিবর্তে দণ্ডকোষগুলির উপর নির্ভরশীল হয়—তখন চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে, তার নাম দেওয়া হয় পুর্‌কিন্‌য়ী ঘটনা (Purkinje Phenomenon)—পুর্‌কিন্‌য়ী নামের অস্ট্রিয়ার জনৈক বিজ্ঞানীই প্রথম এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেন। ঘটনাটি হল : ভাল আলোয়—অর্থাৎ রেটিনার চূড়াকৃতি কোষগুলি যখন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় তখন—আমাদের চোখে উজ্জ্বলতম রঙ বলতে লাল এবং হলুদ। কিন্তু আলো যত কমে আসে ততই এই দুটি রঙের ঔজ্জ্বল্যও কমে যায়। অপরপক্ষে, ভাল আলোয় নীল এবং সবুজ রঙ অপেক্ষাকৃত ম্লান বা কম উজ্জ্বল থাকে ; কিন্তু আলো যতই কমে আসে ততই এই দুটি রঙের ঔজ্জ্বল্য লাল ও

হলুদের তুলনায় বেড়ে যায়। অতএব চূড়াকৃতি কোষ-নির্ভর বর্ণবৈচিত্র্যময় চাক্ষুষ সংবেদন পরিবর্তিত হয়ে দণ্ডকোষ-নির্ভর বর্ণবিহীন চাক্ষুষ সংবেদনে পরিণত হবার সময় সর্বপ্রথম লাল ও হলুদের সংবেদন লোপ পায় এবং চাক্ষুষ সংবেদন সম্পূর্ণ বর্ণ-বিহীন হবার আগে পর্যন্ত শেষ বর্ণ-বৈচিত্র্য হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে নীল এবং সবুজ। যথা : সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তখন আমরা দেখি রক্তবর্ণ ও হলুদবর্ণ ফুলযুক্ত গাছের ফুলগুলির রঙ আমাদের চোখে আর ধরা না পড়লেও গাছের সবুজ পাতাকে সবুজই দেখাচ্ছে। সন্ধ্যার আলো আরো ম্লান হলে অবশ্য সবুজ এবং নীল রঙের সংবেদনও লোপ পায়, সে-অবস্থায় চাক্ষুষ সংবেদন শুধুমাত্র দণ্ডকোষ-নির্ভর—অতএব সম্পূর্ণ বর্ণবিহীন—হয়ে যায়।

ঘ॥ চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত মতাবলী (Theories of Vision)

যদিও এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে বর্ণ-বৈচিত্র্যযুক্ত চাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে চূড়াকৃতি কোষগুলির সক্রিয়তার উপরই, তবুও ঠিক কী ভাবে এই চূড়াকৃতি কোষগুলি আমাদের বর্ণ-সংবেদন দেয় সে-বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনো পাওয়া যায়নি। ফলে তার ব্যাখ্যায় নানা মতবাদ (theory) প্রস্তাবিত হয়েছে। যথা :—

এক : ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌-এর মতবাদ (Young-Helmholtz Theory)

বর্ণ-সংবেদন সংক্রান্ত একটি মতবাদ প্রস্তাব করেন ইয়ং (Young) এবং তারপর হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌ (Helmholtz) সেই মতবাদটি পরিশোধন করেন বলে সেটি উভয়ের নামের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। এই মতে রেটিনার চূড়াকৃতি কোষ আসলে তিন রকমের, বর্ণালীতে (spectrum) আমরা যে-কয়টি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো দেখতে পাই তার সব কয়টিই উক্ত ত্রিবিধ চূড়াকৃতি কোষকে উদ্দীপিত করে। কিন্তু এই তিন রকমের চূড়াকৃতি কোষের মধ্যে এক জাতীয় কোষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় লাল এবং লালের কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলোর দ্বারা ; দ্বিতীয় জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় সবুজ এবং সবুজের কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো দ্বারা ; তৃতীয় জাতীয় চূড়াকৃতিকোষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় নীল এবং নীলের কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো দ্বারা। যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর জন্য আমরা হলুদের সংবেদন পাই তার দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপিত হবার মতো কোন স্বতন্ত্র জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ এই মতে স্বীকারযোগ্য নয় ; কেননা লাল এবং সবুজের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একাধারে রেটিনার দু' রকম চূড়াকৃতি কোষকে উদ্দীপিত করলে হলুদের সংবেদন পাওয়া যায়। এই মতে, রেটিনার ত্রিবিধ চূড়াকৃতি কোষই সমানভাবে

উদ্দীপিত হলে আমরা সাদার সংবেদন পাই, চূড়াকৃতি কোষের মধ্যে কোন এক রকমও যদি উদ্দীপিত না হয় তাহলে আমরা সংবেদন পাই কালোর। রেটিনার একাধিক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ একাধারে বিভিন্নভাবে উদ্দীপিত হলে আমরা লাল, সবুজ ও নীল ছাড়া অন্যান্য নানা রঙের সংবেদন পাই।

আলোচ্য মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণাত্মক চাক্ষুষ অনু-সংবেদনের (Negative Visual After-Sensation) চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয়েছে। যথা : যে-চূড়াকৃতি কোষগুলি বিশেষ করে লাল আলোর দ্বারা উদ্দীপিত হয় সেগুলি একটানা অনেকক্ষণ উদ্দীপিত অবস্থায় থাকলে 'ক্লান্ত' হয়ে পড়ে। ফলে, লাল রঙ থেকে চোখ সরিয়ে পাশের সাদা দেয়ালের দিকে চাইলে সাদা দেয়াল থেকে চোখে বর্ণালীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রঙের আলো এলেও লালের জন্য বিশেষভাবে দায়ী চূড়াকৃতি কোষগুলির স্বাভাবিক সক্রিয়তা থাকে না; এ-অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকে নীল এবং সবুজ সংবেদনের জন্য দায়ী চূড়াকৃতি কোষগুলি। ফলে আমরা নীল-সবুজের (অর্থাৎ লালের পরিপূরক বর্ণের) সংবেদন পাই।

তবুও এ-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই মত থেকে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red-Green Blindness) সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যেমন, লাল সংবেদন এবং সবুজ সংবেদনের জন্য যদি রেটিনার দু'রকম স্বতন্ত্র জাতের চূড়াকৃতি কোষই দায়ী হয় তাহলে মানতে হবে, যে-ব্যক্তি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ তার রেটিনায় এই দু'রকম চূড়াকৃতি কোষ উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত হতে পারে না। অর্থাৎ, এই দ্বিবিধ চূড়াকৃতি কোষ নষ্ট বা অসুস্থ হলেই মানুষ লাল-সবুজ বর্ণান্ধ হবে। কিন্তু তাহলে এ-হেন ব্যক্তির পক্ষে হলুদের সংবেদনও হওয়া সম্ভব নয়; কেননা এই মতে লাল এবং সবুজের জন্য দায়ী দ্বিবিধ চূড়াকৃতি কোষ একাধারে উদ্দীপিত হলেই হলুদ রঙের সংবেদন হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তিরাও হলুদের সংবেদন পায়। এমনকি, এই মতে লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তির পক্ষে সাদার সংবেদনও অসম্ভব হবার কথা। কেননা এই মতে রেটিনার ত্রিবিধ চূড়াকৃতি কোষ সমানভাবে উদ্দীপিত হলে সাদার সংবেদন হয়, এবং যার রেটিনায় লাল ও সবুজের জন্য দায়ী চূড়াকৃতি কোষ অক্ষম হয়েছে তার পক্ষে ত্রিবিধ চূড়াকৃতি কোষের সমান-উদ্দীপনার কথা ওঠে না। অথচ, বাস্তবভাবে দেখা যায়, লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তিও সাদার সংবেদন থেকে বঞ্চিত নয়।

দুই : হেরিং-এর মত (Hering's Theory)

হেরিং (Hering) চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত অপর একটি মতবাদ প্রস্তাব

করেছেন। তাঁর মতে, রেটিনায় চূড়াকৃতি কোষ আসলে দু'রকমের : এক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ লাল ও সবুজ রঙের সংবেদন দেয়, অপর জাতীয় কোষ সংবেদন দেয় নীল ও হলুদের। এছাড়াও অবশ্য রেটিনায় দণ্ডকোষ বর্তমান ; সেগুলি আমাদের সাদা-কালোর সংবেদন দেয়। অতএব, মোটের উপর রেটিনায় তিন রকম কোষ বর্তমান : (১) সাদা-কালো সংবেদনের জন্য দায়ী দণ্ডকোষ, (২) লাল-সবুজ সংবেদনের জন্য দায়ী এক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ এবং (৩) নীল-হলুদ সংবেদনের জন্য দায়ী অপর এক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ। অতএব এই মতে, রেটিনার ত্রিবিধ কোষের প্রতি জাতীয় কোষ থেকে আমরা দ্বিবিধ সংবেদন পাই। যথা : দণ্ডকোষগুলি সাদা ও কালোর সংবেদন দেয়, ঐক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ লাল ও সবুজ উভয় বর্ণের সংবেদন দেয় এবং অপর এক জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ দেয় নীল ও হলুদের সংবেদন। স্বভাবতই এই দ্বিবিধ সংবেদনের জন্য প্রতি জাতীয় কোষের দ্বিবিধ প্রক্রিয়া অনুমিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই মতে কল্পনা করা হয়েছে আলোর দ্বারা উদ্দীপিত হলে রেটিনার কোষগুলির রাসায়নিক পদার্থে 'গঠন' (Assimilation) এবং 'অপচিতি' (Dissimilation)—এই দ্বিবিধ পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং কোন্ ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা নির্ভর করছে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর উপর। যথা : লাল-সবুজ চূড়াকৃতি কোষগুলিতে লাল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলোক এলে কোষগুলির রাসায়নিক পদার্থে 'অপচিতি' ঘটবে ; তার ফলে আমরা পাবো লালের সংবেদন। কিন্তু ঐ কোষগুলিতেই সবুজ (অর্থাৎ লালের পরিপূরক) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো এলে সেগুলির রাসায়নিক পদার্থে 'গঠন'মূলক পরিবর্তন ঘটবে ; ফলে আমরা সবুজের সংবেদন পাবো। তেমনি, হলুদ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো এলো নীল-হলুদ চূড়াকৃতি কোষগুলিতে 'অপচিতি'মূলক পরিবর্তন ঘটবে ; ফলে সংবেদন হবে হলুদ বর্ণের। কিন্তু ঐ চূড়াকৃতি কোষগুলিতেই নীল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো গেলে 'গঠন'মূলক পরিবর্তন ঘটবে ; ফলে আমরা পাবো নীলের সংবেদন।

সহজেই বোঝা যায়, যে-তথ্যগুলির নজির দেখিয়ে ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোৎসের মতবাদ সমালোচনা করা হয়, হেরিং-এর এই মতবাদ থেকে সেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন নয়। কেননা, হেরিং-এর মতে লাল-সবুজ এবং নীল-হলুদের সংবেদন রেটিনার দু'রকম স্বতন্ত্র জাতীয় চূড়াকৃতি কোষের উপর নির্ভর করে। ফলে, লাল-সবুজ বর্ণান্ধর পক্ষেও হলুদ বর্ণের সংবেদন পাওয়ায় বাধা থাকে না। তেমনি, সাদার সংবেদন নির্ভর করে দণ্ডকোষগুলির উপর। ফলে লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তির রেটিনায় লাল-সবুজের চূড়াকৃতি কোষগুলির দোষ বা অক্ষমতা স্বীকৃত হলেও সেই ব্যক্তির পক্ষে সাদার সংবেদন পাওয়ায় বাধা থাকে না।

তবুও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে হেরিং-এর এই মতবাদ বিশেষ কোন মর্যাদা পায়নি। তার প্রধান কারণ, এই মতবাদে কল্পিত উপরোক্ত 'গঠন'মূলক ও 'অপচিতি'মূলক দ্বিবিধ পরিবর্তনের কথা কোন বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। দ্বিতীয়ত আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যেক স্নায়ু-অংশুর (Nerve Fibres) পক্ষে শুধুমাত্র একই রকম নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের ক্ষমতা বর্তমান। অতএব, রেটিনার প্রত্যেক জাতীয় কোষে দ্বিবিধ পরিবর্তনের ফলে দ্বিবিধ স্নায়বিক শক্তির উদ্ভব হয়—এ-জাতীয় কষ্টকল্পিত কথা যদিই বা স্বীকার করা যায় তাহলেও সেই কোষগুলির সঙ্গে সংযুক্ত একই স্নায়ু-অংশুর মাধ্যমে উক্ত দ্বিবিধ স্নায়বিক শক্তি গুরুমস্তিষ্ক পর্যন্ত কী করে পরিবাহিত হতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

তিন : ল্যাড্-ফ্রাঙ্কলিন্-এর মত (Ladd-Franklin's Theory)

ল্যাড্-ফ্রাঙ্কলিন্ (Ladd-Franklin) জীবজগতে ক্রমবিকাশের (Biological Evolution) দৃষ্টিকোণ থেকে চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত একটি নতুন মত প্রস্তাব করেছেন। এই মতে ক্রমবিকাশের ফলে যে-প্রাণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম চাক্ষুষ সংবেদনের শক্তি দেখা দিয়েছিল তাদের চাক্ষুষ সংবেদন ছিল বর্ণবিহীন (Achromatic)। অর্থাৎ, সেই প্রাণীদের রেটিনায় শুধুমাত্র দণ্ডকোষ দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু কোন চূড়াকৃতি কোষ দেখা দেয়নি। তারপর আরো উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণী-দেহের আবির্ভাবের ফলে ক্রমশ রেটিনায় ঐ দণ্ডকোষগুলির মধ্যে একাংশ পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের কোষে—অর্থাৎ চূড়াকৃতি কোষে—পরিণত হয়। রেটিনার কিনারার দিকে দণ্ডকোষগুলি আজো অপরিবর্তিত অবস্থায়—অর্থাৎ আদিম বর্ণহীন সংবেদনের উপযোগী হয়েই—বর্তমান আছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর চোখে যে-চূড়াকৃতি কোষ দেখা দেয় তা মোটের উপর দু'রকমের। এই দু'রকম চূড়াকৃতি কোষ নীল ও হলুদ বর্ণের সংবেদনের পক্ষে উপযুক্ত। ফলে ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ের প্রাণীদের পক্ষে নীল ও হলুদ বর্ণের সংবেদন সম্ভব হয়েছিল ; কিন্তু তখনো তারা লাল ও সবুজের সংবেদন গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আরো পরবর্তী পর্যায়ে হলুদ সংবেদনের চূড়াকৃতি কোষের একাংশ পরিবর্তিত হয়ে আরো দু'রকম নতুন জাতীয় চূড়াকৃতি কোষে পরিণত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে একরকমের চূড়াকৃতি কোষ লাল এবং অপর রকম চূড়াকৃতি কোষ সবুজ বর্ণের সংবেদনের পক্ষে উপযুক্ত। সংক্ষেপে, এই মত অনুসারে (অন্যান্য উন্নত প্রাণীর মতই) মানুষের রেটিনাতে মোটের উপর চার রকম চূড়াকৃতি কোষ বর্তমান এবং এই চার রকম চূড়াকৃতি কোষের উপর নির্ভর করে চার রকম বর্ণের—অর্থাৎ নীল, হলুদ, সবুজ এবং লালের—সংবেদন হয়।

অতএব ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোৎস্‌-এর মতের বিরুদ্ধে যে-জাতীয় ঘটনার নজির দেখিয়ে আপত্তি তোলা হয় ল্যাড্‌-ফ্রাঙ্ক্‌লিন-এর মতের বিরুদ্ধে সে-জাতীয় ঘটনা আপত্তি জনক বলে বিবেচিত হবে না। কেননা, এই দ্বিতীয় মতে কোন ব্যক্তির পক্ষে লাল-সবুজ বর্ণান্ধ হওয়া সত্ত্বেও হলুদের সংবেদন পাওয়া অবশ্যই সম্ভবপর। কিন্তু ল্যাড্‌-ফ্রাঙ্ক্‌লিন-এর মতবাদটিকে চরম সত্য বলে স্বীকার করবার বিরুদ্ধে বাধা এই যে, প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বাস্তব তথ্যর সঙ্গে এই মতবাদের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি কিছুই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না। তবে এই মতের সমর্থনে দাবি করা হয় যে আমাদের রেটিনা বাস্তবভাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তার কেন্দ্রস্থলে—অর্থাৎ ফোভিয়া বিন্দুর নিকটবর্তী অংশে—অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চূড়াকৃতি কোষ বর্তমান এবং রেটিনার এই অংশে লাল, সবুজ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণরই সংবেদন হয়; তার অপেক্ষাকৃত বাইরের অংশে হলুদ, নীল (এবং সাদা ও কালোর) সংবেদন হয়, কিন্তু লাল ও সবুজের সংবেদন হয় না। আরো বাইরের অংশে সংবেদন হয় শুধু সাদা-কালোর, অর্থাৎ সেই অংশে কোন বর্ণ-সংবেদন হয় না। অতএব, রেটিনার কিনারার অংশই আদিমতম এবং সবচেয়ে ভিতরের অংশ উন্নততম হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকারযোগ্য।

৭ ॥ শ্রৌত সংবেদন (Auditory Sensation)

ক : শ্রৌত সংবেদনের ইন্দ্রিয় : কান

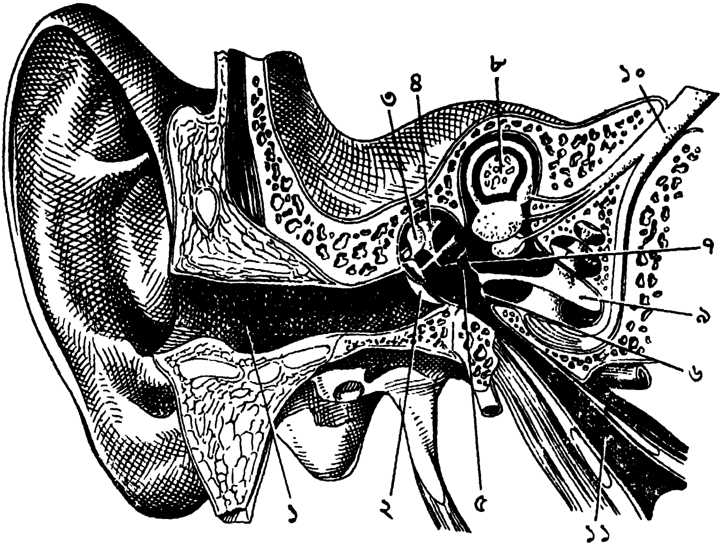
শ্রৌত সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল কান এবং উদ্দীপক হল শব্দতরঙ্গ। কানের গঠন অবশ্যই অত্যন্ত জটিল। মোটামুটিভাবে শ্রৌত সংবেদনের কথা বোঝার জন্য এখানে তার সামান্য পরিচয় দেখা যাক।

কানের গঠন বোঝবার জন্য মোটের উপর তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: (১) কানের বাইরের অংশ (Outer Ear), (২) মাঝের অংশ (Middle Ear) এবং (৩) ভিতরের অংশ (Inner Ear)।

বাইরের থেকে কানের যে-অংশ চোখে পড়ে এবং তার সঙ্গে কানের গর্ত বা কর্ণবিবর—এই দুই মিলে কানের বাইরের অংশ। এই অংশর কাজ হল পৃথিবী থেকে বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করে তাকে কানের মাঝের অংশর দিকে পরিচালিত করা।

যেখান থেকে কানের মাঝের অংশ শুরু সেখানে 'ইয়ার-ড্রাম' (Ear-Drum) নামের একটি ঝিল্লি (Membrane) আছে। আরো ভিতর দিকে পর পর আছে তিনটি ছোট্ট হাড়: গঠন-বৈচিত্র্যর দিক থেকে এই তিনটি হাড়ের নাম দেওয়া হয় হাতুড়ি (Hammer), নেহাই (Anvil) এবং রেকাব (Stirrup)।

যেখানে কানের মাঝের অংশ শেষ এবং ভিতরের অংশ শুরু সেখানে আরো একটি ঝিল্লি আছে। উপরোক্ত রেকাব (Stirrup) নামের হাড়ের ঠিক পরেই



১১ : (১) কর্ণ-রন্ধ্র, (২) ড্রাম, (৩)—(৫) তিনটি হাড়, (৬) গোলাকৃতি জানালা (Round Window), (৭) ডিম্বাকৃতি জানালা (Oval Window), (৮) অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী, (৯) কক্‌লিয়া, (১০) শ্রোত স্নায়ু

এই ঝিল্লি অবস্থিত এবং কানের ভিতরকার অংশের ডিম্বাকৃতি মুখ বা জানালা (Oval Window) এই ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

কানের ভিতরের অংশটি (Inner Ear) করোটির (Skull) একটি হাড়ের ভিতরকার বিবর (Cavity)। বিবরটি অত্যন্ত ছোট; কিন্তু তার গঠন অতি জটিল। তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি উপ-প্রকোষ্ঠ (Vestibule) বর্তমান এবং এই উপ-প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু হয়েছে : (১) তিনটি অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী (Semicircular Canals) এবং (২) 'কক্‌লিয়া' (Cochlea) নামের শামুকের মত একটি অংশ। প্রকৃত শ্রবণ-ইন্দ্রিয় এই 'কক্‌লিয়া'র মধ্যেই অবস্থিত।

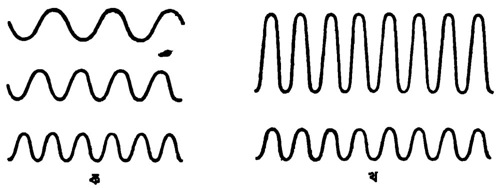
শামুকের ভিতর-পথ যেমন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উপরদিকে উঠেছে 'কক্‌লিয়া'র ভিতরকার ফাঁপা পথও অনেকটা সেই রকম। এই ফাঁপা পথটির মধ্যে এক রকম তরল পদার্থ আছে এবং একটি সরু ফিতের মত লম্বা ঝিল্লি (Membrane) আছে। তার নাম 'মধ্যম ঝিল্লি' (Basilar Membrane)। এই ঝিল্লির গায়ে রোঁয়া-রোঁয়া দেখতে এবং সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ স্নায়ুকোষ আছে। এই কোষগুলিই প্রকৃত

শ্রবণেন্দ্রিয় গঠন করেছে ; সেই শ্রবণেন্দ্রিয়র নাম দেওয়া হয় 'কর্টি' (Corti)। 'কর্টি'র স্নায়ুকোষগুলি থেকে স্নায়ু-অংশু (Nerve Fibres) প্রসারিত হয়ে যে-অন্তর্মুখী স্নায়ু গঠন করেছে তাকে বলা হয় 'শ্রৌত স্নায়ু' (Auditory Nerve)।

কানের এই গঠনটি মনে রেখে দেখা যাক, শ্রবণেন্দ্রিয় কী ভাবে উদ্দীপিত হয়। প্রথমে কানের বাইরের অংশ (Outer Ear) শ্রৌত সংবেদনের উদ্দীপককে—অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গকে—কেন্দ্রীভূত করে মাঝের অংশর দিকে পরিচালিত করে। তার আঘাতে কম্পিত হয় 'ইয়ার-ড্রাম' (Ear Drum) এবং 'ইয়ার-ড্রাম' কম্পিত হলে তার সংলগ্ন তিনটি হাড় (যথা 'হাতুড়ি', 'নেহাই' এবং 'রেকাব') দিয়ে কম্পন পরিচালিত হয় কানের ভিতরকার অংশর (Inner Ear) দিকে। ফলে, ভিতরকার অংশর ডিম্বাকৃতি মুখের কাছে যে-ঝিল্লি বর্তমান তার উপর চাপ পড়ে এবং সেই চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত 'ককলিয়া'র ভিতরকার তরল পদার্থে খুব সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে এবং সে-ঢেউতে উদ্দীপিত হয় 'ককলিয়া'র ভিতরকার 'কর্টি'র স্নায়ুকোষ। এই স্নায়ুকোষগুলিতে যে স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় তা শেষ পর্যন্ত 'শ্রৌত স্নায়ু' দিয়ে গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হলে শ্রৌত সংবেদন ঘটে।

খ : শ্রৌত সংবেদনের উদ্দীপক : শব্দ-তরঙ্গ

শ্রৌত সংবেদনের উদ্দীপক হল শব্দ-তরঙ্গ। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, তরঙ্গর মাপ দু'দিক থেকে হতে পারে : (১) উচ্চতা (Amplitude) এবং (২) তরঙ্গর দৈর্ঘ্য (Wave length)। তরঙ্গর এই দ্বিবিধ মাপ বোঝাবার জন্য এখানে দুটি ছবি দেওয়া গেল। 'ক' চিত্রের তিনটি তরঙ্গরই উচ্চতা সমান ; কিন্তু তিনটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথক। 'খ' চিত্রের দুটি তরঙ্গ উচ্চতার দিক থেকে অসমান ; কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর দিক থেকে দুটিই সমান।



১২ : শব্দ-তরঙ্গ : (ক) তিনটির উচ্চতা সমান কিন্তু দৈর্ঘ্য অসমান ; (খ) দুটির দৈর্ঘ্য সমান কিন্তু উচ্চতা অসমান

শ্রৌত সংবেদনের উচ্চতা (Loudness) নির্ভর করে উদ্দীপক হিসাবে পাওয়া **শব্দ-তরঙ্গর উচ্চতার (Amplitude) উপর : শব্দ-তরঙ্গ যত উচ্চ হয় শ্রৌত সংবেদনও ততোই জোর বা উচ্চ (loud) হয়।** যথা, চীৎকার করার সময় আমরা যে শব্দ-তরঙ্গ

সৃষ্টি করি সেগুলির উচ্চতা (Amplitude) বেশি ; ফিসফিস করে কথা বলার সময় আমরা যে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করি তা উচ্চতায় কম।

শ্রৌত সংবেদনের একটি গুণ বা ধর্মকে বলা হয় স্বনতীক্ষ্ণতা (Pitch)। এই ধর্ম অনুসারেই সঙ্গীতজ্ঞরা স্বরকে উদারা, মুদারা এবং তারায় বিভক্ত করেন। শ্রৌত সংবেদনের এই ধর্মটি নির্ভর করে বায়ুতরঙ্গর দৈর্ঘ্যর উপর : বায়ুতরঙ্গর দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে (অতএব বায়ুতরঙ্গর কম্পন যত শ্লথ হবে) স্বনতীক্ষ্ণতা ততই 'খাদে'র দিকে হবে ; বায়ুতরঙ্গর দৈর্ঘ্য যত কম হবে (অতএব, বায়ুতরঙ্গর কম্পন যত দ্রুত হবে) স্বনতীক্ষ্ণতা ততই 'চড়া'র দিকে হবে।

গ : দেহসাম্যর ইন্দ্রিয় (Equilibration Sense)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, কানের ভিতরকার (Inner Ear) অংশ বলতে 'কক্‌লিয়া' ছাড়াও তিনটি 'অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী' (Semicircular Canals) আছে। 'কক্‌লিয়া'র মধ্যে প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় বর্তমান। কিন্তু 'অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী'র সঙ্গে শ্রৌত সংবেদনের সম্পর্ক নেই। তার বদলে কানের এই অংশর কাজ হল আমাদের দেহসাম্য সংক্রান্ত সংবেদন দেওয়া। এই 'প্রণালী'গুলির মধ্যেও এক রকম তরল পদার্থ ও ক্ষুদ্র পাথরকুঁচির মত পদার্থ (Otoliths) আছে এবং এগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম রোমের মত স্নায়ুকোষ বর্তমান। আমাদের মাথা একভাবে থাকলে ঐ তরল পদার্থ ইত্যাদি স্নায়ুকোষগুলিকে একভাবে উদ্দীপিত করে, মাথার অবস্থিতি পরিবর্তিত হলে স্নায়ুকোষগুলি অন্যভাবে উদ্দীপিত হয়। স্নায়ুকোষগুলি থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তু দিয়ে উপরোক্তভাবে উদ্বুদ্ধ স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছুলে আমরা মাথার নির্দিষ্ট অবস্থিতি সংক্রান্ত সংবেদন পাই। এই সংবেদনের উপর নির্ভর করেই আমাদের পক্ষে দেহসাম্য (Equilibrium of the Body) রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই কারণে ওয়াট্‌সন্ দেহসাম্যর সংবেদন সংক্রান্ত এই ইন্দ্রিয়কে 'দেহসাম্যর ইন্দ্রিয়' (Equilibration Sense) আখ্যা দিয়েছেন।

ঘ : শ্রৌত সংবেদন প্রসঙ্গে হেল্‌ম্‌হোৎস্-এর মত (Helmholtz's theory of Audition)

শ্রৌত সংবেদন প্রসঙ্গে হেল্‌ম্‌হোৎস্ (Helmholtz) একটি চিত্তাকর্ষক মত প্রস্তাব করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে 'কক্‌লিয়া'র অন্তর্ভুক্ত 'মধ্যম ঝিল্লি'র (Basilar Membrane) গায়ে রোঁয়ার মত যে-স্নায়ুকোষগুলি বর্তমান সেগুলিতে 'প্রতিনাদ' (Resonance) জাতীয় একরকম প্রক্রিয়া ঘটে। আসলে এই

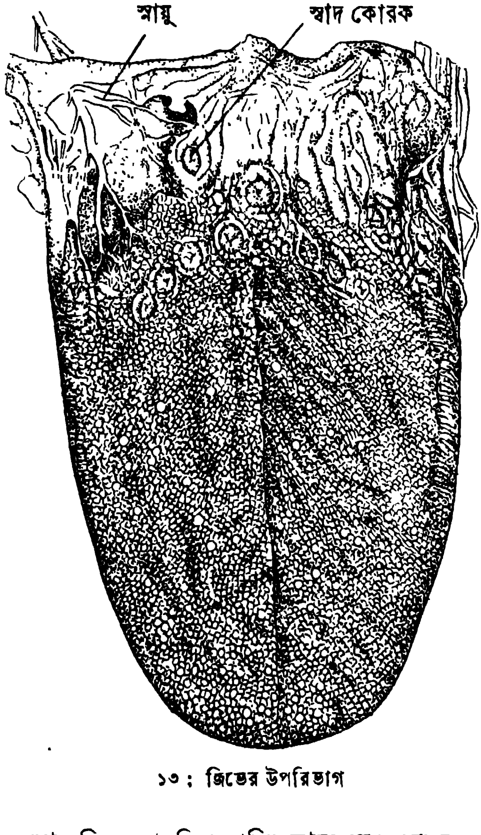
'মধ্যম ঝিল্লি'টি 'কক্লিয়া'র নিম্নতম স্থান থেকে উচ্চতম চূড়া পর্যন্ত প্রসারিত এবং নিচের থেকে চূড়া পর্যন্ত এই ঝিল্লিটি ক্রমশ চওড়া হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, সবচেয়ে নিচের দিকে ঝিল্লিটি সবচেয়ে সরু, চূড়ার কাছে সবচেয়ে চওড়া। ঝিল্লির উপর অবস্থিত রোমের মত স্নায়ুকোষগুলির তন্তুও নিচের দিক থেকে উপরের দিক পর্যন্ত আকারে ক্রমশ বড়—সব নিচের তন্তুগুলি আকারে সবচেয়ে ছোট, সব উপরের তন্তুগুলি আকারে সবচেয়ে বড়। শব্দ-তরঙ্গ কানের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্যন্ত 'কক্লিয়া'র ভিতরকার তরল পদার্থে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঢেউ সৃষ্টি করে। দৈর্ঘ্যর (Wave length) দিক থেকে শব্দ-তরঙ্গ যত ছোট ততই তার স্বনতীক্ষ্ণতা (Pitch) বেশি; দৈর্ঘ্যর দিক থেকে যত বড় ততই তার স্বনতীক্ষ্ণতা কম। অতএব, চড়া স্বনতীক্ষ্ণতার শব্দ-তরঙ্গ 'কক্লিয়া'র তরল পদার্থে ছোট-ছোট ঢেউ সৃষ্টি করবে; খাদের স্বনতীক্ষ্ণতা সৃষ্টি করবে বড় বড় ঢেউ। হেল্ম্‌হোৎসের মতে, 'কক্লিয়া'র তরল পদার্থের ছোট ঢেউগুলি 'মধ্যম ঝিল্লি'র ছোট স্নায়ুতন্তুগুলিতে একরকম 'প্রতিনাদ' (Resonance) সৃষ্টি করে, বড় ঢেউ 'প্রতিনাদ' জাগায় বড মাপের স্নায়ুতন্তুগুলিতে। অর্থাৎ, এক-সুরে বাঁধা দুটি সেতারের মধ্যে একটি ঝঙ্কৃত হলে যেমন অপরটিতেও ঝঙ্কার ওঠে তেমনি 'কক্লিয়া'র তরল পদার্থে বড় ঢেউ 'মধ্যম ঝিল্লি'র শুধুমাত্র বড় তন্তুতে 'প্রতিনাদ' জাগায়, ছোট ঢেউ প্রতিনাদ জাগায় ছোট তন্তুতে : চড়া 'স্বনতীক্ষ্ণতা'র শব্দ 'মধ্যম ঝিল্লি'র নিচের দিকের অংশকে উদ্দীপিত করে, খাদের শব্দ উদ্দীপিত করে এই ঝিল্লির উপর দিকের অংশ। অতএব প্রতিটি স্বনতীক্ষ্ণতার শব্দর গ্রাহক বলতে 'মধ্যম ঝিল্লি'র কোন এক নির্দিষ্ট অংশ এবং সেই নির্দিষ্ট অংশ উদ্দীপিত হয়ে মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট স্বনতীক্ষ্ণতার সংবেদন দেয়।

হেল্ম্‌হোৎস-এর এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে 'মধ্যম ঝিল্লি'র উপর সহস্র সহস্র স্নায়ুতন্তু বর্তমান; মাপের দিক থেকে এগুলি অবশ্যই অসমান, কিন্তু ঐ অজস্র স্নায়ুতন্তুর মধ্যে প্রতিটি নির্দিষ্ট মাপের স্নায়ুতন্তুকে কোন এক নির্দিষ্ট 'স্বনতীক্ষ্ণতা'র সংবেদনের জন্য দায়ী বলে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। তবুও আধুনিককালে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে হেল্ম্‌হোৎস-এর এই মতবাদটিই সমর্থিত হয়। যেমন, যাদের শ্রবণশক্তি চড়া 'স্বনতীক্ষ্ণতা'র সংবেদন গ্রহণের অযোগ্য এ-জাতীয় অর্ধ-বধির ব্যক্তিদের শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে তাদের 'কক্লিয়া'র নিম্নাংশ অসুস্থ বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গিনিপিগ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক আধুনিক পরীক্ষাও উল্লেখযোগ্য। তাদের কানের কাছে ক্রমান্বয়ে খুব চড়া—অর্থাৎ উচ্চ স্বনতীক্ষ্ণতার—বাঁশী বাজিয়ে তাদের 'কক্লিয়া'র অংশবিশেষকে নষ্ট করা হয়;

পরে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায় সেগুলির 'ককলিয়া'র নিচের দিকের অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৮ ॥ রাসন সংবেদন (Gustatory Sensation)

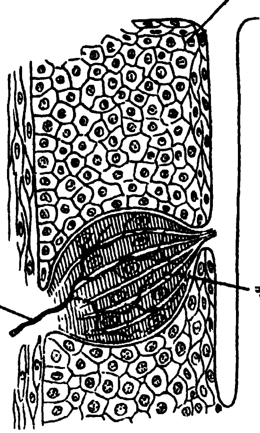
আস্বাদ-সংবেদন (Taste Sensation) বা রাসন সংবেদনের (Gustatory Sensation) ইন্দ্রিয় হল জিভের উপর-তল। জিভের উপর-তলটি মসৃণ নয়; সেখানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সামান্য উঁচু উঁচু বিন্দু আছে; এগুলিকে বলে 'প্যাপিলা' (Papillae)। এগুলির গর্তের মধ্যেই এক জাতীয় সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ অবস্থিত; সেই কোষগুলিকে বলা হয় 'স্বাদ-কোরক' (Taste buds বা Gustatory buds)। উক্ত স্বাদ-কোরকগুলিই রাসন সংবেদনের প্রকৃত গ্রাহক—এগুলি থেকে স্নায়ু-অংশু প্রসারিত হয়েছে এই সেই স্নায়ু-অংশুগুলি মিলিতে হযে যে অন্তর্মুখী স্নায়ু গড়ে তুলেছে তাকে বলে 'রাসন স্নায়ু' (Gustatory Nerve)। রাসায়নিক পদার্থর সংস্পর্শে এলে জিভের উপরকার স্বাদ-কোরকগুলি উদ্দীপিত হয় এবং রাসন স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে—শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে—পৌঁছলে আমরা 'রাসন সংবেদন' লাভ করি।



১৩ : জিভের উপরিভাগ

আমাদের জিভের উপর স্বাদ-কোরকের মোট সংখ্যা প্রায় ৯০০০। আমাদের প্রধান বা মুখ্য স্বাদ সংবেদন বলতে চার রকম : মিষ্টি, নোন্‌তা, টক ও তেতো। কিন্তু জিভের সব অংশই সমস্ত রকম মুখ্য স্বাদের উদ্দীপক দ্বারা সমানভাবে উদ্দীপিত হয় না। বিভিন্ন জাতীয় স্বাদ-কোরক বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা সহজে এবং

বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়। অতএব, স্বাদ-কোরকগুলিকে মোটের উপর চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। মিষ্টত্বর স্বাদ-কোরক, অম্লতার স্বাদ-কোরক, ইত্যাদি। অর্থাৎ, মিষ্টত্বর স্বাদ-কোরকের বিশেষ প্রবণতা মিষ্টত্বর স্বাদ-সংবেদন দেওয়া, অম্লত্বর স্বাদ-কোরকের বিশেষ প্রবণতা অম্লত্বের স্বাদ-সংবেদন দেওয়া। জিভের বিভিন্ন এলাকায় এক-এক জাতীয় স্বাদ-কোরকের প্রাচুর্যবশত এক-একটি এলাকা এক-এক জাতীয় স্বাদ-সংবেদনের পক্ষে বিশেষ-ভাবে উপযুক্ত। যেমন, জিভের একেবারে ডগাটিতে মিষ্টত্বর স্বাদ-কোরকের প্রাচুর্য, সামনের দিকে দু'পাশে নোন্‌তা বা লবণাক্ততার স্বাদ-কোরকের প্রাচুর্য, আরো পিছিয়ে দু'পাশে অম্লতার স্বাদ-কোরকের প্রাচুর্য, গলার দিকে জিভের মাঝামাঝি তিক্ততার স্বাদ-কোরকের প্রাচুর্য।



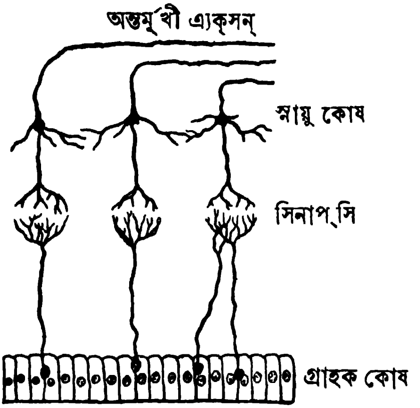
১৪ : স্বাদ-কোরক

রাসন সংবেদন বহুলাংশেই ঘ্রাণ সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। কিংবা, ঘ্রাণ সংবেদন বহুলাংশেই রাসন সংবেদনকে প্রভাবিত করে। খাদ্যের সুস্বাদ বলতে আমরা যা বুঝি তা বহুলাংশেই খাদ্যদ্রব্যটির সুঘ্রাণের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই পাকা রাঁধুনীরা জাফ্রাণ, গরম মশলা প্রভৃতি ব্যবহার করে খাদ্যর স্বাদ উপাদেয় করার আয়োজন করেন। কিংবা, নাক-চোখ বন্ধ করে আমরা যদি একটি পাকা আপেল খাই তাহলে অনেকটা আলু-সিদ্ধর মত মনে হবে। অর্থাৎ, আপেলের স্বাদ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা অনেকাংশেই আপেলের আঘ্রাণের উপর নির্ভরশীল।

রাসন সংবেদন অনেকাংশে স্পর্শ-সংবেদনের উপরও নির্ভরশীল। তাই তেল-ঘি ব্যবহার করে একটি খাদ্যদ্রব্যর স্পর্শ মসৃণ করলে আমরা মনে করি তার স্বাদও উন্নত হয়েছে। কিংবা, ঝাল বলে কোন স্বতন্ত্র স্বাদ নেই; জিভের উপর লঙ্কা প্রভৃতির স্পর্শ লাগলে জ্বালার—অর্থাৎ এক জাতীয় স্পর্শর—সংবেদন হয়; এই স্পর্শ-সংবেদনকে আমরা এক স্বতন্ত্র স্বাদ-সংবেদন বলে মনে করি।

৯॥ ঘ্রাণ-সংবেদন (Olfactory Sensation)

নাকের গর্তের ভিতর অংশটি যে-ঝিল্লি (Membrane) দ্বারা আবৃত তাতে বহু সংবেদনশীল স্নায়ুকোষ অবস্থিত আছে; এই কোষগুলির বাইরের অনাবৃত প্রান্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং এগুলির ভিতর দিককার প্রান্ত থেকে স্নায়ু-অংশু বহির্গত হয়ে রচনা করেছে অন্তর্মুখী ঘ্রাণ-স্নায়ু (Olfactory Nerve)। শ্বাসগ্রহণের সময় বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা গ্যাস বা গন্ধকণার দ্বারা উক্ত সংবেদনশীল কোষগুলি উদ্দীপিত হয় এবং অন্তর্মুখী ঘ্রাণ-স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে পরিচালিত হলে আমরা ঘ্রাণ-সংবেদন পাই।



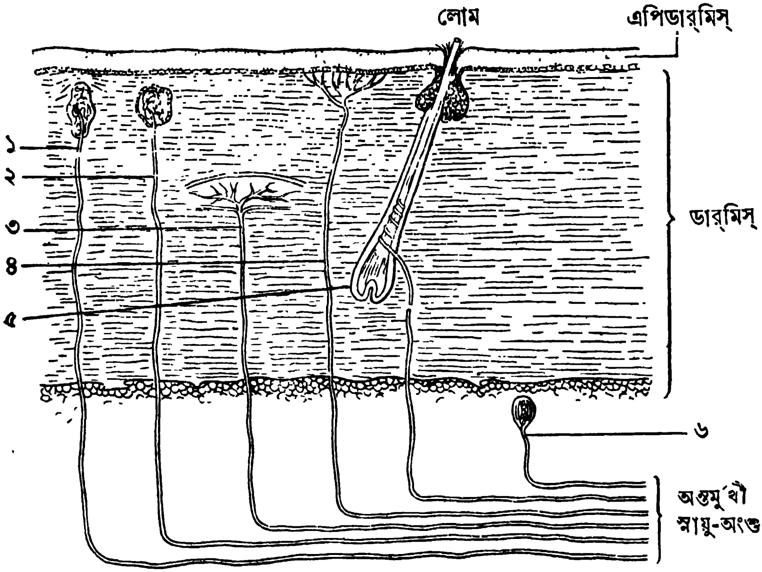
১৫ : নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে ঘ্রাণ-সংবেদনের গ্রাহক কোষ

১০॥ ত্বক্-সংবেদন (Cutaneous Sensation)

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির মত ত্বক্-ইন্দ্রিয় আমাদের শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত নয়; তার বদলে ত্বক্ ইন্দ্রিয় সারা দেহময় ছড়িয়ে রয়েছে। ত্বক্ ইন্দ্রিয় বলতে আমরা সাধারণত গায়ের চামড়াই বুঝে থাকি। কিন্তু এই চর্মকে আরো ভালো করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চামড়ার সবচেয়ে বাইরের দিকে একটি বহিরাবরণ আছে; তার নাম 'এপিডার্মিস্' (Epidermis)। এই বহিরাবরণটি সংবেদনশীল নয়। এর নিচে আর একটি স্তর বর্তমান; তাকে বলা হয় 'ডার্মিস্' (Dermis)। 'ডার্মিস্' স্তরেই নানা রকম স্নায়ুকোষ বর্তমান—স্নায়ুকোষগুলি থেকে নিচের দিকে অন্তর্মুখী স্নায়ু-অংশু (Nerve fibre) বেরিয়ে গিয়েছে। 'ডার্মিস্'-এর স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত হলে অন্তর্মুখী স্নায়ু-অংশু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রর দিকে পরিচালিত হয় এবং স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রে পৌঁছুলে আমরা ত্বক-সংবেদন পাই।

ত্বক-সংবেদন মূলত চার রকম : (১) গরম (Warm), (২) ঠাণ্ডা (Cold), (৩) চাপ (Pressure) এবং (৪) ব্যথা (Pain) সংবেদন। কিন্তু আমাদের শরীরের চামড়ার সমস্ত জায়গা থেকেই এই চার রকম সংবেদন সমানভাবে পাওয়া যায় না। অতি-সূক্ষ্ম ছুঁচ জাতীয় জিনিসের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, শরীরের

বিভিন্ন বিন্দুর (Spots) পক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ত্বক্-সংবেদন দেবার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। অর্থাৎ, কোন বিন্দু থেকে বিশেষ করে পাওয়া যায় উষ্ণতার সংবেদন,



১৬ : (১) মাইস্নার কর্পাস্‌ল্, (২) ক্রাউস্ এণ্ড ব্যাল্ব, (৩) রুফিনি কোষ
(৪) মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত, (৫) লোম-উদ্গম-বিন্দু (৬) পাসিনি কোষ

কোন বিন্দু থেকে বিশেষ করে পাওয়া যায় শৈত্য-সংবেদন। অতএব বিন্দুগুলিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) উষ্ণতা-বিন্দু (Warm Spot), (২) শৈত্য-বিন্দু (Cold Spot), (৩) চাপ-বিন্দু (Pressure Spot) এবং (৪) কষ্ট-বিন্দু (Pain Spot)। বিশেষ চিত্তাকর্ষক কথা হল, এ-জাতীয় কোন শৈত্য-বিন্দুতে যদি অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ছুঁচ স্পর্শ করা হয় তাহলেও আমরা শৈত্য-সংবেদনই পেয়ে থাকি। এ-জাতীয় উত্তপ্ত উদ্দীপক থেকে পাওয়া শৈত্য-সংবেদনকে অনেক সময় 'আপাতঃ-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন' (Paradoxical Cold Sensation) বলা হয়।

ত্বকের এ-জাতীয় বিভিন্ন বিন্দুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিককালে অনেক গবেষণা হয়েছে। তার ফলে মোটের উপর অনুমান করা হয় যে 'ডার্মিস্' স্তরের বিভিন্ন জাতীয় স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্যই এই পার্থক্যর প্রধান কারণ। চিত্রে কয়েক রকম প্রধান স্নায়ুকোষের পরিচয় দেওয়া হল। এর মধ্যে (৩) এবং (৬) —অর্থাৎ 'রুফিনি' এবং 'পাসিনি' কোষ (Ruffinian Cylinder এবং Pacinian Corpuscle) বিশেষত উত্তাপ সংবেদনের জন্য দায়ী বলে অনুমিত হয়েছে।

অর্থাৎ, ত্বকের যেখানে এ-জাতীয় কোষ বর্তমান সেখানে উদ্দীপনা পৌঁছোনোর ফলে আমাদের পক্ষে উষ্ণতা-সংবেদন পাবার কথা ; কিংবা, সেই জায়গাকে উষ্ণতা-বিন্দু (Warm Spot) বলা হবে। তেমনি 'ক্রাউস্ এণ্ড বাল্‌ব' (Krause End Bulb) নামের কোষগুলির স্বাভাবিক প্রবণতা শৈত্য-সংবেদন দেবার। চাপ-সংবেদন দেবার স্বাভাবিক প্রবণতা হল 'লোম-উদ্গম-বিন্দু' (Hair Roots) এবং 'মাইস্‌নার কর্পাসল্' (Meissner Corpuscle) নামের কোষগুলির। ব্যথা-সংবেদনের জন্য মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত বা 'ফ্রি নার্ভ এণ্ডিং' (Free Nerve Endings) বিশেষভাবে দায়ী বলে বিবেচিত।

১১॥ সংবেদন-জটিলতা এবং সহ-সংবেদন (Complication এবং Synesthesia)

সাধারণ নিয়ম হল, এক জাতীয় নির্দিষ্ট উদ্দীপক একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে এক জাতীয় নির্দিষ্ট সংবেদন সৃষ্টি করবে। যেমন, আলো উদ্দীপিত করে শুধুমাত্র চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে এবং তার ফলে শুধু চাক্ষুষ সংবেদনই ঘটে। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে অনেক সময় দেখা যায়, একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হবার ফলে অপর কোন ইন্দ্রিয় থেকেও (কিছুটা অস্পষ্ট) সংবেদন পাওয়া যায়। যেমন, বরফের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শীতবোধ হয়, কিংবা চক্ষু-ইন্দ্রিয়র মধ্যস্থতায় যেন চন্দনের সৌরভও পাওয়া যায়। শীত-সংবেদন ত্বক্-ইন্দ্রিয়র অবদান, সৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকেই পাবার কথা ; কিন্তু আলোচ্য দৃষ্টান্তে চক্ষু-ইন্দ্রিয় যেন ত্বক্ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়র সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে। এইভাবে একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হবার ফলে একই সঙ্গে যখন অপর কোন ইন্দ্রিয়-জন্য সংবেদনও পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় 'সংবেদন-জটিলতা' (Complication)। অতি আধুনিককালে বস্তুত এক জাতীয় 'সংবেদন-জটিলতা'র প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয় 'সহ-সংবেদন' (Synesthesia)। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'রঙিন শ্রৌত-সংবেদন' (Coloured Hearing) উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, শ্রোতা কোন একটি শব্দ শ্রবণের সময় যেন একটি বর্ণেরও সংবেদন পেয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য, সমস্ত শ্রোতার মধ্যেই এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার প্রবণতা সমান নয় ; তবুও পরীক্ষামূলকভাবে দাবি করা হয়েছে যে বহু ব্যক্তির মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন : কোন গভীর সুর তাঁদের গাঢ়-নীলের অনুভূতি দেয়, দামামা-র শব্দ থেকে তাঁরা লাল রঙের সংবেদন পেয়ে থাকেন। অবশ্যই এ-জাতীয় 'রঙিন শ্রৌত সংবেদন' ছাড়াও সহ-সংবেদন অন্যান্য রকমেরও হতে পারে এবং উড্ওয়ার্থ মন্তব্য করছেন যে শৈশবে বিভিন্ন সংবেদনকে যোগযুক্ত করার খেলা থেকেই এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার সূত্রপাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ

১॥ প্রত্যক্ষর অর্থ (Meaning of Perception)

ইতিপূর্বে দেখেছি অন্তত আমাদের পরিণত বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের মূর্ত অভিজ্ঞতা বলতে বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষই ঘটে এবং বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব অনুমানমূলকভাবেই স্বীকৃত। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। আমার সামনে একটি কমলালেবু আছে। এই বস্তুটি থেকে এক নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো আমার চোখের রেটিনার গ্রাহক কোষে এক জাতীয় স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করলে এবং চক্ষু-সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হলে আমার পক্ষে একটি সংবেদন পাবার কথা। কিন্তু যদি সত্যিই আমার পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন বলে কোন অভিজ্ঞতা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ফলে আমি ঠিক কিসের সংবাদ পাবো? শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বর্ণের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কি একটি বর্ণমাত্রই দেখি? নিশ্চয়ই নয়। প্রকৃতপক্ষে আমি দেখি কমলালেবু বলে বস্তুটিকে এবং কমলালেবু বলে বস্তুটিকে দেখা মানেই আমি জানতে পারি এই বস্তুটি অন্যান্য কমলালেবুর সমজাতীয়, কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব স্বীকার করতে হবে, কমলা-লেবুকে দেখার সময় আমার গুরুমস্তিষ্ক শুধু যে কোন এক নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি গ্রহণই করেছে তাই নয়; এই গ্রহণ কার্য ছাড়াও তুলনায় উচ্চতর প্রক্রিয়া হিসাবে গুরুমস্তিষ্কে অন্যান্য ঘটনাও ঘটেছে—সেই ঘটনাগুলিকে আমরা ব্যাখ্যামূলক বা বিচারমূলক আখ্যা দিতে পারি। এই ব্যাখ্যামূলক বা বিচারমূলক প্রক্রিয়া বাদ দিলে শুধুমাত্র উক্ত গ্রহণাত্মক ঘটনাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বলা যায়। কিন্তু আমাদের পরিণত বয়সে বাস্তবিকই এ-জাতীয় বিশুদ্ধ গ্রহণাত্মক কোন ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় না: বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত হয়েই উক্ত গ্রহণাত্মক ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। এ-জাতীয় বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রহণাত্মক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, যদিও স্বীকার করা প্রয়োজন যে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাকে বিচার করলে তার সরলতম উপাদান হিসাবে বিশুদ্ধ গ্রহণাত্মক ঘটনা বা বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকারযোগ্য। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে-মূর্ত ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ঘটে তাকেই প্রত্যক্ষ আখ্যা দেওয়া

প্রয়োজন এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা অনুমান করতে পারি এই অভিজ্ঞতার নিছক গ্রহণাত্মক কোন সরল উপাদান বর্তমান—সেই উপাদানকে সংবেদন বলা হয়।

২ ॥ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ (Psychological Analysis of Perception)

উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে, অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রত্যক্ষ একটি জটিল ঘটনা। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জটিল ঘটনার বিশ্লেষণ করে প্রত্যক্ষের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয় :

(ক) প্রত্যক্ষের উপাদান হল সংবেদন। অতএব, সংবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্তগুলি পূর্ণ না হলে প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। সংবেদনের সর্ত বলতে কী কী? প্রথমত, বহির্বস্তু থেকে উদ্দীপক গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, উদ্দীপকের প্রভাবে কোন একটি ইন্দ্রিয়ে স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়া। তৃতীয়ত, অন্তর্মুখী স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের 'উচ্চতর কেন্দ্রে' পরিচালিত হওয়া।

(খ) প্রত্যক্ষ হল বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত সংবেদন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় অবশ্য বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিই বা তা পাওয়া যেতো তাহলেও তা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা হিসাবে অর্থহীন হতো। যেমন, সামনের বস্তুটিকে আমরা কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করি বলেই এ-অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ; এর পরিবর্তে যদি শুধুমাত্র একটা রঙের ছোপ সংক্রান্ত সংবেদন হত তাহলে তা অর্থহীন হয়ে থাকতো। কিন্তু প্রত্যক্ষ তাৎপর্যপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ হয় কেন? কেননা, প্রত্যক্ষের সময় উপাদান হিসাবে গৃহীত সংবেদনটির সঙ্গে বিচার-ব্যাখ্যা সম্বলিত হয়। এবং এই বিচার-ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। যথা :

এক : পার্থক্যকরণ (Discrimination)। সামনের বস্তুটিকে কমলালেবু হিসাবে জানা মানেই অন্যান্য জাতীয় সমস্ত বস্তু থেকে—অর্থাৎ, কমলালেবু ছাড়া বাকী সবরকম বস্তু থেকে—তার পার্থক্য করা।

দুই : সাদৃশ্য-নিরূপণ (Assimilation)। প্রত্যক্ষকালে আমরা প্রত্যক্ষর বিষয়বস্তুকে শুধু যে বিজাতীয় সমস্ত বস্তু থেকে পৃথকভাবে জানি তাই নয়, উক্ত বস্তুকে সমস্ত সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে সদৃশ বলেও জানি। সামনের বস্তুটিকে কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করা মানেই এই বস্তুটিকে অন্যান্য সমস্ত কমলালেবুর সদৃশ বলে জানা।

তিন : অনুষঙ্গ ও পুনরুৎপাদন (Association and Reproduction) কিন্তু প্রত্যক্ষকালে তো শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তুই আমাদের সামনে বর্তমান অতএব এই প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তুটিকে অন্যান্য স্বজাতীয় বস্তুর সদৃশ বলে জানি কী করে? পূর্ব অভিজ্ঞতা বা স্মৃতির সহায়তায়। অতএব স্বীকার করা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে অন্যান্য বস্তুর যে-অভিজ্ঞতা ঘটেছে বর্তমানে প্রত্যক্ষকালে কোন-না-কোন ভাবে তার পুনরুৎপাদন (Reproduction) ঘটে এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ স্বজাতীয় বস্তুগুলির সঙ্গে বর্তমানে উপস্থিত বস্তুটির কোন একরকম অনুষঙ্গও (Association) ঘটে থাকে। সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষ স্মৃতির (Memory) উপরও নির্ভরশীল। অবশ্য এই স্মৃতির পরিচয় প্রকট বা সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু যত অস্ফুটভাবেই হোক না কেন স্মৃতির সহায়তা ছাড়া সম্মুখস্থ বস্তুকে নির্দিষ্ট বস্তু হিসাবে চেনা সম্ভব নয়। বর্তমানে একটি বস্তুকে যখন আমি কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করছি তখন স্বীকার করতে হবে যে অতীতে যে-সব কমলালেবু আমি দেখেছি, স্পর্শ করেছি, আস্বাদন করেছি সেগুলির অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে আমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আমি সেই অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করি। যে-ব্যক্তির জীবনে ইতিপূর্বে কমলালেবুর কোন অভিজ্ঞতা হয়নি তার পক্ষে প্রথম দর্শনেই একটি কমলালেবুকে কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

চার : দেশ-নির্দেশ (Localisation)। প্রত্যক্ষকালে আমরা বস্তুটিকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হিসাবেই প্রত্যক্ষ করি। কমলালেবুটিকে আমার সামনের দিকে এবং এক নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত বস্তু বলেই আমি প্রত্যক্ষ করি, শব্দ-প্রত্যক্ষর সময় আমরা জানি কোন্ দিক থেকে এবং কতদূর থেকে এই শব্দ আসছে।

পাঁচ : বিশ্বাস (Belief)। প্রত্যক্ষকালে আমাদের মনে এই বিশ্বাসও জন্মায় যে বহির্জগতে প্রত্যক্ষগোচর বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমান আছে।

(গ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক (Selective)। বহির্জগৎ থেকে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই আমাদের কাছে বহুবিধ উদ্দীপক আসে। কিন্তু এত রকম উদ্দীপকের উৎস সমস্ত বস্তুকেই আমরা সব সময় প্রত্যক্ষ করি না; তার মধ্যে নির্বাচিত মাত্র এক বা একাধিক বস্তুকেই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেমন, পথ চলবার সময় কত বিচিত্র বস্তু থেকেই আমাদের চোখে আলোকতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ ইত্যাদি আসে। কিন্তু আমরা সমস্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করি না,—চলতি কথায় যেমন বলা হয় 'চেয়েও দেখি না'। এত বস্তুর মধ্যে নির্বাচিত মাত্র এক বা একাধিক বস্তু আমরা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করি। এই নির্বাচন আংশিকভাবে নির্ভর করে বস্তুটির

নিজস্ব ধর্মের উপর এবং আংশিকভাবে তা নির্ভর করে আমাদের মনোযোগের (Attention) উপর।

(ঘ) প্রত্যক্ষ অনেকাংশে পরিবেশ (Environment), প্রসঙ্গ (Context), এবং প্রস্তুতি (Set) প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়দের চালচলন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়—যা কিনা সাধারণ অবস্থায় কোন ব্যক্তির চালচলনে আমাদের চোখে পড়ে না। তার কারণ, খেলার মাঠের নির্দিষ্ট পরিবেশ, খেলার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ এবং খেলা দেখতে গিয়ে দর্শক হিসাবে আমার আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি বহুলাংশেই আমার প্রত্যক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে। আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিও আবার বহুলাংশে নির্ভর করে প্রত্যক্ষকারীর শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সংস্কার, পেশা, শখ প্রভৃতির উপর। এদিক থেকেও বোঝা যায় আমাদের বাস্তব প্রত্যক্ষের উপর পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাব কত গভীর।

(ঙ) প্রত্যক্ষ ও আচরণ (Perception and Behaviour)। বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ (Behaviour) বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষকে আচরণের একটি সরল নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কেননা, প্রত্যক্ষ হল আমাদের উপর বহির্জগতের প্রভাবের একটি মূর্ত নিদর্শন। বহির্জগৎ আমাদের উপর সক্রিয় হলেই আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষের ফলে বহির্জগতে পরিবর্তন সৃষ্টির প্রবণতাও আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। সামনের বস্তুটিকে খুব ভারি বলে প্রত্যক্ষ করলে আমরা একহাতের বদলে দু'হাত দিয়ে সেটি টেনে তোলার জন্য অগ্রসর হই, সামনে সাপ দেখলে আমরা লাফিয়ে উঠি। অতএব, প্রত্যক্ষকে অন্তর্দর্শন-গ্রাহ্য মানসিক অভিজ্ঞতার প্রকার-বিশেষ মনে না করে আচরণেরই একটি নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এবং আচরণের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করলেই মনোবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত গভীর ও বিস্তৃততর জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিবে। কেননা, শিশু এবং জীবজন্তুর প্রত্যক্ষকে অন্তর্দর্শন-গ্রাহ্য মানসিক অভিজ্ঞতা মাত্র মনে করলে সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সুযোগ থাকে না। কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষকে আচরণবিশেষ বিবেচনা করলে আমরা তাদের প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য পেতে পারি।

৩ ॥ সংবেদন ও প্রত্যক্ষ (Sensation and Perception)

আগেই দেখেছি, বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব অনুমানমূলক ; অন্তত আমাদের পরিণত বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

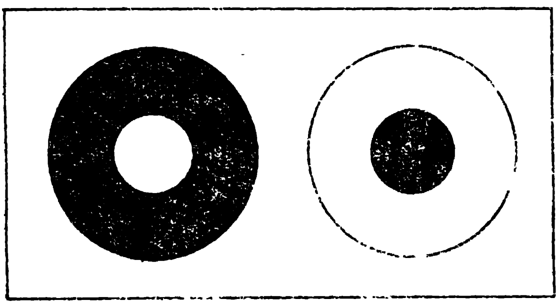
বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিবর্তে মূর্ত অভিজ্ঞতা হিসাবে আমরা প্রত্যক্ষেরই পরিচয় পাই। কিন্তু অনুমানমূলকভাবে সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে আমরা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষের পার্থক্য বিচার করতে পারি। মনোবিজ্ঞানে এইভাবেই সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে :

(১) সংবেদন হল প্রত্যক্ষের সরল উপাদান ; কিংবা, প্রত্যক্ষ হল বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত সংবেদন। (২) অতএব, অনুমানমূলকভাবে আমরা যাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বলে স্বীকার করি তাকে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান বলা যায় না ; তার নিজস্ব কোন অর্থ নেই। অর্থযুক্ত হয়ে এই সংবেদনকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার জন্য তার সঙ্গে বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন—অর্থাৎ, প্রয়োজন সংবেদনটিকে প্রত্যক্ষে পরিণত করা। সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষ বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান ; কিন্তু সংবেদন জ্ঞান নয়। অতএব মন্তব্য করা হয়েছে, সংবেদনের সাহায্যে আমরা বস্তুর সান্নিধ্য (acquaintance with the object) লাভ করতে পারি ; কিন্তু প্রত্যক্ষই বস্তু সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান (knowledge of the object) দেয়। (৩) বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব হলেও তার সাহায্যে আমরা বড়জোর বস্তুর বিভিন্ন ধর্মকে (qualities) স্বতন্ত্রভাবে জানতে পারতাম, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বস্তুটিকে এক নির্দিষ্ট বস্তু হিসাবে জানা একমাত্র প্রত্যক্ষক্ষেত্রেই সম্ভব। যেমন, কমলালেবুর রঙ, স্বাদ, আকার প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের স্বতন্ত্র সংবেদন স্বীকার করলেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষের সাহায্যেই কমলালেবুকে সামগ্রিকভাবে কমলালেবু হিসাবে জানা যেতে পারে। (৪) ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যক্ষক্ষেত্রে বহির্জগতে বস্তুটির বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে ; কিন্তু সংবেদন এ-জাতীয় কোন বিশ্বাসের অনিবার্য নির্দেশক নয়। (৫) সংবেদন যেহেতু গুরুমস্তিষ্কের পক্ষে স্নায়বিক শক্তির শুধুমাত্র গ্রহণাত্মক প্রক্রিয়া বলেই পরিকল্পিত এবং যেহেতু প্রত্যক্ষের জন্য বিচার-ব্যাখ্যামূলক গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর প্রক্রিয়া স্বীকার্য সেইহেতু বলা যায়, তুলনামূলকভাবে সংবেদন নিষ্ক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ সক্রিয়। (৬) ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যক্ষের জন্য আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু সংবেদন হিসাবে অনুমিত অভিজ্ঞতার জন্য এ-জাতীয় পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। (৭) তেমনি, প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক এবং তা অনেকাংশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রসঙ্গ এবং আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু সংবেদনের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় নির্ভরশীলতা অনুমান করার কারণ নেই। (৮) প্রত্যক্ষকে আচরণের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন ; কিন্তু বিশুদ্ধ সংবেদন নামে আমাদের কোন মূর্ত অভিজ্ঞতা হয় না বলেই তাকে আচরণের নিদর্শনও বলার কারণ নেই।

৪ ॥ প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাল্ট মতবাদ (Gestault Theory of Perception)

মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায় গেস্টাল্ট (Gestault) নামে পরিচিত। 'গেস্টাল্ট' শব্দটি জার্মান; বাংলায় তার হুবহু প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটিভাবে শব্দটিকে আমরা 'সামগ্রিক রূপ' অর্থে গ্রহণ করতে পারি। এই সম্প্রদায়ের মূল দাবি হল, কোন মানসিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে তার সরল উপাদান নির্ণয়ের প্রয়াস করলে বস্তুত মানসিক অভিজ্ঞতার স্বরূপই আমরা বুঝতে পারবো না। অতএব, বিশ্লেষণের পরিবর্তে অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপটির উপরই গুরুত্ব আরোপণের প্রয়োজন। গেস্টাল্টবাদীরা তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও সামগ্রিক রূপটিকে সনাক্ত করার প্রয়াস করেন। ভুণ্ড্ট (Wundt), টিচেনার (Titchoner) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করে তার সরলতম উপাদান হিসাবে সংবেদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; গেস্টাল্টবাদীরা এই প্রয়াসের মৌলিক বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যক্ষ একরকমের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা; বিশ্লেষণের সাহায্যে এই অভিজ্ঞতাকে বোঝবার প্রয়াস করলে প্রকৃতপক্ষে আমরা তার স্বরূপটিই উপেক্ষা করতে বাধ্য হব।

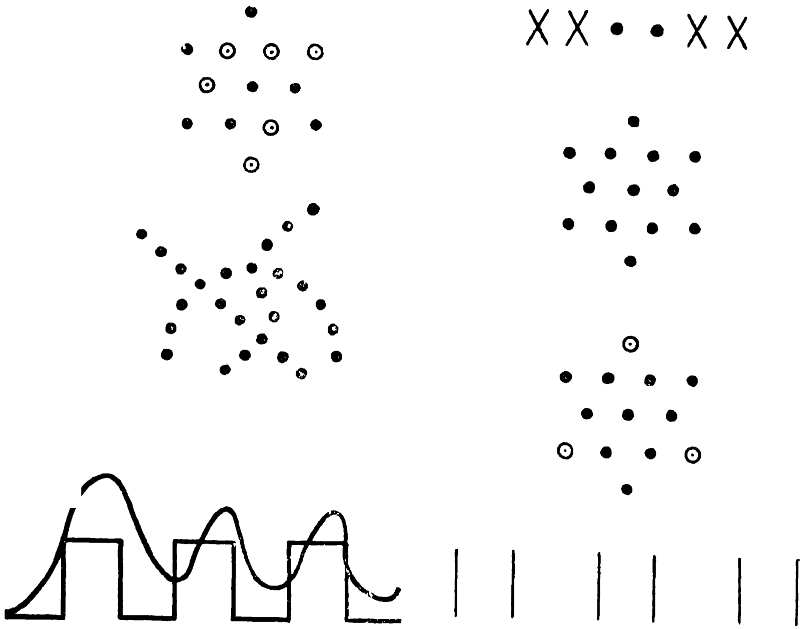
গেস্টাল্টবাদ অনুসারে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রত্যক্ষের নানা বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়। প্রথমত, যে-কোন বস্তুর প্রত্যক্ষকালে আমরা নিছক বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ



১ : প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাল্টবাদীদের পরীক্ষা :
কালো-পটভূমিতে সাদা বৃত্তের প্রত্যক্ষ এবং সাদা পটভূমিতে
কালো বৃত্তের প্রত্যক্ষ

করি না; তার বদলে বস্তুটি অনিবার্যভাবেই এক নির্দিষ্ট পটভূমিতে অবস্থিত হিসাবে ('a figure in relation to a ground') প্রত্যক্ষগোচর হয়। অতএব, এই পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটলে বস্তুটির প্রত্যক্ষেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, কালো পটভূমি এবং সাদা পটভূমি অনুসারে একই মাপের দু'টি বৃত্তের প্রত্যক্ষ দু'রকমের হয়।

দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে নানা জাতীয় বস্তু প্রত্যক্ষের সময় যে-জাতীয় বস্তুগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান সেগুলি মিলে একটি করে স্বতন্ত্র এবং সামগ্রিক রূপ গ্রহণের প্রবণতা



২-৩ : প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাল্টবাদীদের পরীক্ষা : মিশ্র চিহ্নাবলীর মধ্যে সমজাতীয় চিহ্নগুলিকে মিলিয়ে একটি সামগ্রিক রূপ গঠনের প্রবণতা

দেখায়। যেমন, একই চিত্রে বিভিন্ন জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হলে এক-এক জাতীয় চিহ্ন মিলে যেন এক একটি গোষ্ঠী গঠন করে। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর পক্ষে যদি একটি সামগ্রিক রূপ গ্রহণের বিরুদ্ধে কোথাও কোন বাধা বা অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলেও প্রত্যক্ষকালে আমরা সেই বাধা ও অসম্পূর্ণতা উত্তীর্ণ হয়ে সামগ্রিক রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করার প্রবণতা প্রদর্শন করি, ইত্যাদি।

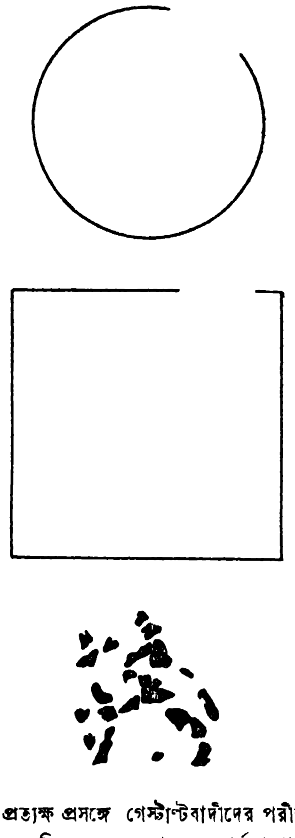
সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষের স্বাভাবিক প্রবণতা একটি সামগ্রিক রূপের প্রতিই। এই সামগ্রিক রূপের উপরই তার অংশগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে; কিন্তু অংশগুলি মিলিত হয়ে বস্তুটির সামগ্রিক রূপ দান করে—এ-জাতীয় কথা কল্পনা করা যায় না। এবং সামগ্রিক একটি রূপ গ্রহণ করার প্রতি প্রত্যক্ষের এই প্রবণতা আছে বলেই প্রত্যক্ষগত বস্তু ও তার পটভূমি মিলে এক অখণ্ডতা সৃষ্টি করে, প্রত্যক্ষের বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকলে আমরা তা পরিপূরণ করে নেবার আয়োজন করি; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৫ ॥ 'দেশ'-প্রত্যক্ষ (Perception of Space)

আগেই দেখেছি, প্রত্যক্ষের সময় বস্তুটিকে কোন এক নির্দিষ্ট 'দেশ'-এ (Space) অবস্থিত হিসাবেই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেমন, জানালা দিয়ে একটি গাছ দেখবার সময় আমরা বুঝতে পারি গাছটি আমাদের কাছ থেকে কত দূরে বর্তমান। অতএব, বস্তু প্রত্যক্ষ একাধারে দূরত্বের বা 'দেশ'-এরও প্রত্যক্ষ। প্রশ্ন হল, এই 'দেশ'-প্রত্যক্ষ (Perception of Space) সম্ভব হয় কী করে?

স্পর্শ সংবেদন (Touch Sensasion) এবং পেশীর সংবেদনের (Muscular Sensation) মাধ্যমেই 'দেশ' বা দূরত্বকে সরাসরিভাবে জানা সম্ভব। তাছাড়াও অবশ্য চাক্ষুষ সংবেদনেরও মাধ্যমে আমরা ক্রমশ দূরত্ব অবগত হই।

প্রথমে দেখা যাক, 'দেশ'-সংবেদনের ক্ষেত্রে স্পর্শ-সংবেদনের অবদান কী রকম। স্পর্শ-সংবেদন দু'রকম হতে পারে: নিষ্ক্রিয় (Passive) এবং সক্রিয় (Active)। যেমন, টেবিলের উপর আমি হাত স্থির-ভাবে রাখলাম—অর্থাৎ, হাতটি নড়াচড়া করলাম না। এক্ষেত্রে আমার যে স্পর্শ-সংবেদন হবে তাকে নিষ্ক্রিয় আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু টেবিলের উপর হাত বোলাবার সময় আমার যে স্পর্শ-সংবেদন ঘটে তাকে সক্রিয় বলা হয়। স্পর্শ-সংবেদনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 'দেশাভিজ্ঞান' (Local Sign)। অর্থাৎ, স্পর্শ-সংবেদনটি শরীরের ঠিক কোন্ নির্দিষ্ট 'দেশে' বা স্থানে ঘটছে সে-বিষয়ে আমাদের হুঁস হয়। অতএব, টেবিলের উপর আমি যখন নিষ্ক্রিয়ভাবে হাত স্থাপন করি তখন আমার হাতের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন দেশাভিজ্ঞানসংযুক্ত স্পর্শ-সংবেদন ঘটে। টেবিলের



৪: প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাল্টবাদীদের পরীক্ষা: প্রত্যক্ষর বিষয়বস্তুতে কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে প্রত্যক্ষকালে আমরা তা পরিপূর্ণ করে বিষয়টির এক সামগ্রিক রূপ গঠন করে নি। এইভাবেই আমরা সর্ব উপরের ছবিতে একটি বৃত্ত, মাঝের ছবিতে একটি চতুষ্কোণ এবং সর্বনিম্নের ছবিতে একটি অশ্বারোহী প্রত্যক্ষ করি।

বিভিন্ন বিন্দু আমার ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন—কেননা স্বতন্ত্র দেশাভিমানযুক্ত—সংবেদন সৃষ্টি করে বলেই এ-জাতীয় নিষ্ক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মাধ্যমেই আমি অবগত হই আমার হাত টেবিলের উপরকার কতখানি আয়তন জুড়ে রয়েছে। এইভাবে পাওয়া আয়তন সংক্রান্ত বোধকেই 'দেশ'-প্রত্যক্ষের একটি উপকরণ বলে বিবেচনা করা হয়। যেমন, অন্ধকারে একটি বস্তু স্পর্শ করেও আমরা বস্তুটির আয়তন প্রত্যক্ষ করতে পারি—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষমূলকভাবে জানতে পারি বস্তুটি কতখানি 'দেশ' (Space) জুড়ে রয়েছে। নিষ্ক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন থেকে এ-ভাবে 'দেশ' সংক্রান্ত প্রাথমিক বোধটি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সহায়তায় আরো উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়। কেননা, সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে আমরা শুধুই যে ব্যাপকতর আয়তনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিন্দুর নির্দিষ্ট পরিচয় পাই তাই নয়, হাত প্রভৃতি অঙ্গ বিভিন্নভাবে—যেমন, এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে বা বিপরীতভাবে—পরিচালিত করে আমরা এই বিন্দুগুলির অবস্থিতি সংক্রান্ত বাঁধাধরা সম্পর্কের পরিচয় পাই। এইভাবে আয়তন সংক্রান্ত আমাদের বোধ স্পষ্টতর হয়।

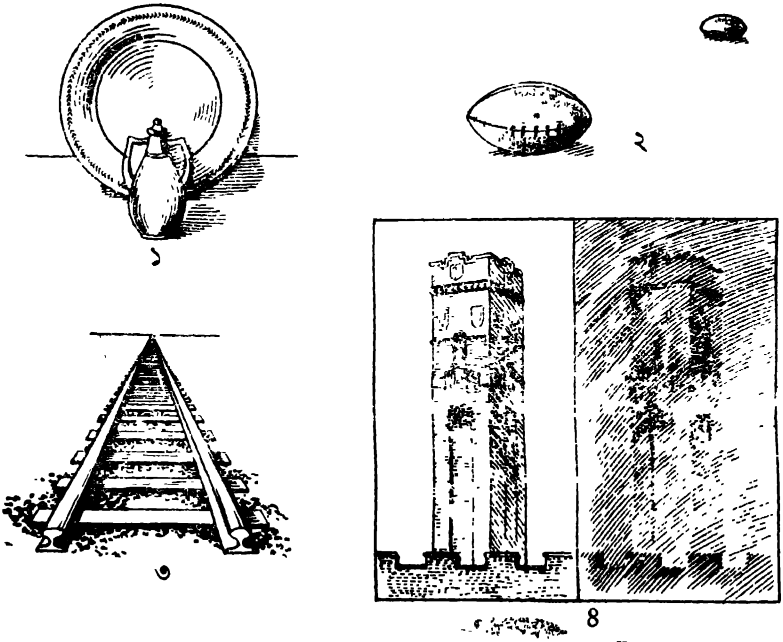
স্পর্শ-সংবেদন ছাড়াও পেশীয় সংবেদন সরাসরিভাবে 'দেশ'-প্রত্যক্ষের সহায়ক হয়। একটি বস্তুকে স্পর্শ করার জন্য আমরা যখন হাত বাড়াই তখন হাতের পেশী সুনির্দিষ্টভাবে সক্রিয় হয়। কাছের বস্তু স্পর্শ করার জন্য যতটা পেশীয় সক্রিয়তা প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত দূরের জিনিস স্পর্শ করার জন্য তুলনায় তার বেশী পেশীয় সক্রিয়তা প্রয়োজন হয়। আবার, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হেঁটে যাবার জন্য পায়ের পেশীরও সুনির্দিষ্ট সক্রিয়তা প্রয়োজন। আমাদের পেশী সক্রিয় হলে পেশী সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে পেশী পরিচালন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট সংবেদন (পেশীয় সংবেদন) লাভ করি। এবং এই পেশীয় সংবেদনও ক্রমশই দূরত্বের পরিচায়ক হয়। অর্থাৎ, একটি বস্তু পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য পেশীর যে-প্রকার সক্রিয়তা প্রয়োজন হয় তারই সংবেদন আমাদের কাছে যেন দূরত্বের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়—সেই পেশীয় সংবেদনের হিসাব অনুসারে আমরা দূরত্বের হিসাব করে থাকি।

৬ ॥ 'দেশ' বা দূরত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Space)

'দেশ' বা দূরত্ব প্রত্যক্ষের জন্য মুখ্যত স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের উপর আমরা নির্ভরশীল হলেও ক্রমশ চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যেও আমরা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই। কেননা, স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের নির্ভরে আমরা যখন বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব অবগত হই সেই সময় এই বস্তুগুলির চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেও নানা বৈশিষ্ট্য

পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমশ এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই আমরা বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব জানতে অভ্যস্ত হই। অর্থাৎ, চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে এই চিহ্নগুলি অস্ফুটভাবে স্পর্শ-সংবেদন ও পেশীয় সংবেদনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারই সাহায্যে আমরা ক্রমশ শুধুমাত্র চাক্ষুষ সংবেদনের উপর নির্ভর করেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই। সংক্ষেপে, দূরত্ব প্রত্যক্ষের জন্য আমরা সরাসরিভাবে স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল হলেও ক্রমশ পরোক্ষভাবে চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যেও 'দেশ' বা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে শিখি; চাক্ষুষ সংবেদনের নানা বৈশিষ্ট্যও দূরত্বের নির্ণায়ক হয়। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে কী কী?

প্রথমত, বস্তুর আকারের আপাত-পরিবর্তন। বস্তুটি আমাদের কাছ থেকে যত দূরে সরে যায় আমাদের চোখে বস্তুটির আকারও ততই ছোট হয়ে আসে; বস্তুটি



৫ : চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কয়েকটি দূরত্ব-নির্দেশক চিহ্ন

(১) সামনে-পিছনে—যেট সামনে সেটি কাছে, যেটি পিছনে সেটি তুলনায় দূরে;

(২) বস্তুর আকারের আপাত-পরিবর্তন—দূরের বস্তু আকারে ছোট দেখায়;

(৩) দূরে সমান্তরাল রেখার আপাত-মিলন;

(৪) বস্তুটি যত দূরে থাকে তত ঝাপসা দেখায়।

যতই আমাদের কাছে আসে আমাদের চোখে তার আকারও তত বড হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, আকারের দিক থেকে বস্তুটি সত্যিই বড বা ছোট হয় না; তাই একে আকারের আপাত-পরিবর্তন বলা হল।

দ্বিতীয়ত, পরপর দু'টি বস্তু থাকলে সামনের বস্তুটিকে পুরো দেখা যায়, পিছনেরটি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে। অতএব আমরা চোখে দেখেই বুঝতে পারি, সামনা-সামনি রাখা দু'টি বস্তুর মধ্যে যেটি আংশিকভাবে ঢাকা পডছে সেটি অপেক্ষাকৃত দূরে রয়েছে, তুলনায় যেটি পূর্ণতরভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেটি কাছে আছে।

তৃতীয়ত, সমান্তরাল রেখার আপাত-মিলন। যেমন, রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হয় সমান্তরাল রেললাইন দু'টি ক্রমশ যেন একটা জাযগায় পরস্পবের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। অবশ্যই এ-জাতীয় সমান্তরালরেখা প্রকৃতপক্ষে কোথাও মিলিত হয় না; কিন্তু আমাদের চোখে তা যেভাবে মিলিত হচ্ছে বলে প্রতীত হয় তা থেকেও আমরা দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি।

চতুর্থত, কাছের বস্তু স্পষ্টতরভাবে দৃষ্ট হয়, দূরের বস্তু আমাদের চোখে ঝাপসা দেখায়। অতএব দৃশ্য বস্তুটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, না, ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে —তার উপর নির্ভর করেও আমরা বস্তুটির দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করি।

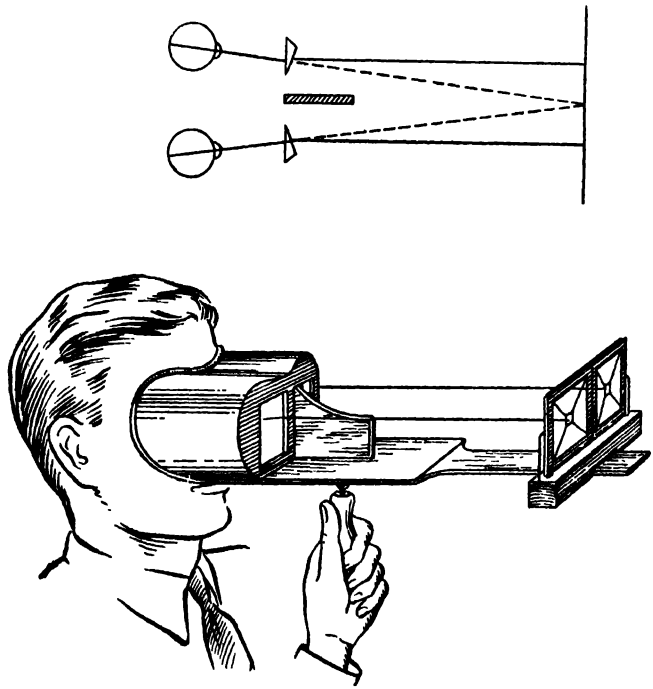
পঞ্চমত, একটি বস্তুর উপর যেভাবে আলোছায়া পডে তা দেখেও আমরা বস্তুটিব বিভিন্ন অংশের দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি—কেননা বস্তুটির সামনের দিকেব অংশে আলো পড়ে, পিছনের দিকের অংশ তুলনায় ছায়াবৃত থাকে।

ষষ্ঠত, আমাদের গতির সঙ্গে পরিদৃশ্য বস্তুব আপাত-গতির প্রকৃতি থেকেও বস্তুটিব দূরত্ব সংক্রান্ত বোধ হয়। যেমন, ট্রেনে যাবার সময় জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকলে মনে হয়, কাছের গাছপালা প্রভৃতি আমার গতি-পথের উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে, তুলনায় দূরের পাহাড প্রভৃতি আমার গতি-পথের অভিমুখেই—বা আমার সঙ্গেই—এগিয়ে চলেছে। চলমান দ্রষ্টার অনুপাতে বিভিন্ন বস্তুর এ-জাতীয় আপাত-গতিকে বলা হয় 'প্যারালাক্স' (Parallax) এবং এই ঘটনা থেকেও আমরা বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব বোধ করতে পারি।

এ-ছাডাও চোখের বিভিন্ন পেশী বিভিন্ন দূরের বস্তুকে দেখবার জন্য বিভিন্নভাবে সক্রিয় হয় এবং এই পেশীগুলির সক্রিয়তা সংক্রান্ত সংবেদনও দূরত্ব নির্ণযের সহায়ক হয়—যদিও সেই সংবেদনগুলি পেশীয় সংবেদনই, চাক্ষুষ সংবেদন নয়। যেমন, বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুকে ঠিকমতো দেখবার জন্য চোখকে বিভিন্নভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন এবং এই পরিচালনার দায়িত্ব চক্ষু সংলগ্ন পেশীর উপর। কিংবা, কাছের এবং দূরের বস্তুকে দেখার জন্য চোখের লেন্সকে 'সিলিয়ারি পেশী' বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

৭ ॥ ঘনত্ব প্রত্যক্ষ (Perception of Solidity or the Third Dimension of Space)

সাধারণ বস্তুর দৈর্ঘ্য (Length) ও প্রস্থ (Breadth) ছাড়াও ঘনত্ব বা গভীরতা (Solidity বা Depth) বর্তমান। বস্তুর ঘনত্ব-প্রত্যক্ষও মুখ্যত স্পর্শ এবং পেশীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল, কেননা বস্তুটিকে স্পর্শ করে এবং তার উপর হাত বুলিয়ে আমরা সরাসরিভাবে তার ঘনত্ব হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু ক্রমশ চাক্ষুষ সংবেদনও গৌণ-ভাবে ঘনত্ব প্রত্যক্ষের উপযোগী হয়ে ওঠে। চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যে আমরা কী ভাবে ঘনত্ব উপলব্ধি করি ? এ-জাতীয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে দু'টি চোখের সমবেত অবদান থাকে। আমার ডান চোখ এবং বাঁ চোখ উভয়ের মধ্যেই সম্মুখস্থ ঘনবস্তুটির একটি করে প্রতিকৃতি (Image) পড়ে এবং মোটামুটিভাবে এই দু'টি প্রতিকৃতি সমান হলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে। কিন্তু গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্র উভয়



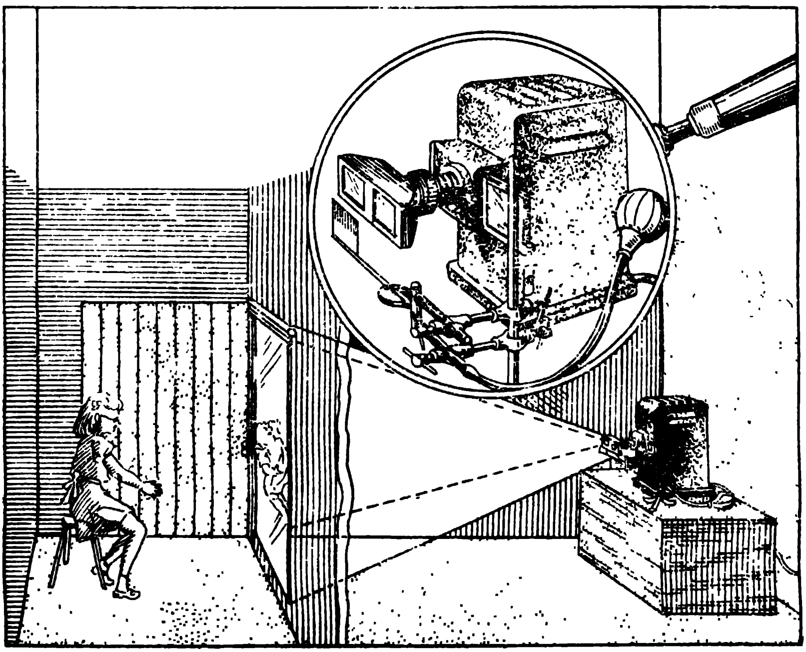
৬ : স্টিরিওস্কোপ

প্রতিকৃতি উদ্দীপিত স্নায়বিক শক্তিকে মিশ্রিত (Fuse) করে একই প্রতিকৃতির প্রত্যক্ষে পরিণত করে এবং যদিও দু'টি প্রতিকৃতির কোনটিতে স্বতন্ত্রভাবে ঘনত্বের

ইংগিত থাকে না তবুও উক্ত মিশ্র প্রত্যক্ষে ডান চোখে দেখা এবং বাঁ চোখে দেখার বৈশিষ্ট্য একত্রীভূত হয়ে ঘনত্বের বোধ সৃষ্টি করে।

'স্টিরিওস্কোপ'-এর (Stereoscope) সাহায্যে সহজেই আমরা এই ঘনত্ব প্রত্যক্ষের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে পারি। সাধারণ একটি আলোকচিত্রে বিভিন্ন বস্তুর ঘনত্ব উপলব্ধ হয় না, বস্তুগুলির শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চোখে পড়ে। কিন্তু একই বস্তুর বা একই দৃশ্যের যদি দু'টি স্বতন্ত্র আলোকচিত্র এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যে প্রথমটি শুধুমাত্র বাঁ চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত এবং দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র ডান চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত তাহলে ছবি দু'টির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকবে। এবং ছবি দু'টি দেখবার সময় যদি আমরা এমনভাবে দেখি যে উভয় চোখ একই ছবি দেখতে পাচ্ছে না—বাঁ চোখ শুধুমাত্র একটি ছবিই দেখছে এবং ডান চোখও শুধুমাত্র অপর ছবিটিই দেখছে—তাহলে আমাদের দু'টি স্বতন্ত্র চোখে দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি পড়বে এবং এই দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিকৃতির সংমিশ্রণে আমরা দৃশ্যের ঘনত্ব উপলব্ধি করতে পারবো।

মূলত একই কৌশলে চলচ্চিত্রেও ঘনত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব। দু'টি চোখের দৃষ্টিকোণ



৭: ঘনত্ব-প্রত্যক্ষের পরীক্ষার জন্য জটিল প্রোজেক্টার

থেকে একই বিষয়বস্তুর দু'টি স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হল; একটি লাল রঙের, অপরটি নীল রঙের। চিত্র দু'টিকে অধ্যস্ত (Superimposed) করে প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হল এবং দর্শকদের চোখে লাগিয়ে দেওয়া হল এমন চশমা যার একটা কাঁচ নীল এবং অপর কাঁচটি লাল। ফলে দর্শকেরা উপরোক্ত দু'টি স্বতন্ত্র চিত্রের মধ্যে এক চোখ দিয়ে শুধু লাল চিত্রটি এবং অপর চোখ দিয়ে শুধুমাত্র নীল চিত্রটি দেখতে পাবে এবং এই দু'টি পৃথক চিত্র একত্র সংমিশ্রিত হয়ে দর্শকদের মধ্যে ঘনত্বের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করবে। এ-জাতীয় চলচ্চিত্রে একটি বল সামনের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া দেখতে দেখতে আমার মনে হবে বলটি বুঝি পর্দা থেকে আমার চোখের দিকে এগিয়ে আসছে।

আরো একরকম অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যবস্থার সাহায্যে ঘনত্ব প্রত্যক্ষের পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটির বিশেষ সুবিধা এই যে তার সাহায্যে এমনকি দু'বছরের শিশুদের আচরণ থেকেও ঘনত্ব প্রত্যক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বা 'প্রোজেক্টার'-এর (Projector) সাহায্যে পর্দার উপর একই সঙ্গে একটি পুতুলের দু'টি ছবি ফেলা হল; একটি ছবি বাঁ চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত, অপর ছবিটি ডান চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত। শিশুটির চোখে এমন চশমা পরিয়ে দেওয়া হল যে তার এক-একটি চোখে মাত্র এক-একটি ছবির প্রতিকৃতি পড়ে। এ-অবস্থায় শিশুটির কাছে পুতুলের ছবি আর ছবি বলে মনে হবে না; তার বদলে সে ঘনত্বযুক্ত এমন বাস্তব একটি পুতুল দেখবে যে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে।

৮॥ গতি প্রত্যক্ষ (Perception of Movement)

গতিশীল বস্তুর গতিও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। কী ভাবে হয়? সরাসরি-ভাবে গতি প্রত্যক্ষের জন্য অবশ্যই আমরা স্পর্শ-সংবেদন এবং পেশীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আমার গায়ের উপর দিয়ে একটি পোকা চলে বেড়ালে স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যেই পোকাটির গতি আমি জানতে পারি, কিংবা আমার গায়ে কেউ হাত বুলিয়ে দিলে স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যেই আমি তার হাতের গতি অবগত হই। তেমনি, কোন গতিশীল বস্তুর উপর হাত রাখলে বস্তুটির স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে আমার হাতের পেশীতেও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই পেশীয় পরিবর্তন সংক্রান্ত সংবেদন থেকে আমি বস্তুটির গতি অবগত হব। কিংবা একটি গতিশীল বস্তুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োবার সময় আমার যে-পেশীয় সংবেদন হবে তা থেকেও আমি গতি সম্বন্ধে জ্ঞান পাবো। ঘাড়, মাথা এবং চক্ষু সংলগ্ন পেশীগুলিও নানাভাবে গতি প্রত্যক্ষের সহায়ক হয়। কেননা, কোন একটি গতিশীল বস্তু দেখবার সময়

আমরা ঘাড় ও মাথা নাড়াতে বাধ্য হই : যেমন ফুটবল মাঠে বল যেদিকে যায় এবং খেলোয়াড়রা যেদিকে দৌড়ায় আমরা সেদিকেই ঘাড় ফেরাই। আবার গতিশীল বস্তুটিকে দৃষ্টিপথে রাখার জন্য ক্রমাগতই চক্ষু সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। অতএব, এইভাবে নানা রকম স্পর্শ-সংবেদন এবং পেশীয় সংবেদনের সাহায্যে আমরা সরাসরিভাবে গতি প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই।

এ-ছাড়াও চলচ্চিত্র প্রভৃতি দর্শনকালে আমাদের মনে হয় যে আমরা বুঝি বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির গতি প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি গতি-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত নয় ; প্রত্যক্ষের বদলে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে গতি সংক্রান্ত আমাদের একরকম ভ্রম (Illusion) হয়। পরে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে আমরা এই ঘটনার আলোচনা করব।

৯ ॥ কাল প্রত্যক্ষ (Perception of Time)

প্রত্যক্ষের সাহায্যে কাল (Time) সংক্রান্ত আমাদের একপ্রকার প্রাথমিক বোধ হয় ; এই বোধ পরে স্মৃতি (Memory) এবং কল্পনার (Imagination) সাহায্যে সুস্পষ্ট 'কাল'-জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রথমে দেখা যাক, প্রত্যক্ষ থেকে আমরা কী ভাবে কাল সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা পাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মাত্রেরই নিজস্ব স্থায়িত্ব (Duration) বর্তমান : কোন প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব বেশি, কোন প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব কম। অতএব, প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটিই আমাদের মধ্যে সময় বা কাল সংক্রান্ত কোন এক-রকম বোধ জাগায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে পারম্পর্য (Succession) বর্তমান : যেমন, একটু আগে আমার একরকম শ্রৌত প্রত্যক্ষ ঘটছিল, বর্তমানে তার বদলে আমার অপর একটি শ্রৌত প্রত্যক্ষ ঘটছে, একটু পরে আবার তৃতীয় কোনপ্রকারের শ্রৌত প্রত্যক্ষ ঘটবে। প্রত্যক্ষের এ-জাতীয় পারম্পর্য থেকে আমাদের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বোধ জন্মায় এবং সেই সঙ্গে আমরা আরো হৃদয়ঙ্গম করি যে এই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়—এগুলির মধ্যে একরকম ধারাবাহিকতাও বর্তমান।

এইভাবে প্রধানত প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব এবং প্রত্যক্ষ-পারম্পর্য থেকে আমরা 'কাল' সংক্রান্ত একটা প্রাথমিক বোধ লাভ করি। কিন্তু এই প্রাথমিক বোধটির পক্ষে সুস্পষ্ট 'কাল'-জ্ঞানে পরিণত হবার জন্য প্রতীক-ব্যবহার (Use of Symbols), স্মৃতি (Memory) এবং প্রত্যাশার (Expectation) সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব (Duration) কমবেশি হলেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষের সাহায্যে সুদীর্ঘ স্থায়িত্বের বোধ সম্ভব নয়। নানা প্রকার প্রতীকের (Symbol) সাহায্যে আমরা

ক্রমশ দীর্ঘস্থায়িত্ব বোধ করতে সমর্থ হই। যেমন, আকাশে সূর্যের অবস্থিতি দেখে বা ঘড়ির কাঁটা দেখে আমরা ক্রমশ তুলনায় দীর্ঘতর কালের ধারণা লাভ করি। তেমনি, প্রত্যক্ষ-পারম্পর্যের সাহায্যে ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যেটুকু বোধ জন্মায় তা নিতান্তই প্রাথমিক। স্মৃতি (Memory) এবং প্রত্যাশার (Expectation) সাহায্যেই এই প্রাথমিক বোধটি উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়। কেননা, ভূত বা পূর্ব প্রত্যক্ষকে সুস্পষ্টভাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা হিসাবে বোঝবার জন্য স্মৃতির সহায়তা প্রয়োজন : যদি স্মৃতি রূপে পূর্ব-প্রত্যক্ষের কোন রেশ টিকে না থাকে তাহলে ভূত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য অসম্ভব হবে। তেমনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অবগতির জন্যও প্রত্যাশার সহায়তা প্রযোজন : শৈশব থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা হয় যে একটি বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর অপর একটি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়—যেমন, মেঘের প্রত্যক্ষের পর বৃষ্টির প্রত্যক্ষ ঘটে ; অতএব আমরা ক্রমশই প্রথম প্রত্যক্ষটি পেলে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষটির প্রত্যাশা করতে অভ্যস্ত হই এবং এইভাবেই বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

১০ ॥ উপর-নীচ এবং ডান-বামের প্রত্যক্ষ (Perception of Up and Down, Right and Left)

ইতিপূর্বে দেখেছি, চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে দৃশ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবিটি রেটিনার উপর উল্টোভাবে পড়ে : অর্থাৎ, রেটিনার প্রতিচ্ছবিতে বস্তুটির উপর দিকটা নীচের দিকে, নীচের দিকটা উপর দিকে—মানুষের মাথা নীচের দিকে, পা উপর দিকে ; গাছের গুঁড়ি উপর দিকে, ডালপালা নীচের দিকে। কিন্তু আমরা কোন বস্তুকেই এ-ভাবে প্রত্যক্ষ করি না—তার বদলে বস্তুটির উপর দিকটাই উপর দিকে দেখি, নীচের দিকটাই নীচের দিকে দেখি। অতএব প্রশ্ন ওঠে, রেটিনায় প্রতিচ্ছবি উল্টো হওয়া সত্ত্বেও আমরা বস্তুগুলিকে উল্টোভাবে প্রত্যক্ষ করি না কেন? কিংবা, উল্টো প্রতিচ্ছবি সত্ত্বেও আমরা কী করে বস্তুকে সোজাভাবেই প্রত্যক্ষ করি? এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর এখনো জানা যায়নি। অনুমান করা যেতে পারে যে প্রতিচ্ছবিটিকে আবার উল্টো করে নেবার জন্য গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রে কোন-না-কোন জটিল প্রক্রিয়া ঘটে ; অতএব আশা করা যায় যে গুরুমস্তিষ্কের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উন্নততর গবেষণা ভবিষ্যতে আলোচ্য রহস্যের উপর নূতন আলোকপাত করবে। কিন্তু মনো-বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি হল, আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বহুলাংশেই স্পর্শ-সংবেদন

এবং পেশীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল, কিংবা, আমাদের স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদন বহুলাংশেই চাক্ষুষ সংবেদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন: চোখে বস্তুটির প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে পড়লেও বস্তুটির মাথার দিকটা স্পর্শ করার সময় আমরা উপর দিকেই হাত বাড়াতে বাধ্য, বস্তুটির নীচের দিক স্পর্শ করার জন্য আমরা নীচের দিকেই হাত বাড়াতে বাধ্য। কিংবা, রেটিনায় উল্টো প্রতিচ্ছবি সত্ত্বেও বস্তুটির মাথার দিকটা নজর করার জন্য আমরা উপর দিকে ঘাড় বাঁকাতে এবং চোখ তুলতে বাধ্য, নীচের দিকটা নজর করার সময় আমরা নীচের দিকে ঘাড বাঁকাতে এবং চোখ নামাতে বাধ্য। এ-জাতীয় পেশী পরিচালনার সংবেদন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত ক'রে বস্তুটির উল্টো প্রতিচ্ছবিকে আবার যেন উল্টিয়ে নিতে সহায়তা করে—উপর দিক হিসাবে বাস্তবিকই যে-প্রতিচ্ছবি পাই তাকেই নীচের দিক হিসাবে চিনতে অভ্যস্ত হই; ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে স্ট্রাটন (Stratton) একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা করেন। তিনি এমন একটি চশমা প্রস্তুত করেন যা চোখে দিলে রেটিনায় প্রতিচ্ছবিটি স্বাভাবিক অবস্থায় যে-ভাবে পড়বার কথা তার উল্টোভাবেই পড়ে—অর্থাৎ, এই প্রতিচ্ছবিতে বস্তুটির উপর দিকটি উপর দিকেই থাকে এবং নীচের দিকটি নীচের দিকেই থাকে। দেখা গেল, নিরবচ্ছিন্নভাবে এই চশমা পরে থাকার ফলে প্রথমাবস্থায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বস্তুটির নীচের দিক হিসাবে যে-দিকটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে সেই দিকটি দেখবার জন্য উপর দিকে ঘাড তুলতে হয় এবং উপর দিক হিসাবে যে-দিকটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে তা দেখবার জন্য নীচের দিকে ঘাড় নামাতে হয়। অর্থাৎ, রেটিনায় বস্তুর প্রতিচ্ছবি সোজাভাবে পড়লেও পূর্ব অভ্যাস অনুসারে প্রত্যক্ষকালে রেটিনার এই প্রতিচ্ছবিকে আবার উল্টেই নেওয়া হয়, এবং এই উল্টো প্রত্যক্ষ অনুসারে আচরণও উল্টো-ভাবে করবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে একটানা এ-জাতীয় চশমা পরে থাকার পর দেখা গেল বস্তুটির উপর-নীচ প্রত্যক্ষে আর দিক্‌ভ্রম ঘটছে না—অর্থাৎ, আগে যেমন উপর দিকটিই উপর দিক হিসাবে প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছিল এ-জাতীয় চশমা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে উপর দিকটি তেমনি উপর দিক হিসাবেই প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে। অতএব এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল, রেটিনায় প্রতিচ্ছবি সোজাভাবেই পড়ুক বা উল্টোভাবেই পড়ুক আমাদের স্পর্শ-সংবেদন এবং পেশীয় সংবেদনের প্রভাবে বস্তুটিকে আমরা সোজাভাবেই দেখতে অভ্যস্ত হই।

উপর-নীচ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই মন্তব্য ডান-বাম সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। কেননা, রেটিনার প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে পড়ে বলেই সেই প্রতিচ্ছবিতে যে উপর দিকটি নীচের দিক হয়ে যায় তাই নয়, ডান দিকটিও বাম দিক হয়ে

যায় এবং বাম দিকটিও দক্ষিণ দিক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের প্রভাবে আমরা বস্তুটির ডান দিককে ডান দিক হিসাবেই এবং বাঁ দিকটিকে বাঁ দিক হিসাবেই প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই।

দিক্-প্রত্যক্ষর জন্য আমরা বহুলাংশে শ্রৌত সংবেদনের উপরও নির্ভরশীল। কেননা, আমাদের ডান-কান এবং বাঁ-কান উভয়ের সাহায্যে একই শব্দ-তরঙ্গ গৃহীত হলেও শব্দ-তরঙ্গর উৎস ডান দিকে হলে ডান-কানটি তুলনায় বেশি উদ্দীপিত হয়, শব্দ-তরঙ্গর উৎস বাঁ দিকে হলে বাঁ-কান তুলনায় বেশি উদ্দীপিত হয়। এই-ভাবে শব্দ-সংবেদন থেকেই দক্ষিণ ও বাম সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে। কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে বোঝা যায়, দিক্-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রৌত সংবেদন বহুলাংশেই চাক্ষুষ সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। ইয়ং (Young) এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেন যার সাহায্যে ডান দিক থেকে আসা শব্দ-তরঙ্গকে বস্তুতপক্ষে বাঁ-কানে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং বাঁ দিক থেকে আসা বায়ু-তরঙ্গকে বস্তুতপক্ষে ডান কানে পৌঁছে দেওয়া হয়। দেখা গেল, চোখ বাঁধা অবস্থায় এই যন্ত্র পরে থাকলে শব্দের উৎস সংক্রান্ত দিক্-ভ্রম ঘটছে। বাঁ দিক থেকে কেউ ডাকলে মনে হচ্ছে শব্দটি আসলে ডান দিক থেকে আসছে,



৮ : 'ইয়ং'-এর যন্ত্র

ডান দিক থেকে কেউ ডাকলে মনে হচ্ছে বাঁ দিক থেকে কেউ ডাকছে। কিন্তু চোখ খোলা অবস্থায় এই যন্ত্র পরে থাকলেও দিক্-ভ্রম হয় না। অতএব বোঝা গেল, দিক্-নির্ণয়ের জন্য আমরা বহুলাংশে শ্রৌত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল হলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কল্পনা ও স্মৃতি

১॥ কল্পনা ও প্রতিরূপ (Imagination and Image)

অতীতে আমি তাজমহল দেখেছিলাম—অর্থাৎ, তাজমহল নামের বস্তুটি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। প্রত্যক্ষকালে অভিজ্ঞতায় ঠিক যা পাওয়া যায় তাকেও—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকেও—বলা হয় প্রত্যক্ষ (Percept)। অতএব বলতে পারি, অতীতে আমি তাজমহলের প্রত্যক্ষ (Percept) লাভ করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমার সামনে তাজমহল উপস্থিত নেই; অতএব বর্তমানে আমার পক্ষে তাজমহলের প্রত্যক্ষ (Percept) সম্ভব নয়। তবুও আমি তাজমহল সংক্রান্ত আমার ঐ অতীত অভিজ্ঞতাটিকে কোন একভাবে বর্তমান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও পুনরুত্থাপিত করতে পারি। অবশ্যই সে-ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতাটি প্রত্যক্ষরূপেই উপস্থিত হবে না—অর্থাৎ, অতীত প্রত্যক্ষকে কোন এক-প্রকারের রূপান্তরিত অবস্থায় বর্তমান অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রে পুনরুত্থাপিত করা সম্ভব। চলতি কথায় আমরা বলি, বর্তমানে আমি কল্পনায় তাজমহল দেখছি। অর্থাৎ, অতীত প্রত্যক্ষটি বর্তমানে আমার কাছে যেন কোন একরকম 'ছবি' হিসাবে পুনরুত্থাপিত হচ্ছে। অতীত প্রত্যক্ষ (Percept) যে-ভাবে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হয় তাকে বলে 'প্রতিরূপ' (Image)। অতএব বলতে পারি, অতীতে তাজমহলের প্রত্যক্ষ (Percept) পেয়েছিলাম, বর্তমানে তারই প্রতিরূপ (Image) পাচ্ছি। যে-বৃত্তির সাহায্যে আমি অতীত প্রত্যক্ষকে বর্তমান প্রতিরূপ হিসাবে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত করছি ব্যাপক অর্থে সেই বৃত্তিটিকেই বলা হয় কল্পনা (Imagination)। কিন্তু এই পুনরুত্থাপন প্রক্রিয়াটি দু'ভাবে ঘটতে পারে : (১) বর্তমান প্রতিরূপ বা প্রতিরূপগুলি অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি মাত্র; (২) অতীত প্রত্যক্ষগুলি থেকে নানা রকম উপাদান সংগ্রহ করে এই উপাদানগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন ধরনের কোন প্রতিরূপ গড়ে তোলা। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : অতীতে পাখীর প্রত্যক্ষ হয়েছিল, বর্তমানে সেই প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি হিসাবে পাখীরই প্রতিরূপ অভিজ্ঞতা করছি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : অতীতে পাখী এবং ঘোড়ার প্রত্যক্ষ ঘটেছিল; বর্তমানে ঐ দু'টি অতীত প্রত্যক্ষ থেকে উপাদান সংগ্রহ

করে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার প্রতিরূপ গড়ে তুলছি। এই দু'রকম পুনরুত্থাপন-বৃত্তির মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় স্মৃতি (Memory) বা পুনরাবৃত্তিমূলক কল্পনা (Reproductive Imagination) ; দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'সংকীর্ণ অর্থে কল্পনা' (Imagination in the narrow sense) বা গঠনমূলক কল্পনা (Productive Imagination)। অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে কল্পনা বলতে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং গঠনমূলক উভয় জাতীয় কল্পনাই বোঝায়, সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র গঠনমূলক কল্পনাকেই কল্পনা বলা হয়। অর্থ বিপর্যয়ের আশঙ্কা পরিহারের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কল্পনা শব্দকেই উভয় অর্থে ব্যবহার না করে স্মৃতি ও কল্পনা দু'টি স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করতে পারি। অর্থাৎ, স্মৃতি (Memory) বলতে আমরা বুঝব বর্তমান প্রতিরূপ হিসাবে অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি এবং কল্পনা বলতে বুঝব অতীত প্রত্যক্ষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নতুন ধরনের প্রতিরূপ গঠন। এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি প্রতিরূপও দ্বিবিধ : স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory Image) এবং কল্পনা-প্রতিরূপ (Image of Imagination)। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিরূপটি অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিরূপটি অতীত প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল হলেও গঠনমূলক বা নতুন কিছু।

২॥ প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ ও ধারণা (Percept, Image and Idea)

কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে—অর্থাৎ, বস্তুটি থেকে উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে—আমরা বস্তুটির প্রত্যক্ষ (Percept) লাভ করি। অপরপক্ষে, কোন বস্তুর অতীত প্রত্যক্ষর বর্তমান অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত রূপটিকে প্রতিরূপ (Image) বলা হয়। স্বভাবতই প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাকালে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না ; কিন্তু বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগই প্রত্যক্ষর প্রধানতম সর্ত। প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য থেকে নিম্নোক্ত অপেক্ষাকৃত গৌণ পার্থক্যগুলি নির্ণীত হয় :

প্রথমত, প্রতিরূপের তুলনায় প্রত্যক্ষ অনেক বেশি সজীব (lively) এবং সুস্পষ্ট (vivid)। অতীতে যখন আমি তাজমহল দেখেছিলাম তখন তাজমহল সম্বন্ধে আমার যে-সজীব ও সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়েছিল তার তুলনায় তাজমহলের বর্তমান প্রতিরূপটি অনেক নির্জীব ও অস্পষ্ট হতে বাধ্য। কিংবা, হাতে আগুন স্পর্শ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অতীতে হাত পুড়ে যাবার বর্তমান স্মৃতি—এই দু'টি তুলনা করলে আমরা সহজে বুঝতে পারি প্রতিরূপের তুলনায় প্রত্যক্ষ কত সজীব ও সুস্পষ্ট। বস্তুত আমাদের অস্পষ্টতম প্রত্যক্ষও স্পষ্টতম প্রতিরূপের চেয়ে স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল বলেই প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে বহির্জগতের দিক থেকে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর একটা বাধ্য-বাধকতার ভাব (Sense of objective coercion) থাকে। যেমন, সামনে ঘোড়া থাকলে আমি ঘোড়া দেখতে বাধ্য; ঘোড়ার পরিবর্তে গরু দেখবার স্বাধীনতা আমার নেই। কিন্তু প্রতিরূপের ক্ষেত্রে অন্তত তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞতার উপর এ-জাতীয় কোন বাধ্যবাধকতার ভাব নেই—অর্থাৎ, অন্তত তুলনামূলকভাবে আমাদের স্বাধীনতা বর্তমান। 'তুলনামূলকভাবে' এই কারণে বলা হচ্ছে যে আমরা পরে দেখবো এমনকি প্রতিরূপ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গেও কয়েকটি নিয়ম বর্তমান। অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বর্তমানে কোন্ অতীত প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুত্থাপিত হবে তা সম্পূর্ণভাবে আমার খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল, তবুও প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই—কিংবা আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য অনুসারেই—আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমি প্রতিরূপ চয়ন করে থাকি। যেমন, বর্তমানে শাজাহান-এর নাম শুনলে তাজমহলের কথা মনে পড়ে, কিন্তু শের শাহ্ বা মীর কাসেমের নাম শুনলে তাজমহলের কথা মনে পড়ে না।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষর তুলনায় প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের দিক থেকে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর বাধ্যবাধকতার ভাব অন্তত তুলনামূলকভাবে অনেক কম বলে প্রত্যক্ষর তুলনায় প্রতিরূপ বাস্তব জগতের সঙ্গে কম সংশ্লিষ্ট; অতীতে যে-পরিবেশে একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটেছিল বর্তমান প্রতিরূপের ক্ষেত্রেও বস্তুটি ঠিক সেই পরিবেশে স্থাপিত হতে বাধ্য নয়।

চতুর্থত, বাস্তব জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপকের উপর ঐকান্তিকভাবে নির্ভরশীল বলেই প্রত্যক্ষর একরকম অবিচলিত ভাব বর্তমান; তুলনায় প্রতিরূপ অনেক চঞ্চল বা অস্থির।

প্রতিরূপ (Image) এবং ধারণার (Idea) মধ্যে পার্থক্য

সংবেদন ও প্রত্যক্ষর মধ্যে আমরা ইতিপূর্বে যে-পার্থক্য আলোচনা করেছি প্রতিরূপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য বলতেও অনেকটা সেই রকমই। অর্থাৎ, বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত হলে সংবেদন যেমন প্রত্যক্ষে পরিণত হয় অনেকটা সেইভাবেই প্রতিরূপও বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত হলে পরিণত হয় ধারণায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অন্তত আমাদের পরিণত অভিজ্ঞতায় (অর্থাৎ, নেহাতই নবজাতকের অভিজ্ঞতা বাদ দিলে) বিশুদ্ধ সংবেদন বলে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া

যায় না। এই কারণে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব নেহাতই অনুমানমূলকভাবে স্বীকৃত হতে পারে। বিশুদ্ধ প্রতিরূপ প্রসঙ্গেও প্রায় একই মন্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, আমাদের পরিণত অভিজ্ঞতায় অর্থহীন প্রতিরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না; সমস্ত প্রতিরূপই অল্পবিস্তর অর্থসমন্বিতভাবে—অর্থাৎ, ধারণা হিসাবেই—আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে।

৩ ॥ প্রত্যক্ষ থেকে প্রতিরূপ (Transition from Percept to Image)

অতীতের প্রত্যক্ষ বর্তমানে প্রতিরূপ হিসাবে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হয়; বর্তমানের প্রত্যক্ষও আবার ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতায় প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুত্থাপিত হতে পারে। অতএব, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যে সময়ের একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান স্বীকার্য। কিন্তু এই সুস্পষ্ট সময়-ব্যবধানের মধ্যে অন্যান্য কয়েক প্রকার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা আছে—যেগুলিকে প্রত্যক্ষও বলা যায় না, আবার পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপও বলা যায় না। এ-জাতীয় মধ্যবর্তী অভিজ্ঞতা বলতে কী কী ?

(ক) অনুবেদন (After-Sensation)। আমরা ইতিপূর্বে চাক্ষুষ সংবেদন প্রসঙ্গে অনুবেদনের সাধারণ পরিচয় দেখেছি : উদ্দীপক অপসারণের পরও অনেক সময় সংবেদনের যে-রেশ টিকে থাকে তাকেই অনুবেদন বলে। এই অনুবেদনকে আমরা প্রত্যক্ষ বলতে পারি না; কেননা প্রত্যক্ষর জন্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রয়োজন, অথচ অনুবেদনের সময় বস্তুর সঙ্গে বাস্তবিকই কোন ইন্দ্রিয়-সংযোগ নেই। অপরপক্ষে অনুবেদনকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিরূপও বলা যায় না, কেননা অনুবেদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সুস্পষ্ট সময়-ব্যবধান নেই—অনুবেদনটি প্রত্যক্ষরই একরকম রেশ—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষর সঙ্গে সময়ের দিক থেকে তার একরকম ধারাবাহিকতা বর্তমান। অতএব অনুবেদনকে প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কোন একরকম অভিজ্ঞতা বলা প্রয়োজন।

(খ) পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ (Recurrent Image)। অনেক সময় অত্যন্ত সজীব ও সুস্পষ্ট কোন প্রত্যক্ষর পর ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপকটি অপসারিত হলেও প্রত্যক্ষর একটি প্রতিরূপ সামান্য সময়ের ব্যবধানে বারবার যেন অভিজ্ঞতায় ভেসে ওঠে। যেমন, দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণু পরীক্ষা করার পর অনুবীক্ষণ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেও বারবার জীবাণুর ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ-জাতীয় প্রতিরূপকে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ বলে। অনুসংবেদন যেমন প্রত্যক্ষরই একটানা রেশ পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ সে-রকম নয়। প্রত্যক্ষ এবং পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপের মধ্যে কমবেশি সময়ের ব্যবধান থাকে। তবুও

পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিরূপও বলা যায় না। কেননা, সময়ের দিক থেকে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ মোটের উপর প্রত্যক্ষর নিকটবর্তীই : প্রত্যক্ষর সঙ্গে সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট হলে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ বিলুপ্ত হয়। যেমন, অনুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু পরিদর্শনের পর মাত্র কিছুক্ষণ ধরেই জীবাণুর চিত্র যেন বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে আর এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা হয় না। অপরপক্ষে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানও সম্ভবপর। যেমন, দশ বছর আগে আমি তাজমহল দেখেছিলাম, এখন অভিজ্ঞতায় তার প্রতিরূপ পাচ্ছি। অতএব পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ যদিও অনুসংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষর পরিবর্তে প্রতিরূপেরই নিকটবর্তী, তবুও তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়; এই কারণে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপকেও প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের মধ্যবর্তী একজাতীয় অভিজ্ঞতা বলা হয়।

(গ) মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপ (Primary Memory Image)। অনেক সময় কোন উদ্দীপক গ্রহণকালে সে-বিষয়ে আমাদের চেতনা থাকে না—অর্থাৎ, উদ্দীপক গৃহীত হলেও আমরা উদ্দীপকের উৎসকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রতিরূপটি আমাদের অভিজ্ঞতা-গোচর হয়। এ-জাতীয় প্রতিরূপকে 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপ' (Primary Memory Image) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন, খুব মনোযোগ সহকারে আমি বই পড়ছি, এমন সময় কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। সে-সময়ে আমি শব্দটি যেন 'শুনেও শুনি না'—অর্থাৎ, উদ্দীপক এলেও তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয় না। কিন্তু একটু পরেই আমার খেয়াল হয় : কে বুঝি আমার নাম ধরে ডাকছিল! কিংবা, কোন কথা চিন্তা করতে করতে পথ চলবার সময় হয়ত একটি চেনা মুখ আমার 'চোখে পড়েও পড়ল না'; কিন্তু একটু পরেই সে-বিষয়ে আমার 'হুঁস হল'—অর্থাৎ, আমার অভিজ্ঞতায় তার প্রতিরূপ উত্থাপিত হল।

এ-জাতীয় 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপ' অবশ্যই প্রকৃত প্রতিরূপ জাতীয়ই; কেননা এখানে পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং প্রতিরূপের মধ্যে যত কমই হোক না কেন সুস্পষ্ট সময়ের ব্যবধান বর্তমান। তবুও পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের সঙ্গে এর পার্থক্যও বর্তমান। কেননা, উদ্দীপক গ্রহণ এবং 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপের' অভিজ্ঞতা—উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সুস্পষ্ট হলেও যৎসামান্য : উদ্দীপক গ্রহণের সামান্য পরেই 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপে'র অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু যথেষ্ট পরে আর তা হয় না। তাই 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপে'র অভিজ্ঞতাকে উদ্দীপক গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নও মনে করা যায় না, উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সুস্পষ্ট হলেও সময়ের দিক থেকে কোন একরকম

নিকটতাও বর্তমান। এই কারণে 'মুখ্য স্মৃতি-প্রতিরূপ'কেও প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কোন একপ্রকার অভিজ্ঞতা বলা যায়।

৪॥ আইডেটিক্ প্রতিরূপ (Eidetic Image) এবং আইডেটিক্-প্রবণ ব্যক্তি (Eidetic Type)

১৪ বছর বয়সের কম শিশুদের শতকরা প্রায় ৫০।৬০ ভাগের মধ্যে একরকম অত্যন্ত সজীব ও হুবহু প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা দেখা যায়; আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ-জাতীয় প্রতিরূপকে 'আইডেটিক্ প্রতিরূপ' (Eidetic Image) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আইডেটিক্ প্রতিরূপের সজীবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে এমনকি 'আলোকচিত্রের মতো স্মৃতি' (Photographic Memory) বলা হয়। শিশু প্রায় আধমিনিট ধরে তন্ময়ভাবে কোন বস্তু বা চিত্র পরীক্ষা করার পর চোখ বন্ধ করলে—বা চোখ সরিয়ে নিয়ে ধূসর পটভূমির দিকে চেয়ে থাকলে—তখনো বস্তু বা চিত্রটিকে যেন স্পষ্টভাবে 'দেখতে পায়'; বস্তুত এ-অবস্থায় শিশুর কাছে প্রতিরূপটি এমনই সজীব ও হুবহু যে মনে হতে পারে বস্তু বা চিত্রটি বুঝি তখনো তার প্রত্যক্ষগোচরই হচ্ছে। এই প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাকালে শিশুকে প্রশ্ন করলে বস্তু বা চিত্রটির অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যও সে বর্ণনা করতে পারে। আমরা পরে দেখবো, সামনে বস্তুর অভাব সত্ত্বেও কল্পনা-প্রভাবে বস্তু-প্রত্যক্ষ ঘটলে তাকে 'অমূল-প্রত্যয়' (Hallucination) আখ্যা দেওয়া হয়। আইডেটিক্ প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাকালেও প্রত্যক্ষগোচর বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান; তবুও প্রতিরূপটি এমনই হুবহু যে তা প্রায় প্রত্যক্ষরই সমগোত্রীয়। এই কারণে আইডেটিক্ প্রতিরূপকে 'নকল অমূল-প্রত্যয়' (Pseudo-hallucination) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও অবশ্যই এ-জাতীয় প্রতিরূপকে বাস্তবিকই অমূল-প্রত্যয় জাতীয় মনে করা ভুল। বয়স বাড়ার সঙ্গে আইডেটিক্ প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা হ্রাস পায়; পরিণত বয়সে এ-জাতীয় প্রতিরূপের অভিজ্ঞতা সাধারণত হয় না। যে-ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে আইডেটিক্ প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা দেখা যায় তাদের বলা হয় 'আইডেটিক্ প্রবণ ব্যক্তি' (Eidetic Type)।

৫॥ প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ (Types of Imagery)

অতীত প্রত্যক্ষ স্মৃতিরূপে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হলে তাকে প্রতিরূপ বলা হয়। প্রত্যক্ষর মূল উপাদান হল সংবেদন। অতএব সংবেদনকে আমরা যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি প্রতিরূপকেও মোটের উপর সেই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা, শ্রৌত প্রত্যক্ষ স্মৃতিরূপে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হলে

তাকে শ্রৌত প্রতিরূপ আখ্যা দেওয়া যায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্মৃতিরূপে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হলে তাকে চাক্ষুষ প্রতিরূপ বলা যায় ; এইভাবে স্পর্শ প্রতিরূপ, ঘ্রাণ প্রতিরূপ প্রভৃতিরও স্বীকৃতি সম্ভব। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, কোন একটি বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষর এক বিচ্ছিন্ন প্রতিরূপের পরিবর্তে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় নানা প্রতিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ বা শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় বর্তমান। প্রতিরূপের এ-জাতীয় সমষ্টিকে বলা হয় 'প্রতিরূপশ্রেণী' (Imagery)। প্রতিরূপশ্রেণীকেও 'সরল' ও 'জটিল'—এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিরূপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিরূপগুলি সমজাতীয় হলে তাকে বলা হবে সরল ; যেমন, একাধিক চাক্ষুষ প্রতিরূপেরই কোন শ্রেণী। অপরপক্ষে, চাক্ষুষ প্রতিরূপ, শ্রৌত প্রতিরূপ প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় প্রতিরূপের শ্রেণীকে বলা হয় জটিল।

প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কোন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সজীব প্রতিরূপের অভিজ্ঞতা পায়, কারুর অভিজ্ঞতায় প্রতিরূপ অস্পষ্ট, আবার কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা এমনই ক্ষীণ যে তাদের বিশেষ কোন প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাই হয় না। প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও নানা প্রকার তারতম্য দেখা যায়। কারুর-কারুর মধ্যে চাক্ষুষ প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা ও প্রবণতাই বিশেষ প্রবল, কারুর মধ্যে আবার শ্রৌত প্রতিরূপের অভিজ্ঞতার প্রতিই বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। অতএব, প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতার দিক থেকে টিচেনার (Titchener) প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা : (১) চাক্ষুষ প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি (The Visual Type)। সাধারণভাবে বলা যায়, চিত্রশিল্পীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেননা তাঁদের মধ্যে চাক্ষুষ প্রতিরূপ গঠনেরই প্রবণতা বিশেষ প্রবল। এ-জাতীয় ব্যক্তি গানের আসর থেকে ফিরে সুরের চেয়েও গায়কদের অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি বেশি করে মনে রাখবেন। (২) শ্রৌত প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি (The Auditory Type)। সাধারণভাবে বলা যায় গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-জাতীয় ব্যক্তি নাটক বা সিনেমা থেকে ফিরে নাটকের দৃশ্যের পরিবর্তে বিশেষ করে গানের সুর বা নায়ক-নায়িকার কণ্ঠস্বরই বেশি করে মনে রাখবেন। (৩) স্পর্শ ও পেশীয় প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি (The Tactual or Motor Type)। এ-জাতীয় ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলনায় কম হলেও সাধারণভাবে বলা যায় বেহালাবাদক ও তবলচীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৪) মিশ্র প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি—অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে একাধারে চাক্ষুষ, শ্রৌত এবং স্পর্শ-প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা দেখা যায়।

৬ ॥ স্মৃতির বিশ্লেষণ (Analysis of Memory)

স্মৃতি বলতে আমরা চলতি কথায় বুঝি 'মনে রাখা'—অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন-না-কোন ভাবে অতীত অভিজ্ঞতার 'সংরক্ষণ' (Retention)। যেমন, স্মৃতির প্রচলিত দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বলি : 'শৈশবে একটি কবিতা মুখস্থ করেছিলাম, এখনো সেটি মনে আছে'। কিন্তু বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো, এই 'সংরক্ষণ' স্মৃতির একটি উপাদান—এমনকি প্রধান উপাদান—হলেও একমাত্র উপাদান নয়। বস্তুত, 'সংরক্ষণ' ছাড়াও স্মৃতির আরো তিনটি উপাদান স্বীকার্য। অর্থাৎ, স্মৃতির উপাদান বলতে মোট চারটি। যথা : (১) অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা (Learning), (২) সংরক্ষণ (Retention), (৩) পুনরুৎপাদন (Reproduction বা Recall) এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)। একে একে এই চারটি উপাদানের পরিচয় দেখা যাক।

উপরের দৃষ্টান্তটিই বিচার করা যাক। ছোটবেলায় একটি কবিতা মুখস্থ করেছিলাম, এখনো সেটি 'মনে আছে'। স্বভাবতই, কবিতাটি যদি মুখস্থ না করতাম তাহলে সেটি 'মনে রাখবার'ও প্রশ্ন উঠতো না। অর্থাৎ, সংরক্ষিত হবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল অভিজ্ঞতাটি আয়ত্ত করা বা চয়ন করা বা শিক্ষা করা। যে-ব্যক্তি তাজমহল দেখেনি তার পক্ষে তাজমহলের কথা 'মনে রাখার' প্রশ্ন ওঠে না, যে-ব্যক্তি সাঁতার কাটতে শেখেনি বা সাইকেল চালাতে শেখেনি তার পক্ষে সাঁতার কাটার কৌশল বা সাইকেল চালাবার কৌশল মনে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব স্বীকার করতে হবে, স্মৃতির প্রথম উপাদান হল অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা। স্মৃতির এই উপাদানটির ব্যাখ্যায় উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) স্মৃতির সঙ্গে চিন্তার পার্থক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধরা যাক, দু'টি ব্যক্তিকে একই ধাঁধার সমাধান করতে বলা হল ; প্রথম ব্যক্তি ইতিপূর্বেই ধাঁধাটির সমাধান শিখেছে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ধাঁধাটি নতুন ; তাই তার পক্ষে চিন্তা করে ধাঁধাটির উত্তর বার করা প্রয়োজন। স্বভাবতই প্রথম ব্যক্তির কাছে ধাঁধাটির উত্তর তৈরিই আছে—অর্থাৎ, সে সরাসরিভাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ধাঁধাটির উত্তর পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অবশ্যই পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবে ; কেননা চিন্তা করে ধাঁধার উত্তর বার করবার জন্যও পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও তার পক্ষে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে কোন তৈরি উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, স্মৃতির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতাকে আমরা সরাসরিভাবে ব্যবহার করি, চিন্তার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি পরোক্ষভাবে বা উপায় হিসাবে। কিংবা, স্মৃতির ক্ষেত্রে

অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরুক্তি ঘটে, পক্ষান্তরে চিন্তার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল সংরক্ষণ (Retention), চলতি কথায় যাকে বলা হয় 'মনে রাখা'। শুধুমাত্র অতীতে অভিজ্ঞতা-চয়ন করলেই স্মৃতি হয় না; অতীত অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে সংরক্ষিত হওয়াও প্রয়োজন। বস্তুত, জন্ম থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বহু লক্ষ লক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং নিয়তই তা ঘটে চলেছে। তার মধ্যে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়, অধিকাংশই হয় না। যেগুলি সংরক্ষিত হয় সেগুলি সম্বন্ধেই স্মৃতি সম্ভব, যেগুলি সংরক্ষিত হয় না সেগুলিকে আমরা বিস্মৃত হই। যেমন, অতীতে তাজমহল দেখার সময় আমি আগ্রা শহরের পথঘাট এবং অনেক সাধারণ ঘরদোর দেখেছিলাম। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে তাজমহলের অভিজ্ঞতাই আমার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে, ফলে বিশেষ করে তাজমহল সম্বন্ধেই আমার স্মৃতি হয়। অবশ্য সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে বস্তুতপক্ষে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতাই সংরক্ষিত হয়; কেননা অনেক সময় দেখা যায় শৈশবের যে-সব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সে-জাতীয় অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের ফলে পুনরুত্থিত হচ্ছে, কিংবা, জ্বরের ঘোরে রোগী তার শৈশবের বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করে চলেছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-জাতীয় ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলা যায়, এগুলির নজির থেকেই যদি সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত করা হয় যে প্রত্যেকের মধ্যেই তার সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে সংরক্ষিত বা সঞ্চিত থাকে তাহলে সিদ্ধান্তটি অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট হবে।

স্মৃতির তৃতীয় উপাদান হল পুনরুৎপাদন (Reproduction বা Recall)। পুনরুৎপাদন বলতে বোঝায়, অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুত্থাপিত করা। অতীতে অভিজ্ঞতালাভ এবং সেই অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সত্ত্বেও বর্তমানে যদি তা পুনরুৎপাদিত বা পুনরুত্থাপিত করা সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই স্মৃতি হবে না। অর্থাৎ, চলতি কথায়, স্মৃতি বলতে শুধু 'মনে রাখা'ই নয়, 'মনে পড়া'ও। অনেক সময় দেখা যায়, অতীত অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তার পুনরুৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না, কিংবা, বিশেষ আয়াসসাধ্য হচ্ছে। যেমন, শৈশবের কোন বন্ধুর নাম 'কিছুতেই মনে পড়ছে না' বা 'অনেক কষ্টে মনে পড়ল'।

স্মৃতির চতুর্থ উপাদানকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা' (Recognition)—অর্থাৎ,

অতীতে যে-বস্তু বা যে-বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল বর্তমানে সেই বস্তু বা বিষয়কে চিনতে পারা। অনেক সময় দেখা যায়, পূর্ব পরিচিত কোন ব্যক্তিকে সহজেই চিনতে পারলাম ; কিন্তু কোথায় এবং কখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তা 'মনে পড়ল না'। অর্থাৎ, পুনরুৎপাদনের তুলনায় প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) অনেক সময় সহজে ঘটে। যেমন, পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তিদের মুখ অনেক সহজে চেনা যায়, কিন্তু তাদের নাম তত সহজে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত হয় না। কিংবা, একজনের নাম হয়ত চেষ্টা করেও কিছুতেই 'মনে পড়ছে না' ; কিন্তু অপর কেউ নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নামটি চিনতে পারি—অর্থাৎ, বুঝতে পারি এই নামটিই স্মরণের প্রয়াস করছিলাম। আবার অনেক সময় দেখা যায় পুনরুৎপাদন সত্ত্বেও প্রত্যভিজ্ঞার অভাব ঘটছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উড্ওয়ার্থ যেমন বলছেন, কবিতা লেখার সময় কোন কবির অভিজ্ঞতায় হয়ত পূর্ব-অধীত কোন কাব্যাংশ পুনরুত্থাপিত হল ; কিন্তু এই কাব্যাংশর প্রত্যভিজ্ঞার অভাববশত—অর্থাৎ, কাব্যাংশটিকে প্রকৃতপক্ষে অপরের রচনা হিসাবে চিনতে না পারার ফলে—আলোচ্য কবি হয়ত সেটি স্বীয় কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করলেন। অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে কবি 'অচেতন কুম্ভীলক' (Unconscious Plagiarism) বৃত্তির দোষদুষ্ট হলেন।

অতএব, সংক্ষেপে, প্রত্যভিজ্ঞা সত্ত্বেও পুনরুৎপাদন সম্ভব না হতে পারে, আবার, পুনরুৎপাদন সত্ত্বেও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব না হতে পারে। ফলে, পুনরুৎপাদন ও প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এবং এই কারণে পুনরুৎপাদন ও প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মৃতির দু'টি স্বতন্ত্র উপাদান—অর্থাৎ, তৃতীয় এবং চতুর্থ উপাদান—বলে স্বীকার করা প্রয়োজন।

অনেক সময় স্মৃতির অপর একটি উপাদান হিসাবে দেশ-কাল নির্দেশের (Localisation) উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রতিরূপ হিসাবে অতীত প্রত্যক্ষ পুনরুত্থাপিত হবার সময় কখন এবং কোথায় এই অতীত প্রত্যক্ষ ঘটেছিল সে-বিষয়েও চেতনা হয়। অতীত প্রত্যক্ষকে একটি নিদিষ্ট দেশে ও নির্দিষ্ট কালে আমরা স্থাপন করি। যেমন, বর্তমানে যখন তাজমহলের কথা মনে পড়ে তখন সেই সঙ্গেই এ-কথাও মনে পড়ে যে অমুক বছরের অমুক মাসে (অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট কালে) এবং আগ্রা শহরে যমুনার কিনারায় (অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট দেশে) আমি তাজমহল প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু বিচারে প্রতীত হয় যে এ-জাতীয় দেশ-কাল নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞারই অঙ্গ বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় : বর্তমান প্রতিরূপকে অতীত প্রত্যক্ষরই পুনরুত্থাপিত রূপ বলে চেনা মানেই এই অতীত প্রত্যক্ষ কখন এবং কোথায় ঘটেছিল সে-বিষয়েও সচেতন হওয়া। অতএব, আলোচ্য দেশ-কাল

নির্দেশকে স্মৃতির কোন স্বতন্ত্র উপাদান বলে গ্রহণ না করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্মৃতির উপাদান প্রধানত চারটিই। যথা : (১) অভিজ্ঞতা-চয়ন, (২) সংরক্ষণ, (৩) পুনরুৎপাদন, এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা।

৭ ॥ সংরক্ষণের সমস্যা (Problem of Retention)

স্মৃতির প্রধান উপাদান হল সংরক্ষণ। অতীত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কোন-না-কোন ভাবে আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে বা সংরক্ষিত হয়; তা না-হলে বর্তমানে তার পুনরুৎপাদন অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে তা সংরক্ষিত হয়? অর্থাৎ, সংরক্ষণকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করলেও তার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে। সেই ব্যাখ্যা বলতে ঠিক কী?

উত্তরে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সংরক্ষণের কোন পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি; অতএব এই প্রসঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর মতান্তর বর্তমান। মতবাদগুলিকে আমরা প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একজাতীয় মতবাদকে বলা যায় মূলত স্নায়ুতন্ত্রমূলক; অপর জাতীয় মতবাদকে বলা যায় 'তথাকথিত' বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানমূলক। 'তথাকথিত' শব্দটি কেন ব্যবহার করছি একটু পরেই তার কারণ দেখা যাবে।

মিল্ (Mill), কারপেণ্টার (Carpenter), জেম্স্ (James) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা শরীরবিজ্ঞানের—বিশেষত স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neurology)—দৃষ্টিকোণ থেকে সংরক্ষণের ব্যাখ্যা অন্বেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে—বিশেষত মস্তিষ্কে—এমন কোন স্থায়ী বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে অতীত অভিজ্ঞতাটির ইতিহাস অতীতেই পরিসমাপ্ত হয় না; মস্তিষ্কের পরিবর্তনটি স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বলেই তার উপর নির্ভরশীল অভিজ্ঞতার রেশও স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্যই আমাদের মস্তিষ্কের গঠন অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম; তাই প্রতিটি অভিজ্ঞতা—বা অন্তত উল্লেখযোগ্য, অতএব স্মরণযোগ্য সমস্ত অভিজ্ঞতা—মস্তিষ্কে ঠিক কোন্ ধরনের স্থায়ী বা অল্পবিস্তর দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সৃষ্টি করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা অত্যন্ত কঠিন; হয়ত ভবিষ্যতে শরীরবিজ্ঞানের উন্নতি অনেক বেশি হলে এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। বস্তুত মস্তিষ্কের এই স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনটির স্বরূপ এখনো নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলেই আলোচ্য মতবাদের সমর্থকেরা সে-বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব করেছেন। মিল্ ও কারপেণ্টার বলেছেন, প্রত্যক্ষর ফলে আমাদের মস্তিষ্কে কোন একরকম কম্পন (vibration) শুরু হয়;

প্রত্যক্ষর পরেও এই কম্পনের রেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে টিকে থাকে এবং অতীত প্রত্যক্ষজনিত কম্পন বর্তমানে শক্তিশালী হলে সেই অতীত প্রত্যক্ষর স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সংক্ষেপে, সংরক্ষণের কারণ হল মস্তিষ্কে অতীত প্রত্যক্ষ জাত একরকম কম্পনের রেশ। জেম্‌স্‌ অবশ্য এ-জাতীয় কোন কম্পনের প্রকল্প প্রস্তাব করেননি। তাঁর মতে অতীত প্রত্যক্ষ মস্তিষ্কে একরকম স্থায়ী পরিবর্তন (Permanent Modification of the Brain Structure) সৃষ্টি করে; এই পরিবর্তনের স্বরূপ হল মস্তিষ্কে একরকম নতুন স্নায়বিক সংযোগ স্থাপন। এবং মস্তিষ্কে এ-জাতীয় স্থায়ী পরিবর্তনই সংরক্ষণের প্রকৃত কারণ। অর্থাৎ, মিল্‌ এবং জেম্‌স্‌ উভয়ের মতেই সংরক্ষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা শরীরবিজ্ঞানের—বিশেষত স্নায়ুবিজ্ঞানের—মধ্যেই অন্বেষণ করা প্রয়োজন, যদিও স্নায়ুতন্ত্রে ঠিক কোন্‌ ধরনের পরিবর্তনের ফলে সংরক্ষণ সম্ভব হয় সে-বিষয়ে উভয়ের প্রকল্পে পার্থক্য আছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যান্য অনেকে সংরক্ষণের এ-জাতীয় শরীরবিজ্ঞান-মূলক ব্যাখ্যার বিশেষ বিরোধিতা করেছেন। মস্তিষ্কে কোনরকম কম্পনের রেশ বা স্থায়ী পরিবর্তনকে সংরক্ষণের কারণ বলে স্বীকার করার পরিবর্তে তাঁরা দাবি করেছেন যে সংরক্ষণ যেহেতু মানসিক ঘটনাই সেই হেতু শুধুমাত্র মানসিক তথ্যের সাহায্যেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। এবং সংরক্ষণের বিশুদ্ধ মানসিক ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁরা বলেন, আমাদের মনের একাংশকে নির্জ্ঞান (Unconscious) বলে স্বীকার করা প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপ হিসাবে মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে সঞ্চিত থাকে; পরে আমরা সেগুলিকে মনের নির্জ্ঞান প্রদেশ থেকে সজ্ঞান বা সচেতন প্রদেশে পুনরুৎপাদিত করতে পারি। সংরক্ষণের এই ব্যাখ্যাকে বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানমূলক আখ্যা দেওয়া হয়।

আমরা পরে নির্জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো এবং তখন দেখবো, বৈজ্ঞানিক-ভাবে ঠিক কোন্‌ অর্থে নির্জ্ঞান সংক্রান্ত প্রকল্পটি স্বীকারযোগ্য। আপাতত সংরক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের মন্তব্য এই যে স্নায়ুতন্ত্রমূলক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে সংরক্ষণকে কোনরকম বিশুদ্ধ মানসিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করা এবং তার কোন এক বিশুদ্ধ মানসিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের প্রয়াস সংস্কারমূলক—অতএব অবৈজ্ঞানিক—দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক হবে। কেননা, 'মন' বলে দেহাতিরিক্ত এবং স্বয়ং-স্বতন্ত্র কিছুর সত্তা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকারযোগ্য নয়; বস্তুত দেহাতিরিক্ত 'মন' ও 'মানসিক ঘটনার' পরিকল্পনা প্রাচীন সংস্কারেরই পরিচায়ক। অর্থাৎ, আমরা সাধারণত যে-ঘটনাবলীকে 'মানসিক' আখ্যা দিয়ে থাকি সেগুলির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার না-করলেও স্বীকার করা প্রয়োজন যে দৈহিক ঘটনাবলীই সেগুলির চরম

ভিত্তি। আমাদের সজ্ঞান বা সচেতন অভিজ্ঞতার মতই নির্জ্ঞানেরও দৈহিক ভিত্তি থাকতে বাধ্য। অতএব, সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় নির্জ্ঞানকে কোন একরকম মনের অজানা গুহা বা গোপন গুদামঘর জাতীয় কিছু মনে করে যদি বলা যায় যে সেখানেই অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপ হিসাবে জমা থাকে—তাহলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পথ পরিহার করে কল্পনা-বিলাসের পথেই অগ্রসর হবার আশঙ্কা থাকে। অতএব, উপরোক্ত দ্বিবিধ মতের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যাখ্যা হিসাবে শরীরবিজ্ঞানমূলক বা স্নায়ুবিজ্ঞানমূলক মতটিকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বলে স্বীকার করা উচিত। অবশ্যই স্নায়ুবিজ্ঞানের উন্নতির বর্তমান পর্যায়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলি স্নায়ুতন্ত্রে—বিশেষত মস্তিষ্কে—ঠিক কোন্ ধরনের চিহ্ন বা সাক্ষ্য রেখে যায় তা সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তবুও এ-জাতীয় কোনো সাক্ষ্য বা চিহ্নই সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসাবে স্বীকারযোগ্য। মস্তিষ্কের অতীত অভিজ্ঞতাজনিত পরিবর্তনকে উড্ওয়ার্থ 'স্মৃতি সাক্ষ্য' (Memory Trace) আখ্যা দিতে চান এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, এই সাক্ষরের স্বরূপ আমরা জানি না, কেননা আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করতে পারি না; কিন্তু একথা মেনে নেবার অধিকার আমাদের আছে যে শিক্ষামূলক প্রতিটি পদ্ধতি আমাদের মস্তিষ্কে কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন রেখে যায় এবং এই পরিবর্তন অন্তত কিছুকাল ধরে টিকে থাকে; তারই ফলে যা একবার শেখা হয়েছে তা স্মরণ করা সম্ভব হয়।

৮ ॥ পুনরুৎপাদনের সমস্যা (Problem of Reproduction or Recall) : অভিভাবন (Suggestion) ও অনুষঙ্গ (Association)

স্মৃতি প্রসঙ্গে আর একটি প্রধান সমস্যা হল পুনরুৎপাদনের (Reproduction) সমস্যা। কেননা স্মৃতি বলতে অতীত অভিজ্ঞতার শুধু সংরক্ষণই নয়, পুনরুৎপাদনও—চলতি কথায় আমরা যেমন বলি, শুধু 'মনে রাখা' নয়, 'মনে করা'ও বা 'মনে পড়া'ও। এই পুনরুৎপাদনের ব্যাখ্যা কী? কী কারণে কোন-এক অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমানে প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুত্থাপিত হয়?

এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হল: অভিভাবন (Suggestion)। অভিভাবন মানে কী? পুনরুৎপাদনের একটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। অতীতে আমি তাজমহল প্রত্যক্ষ করেছিলাম, বর্তমানে আমার তাজমহলের কথা মনে পড়লো। কেন মনে পড়লো? তার কারণ হয়ত এই যে বর্তমানে আমি আগ্রা শহরের নাম শুনেছি বা শাজাহানের নাম শুনেছি। অর্থাৎ, বর্তমানে আমার এমন একটি অন্য অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার প্রভাবে ঐ অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদিত হল। বর্তমান অভিজ্ঞতার

এ-জাতীয় প্রভাবকেই—অর্থাৎ, যার ফলে কোন অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদিত হয়—অভিভাবন বলে।

কিন্তু অভিভাবন প্রসঙ্গেও আবার নতুন সমস্যা ওঠে। অতীতে তো আমার বহু—লক্ষ লক্ষ—অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং বহু অতীত অভিজ্ঞতাই কোন-না-কোন প্রকারে আমার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আগ্রা শহরের নাম সংক্রান্ত আমার বর্তমান অভিজ্ঞতাটি অপর কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনরুৎপাদিত না-করে কেন শুধুমাত্র তাজমহল সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অতীত অভিজ্ঞতাটিই পুনরুৎপাদিত করলো? যেমন, আগ্রা শহরের নাম শুনলে আমার কলকাতার চিড়িয়াখানা মনে পড়ে না, বোম্বাই-এর সমুদ্র মনে পড়ে না; তার পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে তাজমহলের কথাই মনে পড়ে। অর্থাৎ, অভিভাবনের মূলেও কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রভাব অনুমেয়, যে-নিয়মের ফলে অভিভাবনও নির্বাচনমূলক হয়,—বর্তমানের একটি অভিজ্ঞতা অতীতের কোন সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকেই পুনরুৎপাদিত করে, এলোমেলোভাবে অতীতের যে-কোন অভিজ্ঞতাকে পুনরুৎপাদিত করে না। অতএব, পুনরুৎপাদনের কারণ অভিভাবন—এ-কথা স্বীকার করলেও প্রশ্ন থাকে: অভিভাবনের কারণ কী? বা কোন্ নিয়ম অনুসারে অভিভাবনের প্রভাব পরিচালিত হয়?

উত্তরে বলা হয়েছে, অভিভাবনের মূলে আছে অনুষঙ্গ (Association)—অর্থাৎ, অনুষঙ্গের নিয়ম অনুসারেই অভিভাবনের প্রভাব পরিচালিত হয়। একটি প্রত্যক্ষ এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে, বা দু'টি প্রতিরূপের (বা ধারণার) মধ্যে যে-যোগাযোগের ফলে একটির পক্ষে অপরটিকে অভিজ্ঞতায় পুনরুত্থাপিত করবার প্রবণতা থাকে সেই যোগাযোগকে অনুসঙ্গ বলা হয়। আগ্রা শহরের নাম শুনলে আমার অভিজ্ঞতায় তাজমহলের প্রতিরূপ পুনরুৎপাদিত হবার সম্ভাবনা; তার কারণ আগ্রা শহরের নাম এবং তাজমহলের মধ্যে আমার অভিজ্ঞতায় এরকম যোগাযোগ বা অনুষঙ্গ বর্তমান। কিন্তু এ-জাতীয় যোগাযোগ বা অনুষঙ্গ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? উত্তরে মনোবিজ্ঞানীরা তিনটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। এই নিয়ম তিনটিকে 'অনুষঙ্গের নিয়ম' (Laws of Association) আখ্যা দেওয়া হয়।

৯ ॥ অনুষঙ্গের নিয়ম (Laws of Association)

তিনটি পরিস্থিতির উপর অনুষঙ্গ নির্ভর করে। যথা: (১) নিকটতা (Contiguity), (২) সাদৃশ্য (Similarity), এবং (৩) বৈপরীত্য (Contrast)। অতএব, অনুষঙ্গেরও তিনটি নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। যথা: নিকটতার নিয়ম (Law of

Contiguity), (২) সাদৃশ্যের নিয়ম (Law of Similarity), এবং (৩) বৈপরীত্যের নিয়ম (Law of Contrast)। একে একে এই নিয়মগুলির পরিচয় দেখা যাক।

(১) নিকটতার নিয়ম: একাধিক প্রত্যক্ষ বা ধারণার বিষয়বস্তু যদি স্থান বা কালের দিক থেকে পরস্পরের নিকটবর্তী হয় তাহলে এগুলির মধ্যে যে-কোন একটি অপরটিকে অভিভাবিত করে, বা, অন্তত অভিভাবিত করার প্রবণতা দেখায়। যেমন ধরা যাক, আগ্রা শহর এবং তাজমহল। দেশ বা স্থানের দিক থেকে উভয়ই পরস্পরের নিকটবর্তী। ফলে আগ্রা শহরের নাম শুনলে তাজমহলের কথা 'মনে পড়ে', বা, তাজমহলের কথা শুনলেও আগ্রা শহরের কথা 'মনে পড়ে'। অবশ্য এ-জাতীয় দেশগত বা স্থানগত নিকটতা ছাড়াও একাধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে কালগত নিকটতার অনুষঙ্গও সম্ভব হতে পারে। যেমন, অতীতে একই সময়ে দু'টি বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটেছিল—অর্থাৎ, আমার অতীত অভিজ্ঞতায় উভয় বস্তু একই কালে বা সময়ে উপস্থাপিত হয়েছিল। ফলে—অর্থাৎ, এই সময়গত বা কালগত নিকটতার দরুণ—একটি বর্তমান প্রত্যক্ষ বা বর্তমান ধারণা অপরটির ধারণাকে আমার অভিজ্ঞতায় পুনরুৎপাদিত করার প্রবণতা দেখায়। হয়ত একই দিনে আমার জীবনে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। অর্থাৎ, সময়ের দিক থেকে আমার অভিজ্ঞতায় দু'টি ঘটনা পরস্পরের নিকটবর্তী। ফলে উভয়ের মধ্যে সময়গত বা কালগত নিকটতার অনুষঙ্গ বর্তমান। অতএব, একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত করার প্রবণতা থাকবে।

(২) সাদৃশ্যের নিয়ম: অভিজ্ঞতায় একাধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে তার একটির পক্ষে অপর যে-কোন একটিকে অভিভাবিত করার প্রবণতা সম্ভব। অর্থাৎ, সদৃশ অভিজ্ঞতা পরস্পরকে পুনরুত্থাপিত করে। এই সাদৃশ্যগত অনুষঙ্গের ফলেই দু'টি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে একটির অভিজ্ঞতাকালে অপরটির স্মরণ হয়, দু'টি নামের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে একটি নাম শুনলে অপর নাম অভিভাবিত হয়। যেমন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখলে কেউ তাজমহল স্মরণ করতে পারে; কেননা বস্তু দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিংবা, রমেশের নাম শুনলে আমি রমেনের নাম স্মরণ করতে পারি; কেননা নাম দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

(৩) বৈপরীত্যের নিয়ম: বিপরীত অভিজ্ঞতার পক্ষে পরস্পরকে অভিভাবিত করার প্রবণতা থাকে। যেমন চলতি কথায় বলা হয়, সুখের দিনে দুঃখের কথা মনে পড়ে, বা, দুঃখের দিনে সুখের কথা মনে পড়ে। কিংবা, অন্ধকারে আলোকের স্মরণ হয়, আলোকে অন্ধকারের স্মরণ হয়।

এই তিনটি নিয়মের মধ্যে বৈপরীত্যের নিয়ম গৌণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

কেননা, বিচার করলে বোঝা যায়, বৈপরীত্য বলতে আংশিক সাদৃশ্য এবং আংশিক নিকটতাই বোঝায়। আংশিক সাদৃশ্য কেন? কেননা, অভিজ্ঞতার দু'টি বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈপরীত্যের প্রশ্ন শুধুমাত্র তখনই ওঠে যখন দু'টি একই বর্গের (Genus) অন্তর্ভুক্ত: সুখের সঙ্গে দুঃখের বৈপরীত্য বর্তমান, কেননা উভয়ই হল অনুভূতি—অর্থাৎ, উভয়ই 'অনুভূতি' বর্গের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু সুখের সঙ্গে চেয়ার-টেবিল বা গরু-ঘোড়ার কোন বৈপরীত্য কল্পনাতীত, কেননা চেয়ার-টেবিল বা গরু-ঘোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আবার সুস্পষ্টভাবে চিন্তার জন্যে সাধারণত আমরা বিপরীত বিষয়বস্তুর কথা একই সঙ্গে ভেবে থাকি; যেমন, আলোর ধারণা ছাড়া অন্ধকারের ধারণা বোঝা যায় না, আবার অন্ধকারের ধারণা ছাড়া আলোর ধারণা বোঝা যায় না। এইভাবে বিপরীত বিষয়বস্তু একই সঙ্গে চিন্তায় উপস্থাপিত হয় বলে উভয়ের মধ্যে নিকটতার সম্পর্কও বর্তমান। তাই বলা হয়, বৈপরীত্যের অনুষঙ্গ আংশিকভাবে সাদৃশ্যমূলক, আংশিকভাবে নিকটতামূলক। ফলে বৈপরীত্যের নিয়মটিকে কোন মৌলিক নিয়ম হিসাবে গ্রহণ না-করে একটি গৌণ নিয়ম বলা হয়েছে।

আবার নিকটতার নিয়ম এবং সাদৃশ্যের নিয়মও অনেকাংশে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নিকটতা কেন সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল? ধরা যাক, অতীতে 'ক' এবং 'খ' দু'টি বিষয়বস্তুর একই সঙ্গে বা একই স্থানে অভিজ্ঞতা হয়েছিল; বর্তমানে 'ক'-এর অভিজ্ঞতা হলে 'খ' অভিভাবিত হয়। কেন হয়? কারণ, 'ক'-এর বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রথমত 'ক'-এরই অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে এবং 'ক'-এর এই অতীত অভিজ্ঞতা 'খ'-এর অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে। কিন্তু 'ক'-এর বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রথমে 'ক'-এরই অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে কেন? তার কারণ, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। এই দিক থেকে বলা যায়, নিকটতাও সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। আবার অপর দিক থেকে সাদৃশ্যকেও নিকটতার উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। কেননা, সাদৃশ্য বলতে বোঝায় আংশিক ঐক্য (Identity) এবং আংশিক অনৈক্য (Difference) এবং সাদৃশ্যমূলক অনুষঙ্গের ক্ষেত্রেও অনৈক্যের দিকটি নিকটতার ফলেই অভিভাবিত হয়। যেমন, রমেশের নাম শুনে যখন রমেন-কে স্মরণ করি তখন 'রমে' পর্যন্ত শব্দাংশ উভয়ের ঐক্যসূচক; তাছাড়াও 'রমেন' নামের 'ন' শব্দাংশটি এই কারণে অভিভাবিত হয় যে ইতিপূর্বে 'রমে' এবং 'ন' শব্দাংশ একই সঙ্গে ('রমেন' শব্দ হিসাবে) অভিজ্ঞাত হয়েছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত তিনটি নিয়মের মধ্যে বৈপরীত্যের নিয়মকে মৌলিক বলে বিবেচনা করার কারণ নেই এবং বাকি দু'টি নিয়মের মধ্যেও সম্পর্ক অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ। অতএব প্রশ্ন ওঠে, তিনটি নিয়মের পরিবর্তে কোন একটি নিয়মকেই কি অনুষঙ্গর মৌলিক নিয়ম বলা যায়? জেম্‌স্ (James) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী নিকটতার নিয়মকেই মৌলিক বিবেচনা করেছেন। কেননা তাঁদের মতে এমনকি সাদৃশ্যর নিয়মের ক্ষেত্রেও অনৈক্যর দিকটি অভিভাবিত হওয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা দেখলাম এই অনৈক্যর দিকটি নিকটতার ফলেই অভিভাবিত হয়। অপরপক্ষে, স্পেনসার (Spencer) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যর নিয়মকেই মৌলিক বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে নিকটতার অনুষঙ্গও মূলত সাদৃশ্যর উপরই নির্ভরশীল। বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রথমে অতীতের একটি সদৃশ অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে এবং তারই মাধ্যমে অতীতের সেই সদৃশ অভিজ্ঞতার নিকটবর্তী কোন অভিজ্ঞতা অভিভাবিত হয়।

কিন্তু হ্যামিল্‌টন্ (Hamilton), হফ্‌ডিঙ (Hoffding) প্রমুখ চিন্তাশীলরা উপরোক্ত দ্বিবিধ প্রচেষ্টারই বিরোধিতা করেছেন—অর্থাৎ, তাঁদের মতে সাদৃশ্যকে নিকটতা-নির্ভর বা নিকটতাকে সাদৃশ্য-নির্ভর বলে প্রমাণ করার উভয় প্রচেষ্টাই অর্থহীন। তার বদলে তাঁরা সাদৃশ্য.ও নিকটতা উভয়কেই একটি ব্যাপকতর নিয়মের অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে চান। এই ব্যাপকতর নিয়মের মূল কথা হল, অতীত অভিজ্ঞতাবলীর এক একটি সামগ্রিক বা শ্রেণীবদ্ধ রূপ আছে; বর্তমানে এ-জাতীয় কোন সামগ্রিকতার বা শ্রেণীর অংশমাত্র অভিজ্ঞাত হলে অতীতের সামগ্রিক বা শ্রেণীবদ্ধ অভিজ্ঞতাটি পূর্ণাঙ্গরূপেই অভিভাবিত হয়। কিংবা, অতীত অভিজ্ঞতার একাংশ সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেই পুনরুৎপাদিত করার প্রবণতা দেখায়। হ্যামিল্‌টন্ এই নিয়মের আখ্যা দিয়েছেন Law of Redintegration, হফ্‌ডিঙ আখ্যা দিয়েছেন Law of Totality।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানে অনুষঙ্গর নিয়মগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল; সাম্প্রতিক কালের মনো-বিজ্ঞানীরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্য এই প্রতিবাদের মূল কথা বাস্তব ঘটনা হিসাবে অনুষঙ্গকে অস্বীকার করা নয়; তার পরিবর্তে সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুষঙ্গর নিয়মগুলিকে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিহার। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা ছিল, আমাদের প্রতিটি অভিজ্ঞতা যেন পরমাণুর মত এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ; বিভিন্ন স্বাধীন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যেভাবে সংযুক্ত হয় অনেকটা সেইভাবেই অনুষঙ্গর নিয়ম অনুসারে আমাদের অভিজ্ঞতা-পরমাণুগুলিও বুঝি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অধিকাংশ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই দেখাতে চান যে

বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলেই অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় এবং সামগ্রিক ব্যক্তি হিসাবেই আমরা এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকি। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতামাত্রেই সামগ্রিকভাবে কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং এই সামগ্রিকতার পটভূমিতেই আমাদের অভিজ্ঞতাকে বিচার করা প্রয়োজন। অতএব, অনুষঙ্গর সাহায্যে বিভিন্ন খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ও স্বাধীন অভিজ্ঞতা-পরমাণু একত্রিত হয়—এ-জাতীয় কল্পনা পরিহার করা প্রয়োজন।

১০ ॥ প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় (Marks of Good Memory)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি(স্মৃতির উপাদান বলতে প্রধানত চারটি : অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা, সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন এবং প্রত্যভিজ্ঞা।) এই উপাদানগুলির কথা মনে রাখলে আমরা সহজেই প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক গুণগুলি নির্ণয় করতে পারব। স্মৃতির প্রথম উপাদান অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা ; অতএব যে-ব্যক্তি যত অনায়াসে এবং অল্প সময়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা লাভ করতে পারে তার স্মৃতিশক্তিকে ততই প্রখর বলা হবে। একটি কবিতা মুখস্থ করার জন্য কারুর পক্ষে হয়ত দশবার কবিতাটি পাঠ করা প্রয়োজন ; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি হয়ত একবার পড়েই কবিতাটি মুখস্থ করতে পারে। স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্মৃতিশক্তিকে অনেক প্রখর বলা হবে। স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল সংরক্ষণ। স্বভাবতই কোন ব্যক্তি যত দীর্ঘকাল ধরে অতীত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করতে পারবে তার স্মৃতিশক্তিকেও ততই প্রখর বলা হবে। যেমন, একমাস আগে যে-কবিতা মুখস্থ করেছি আমি যদি তা ভুলে যাই কিন্তু আমার কোন বন্ধু যদি তা ভুলে না-যায় তাহলে বলতে হবে আমার তুলনায় বন্ধুটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী, অতএব তার স্মৃতিশক্তিও প্রখরতর। স্মৃতির তৃতীয় উপাদান হল পুনরুৎপাদন। অতএব যে-ব্যক্তি যত অনায়াসে ও অল্প সময়ে অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদিত করতে পারবে তার স্মৃতিশক্তিও ততই প্রখর বলে বিবেচিত হবে। যেমন, পরীক্ষার সময় একটি ছাত্র অনেক কষ্ট করে এবং অনেক সময় নিয়ে প্রশ্নর উত্তর খুঁজে পেল—অর্থাৎ, অতীতে যে-অভিজ্ঞতা চয়ন করেছিল বা যে-শিক্ষা লাভ করেছিল অনেক কষ্টে তা পুনরুৎপাদিত করতে পারল ; তুলনায় অপর একটি ছাত্র অত্যন্ত অনায়াসে ও অল্প সময়ে প্রশ্নর উত্তর নির্ণয় করতে পারল। স্বভাবতই বলা হবে, প্রথম ছাত্রটির তুলনায় দ্বিতীয়টির স্মৃতিশক্তি প্রখরতর, কেননা পুনরুৎপাদনের শক্তি দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রবলতর। প্রখর স্মৃতিশক্তির চতুর্থ পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করা হয় 'ব্যবহার-উপযোগিতা' (Serviceableness)। অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতাকে যে-ব্যক্তি যত সহজে এবং যত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে

ব্যবহার করতে পারবে তার স্মৃতিশক্তি ততই প্রখর বলে বিবেচিত হবে। যেমন ধরা যাক, ইতিহাস পড়ার সময় আমি বহু তথ্য শিখেছিলাম; আমার স্মৃতিশক্তি যদি প্রখর হয় তাহলে ইতিহাসের নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গে এই অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারব—যেমন হয়ত ইংরেজী-সাহিত্যের পরীক্ষায় রচনা প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলিই ব্যবহার করতে পারব। কিন্তু যার স্মৃতিশক্তি তুলনায় কম প্রখর সে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট প্রসঙ্গেই ব্যবহার করতে পারবে।

১১॥ স্মৃতিশক্তি কি চেষ্টা করে বাড়ানো সম্ভব? (Can memory be improved by practice?)

জেম্স্-এর (James) মতে অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের সাধারণ ক্ষমতা কোন ব্যক্তির পক্ষেই চেষ্টা করে বাড়ানো সম্ভব নয়। কেননা, স্মৃতিশক্তির মূল কারণ হল দৈহিক—অর্থাৎ, প্রতি ব্যক্তিরই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর (মূলত মস্তিষ্কর বৈশিষ্ট্যের উপর) সাধারণভাবে তার স্মৃতিশক্তি নির্ভরশীল; অতএব চেষ্টা করে এই সাধারণ ক্ষমতাকে বর্ধিত করবার সুযোগ নেই। কিন্তু স্টাউট (Stout) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে কিছুটা মতভেদ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে সাধারণভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়াবার সুযোগ না থাকলেও চেষ্টা করে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতি-সাধন সম্ভবপর হতে পারে। যেমন, চর্চার সাহায্যে ইতিহাসের ছাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সন-তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমশই উন্নততর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, এভাবে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির বিকাশকে সাধারণভাবে স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলা ঠিক নয়। বস্তুত, সাধারণভাবে স্মৃতিশক্তি সমান থাকলেও চর্চার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর সাধারণ স্মৃতিশক্তিকে যেন কেন্দ্রীভূত করতে পারেন; এবং এভাবে কেন্দ্রীভূত করতে পারার প্রকৃত কারণ হল সে-বিষয়ে তাঁর মনোযোগ (Attention) বৃদ্ধি। যেমন, চর্চা করে আমি ঐতিহাসিক বিষয়ে মনোযোগ বাড়াতে পারি এবং তারই ফলে আমার মস্তিষ্কর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল সাধারণ স্মৃতিশক্তি ক্রমশই ইতিহাস প্রসঙ্গে যেন কেন্দ্রীভূত হবে; অতএব, পরিলক্ষিত হবে ইতিহাস প্রসঙ্গে আমার স্মৃতিশক্তির উন্নতি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গণিত বা সঙ্গীত বা অন্যান্য বিষয়েও আমার স্মৃতিশক্তির উন্নতি পরিলক্ষিত হবে—অর্থাৎ, সাধারণভাবে আমার স্মৃতিশক্তি উন্নত হবে। অবশ্য এভাবে চর্চা ও অধ্যবসায়ের ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় প্রসঙ্গে স্মৃতিশক্তির উন্নতিকে প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলা

সঙ্গত কিনা সে-বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। জেম্‌স্‌ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন, এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে অধ্যবসায়ের ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতিটিরই উন্নতিসাধন ঘটে ; কিন্তু সে-উন্নতিকে প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলা যায় না। অর্থাৎ, নেহাতই আপাতদৃষ্টিতে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে স্মৃতিশক্তির উন্নতি সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত বলে ভ্রম হতে পারে। অপরপক্ষে স্টাউট ও তাঁর সমর্থকরা দাবি করবেন, আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলিতে স্মৃতি-উন্নতির প্রধানতম লক্ষণ বর্তমান বলেই এগুলিও প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি-উন্নতিরই দৃষ্টান্ত, যদিও অবশ্য স্বীকার করা প্রয়োজন যে স্মৃতিশক্তির এ-জাতীয় উন্নতি আসলে পরোক্ষই—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উন্নত হয় মনোযোগ এবং মনোযোগ-উন্নতির উপর নির্ভর করেই এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে স্মৃতি-উন্নতির লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এ-তর্ক অবশ্য অনেকাংশে শব্দ-ব্যবহারমূলক বলে প্রতীত হতে পারে। অর্থাৎ, আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলিতে প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশক্তির উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিনা তা অনেকাংশেই নির্ভর করছে স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলতে ঠিক কী বোঝা উচিত এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর। তবুও ব্যবহারিক গুরুত্বর দিক থেকে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠে : সাধারণভাবে স্মৃতিশক্তি শারীরিক—বিশেষত স্নায়বিক—উপাদানের উপর নির্ভরশীল হলেও এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতিকে তত্ত্বগতভাবে প্রকৃত স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলে স্বীকার করা সমীচীন কিনা এ-প্রশ্ন বিতর্কসাপেক্ষ হলেও আমাদের ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কী ভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আমরা চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের সাহায্যে স্মৃতি-শক্তি বাড়াতে পারি ? যথা, ইতিহাসের ছাত্র কী ভাবে ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে চর্চামূলকভাবে স্মৃতিশক্তির উন্নতিসাধন করতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত মনে রাখা দরকার যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতিসাধনের প্রধানতম সর্ত হল সেই বিষয়টি সম্বন্ধে মনোযোগ (Attention) বৃদ্ধি। আমরা পরে দেখব, মনোযোগের প্রধানতম সর্ত হল অনুরাগ (Interest) : যে-বিষয়ে আমার অনুরাগ নেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমার পক্ষে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, কোন একটি বিষয়ের প্রতি অনুরাগের উপরই নির্ভর করছে সে-বিষয়ে স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি : সঙ্গীতে যাঁর অনুরাগ তাঁর পক্ষে স্বভাবতই সঙ্গীতে মনোযোগ—অতএব, সঙ্গীত বিষয়ে স্মৃতি-বৃদ্ধিও—সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতি যদি শেষ পর্যন্ত সে-বিষয়ে অনুরাগের উপরই নির্ভরশীল হয় তাহলে এই অনুরাগের উন্নতি কী ভাবে হতে পারে ? প্রায়ই দেখা যায়, শৈশবের শিক্ষাদীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি

স্বভাবতই অনুরক্ত হন। কিন্তু পরিণত বয়সেও কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি অনুরাগের চর্চা অসম্ভব নয় : কোন বিষয়ের নানামুখী তাৎপর্য আমরা যত স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শিখি বিষয়টির প্রতি আমাদের অনুরাগও ততই বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, যে-বিষয়ের তাৎপর্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয় সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় না। অতএব অনুরাগের উন্নতি নির্ভর করে কোন বিষয়ের নানামুখী তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের উপর এবং এইভাবে অনুরাগবৃদ্ধির ফলে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ—অতএব বিষয়টি সংক্রান্ত আমাদের স্মৃতিশক্তিও—উন্নততর হতে পারে।

১২ ॥ স্মৃতির পরীক্ষা (Experiments in Memory)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে স্মৃতির নানা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। এ-জাতীয় পরীক্ষার জন্য অবশ্য পরীক্ষণ-পাত্র হিসাবে মানুষ ছাড়াও মানবেতর প্রাণীও গৃহীত হয়েছে ; এখানে বিশেষত মানুষের স্মৃতি সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাক।

স্মৃতির পরীক্ষায় সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্র কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করে বা স্মৃতিতে গ্রহণ করে—আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষাই স্মৃতির প্রথম সর্ত। তারপর কিছুটা সময়ের ব্যবধান দেওয়া হয় : সময়ের এই ব্যবধান প্রয়োজনমত কমবেশী করা হয়, এবং বিশেষ করে ব্যবস্থা করা হয় যাতে এই ব্যবধানকালে পরীক্ষণ-পাত্র আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কিত না-থাকে। তারপর অধীত অভিজ্ঞতাকে পুনরুৎপাদিত করতে বলে পরীক্ষণ-পাত্রর স্মৃতিশক্তি বিচার করা হয়। অতএব, স্মৃতির পরীক্ষাকে মোটের উপর নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায় :—

শিক্ষণ……সময়ের ব্যবধান (সংরক্ষণ)…… পুনরুৎপাদন।

এ-জাতীয় পরীক্ষা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, পরীক্ষণ-পাত্র যে-বিষয় আয়ত্ত করবে তা যথাসম্ভব অপরিচিত বা নূতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, স্মৃতির প্রথম সর্ত হল অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা, কিন্তু পূর্ব-পরিচিত বা পূর্ব-অধীত বিষয় কোন-না কোন ভাবে সংরক্ষিত থাকে, অতএব সে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বিশুদ্ধ হয় না। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা-চয়ন বলতে এমন বিষয়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষাগ্রহণ বোঝা দরকার যে-বিষয়ে ইতিপূর্বে আর কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। এইজন্য বিষয়বস্তুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়াই উচিত। কিন্তু বাস্তবভাবে, কোন মানুষের কাছেই সম্পূর্ণ অপরিচিত বা সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া কঠিন। অতএব, স্মৃতির পরীক্ষায়

যথাসম্ভব নূতন বা যথাসম্ভব অপরিচিত বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রয়াস করা হয়। এই উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময় বিষয়বস্তু হিসাবে অর্থহীন বর্ণসমষ্টি, অর্থহীন চিত্র, অর্থহীন পদসমষ্টি, এলোমেলো সংখ্যা প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

(ক) স্মৃতির প্রসার (Memory Span) সংক্রান্ত পরীক্ষা : একজাতীয় পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষণ-পাত্রর স্মৃতির প্রসার নির্ণয় করার প্রয়াস করা হয়। অর্থাৎ, দেখা হয় কোন বিষয়বস্তুকে মাত্র একবার বা মাত্র ক্ষণিকের জন্য প্রত্যক্ষর পর পরীক্ষণ-পাত্র তার কতখানি স্মরণ করতে পারে। যেমন, পরীক্ষণ-পাত্রকে কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি বা কতকগুলি সংখ্যা মাত্র একবার দেখানো হল, তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হল এগুলি পুনরাবৃত্তি করতে। পরীক্ষণ-পাত্র যদি এগুলি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে ক্রমশই শব্দতালিকা বা সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া হবে, এবং দেখা হবে পরীক্ষণ-পাত্রর পক্ষে কত বড় শব্দতালিকা বা কত বড় সংখ্যা এভাবে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব ; অপরপক্ষে, পরীক্ষণ-পাত্র যদি প্রথমে প্রদত্ত শব্দতালিকা বা সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করতে অসমর্থ হয় তাহলে এই তালিকা বা সংখ্যাকে ক্রমশ কমিয়ে যাওয়া হবে। এইভাবে পরীক্ষণ-পাত্রর স্মৃতির প্রসার নির্ণয় করা হয়। যথা :

ক্রমবর্ধমান তালিকা—

৫৩৯

৯৭৬৪

৪১৭৩৯

৯২৭৪৫৬

৮১৩৬৫০৯

এই জাতীয় এলোমেলো সংখ্যাতালিকা ব্যবহার করে স্মৃতির প্রসার নির্ণয় করার প্রচেষ্টায় দেখা গিয়েছে যে চার থেকে ছ' বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুরা সাধারণত চারটি পর্যন্ত সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করতে পারে ; অতএব সংখ্যা প্রসঙ্গে তাদের স্মৃতির প্রসারকে চার বলা হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির প্রসার বাড়ে এবং এইভাবে স্মৃতি-প্রসার বাড়তে বাড়তে সাধারণত আঠারো বছর বয়সে তা সাত বা আট পর্যন্ত হয়। সাধারণত পরিণত বয়সের ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রসঙ্গে স্মৃতি-প্রসার সাত বা আট। অবশ্যই এই সাধারণ হিসাবের বহু ব্যতিক্রম দেখা যায় ; ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি প্রসার কম বা বেশি হতে পারে।

(খ) এবিংহাউসের পরীক্ষা : স্মৃতির বিষয়বস্তু হিসাবে কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি (যথা : wok pam zut bip...) গ্রহণ করে এবিংহাউস দেখান, এই শব্দ-

সমষ্টিতে শব্দের সংখ্যা যত বেড়ে যায় শব্দসমষ্টিকে স্মৃতিগত করার জন্য আবৃত্তি-সংখ্যার প্রয়োজন এবং তাকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তত বেড়ে যায়। যথা :—

৭টি শব্দের সমষ্টিকে	স্মৃতিগত	করার	জন্য	১ বার	আবৃত্তি ও	৩	সেকেণ্ড	সময়	লাগে
৩৬টি "	"	"	"	"	৫৫ "	"	"	৭৯২ "	"	"

এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শব্দতালিকা যত দীর্ঘ হয় ততই স্মৃতিগত করার ব্যাপারে বিভিন্ন শব্দের অভ্যন্তরে একজাতীয় বাধা (Intersyllabic Inhibition) সৃষ্টি হয় ; ফলে এই বাধা অতিক্রম করে শব্দতালিকাকে স্মৃতিগত করার জন্য সময়ের এবং আবৃত্তির প্রয়োজনও ক্রমশ বেড়ে যায়।

পরীক্ষামূলকভাবে এবিংহাউস একই বিষয় প্রথম শিক্ষণ এবং (তা বিস্মরণের পর) পুনঃশিক্ষণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তিনি দেখান, সময়ের এই ব্যবধান যত বেড়ে যায় ততই পূর্বশিক্ষিত বিষয়ের সংরক্ষণও কমে যায় এবং বিস্মৃতির হার তত বেড়ে যায়—কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর বিস্মৃতির হার অপেক্ষাকৃত কমে আসে। যথা :

উক্ত সময়ের ব্যবধান	সংরক্ষণের ভাগ (শতকরা)	বিস্মৃতির ভাগ (শতকরা)
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ "	৩৬	৬৪
২৪ "	৩৪	৬৬
৪৮ "	২৮	৭২
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ "	২১	৭৯

(গ) রেখাঙ্কন-বিষয়ক পরীক্ষা : স্মৃতির আর একরকম পরীক্ষায় রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ, পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি রেখাচিত্র দেখাবার পর তাকে বলা হয় চিত্রটি আবার আঁকতে। সাধারণত দেখা যায়, এ-জাতীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্র পূর্বদৃষ্ট রেখাচিত্রটিকে হুবহু পুনরুত্থাপিত না করে তাতে নানারকম পরিবর্তন সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনগুলিকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (১) বর্জন ও সমীকরণ মূলক পরিবর্তন (Rejecting and Levelling), (২) সুস্পষ্টকরণমূলক পরিবর্তন (Sharpening), এবং (৩) শ্রেণীভুক্তকরণমূলক পরিবর্তন (Assimilation)।

এ-জাতীয় পরিবর্তনসাধনের নানাপ্রকার জটিল কারণ অনুমিত হয়েছে ; যথা : অভিভাবন, ব্যক্তিগত ভাব-আবেগ, ইত্যাদি।

১৩ ॥ বিস্মৃতি (Forgetfulness)

সাধারণভাবে বলা যায়, স্মৃতির সর্তগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়া বা সেগুলির অভাবই বিস্মৃতির কারণ। যেমন, কোন অভিজ্ঞতা যথেষ্ট গভীরভাবে আমাদের মধ্যে রেখাপাত না করলে সেটির পক্ষে স্মৃতি-সংরক্ষণের সম্ভাবনা কমে যায়—অর্থাৎ, আমরা সেটি সহজেই বিস্মৃত হতে পারি। তেমনি, পুনরাবৃত্তির অভাবেও বা অব্যবহারের ফলেও অভিজ্ঞতা-বিশেষ বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, বর্তমান অভিজ্ঞতার অভিভাবন-শক্তির অভাব বা দু'টি অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুষঙ্গের অভাবও বিস্মৃতির একটি কারণ।

কিন্তু সাধারণভাবে স্মৃতির সর্তের অভাবকে বিস্মৃতির কারণ বলে স্বীকার করলেও পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, বিস্মৃতির আর একটি বিশেষ কারণ হল বাধ (Inhibition)। এই বাধ দু'রকমের হতে পারে : ১। অতীতমুখী (Retroactive), এবং ২। সম্মুখমুখী (Proactive)।

কোন অভিজ্ঞতালাভের অব্যবহিত পরে অপর কোন অভিজ্ঞতা ঘটলে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি-পথে একজাতীয় বাধা সৃষ্টি করে। একে বলা হয় অতীতমুখী বাধ। যথা : দুই দল মোটের উপর সমকক্ষ পরীক্ষণ-পাত্রর মধ্যে প্রথম দলকে একটি তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেওয়া হল এবং তার অব্যবহিত পরে আরো একটি তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেওয়া হল। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় দল পরীক্ষণ-পাত্রকে উপরোক্ত প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেবার পর বিশ্রাম দেওয়া হল। তারপর উভয় দলের পরীক্ষণ-পাত্রকেই প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করতে বলা হল। দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের পরীক্ষণ-পাত্র মোটের উপর যথাযথভাবে উক্ত তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করতে সমর্থ ; কিন্তু প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্র সে-তালিকার বিষয়বস্তু তুলনায় অনেকাংশেই বিস্মৃত হয়েছে। অতএব বোঝা গেল, ১নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার অব্যবহিত পরে ২নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার ফলে প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্রর মধ্যে একজাতীয় অতীতমুখী বাধ সৃষ্ট হয়েছে—অর্থাৎ, তাদের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি-পথে একরকম বাধা সৃষ্টি করেছে।

পক্ষান্তরে, একটি অভিজ্ঞতালাভের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতালাভ করলে প্রথম অভিজ্ঞতাটি দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার স্মৃতি-পথেও বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধাকে সম্মুখমুখী বলা হয়। যেমন, দুই দল মোটের উপর সমকক্ষ পরীক্ষণ-পাত্রর

মধ্যে প্রথম দলকে ১নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেবার অব্যবহিত পরে ২নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেওয়া হল। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় দলের পরীক্ষণ-পাত্রদের বিশ্রামদানের পর শুধু ২নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেওয়া হল। তারপর উভয় দলকেই ২নং তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করতে বলা হল। দেখা গেল, এই দ্বিতীয় দলের পরীক্ষণ-পাত্ররা তুলনায় অনেক বেশি যথাযথভাবে ২নং তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করতে সমর্থ। কিংবা, যা একই কথা, প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্ররা ২নং তালিকার বিষয়বস্তু তুলনায় বিস্মৃত হয়েছে ; এর কারণ, ১নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্তজনিত একরকম সম্মুখমুখী বাধ।

আরো একজাতীয় পরীক্ষার ফলে অনুমান হয়, কোন কার্যের সমাপ্তিজনিত স্বস্তিও বিস্মৃতির একটি কারণ হতে পারে, কেননা অসমাপ্তিজনিত অস্বস্তিকে স্মৃতির সহায়ক হতে দেখা যায়। যথা: পরীক্ষণ-পাত্রকে ২০ রকম কাজ করতে দেওয়া হল ; তার মধ্যে কয়েক রকম কাজ তাকে সমাপ্ত করতে দেওয়া হল, কিন্তু অন্যান্য কয়েক রকম কাজের পরিসমাপ্তি বাধা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। দেখা যায়, পরিসমাপ্ত কাজগুলির তুলনায় পরীক্ষণ-পাত্র অসমাপ্ত কাজগুলিকে অনেক ভাল করে মনে রাখতে পারে।

১৪ ॥ স্মৃতি-রোগ (Diseases of Memory)

স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ অবশ্যই নানা অতীত অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হয়। কিন্তু তাছাড়াও অনেক সময় অস্বাভাবিক—বা রোগলক্ষণ হিসাবে—বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। যথা :

ক ॥ অস্মার (Amnesia)

কোন বিষয় সম্বন্ধে অকস্মাৎ সামগ্রিক বা আংশিক স্মৃতিবিলোপকে অস্মার বলে। সাধারণত আঘাতজনিত কারণে এ-জাতীয় অস্বাভাবিক স্মৃতিবিলোপ দেখা যায়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে মাথায় আকস্মিক আঘাত লাভের ফলে সম্পূর্ণ স্মৃতিবিলোপ ঘটতে দেখা গিয়েছে। আবার, মস্তিষ্কের শুধুমাত্র চাক্ষুষ-সংবেদনের উচ্চতর কেন্দ্র বা শুধুমাত্র শ্রৌত-সংবেদনের উচ্চতর কেন্দ্র আহত হবার ফলে চাক্ষুষ বা শ্রৌত সংবেদন সংক্রান্ত আকস্মিক বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে।

খ ॥ বাগ্‌বিস্মৃতি (Aphasia)

কথা বা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্রান্ত নানারকম অস্বাভাবিক বিস্মৃতির বা স্মৃতিরোগের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। একে বাগ্‌বিস্মৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

বাগ্‌বিস্মৃতির ফলে ব্যক্তিবিশেষ কোন শব্দ উচ্চারণ করতে বা লিখতে অসমর্থ হতে পারে ; আর একজাতীয় দৃষ্টান্তে ব্যক্তিটি কোন শব্দ শুনতে বা পাঠ করতে অসমর্থ হতে পারে। উপরোক্ত দ্বিবিধ বাগ্‌বিস্মৃতির মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় কারক-সংক্রান্ত (Motor) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় গ্রাহক-সংক্রান্ত (Sensory)। অর্থাৎ, কারক-সংক্রান্ত বাগ্‌বিস্মৃতির রোগীরা অপরের কথা শুনতে বা পড়তে পারে ; কিন্তু তারা নিজেরা সে-কথা বলতে বা লিখতে পারে না। গ্রাহক-সংক্রান্ত বাগ্‌বিস্মৃতির রোগীরা অপরের কথা শুনতে, পড়তে বা বুঝতে পারে না।

১৫ ॥ অতি-স্মরণ (Hypermnesia)

কথিত আছে, জলে ডুবে মরার সময় মানুষের কাছে তার সমগ্র অতীত অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় ঘটনা সত্য হলে তাকে অতি-স্মরণের দৃষ্টান্ত বলা হবে। সংক্ষেপে, অতি-স্মরণ হল অকস্মাৎ বিস্মৃতি-অপসারণ। অতি-স্মরণের একজাতীয় চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সে-দৃষ্টান্তগুলিকে 'বহু-ব্যক্তিত্বে'র (Multiple Personality) দৃষ্টান্ত বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আঘাত বা অপর কোন কারণে একটি ব্যক্তির অকস্মাৎ স্মৃতি-বিলোপ ঘটলো ; এই স্মৃতিবিলোপ এমনই সামগ্রিক যে ব্যক্তিটি নিজস্ব পরিচিতিই ভুলে গেল। অতএব, স্বতন্ত্র কোন এক ব্যক্তি হিসাবে সে নূতন জীবন শুরু করলো। কিছুদিন এভাবে কাটার পর আবার দেখা গেল অত্যন্ত অকস্মাৎভাবেই তার বিস্মৃতি অপসৃত হয়েছে—অর্থাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎভাবেই নিজ-জীবনের পূর্বকথা এবং তার নিজস্ব পূর্বপরিচিতি স্মৃতিতে পুনরাবর্তন করেছে।

১৬ ॥ ভ্রম-প্রত্যক্ষ (Illusion) এবং অমূল-প্রত্যক্ষ (Hallucination)

আমাদের ভ্রম-প্রত্যক্ষ (Illusion) এবং অমূল-প্রত্যক্ষের (Hallucination) মূলেও কল্পনা ও স্মৃতির বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব, এই প্রসঙ্গে উভয়ের আলোচনা করা যায়।

ভারতীয় দর্শনে ভ্রম-প্রত্যক্ষের সবচেয়ে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হল রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতভ্রম—দড়িতে সাপ দেখা, বা, ঝিনুকে রূপা দেখা। মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনও ভ্রম-প্রত্যক্ষের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সংক্ষেপে, এক বস্তুতে অপর কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটলে তাকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ বলা হয়। শুদ্ধ-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রম-প্রত্যক্ষের পার্থক্য অবশ্যই অনেকাংশে দর্শনের (Philosophy) আলোচ্য বিষয় : প্রত্যক্ষগত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব বহির্বস্তুর মিল থাকলে প্রত্যক্ষকে

শুদ্ধ বলা হবে, না-থাকলে তাকে ভ্রম বলা হবে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রম-প্রত্যক্ষও একরকম প্রত্যক্ষই; কেননা, প্রত্যক্ষর সমস্ত সর্ত-ই ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তেও বর্তমান। যেমন, ভ্রম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্তেও প্রত্যক্ষযোগ্য কোন বহির্বস্তু বিদ্যমান এবং সেই বস্তু থেকে আমরা উদ্দীপক (Stimulus) গ্রহণও করে থাকি। অবশ্যই, উদ্দীপক-গ্রহণই প্রত্যক্ষ নয়; প্রত্যক্ষের জন্য উদ্দীপক-গ্রহণজনিত সংবেদনের একজাতীয় ব্যাখ্যাও প্রয়োজন। ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তেও এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বর্তমান; কিন্তু কল্পনাদির প্রভাবে সে-ব্যাখ্যা এমনই যে বাস্তব বহির্বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত বিষয়ের সংগতি থাকে না। অবশ্যই, শুদ্ধ-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তেও উদ্দীপক-গ্রহণজনিত সংবেদনের ব্যাখ্যায় কল্পনার অবদান থাকে; কিন্তু উক্ত কল্পনা সম্মুখস্থ বস্তুটিকে সেই বস্তু হিসাবেই প্রত্যক্ষ করতে সহায়ক হয়। অতএব, শুদ্ধ-প্রত্যক্ষকেই প্রত্যক্ষের মান হিসাবে গ্রহণ করলে বলা চলে, শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ এবং ভ্রম-প্রত্যক্ষর মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথম ক্ষেত্রে কল্পনার অবদান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তুলনায় অস্বাভাবিক। কিন্তু কল্পনা-অবদানকে এভাবে 'তুলনায় অস্বাভাবিক' বলে উল্লেখ করলেও মনে রাখা দরকার যে এই অস্বাভাবিকতা ভ্রম-প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিবিশেষের অস্বাভাবিকতার সূচক নয়। যেমন, একই অবস্থায় সমস্ত স্বাভাবিক ব্যক্তিই মরুভূমিতে মরীচিকা-দর্শন করবে। কিংবা, জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই দেখবো, অভিজ্ঞতা হিসাবে ভ্রম-প্রত্যক্ষগুলি সার্বিক—অর্থাৎ, একই কারণে সকল ব্যক্তির একই ভ্রম-প্রত্যক্ষ ঘটে।

ভ্রম-প্রত্যক্ষকে 'বস্তুতে অবস্তুর প্রত্যক্ষ' বলা হলে অমূল-প্রত্যক্ষকে বলা হবে 'নির্বস্তুতে বস্তু-প্রত্যক্ষ'। শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ, ভ্রম-প্রত্যক্ষ এবং অলীক-প্রত্যক্ষর তিনটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ: সম্মুখস্থ রজ্জুতে রজ্জুদর্শন। ভ্রম-প্রত্যক্ষ: সম্মুখস্থ রজ্জুতে সর্পদর্শন। অমূল-প্রত্যক্ষ: অসুস্থতার ফলে বা নেশার ঘোরে শূন্যে হস্তিদর্শন। অর্থাৎ, ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে শুদ্ধ-প্রত্যক্ষের মতোই বহির্জগতে একটি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তু বর্তমান থাকে এবং তা থেকে উদ্দীপকও বাস্তবিকই পাওয়া যায়। কিন্তু অলীক-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষযোগ্য কোন বহির্বস্তুই বিদ্যমান নয়; অতএব বহির্জগৎ থেকে কোন বাস্তব উদ্দীপক গ্রহণেরও প্রশ্ন ওঠে না। তাই ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ হিসাবে যদি কল্পনার 'তুলনায় অস্বাভাবিক' প্রভাবকে উল্লেখ করা হয় তাহলে অলীক-প্রত্যক্ষকে অস্বাভাবিক কল্পনারই পরিণাম বা উদ্ভাবন বলতে হবে। তাছাড়া, ইতিপূর্বে দেখেছি, ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে কল্পনার প্রভাব 'তুলনায় অস্বাভাবিক' হলেও একই পরিস্থিতিতে সমস্ত স্বাভাবিক

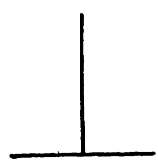
ব্যক্তিরই সমজাতীয় ভ্রম প্রত্যক্ষ ঘটে। কিন্তু অলীক-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোন সার্বিকতার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির জীবনে অলীক-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত একান্তই দুর্লভ। একমাত্র স্বপ্ন-প্রত্যক্ষকেই হয়ত এর ব্যতিক্রম বলা যায়; কেননা সুস্থ ব্যক্তিরও স্বপ্নদশায় যে-সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় সেগুলির স্থানে বস্তুত কোন বাহ্য বস্তু বর্তমান থাকে না। তাই অধিকাংশ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষকে একরকম অলীক-প্রত্যক্ষই বলা যেতে পারে। কিন্তু স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ জটিল; তাই পরে স্বতন্ত্রভাবে তার আলোচনা তোলা যাবে। আপাতত বলা যায়, স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের কথা বাদ দিলে মনোবিকারের রোগীদের মধ্যেই সাধারণত অলীক-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাছাড়াও অবশ্য, মদ্যাদি-পানজনিত সাময়িক অসুস্থতার অবস্থাতেও নানাপ্রকার অলীক-প্রত্যক্ষ ঘটে থাকে।

১৭॥ বিবিধ প্রকারের ভ্রম-প্রত্যক্ষ

ইতিপূর্বে দেখেছি, কল্পনার ‘তুলনায় অস্বাভাবিক’ প্রভাবে এক বস্তুতে অপর বস্তুর প্রত্যক্ষ হলে তাকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ বলা হয়। কল্পনার এ-জাতীয় ‘তুলনায় অস্বাভাবিক’ প্রভাব বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে; ফলে ভ্রম-প্রত্যক্ষও নানাপ্রকারের। এখানে কয়েকপ্রকার ভ্রম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

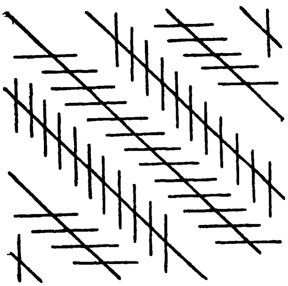
ক ॥ চাক্ষুষ জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষ (Geometrical Optical Illusion) —মুয়েলার-লায়ার ভ্রম-প্রত্যক্ষ (Muller-Lyer Illusion)

একজাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষকে ভুণ্ট (Wundt) আখ্যা দিয়েছিলেন, ‘চাক্ষুষ জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষ’। এ-জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষর অত্যন্ত সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হল, একটি শয়ান রেখার উপর সমান মাপের একটি লম্বরেখা আঁকলে লম্বরেখাটি তুলনায় বড় বলে প্রত্যক্ষ হয়। কিংবা, এই জ্যামিতিক রেখাঙ্কনই এমনভাবেও করা সম্ভব যে লম্বরেখাটি শয়ান রেখার তুলনায় মাপে বাস্তবিকই ছোট; তবুও অধিকাংশ ব্যক্তির চোখেই উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান মনে হবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে, একটি লম্বরেখা ও একটি শয়ান রেখা একত্রে সমাবিষ্ট হলে শয়ান



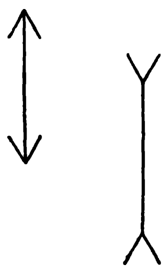
রেখাটির তুলনায় লম্বরেখাটিকে দীর্ঘতর বলে প্রত্যক্ষ ঘটে। এর কারণ হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে লম্বরেখাটির প্রত্যক্ষর জন্য চোখের পেশীগুলিকে তুলনায় বেশি সক্রিয় হতে হয়—অতএব, লম্বরেখাটির বাস্তব দৈর্ঘ্যের তুলনায় সেটি দীর্ঘতর বলে কল্পিত হয়।

চাক্ষুষ জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষর আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।



এই দৃষ্টান্তে অর্ধ-শয়ান রেখাগুলি বস্তুত সমান্তরাল; তবুও এই সমান্তরাল রেখাগুলিকে অন্যান্য যে-সব ছোট ছোট রেখা দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রভাবে সমান্তরাল রেখাগুলি সমান্তরাল বলে প্রতীত হয় না। অর্থাৎ, এখানে সমান্তরাল রেখাগুলির অসমান্তরাল হিসাবে ভ্রম-প্রত্যক্ষ ঘটে। এই ভ্রম-প্রত্যক্ষর কারণ হিসাবে বলা যায়, সমুপস্থিত অন্যান্য বিষয়ের প্রভাবে প্রত্যক্ষর বিষয়টিকে নির্দিষ্ট সেই বিষয় হিসাবে প্রত্যক্ষ করার পরিবর্তে আমরা ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করি।

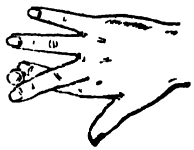
মুয়েলার-লায়ার (Muller-Lyer) এ-জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষর আরো নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। দৈর্ঘ্যে সমান পাশাপাশি দু'টি সরলরেখা আঁকা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই বাঁ দিকেরটির তুলনায় ডান দিকেরটিকে দীর্ঘতর বলে প্রত্যক্ষ করবে। তার কারণ, বাঁ দিকের রেখাটির প্রান্তে আরো দু'টি করে রেখা টেনে যেন একরকম বন্ধন চিহ্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অপরপক্ষে ডান দিকের রেখাটির দু'প্রান্তে আরো দু'টি করে রেখা টেনে বন্ধন চিহ্নের ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যসাধন করা হচ্ছে—অর্থাৎ, দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করার সহায়তা করা হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, দু'টি রেখার প্রান্তবর্তী অন্যান্য রেখা আমাদের কল্পনাকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে দু'টির বাস্তব সমান দৈর্ঘ্য প্রত্যক্ষের পরিবর্তে আমরা অসমান দৈর্ঘ্যই প্রত্যক্ষ করছি।



খ ॥ অন্যান্য কয়েক রকম ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত

আরো নানা কারণে আমাদের কল্পনা-উদ্দীপকজনিত সংবেদনকে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষে পরিণত করতে পারে। এ-জাতীয় একটি কারণ হল অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাব। অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাববশত ভ্রম-প্রত্যক্ষের একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল্। তাই দৃষ্টান্তটিকে 'এ্যারিস্টটল্-এর ভ্রম-প্রত্যক্ষ' (Aristotle's Illusion) বলা হয়। যথা :

ডান হাতের মধ্যমা আঙুলটির স্বাভাবিক অবস্থিতি বদলে যদি সেটিকে তর্জনীর উপর দিয়ে বাঁ দিকে সরিয়ে আনা হয় এবং এই অবস্থায় যদি উভয় আঙুলের মধ্যে একটি ছোট গোলা রাখা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে একটি গোলার পরিবর্তে সুস্পষ্টভাবে দু'টি স্বতন্ত্র গোলার স্পর্শ-প্রত্যক্ষ ঘটবে। একটি গোলাকে এইভাবে দু'টি গোলা হিসাবে প্রত্যক্ষ করা অবশ্যই ভ্রম-প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ কী? সাধারণত আমরা ডান হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা উভয়েরই ডান পাশ দিয়ে দু'টি স্বতন্ত্র বস্তুকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করি। অতএব, আঙুল দু'টির উপরোক্ত অস্বাভাবিক ভঙ্গিমার ক্ষেত্রেও যখন এক বস্তু দ্বারাই উভয় আঙুলেরই ডান পাশ উদ্দীপিত হচ্ছে তখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবে আমাদের মনে হয়, যেহেতু উভয় আঙুলের ডান পাশ একসঙ্গে উদ্দীপিত হচ্ছে সেই হেতু একটির পরিবর্তে দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু এ-জাতীয় উদ্দীপকের উৎস। অতএব, একটির বদলে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু প্রত্যক্ষ করি।

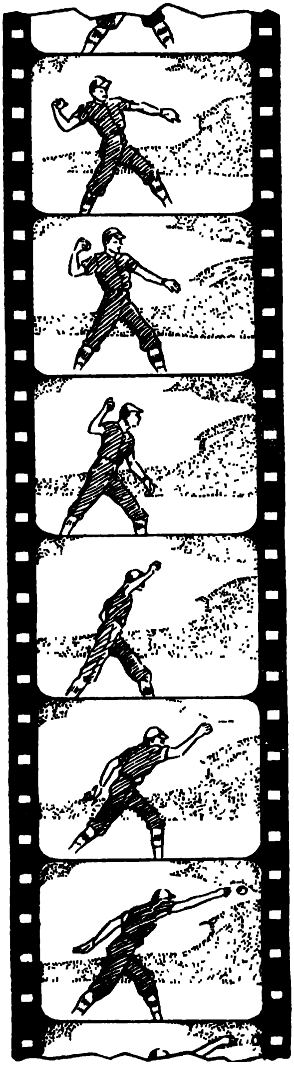


ভ্রম-প্রত্যক্ষের আর একজাতীয় কারণ হল বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিভোরতা বা আবিষ্ট অবস্থা। যেমন, সারা সন্ধ্যা ভুতের গল্প শুনলে এমন এক আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঘটে যার ফলে রাত্রে একটি গাছের গুঁড়িকে সহজেই ভৌতিক ব্যক্তি বলে ভ্রম-প্রত্যক্ষর সম্ভাবনা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, যাঁরা ম্যাজিক দেখান তাঁরা অনেক সময় সুকৌশলে এই সম্ভাবনাটির ব্যবহার করে থাকেন: ম্যাজিক দেখাবার সময় কথা বলতে বলতে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে তাঁরা দ্রষ্টাদের মধ্যে এমন এক আভ্যন্তরীণ অবস্থা সৃষ্ট করেন যার ফলে দ্রষ্টারা সহজেই এক বস্তুতে অপর বস্তু প্রত্যক্ষ করেন।

গ ॥ 'ফি-ফেনোমেনা' (Phi-phenomena)

ভ্রম-প্রত্যক্ষের আর একরকম চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা সকলেই আজকাল সুপরিচিত হয়েছি। নমুনা হিসাবে চলচ্চিত্রের উল্লেখ করা যায়। চলচ্চিত্র দর্শনকালে আমরা চিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন বস্তুকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষ করি, অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের সামনে পর্দার উপর পরপর অনেকগুলি ছবি ফেলা হয় এবং প্রতিটি ছবিতেই বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল। অর্থাৎ, এখানে বহির্জগতের বাস্তব বস্তু প্রকৃতপক্ষে নিশ্চলই; যদিও আমরা নিশ্চল বস্তুকে সচল বা গতিশীল হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। অতএব, গতির প্রত্যক্ষটুকু প্রকৃতপক্ষে ভ্রমাত্মকই এবং এ-জাতীয় ভ্রমাত্মক গতি-প্রত্যক্ষকে বলা হয় 'ফি-ফেনোমেনা' (Phi-phenomena)।

ভ্রমাত্মক গতি-প্রত্যক্ষর ব্যাখ্যা হিসাবে বিশেষত চলচ্চিত্রের দৃষ্টান্তটিই বিচার করা যাক। চলচ্চিত্র গ্রহণের সময় এমন একটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যাতে কোন একটি গতিশীল বস্তুর পরপর বিভিন্ন ভঙ্গির বা বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন ছবি ওঠে, যদিও অবশ্য প্রতিটি ভঙ্গির চিত্রই বস্তুত নিশ্চল। প্রেক্ষাগৃহেও এই সব স্বতন্ত্র ভঙ্গির বিভিন্ন নিশ্চল চিত্রই পরপর প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু প্রোজেক্টরের (Projector) সাহায্যে ছবিগুলি এমনভাবে পর্দায় ফেলা হয় যে একটি ভঙ্গির ছবি ক্ষণিকের জন্য পর্দার উপর পড়ে অন্তর্হিত হয়; তারপর ক্ষণিকের জন্য পর্দার উপর কোন ছবিই থাকে না; তারপর আবার পর্দায় দ্বিতীয় ভঙ্গির ছবিটি ক্ষণিকের জন্য ফেলা হয়। অর্থাৎ, বস্তুত পর্দার উপর পর পর থাকে :



একটি ভঙ্গির নিশ্চল ছবি→ক্ষণিকের অন্ধকার → পরবর্তী ভঙ্গির নিশ্চল ছবি → ক্ষণিকের অন্ধকার → আরো পরবর্তী ভঙ্গির নিশ্চল ছবি → ক্ষণিকের অন্ধকার......ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার ফলে দ্রষ্টার চোখে কী ঘটনা ঘটে? একটি ভঙ্গির নিশ্চল ছবি দেখার পর ক্ষণিকের অন্ধকারের ঐ সময়টিতে সেই ছবিটিরই পূর্ববর্তী সংবেদনের রেশ বা অনুসংবেদন (After Sensation : পৃ: ৯৫ দ্রষ্টব্য) দ্রষ্টার চোখে টিকে থাকে। সেই অবস্থায় দ্বিতীয় ভঙ্গির ছবিটি পর্দায় পড়ে; ফলে দ্রষ্টার চোখে পূর্ববর্তী ভঙ্গির ছবিটির অনুসংবেদন পরবর্তী ভঙ্গির ছবিটির সংবেদনের সঙ্গে কোন-এক ভাবে যেন মিশে যেতে চায়, অতএব তার মনে হয় ছবিতে পূর্ববর্তী ভঙ্গি বদলে গিয়ে পরবর্তী ভঙ্গিতে পরিণত হল—অর্থাৎ, দৃশ্য ব্যক্তির বা বস্তুর ভঙ্গিটিই পরিবর্তিত হল বা বদলে গেল। এইভাবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দ্রষ্টার চোখে পরপর পূর্ববর্তী ভঙ্গির অনুসংবেদন পরবর্তী ভঙ্গির সংবেদনের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে

দ্রষ্টার মনে হয় ছবিতে দৃষ্ট ব্যক্তির ভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে বা ছবিটিই বুঝি গতিশীল বা সচল।

১৮ ॥ দিবাস্বপ্ন (Day-Dream, Reverie)

জাগ্রত অবস্থায় সাধারণত নানা কামনা-বাসনার কাল্পনিক পূর্ণতা বিষয়ে প্রায় স্বপ্নদর্শনের মতো একজাতীয় অর্ধ-অমূল অভিজ্ঞতা ঘটে। তাকে দিবাস্বপ্ন (Day-Dream বা Reverie) বলা হয়। এ-জাতীয় অভিজ্ঞতাকেই আমরা সাধারণত 'শূন্যে সৌধ নির্মাণ', বা 'আকাশকুসুম রচনা' আখ্যা দিয়ে থাকি। যেমন, লটারির টিকিট কিনে একজন দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল যে, লটারিতে বহু টাকা পেয়ে সে বাড়ি-গাড়ি কিনে বিরাট ধনীর মতো জীবনযাপন করছে। স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্নের প্রধান পার্থক্য এই যে নিদ্রাবস্থাতেই মানুষ স্বপ্নদর্শন করে, কিন্তু দিবাস্বপ্ন মানুষ জাগ্রত অবস্থাতেই দেখে। দ্বিতীয়ত, স্বপ্নদশায় মানুষ বাহ্য পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে একান্ত কাল্পনিক বস্তুই প্রত্যক্ষ করে; তাই অধিকাংশ স্বপ্নকে অমূল-প্রত্যক্ষ জাতীয়ই বলা যায়। কিন্তু দিবাস্বপ্নের সময় মানুষ অত্যন্ত বেশি কল্পনাবিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক বস্তুগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে না এবং বাস্তব বা বাহ্য পরিবেশকেও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে না। বস্তুত, দিবাস্বপ্নের সময় আমরা বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে কাল্পনিক পরিবেশকে কোন একভাবে মিশ্রিত করে যেন এক নতুন পরিবেশ গড়ে তুলি। তৃতীয়ত, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং কোন ভূমিকা গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু দিবাস্বপ্নের সময় ব্যক্তিটি নিজেই কল্পিত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

সাধারণ সুস্থ মানুষ অবশ্যই অনেক সময় অল্পবিস্তর দিবাস্বপ্ন দেখে থাকে। তাই দিবাস্বপ্ন মাত্রকেই কোনরকম অসুস্থতার বা অস্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ বলা যায় না। কিন্তু যে-ব্যক্তি অত্যন্ত বেশি দিবাস্বপ্ন-প্রবণ তার এই দিবাস্বপ্ন-প্রবণতা ক্রমশ অলীক-প্রত্যক্ষ প্রবণতায় পর্যবসিত হতে পারে। সে-অবস্থাকে তুলনায় অস্বাভাবিক বলতে হবে।

১৯ ॥ স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা (Autistic Thinking)

স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার (Autistic Thinking) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল দিবাস্বপ্ন। অর্থাৎ, দিবাস্বপ্নের অভিজ্ঞতাকালে মানুষ যে-ধরনের চিন্তা করে সেই ধরনের চিন্তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। কেননা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা বলতে বোঝায় বাহ্য পরিবেশকে উপেক্ষা করে, অন্যান্য ব্যক্তির সমালোচনা—এমনকি আত্মসমালোচনাও—অগ্রাহ্য

করে, একান্ত কল্পনাবিভোর চিন্তাজাল বোনা। অতএব, এই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার সঙ্গে প্রথমত বস্তুধর্মী চিন্তার (Realistic Thinking) পার্থক্য করতে হবে। বস্তুধর্মী চিন্তা বাস্তব জগৎ এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বিজ্ঞানীর চিন্তা: পরিদর্শন ও পরীক্ষালব্ধ বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানী তাঁর চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করেন। তুলনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব-বিচ্ছিন্ন কল্পনার টানেই চিন্তা করে যাওয়া। তার মানে এই নয় যে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নেই; কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল সে-নিয়ম বাস্তব ঘটনার নিয়ম নয়, চিন্তা-বিহ্বলতার বা কল্পনাবিহ্বলতারই নিয়ম। তাই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা অপরের সমালোচনা গ্রাহ্য করে না, এবং এ-জাতীয় চিন্তার সময় ব্যক্তিবিশেষ সচেতনভাবে আত্মসমালোচনাও করে না। সংক্ষেপে বলা যায়, কল্পনার জাল বুনে যাবার সময় মানুষ যে-জাতীয় বাস্তবতা-বর্জিত চিন্তা করে তাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা বলে। যেমন, উন্মাদ রোগীরাও একরকম চিন্তা করে; কিন্তু তাদের এই চিন্তার সঙ্গে আর কোনকিছুর সম্পর্ক নেই; তাদের চিন্তা আত্মবিভোর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। অবশ্যই স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের জীবনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পার্থক্যের মধ্যে এই যে সুস্থ মানুষ সাময়িকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তায় মগ্ন হলেও অনায়াসেই বস্তুধর্মী চিন্তায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে; উন্মাদ রোগীরা তা পারে না। অনেক সময় উন্মাদ রোগীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা এমনই ঐকান্তিক ও বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়।

২০ ॥ স্বপ্ন (Dream)

নিদ্রাবস্থার ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কেননা নিদ্রাবস্থাতেই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা ঘটে। কিন্তু আধুনিক শরীরবিজ্ঞানে নিদ্রাবস্থার ব্যাখ্যা এখনো অনেকাংশেই গবেষণা-সাপেক্ষ। তবুও মোটের উপর বলা যায়, নিদ্রাবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, গুরুমস্তিষ্কের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া বা স্তিমিত হয়ে যাওয়া। অবশ্য আমরা জাগ্রত অবস্থা থেকে হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে নিদ্রাভিভূত হই না; ক্রমশ বা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর নিদ্রায় মগ্ন হই। অতএব বোঝা যায়, আমাদের গুরুমস্তিষ্কের সক্রিয়তাও অকস্মাৎ বা হঠাৎ স্তিমিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না—তা ধীরে ধীরে বা ক্রমশ স্তিমিত হয়। অনুমান হয়, একেবারে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলে আমাদের কোন স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা ঘটে না; ভারতীয় দার্শনিকেরা এ-জাতীয় গাঢ় স্বপ্নবিহীন নিদ্রাবস্থাকে সুষুপ্তি আখ্যা দিয়েছেন। উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন, আমাদের যেসব স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় মনে পড়ার

পক্ষে যথেষ্ট সংলগ্ন (অনেক স্বপ্ন এমনই অসংলগ্ন যে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কিছুতেই মনে পড়ে না) সেগুলির অভিজ্ঞতা সম্ভবত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবার আগে বা গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার সময়ই ঘটে থাকে। অতএব বলা যেতে পারে, গুরুমস্তিষ্কের সক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হলে স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা ঘটে না ; গুরুমস্তিষ্কের কাজ আংশিকভাবে যখন বাধাপ্রাপ্ত বা স্তিমিত হয় তখনই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা ঘটে। গুরুমস্তিষ্কের কাজ যখন এভাবে অংশত বাধাপ্রাপ্ত তখন গুরুমস্তিষ্কের পক্ষে তুলনায় সরল দায়িত্বগুলি পালন করা সম্ভব এবং এ-জাতীয় দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুৎপাদিত করা। কিন্তু সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিরূপের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক-নির্ণয়মূলক চিন্তা প্রভৃতি তুলনায় জটিল দায়িত্বও গুরুমস্তিষ্ক সম্পাদন করে থাকে ; গুরুমস্তিষ্কের কাজ অংশত স্তিমিত বা বাধাপ্রাপ্ত হলে গুরুমস্তিষ্কের পক্ষে এ-জাতীয় তুলনায় জটিল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। অতএব, এ-অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুৎপাদিত হলেও সেগুলির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক-নির্ণয় সম্ভব হয় না। তার বদলে এই প্রতিরূপগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর এলোমেলো সম্বন্ধ গড়ে উঠতে থাকে। এবং বিচার-বিবেচনা-শালীনতাবোধ প্রভৃতিও যেহেতু গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর এবং জটিলতর প্রক্রিয়ারই পরিচায়ক সেই হেতু স্বপ্নদশায় এগুলিরও অভাব ঘটে। তাই অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে যেসব অভিজ্ঞতা ঘটেছিল স্বপ্নদশায় সেগুলির প্রতিরূপ শুধু যে অসংলগ্নভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাই-ই নয়—জাগ্রত অবস্থার বিচারবোধ, রুচিবোধ, শালীনতাবোধ প্রভৃতিও স্বপ্নকালে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে স্বপ্নের আর একটি বৈশিষ্ট্যও বোঝা যাবে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু এবং ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে যত অবাস্তব, অসম্ভব এবং আজগুবি হোক না কেন, স্বপ্নদশায় সেগুলিকে অবাস্তব বলে মনে হয় না—স্বপ্নদর্শনকালে এগুলি যথার্থ বা সত্য বলেই প্রতীত হয়। তার কারণ, যে-বিচারশক্তির সাহায্যে আমরা বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করি তা গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর প্রক্রিয়ারই পরিচায়ক ; স্বপ্নকালে এই প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত বা স্তিমিত থাকে বলেই স্বপ্নদশায় বাস্তব-অবাস্তবে পার্থক্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকে না, এবং অবাস্তবকে অবাস্তব বলে বোঝবার বা সনাক্ত করবার ক্ষমতা থাকে না বলেই স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বস্তু এবং ঘটনাই স্বপ্নদশায় বাস্তব মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় কোন একটি বর্তমান অভিজ্ঞতা অনুষঙ্গের নিয়ম অনুসারে অপর কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে ; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় আমাদের বিচারশক্তি সক্রিয় থাকে বলেই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য-

বোধও বর্তমান থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় অনুষঙ্গর নিয়ম অনুসারে একটি প্রতিরূপ অপর কোন প্রতিরূপকে অভিভাবিত করলে বিচারশক্তির অভাববশত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সুযোগ থাকে না; অতএব উভয় প্রতিরূপ অবাধে মিশ্রিত হয়ে কোন সম্পূর্ণ অলীক বিষয়বস্তু রচনা করতে পারে এবং এই অলীক বিষয়বস্তুকে অলীক বলে সনাক্ত করার ক্ষমতাও থাকে না। অতএব, অনুষঙ্গর নিয়ম অনুসারে অতীত অভিজ্ঞতার অভিভাবন এবং স্বপ্নদশায় গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর প্রক্রিয়ার পরিচায়ক বিচারশক্তির একান্ত অভাব থেকেই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার মূল বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ বিচিত্র বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সাধারণত কোন সম্পর্ক নেই এবং এই কারণে বলা যায় অধিকাংশ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষই অমূল-প্রত্যক্ষ জাতীয়ই। কিন্তু কোন কোন স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ অন্তত অংশবিশেষে ভ্রম-প্রত্যক্ষ জাতীয়ও হতে পারে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তবিশেষে দেখা যায়, বাস্তব সংবেদন অত্যন্ত স্থূলভাবে বিকৃত হয়ে স্বপ্ন-প্রত্যক্ষে পরিণত হচ্ছে। যেমন: নিদ্রিত ব্যক্তির গলায় মশারি পড়েছিল, মশারি পড়ার সংবেদনকে বিকৃত করে সে স্বপ্ন দেখল তাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে স্বপ্ন-প্রত্যক্ষকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ জাতীয় বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্যই অধিকাংশ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ এ-জাতীয় নয়, কেননা অধিকাংশ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও ঘটনার মূলে কোন বাস্তব সংবেদনের পরিচয় নেই।

দিবাস্বপ্ন প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, অপূর্ণ ইচ্ছা বা কামনার কাল্পনিক চরিতার্থতাই তার মূল বিষয়বস্তু। আমরা পরে দেখবো, ফ্রয়েড্-এর মতে স্বপ্নমাত্রই এ-জাতীয় ইচ্ছাপূরণ। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী অবশ্য সেই দাবিকে অতিশয়োক্তি বলে প্রত্যাখ্যান করেন; বিশেষত ফ্রয়েড্ ও তাঁর অনুগামীরা সমস্ত স্বপ্নকে যৌন ইচ্ছার পূরণ বলে প্রমাণ করতে চান; এই দাবির বিচারেও গভীর মত-পার্থক্য আছে। তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অন্তত অনেক স্বপ্নের বিষয়বস্তু দিবাস্বপ্নের মতই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক পূর্ণতামাত্র। যেমন, একজায়গায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না; স্বপ্নে দেখলাম সেখানে বেড়াতে গিয়েছি। অতএব, এই স্বপ্নকে সরাসরি ইচ্ছাপূরণই বলা দরকার। কাম বা যৌন ইচ্ছার চরিতার্থ সংক্রান্ত স্বপ্নের দৃষ্টান্তও সুবিদিত।

২১ ॥ স্বপ্ন সংক্রান্ত ফ্রয়েড্-এর মত (Frued's Theory of Dream)

স্বপ্ন সংক্রান্ত ফ্রয়েড্-এর মতের মূল কথা হল, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছা পূরণ, কিংবা আরো নির্ভুলভাবে বলা উচিত, স্বপ্নমাত্রই মূলত যৌন অবচেতন ইচ্ছার (Unconscious Sexual Desires) পূরণ। অবশ্যই এই মতটিকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে হলে

ফ্রয়েড্-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) নামের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়টির মূলসূত্রগুলির আলোচনা প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়গুলির কথা আমরা পরে আলোচনা করবো এবং সেই প্রসঙ্গেই মনঃসমীক্ষণের মূলসূত্র এবং বিশেষ করে স্বপ্ন সংক্রান্ত এই সম্প্রদায়ের মতটি ব্যাখ্যা ও বিচার করা বাঞ্ছনীয় হবে।

২২ ॥ গঠনমূলক কল্পনা ও তার প্রকারভেদ (Constructive Imagination and Its Various Forms)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সংকীর্ণ অর্থে কল্পনা বলতে বোঝায়, অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নূতন প্রতিরূপ গঠন। যেমন, অতীতে ঘোড়ার অভিজ্ঞতা ঘটেছিল এবং পাখীর অভিজ্ঞতা ঘটেছিল; এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপকে নূতন করে সাজিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার প্রতিরূপ গঠন করা হল।

কল্পনার দৃষ্টান্তগুলিকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) স্বাভাবিক বা গঠনমূলক, (খ) অস্বাভাবিক। ভ্রম, অমূল-প্রত্যয়, দিবাস্বপ্ন, স্বপ্ন প্রভৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অস্বাভাবিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি। বর্তমানে স্বাভাবিক বা গঠনমূলক কল্পনার পরিচয় দেখা যাক।

প্রকৃতি, উদ্দেশ্য প্রভৃতির ভেদে গঠনমূলক কল্পনাকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। যথা:—

ক ॥ সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা (Active and Passive Imagination)

অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি থেকে নূতন প্রতিরূপ গঠনের সময় অনেক ক্ষেত্রে সচেতন প্রয়াসের পরিচয় থাকে, অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। যে-ক্ষেত্রে এ-জাতীয় প্রয়াস বর্তমান সে-ক্ষেত্রে কল্পনাকে সচেষ্ট (Active) বলা হয়; যে-ক্ষেত্রে তা বর্তমান নয় সে-ক্ষেত্রে কল্পনাকে নিশ্চেষ্ট (Passive) বলে। যেমন, চিত্রকর বা ঔপন্যাসিক যখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থেকে সচেতন ও নির্বাচনমূলকভাবে কোন চিত্র বা উপাখ্যান রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন তাঁর কল্পনাকে সচেষ্ট আখ্যা দিতে হবে। কিন্তু কোন অলস মধ্যাহ্নে আমি হয়ত আকাশের মেঘ দেখতে দেখতে কল্পনাস্রোতে 'গা ভাসিয়ে' দিয়েছি: এ-অবস্থায় আমার মনে একের পর এক প্রতিরূপ আসছে-যাচ্ছে, আমি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়াসই করছি না। এ-জাতীয় কল্পনাকে নিশ্চেষ্ট (Passive) আখ্যা দিতে হবে।

খ॥ বিচার-উদ্দেশী, সৌন্দর্য-উদ্দেশী এবং ব্যবহারিক কল্পনা (Intellectual, Aesthetic and Practical Imagination)

উদ্দেশ্যের দিক থেকে কল্পনাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কল্পনার উদ্দেশ্য বিচারমূলক বা সত্যান্বেষণ হলে তাকে বিচার-উদ্দেশী বলা হবে। যেমন, দার্শনিকের কল্পনা। কল্পনার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি বা সৌন্দর্য-উপভোগ হলে তাকে সৌন্দর্য-উদ্দেশী বলা হবে। যেমন, কবির বা শিল্পীর কল্পনা। আবার কল্পনার উদ্দেশ্য ব্যবহারিক হতে পারে। যেমন, এঞ্জিনিয়ার একটি বাড়ির নক্সা প্রস্তুত করছেন ; এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধন। অতএব তাঁর কল্পনাকে ব্যবহারিক আখ্যা দেওয়া হবে।

গ॥ সৃজন মূলক ও গ্রহণ মূলক কল্পনা (Creative and Receptive Imagination)

কাব্য রচনার সময় কবির কল্পনা সৃজনমূলক, কেননা এই কল্পনার সাহায্যে তিনি সৃষ্টি করছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য পাঠ করে আমি যখন কাব্যরস উপভোগ করছি তখন কোন এক ভাবে তাঁর কল্পনায় অংশগ্রহণও করি। এক্ষেত্রে আমার কল্পনা সৃজনমূলক নয়, গ্রহণমূলক মাত্র।

ঘ॥ স-বিশ্বাস ও বিশ্বাস-বিহীন কল্পনা (Imagination with Belief and Imagination without Belief)

কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস থাকে, অনেক সময় থাকে না। অতএব এদিক থেকে কল্পনাকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : স-বিশ্বাস ও বিশ্বাস-বিহীন। যেমন, আজকের ঐতিহাসিক যখন পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা করছেন তখন তিনি অবশ্যই কল্পনার উপর নির্ভর করছেন ; কিন্তু তাঁর এই কল্পনার বিষয়বস্তু যে বাস্তব সে-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাসও আছে। পক্ষান্তরে, যিনি কোন আষাঢ়ে গল্প বিবৃত করছেন তিনিও কল্পনার উপর নির্ভর করলেও এই কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় তাঁর নিজেরই কোন বিশ্বাস নেই। অতএব, প্রথম ধরনের কল্পনাকে স-বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় ধরনের কল্পনাকে বিশ্বাস-বিহীন বলা হবে।

স-বিশ্বাস কল্পনা আবার তিন রকমের হতে পারে : (১) অতীত-আশ্রয়ী, (২) ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী, এবং (৩) সর্বকালীন। ঐতিহাসিকের কল্পনা অতীত-আশ্রয়ী স-বিশ্বাস কল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেননা, তাঁর কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও এই বিষয়বস্তু অতীতেরই ঘটনা—অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তাঁর কল্পনা অতীতকে

আশ্রয় করে আছে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানী যখন কল্পনাবলে ঘোষণা করেছেন, অমুক দিন অমুক সময়ে সূর্যগ্রহণ ঘটবে তখন তাঁর কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস থাকলেও এই বিষয়বস্তুটি অতীতের ঘটনাও নয়, বর্তমানের ঘটনাও নয়—ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন ঘটনা। এ-জাতীয় ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী স-বিশ্বাস কল্পনাকে প্রত্যাশাও বলা হয়। আবার বিজ্ঞানীরা কল্পনা-সাহায্যে যখন কোন সার্বিক নিয়মে উপনীত হন তখন তাঁদের কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় একদিকে যেমন বিশ্বাস বর্তমান অন্যদিকে তেমনি এই বিষয়বস্তুর বাস্তবতা অতীত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান এই ত্রিকালের কোন একটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তা সর্বকালের পক্ষে সত্য বা বাস্তব। যেমন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কল্পনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিন্তা (Thought) ও বিশ্বাস (Belief)

১॥ চিন্তার স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সাধনী (Nature, Aim and Tools of Thought)

দৈনন্দিন জীবনে চিন্তা শব্দটি আমরা সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। ফলে চিন্তা বলতে স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি বিবিধ আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া উল্লিখিত হতে পারে। যেমন, চলতি কথায় বলি, 'ছোটবেলার একটি ঘটনার কথা ভাবছি বা চিন্তা করছি'। এক্ষেত্রে চিন্তা বা ভাবনা বলতে বস্তুত স্মৃতিই বোঝায়। কিংবা যদি বলা হয়, 'শিল্পী চিন্তায় বিভোর হয়েছেন', তাহলে চিন্তা শব্দ বস্তুত সংকীর্ণ অর্থে কল্পনারই বোধক হবে। আবার চিন্তা বলতে উচ্চতর বিচার-বিশ্লেষণ মূলক ভাবনাও উল্লিখিত হয়। যেমন : কোন সমস্যার সমাধান-কল্পে বা কোন বিষয়ের সম্যক অবগতির উদ্দেশ্যে, বা কোন আবিষ্কার (Discovery) বা উদ্ভাবনের (Invention) প্রয়াসে বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় বিবিধ অর্থের পরিবর্তে চিন্তা শব্দকে এক সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম দু'টিকে বোঝার জন্য আমরা ইতিপূর্বে স্মৃতি ও কল্পনা শব্দ ব্যবহার করেছি। অতএব চিন্তা শব্দটিকে মূলত উপরোক্ত তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, চিন্তা বলতে মূলত বিচার-বিশ্লেষণ মূলক ভাবনাই বোঝা উচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনার সহায়তা ব্যতীত এই অর্থে চিন্তা সম্ভব নয়। কেননা বিচার-বিশ্লেষণমূলক ভাবনার জন্য প্রথম প্রয়োজন উপাত্ত (Data) সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনার সহায়তা ছাড়া এই উপাত্ত সংগ্রহ সম্ভব নয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন। তার জন্য তাঁকে সর্বপ্রথম বহু ম্যালেরিয়া রোগী পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে—অর্থাৎ, তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রত্যক্ষর উপর। কিন্তু বিজ্ঞানী একাধারে বা একই সঙ্গে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেননি; এমনকি প্রত্যক্ষলব্ধ দৃষ্টান্ত-গুলি সম্বন্ধে যে-সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করছেন সে-সময়ে তিনি হয়ত কোন

দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষই করছেন না। অতএব, প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান বা তথ্যগুলি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন না-করলে—অর্থাৎ, স্মৃতির সহায়তা গ্রহণ না-করলে—তাঁর পক্ষে এগুলিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই চিন্তা বা উচ্চচিন্তাও প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির উপর নির্ভরশীল।

অতএব, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতিকে চিন্তার সহায়ক বা সাধনী (Tools) বলা যায়। কিন্তু চিন্তা বা উচ্চচিন্তার সাধনী বলতে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি নয়। বস্তুত, চিন্তার জন্য প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির সহায়তা ছাড়াও বিশেষ করে ধারণা (Concept) ও প্রতীক (Symbol)—এবং অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতীক হিসাবে ভাষারও (Language)—একান্ত প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির বিষয়বস্তু হল মূর্ত (Concrete) এবং বিশিষ্ট (Particular) বস্তু বা ঘটনা; অপরপক্ষে প্রত্যক্ষলব্ধ মূর্ত ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে অমূর্ত (Abstract) এবং সার্বিক (Universal) ধারণায় উপনীত হবার পরই এবং প্রতীক হিসাবে বিশেষত ভাষার সাহায্যে এই ধারণাগুলি ব্যবহার করতে সমর্থ হলে পরই আলোচ্য অর্থে চিন্তা সম্ভব হয়। যথা: ম্যালেরিয়া রোগের বিবিধ মূর্ত ও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত এক সার্বিক বা সাধারণ ধারণায় উপনীত হন এবং বিশেষত এই ধারণা নিয়েই চিন্তা করেন। এ-জাতীয় সার্বিক ধারণা অবশ্যই মূর্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; তবুও সার্বিক ধারণাগুলির জন্য আমরা নানা রকম প্রতীক ব্যবহার করতে পারি বলেই সার্বিক ধারণাগুলি নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব হয়। প্রতীক বলতে প্রধানতই হল ভাষা। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে 'ম্যালেরিয়া' শব্দটিই বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত—অর্থাৎ, বিজ্ঞানীর নিকট কাছে 'ম্যালেরিয়া' বলে উচ্চারিত ধ্বনিটুকুই বা লিখিত সংকেতটুকুই সাধারণভাবে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত ম্যালেরিয়ার দৃষ্টান্তরই বোধক। যদিও অবশ্য চিন্তার অধিকাংশ দৃষ্টান্তে ভাষাই—অর্থাৎ, উচ্চারিত ধ্বনি, লিখিত সংকেত বা বিবিধ অঙ্গভঙ্গি (মূক-বধিরদের ভাষা)—সার্বিক ধারণাগুলির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত, তবুও চিন্তাক্ষেত্রে অনেক সময় অর্থপূর্ণ ভাষার পরিবর্তে অর্থহীন সংকেতমাত্রও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে x, y, z প্রভৃতি অর্থহীন সংকেত ব্যবহারই সুবিধাজনক বলে বিবেচিত।

চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা তুলবো। আপাতত চিন্তার সাধনী প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাক। আমরা দেখলাম, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতিকেও ব্যাপক অর্থে চিন্তার সাধনী বলে গ্রহণ করলেও ধারণা ও প্রতীকই (প্রধানত ভাষা) হল চিন্তার বিশিষ্ট সাধনী। মানবেতর প্রাণীর

আচরণ থেকে বোঝা যায় যে তারা প্রত্যক্ষ (Percept) এবং অনেক সময় স্মৃতি-প্রতিরূপের (Memory Image) ব্যবহারে সমর্থ হলেও ধারণা ও প্রতীক (প্রধানত ভাষা) ব্যবহারে অসমর্থ। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, মানবেতর প্রাণীর পক্ষে চিন্তা-প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কিংবা, চিন্তা শব্দটি আমরা এখানে যে-অর্থে গ্রহণ করেছি তা প্রাণীজগতে শুধুমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে প্রাচীন দার্শনিক এ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে : একমাত্র মানুষই হল চিন্তাশীল প্রাণী।

টিচেনার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য দাবি করেন, প্রতিরূপকে (Image) চিন্তার এক অনিবার্য সাধনী বলে স্বীকার করতে হবে; কেননা তাঁদের মতে প্রতিরূপহীন চিন্তা (Imageless Thought) একান্তই অসম্ভব। অর্থাৎ, চিন্তাকালে আমরা অনিবার্যভাবেই প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করে থাকি। এই মত গ্রহণ করলে মানতে হবে যে আমরা মূর্ত ও বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনা ছাড়া অপর কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারি না, কেননা প্রতিরূপ একান্তভাবেই মূর্ত ও বিশিষ্ট। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মূর্ত ও বিশিষ্ট বস্তুর বা ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে সুরু করে সার্বিক ধারণায় উপনীত হবার পরই উচ্চ চিন্তা বা বিচার-বিশ্লেষণ মূলক ভাবনা সম্ভব হয়। তাছাড়া, দর্শন বা উচ্চগণিতে যেসব বিষয়ে চিন্তা করা হয় প্রায়ই সে সব বিষয়ে কোন প্রতিরূপের প্রশ্ন ওঠে না : বরং প্রতিরূপ-পরায়ণতা এ-জাতীয় উচ্চ চিন্তার পক্ষে প্রতিবন্ধক হওয়াই সম্ভব। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা চিন্তাক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিরূপের সহায়তা গ্রহণ করলেও চিন্তামাত্রই প্রতিরূপ-নির্ভর নয়; বস্তুত আমাদের উচ্চ চিন্তা প্রায়ই প্রতিরূপহীন। তাই প্রতিরূপকে চিন্তার অনিবার্য সাধনী মনে করা যায় না। অপরপক্ষে, ধারণা ও প্রতীকই চিন্তার বিশিষ্ট সাধনী এবং এই প্রতীক বলতে প্রধানতই ভাষা। অতএব, চিন্তা প্রসঙ্গে বিশেষত ধারণা এবং ভাষার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজন।

২ ॥ ধারণা (Concept)

ধারণা প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানে বিশেষত দু'টি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। এক : ধারনার স্বরূপ কী? দুই : কীভাবে আমারা ধারণা গঠন করি? ইতিপূর্বে উভয় প্রশ্নের উত্তরেরই ইংগিত বা আভাস পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে তারই অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় দেখা যাক।

ধারণার স্বরূপ বোঝার জন্য বিশেষত প্রত্যক্ষ (Percept) এবং প্রতিরূপের (Image) সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ ও পার্থক্য দেখা দরকার। কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগের ফলে আমরা প্রত্যক্ষ লাভ করি; প্রত্যক্ষর বিষয় মূর্ত ও বিশিষ্ট।

অতীত প্রত্যক্ষই স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত হলে তাকে প্রতিরূপ (Image) বলে। অতএব প্রতিরূপের বিষয় প্রত্যক্ষর মতই বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট। তুলনায় ধারণার বিষয়বস্তু সার্বিক বা সাধারণ। যেমন : কোন নির্দিষ্ট কুকুর সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ হয়েছিল ; সেই কুকুরের প্রত্যক্ষই স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত হয়ে কুকুরটির প্রতিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এ-জাতীয় বহু কুকুরের প্রত্যক্ষ ঘটার ফলে আমি যখন কুকুর সম্বন্ধে একটি ধারণায় উপনীত হই তখন সেই ধারণার বিষয় বলতে কোন নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট কুকুর নয়—সর্বদেশের ও সর্বকালের অর্থাৎ সমস্ত কুকুরের সাধারণ লক্ষণ। স্বভাবতই এ-জাতীয় ধারণার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগের প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ, আমাদের ধারণাগুলি শুধু সার্বিক নয়, অমূর্তও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আমরা কীভাবে সাধারণ বা সার্বিক ধারণায় উপনীত হই ? সেই প্রক্রিয়ার মূলত দু'টি দিক আছে। একটি দিক সচেতন প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল নয় ; অপর দিকটি সচেতন প্রয়াসের উপর অল্প-বিস্তর নির্ভরশীল। 'অল্প-বিস্তর' এই কারণে বলা হল যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত যেসব ধারণায় উপনীত হই তার পিছনে এই সচেতন প্রয়াসের পরিচয় তুলনায় অস্পষ্ট, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে তা তুলনায় প্রকট ও সুস্পষ্ট। একে একে এই দু'টি দিকের পরিচয় দেখা যাক।

প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপ থেকে সাধারণ বা সার্বিক ধারণায় উপনীত হবার প্রথম স্তর হল বর্গ-প্রতিরূপ (Generic Image)—অর্থাৎ, সমজাতীয় বহু বস্তুর মধ্যে শুধুমাত্র সাদৃশ্যগত বা সাধারণ দিকটির কোন একরকম যৌগিক প্রতিরূপ—গঠন। বর্গ-প্রতিরূপ গঠনের প্রক্রিয়াকে অনেক সময় যৌগিক আলোকচিত্র গ্রহণের (Composite Photography) সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন : একই প্লেট বা ফিল্ম-এর একই জায়গায় পরপর অনেকগুলি আল্‌সেসিয়ান্ কুকুরের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা হল। সেই প্লেট বা ফিল্ম থেকে শেষ পর্যন্ত যে-চিত্র পাওয়া যাবে তা কোন একটি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট আল্‌সেসিয়ান্ কুকুরের চিত্র নয় ; তার বদলে সেটি হবে সাধারণভাবে আল্‌সেসিয়ান্ কুকুরদের গড়নের চিত্র। অনেকটা এইভাবেই পর পর সমজাতীয় বহু বস্তুর প্রত্যক্ষ হতে হতে আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যে-প্রতিরূপ গড়ে উঠবে তা কোন একটি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ নয় ; তার পরিবর্তে বহু প্রতিরূপ কোন একভাবে একীভূত হয়ে সমস্ত সমজাতীয় বস্তুগুলির সাধারণ বা বর্গগত বা জাতিগত একটি প্রতিরূপ গঠিত হবে। যেমন : পরপর বহু কুকুরের প্রত্যক্ষ হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন এক প্রতিরূপ গড়ে ওঠে যাকে কোন একটি নির্দিষ্ট কুকুরের প্রতিরূপ বলা যায় না ; তার মধ্যে বিভিন্ন কুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলির দিক অবলুপ্ত হয়ে

অবশিষ্ট থাকে শুধু সাধারণভাবে সমস্ত কুকুরের মধ্যে সাদৃশ্যর দিকটুকু। সংক্ষেপে, সমজাতীয় বহু বস্তুর বহু প্রতিরূপ যৌগিক আলোকচিত্রের মতো একাকার হয়ে একটি বর্গ-প্রতিরূপে পরিণত হয়। এই বর্গ-প্রতিরূপের মধ্যে বিভিন্ন সমজাতীয় প্রতিরূপের বৈশিষ্ট্যের দিক প্রত্যাখ্যাত হয়ে শুধুমাত্র সাধারণ সাদৃশ্যর দিকটি বর্তমান থাকে।

কিন্তু বর্গ-প্রতিরূপও প্রতিরূপই; ধারণা নয়। তবুও এই বর্গ-প্রতিরূপের মাধ্যমে আমরা ধারণা গঠনের দিকে অনেকাংশে অগ্রসর হই। কেননা অন্যান্য প্রতিরূপের মতো বর্গ-প্রতিরূপের বিষয় কোন বিশিষ্ট বস্তু নয়—একজাতীয় বস্তুর সার্বিক বা সাধারণ লক্ষণ। এবং সার্বিকতাই ধারণার প্রধান লক্ষণ। অতএব বর্গ-প্রতিরূপকে 'নিছক প্রতিরূপ এবং ধারণার মধ্যবর্তী' কোন এক স্তর বলে বিবেচনা করা যায়। এই মধ্যবর্তী স্তর থেকে পরিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হবার জন্য কম-বেশি সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। 'কম-বেশি', কেননা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রয়াসের পরিচয় তুলনায় অস্ফুট, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-ভাবে নির্ভরযোগ্য সুনিশ্চিত ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে সে-পরিচয় তুলনায় প্রকট ও সুস্পষ্ট। কিন্তু তুলনায় অস্ফুটভাবেই হোক বা প্রকটভাবেই হোক, ধারণা গঠনের জন্য এই যে সচেতন প্রয়াস তা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলির পরিচয় পাওয়া যায়:

১। তুলনা (Comparison)। সমজাতীয় নানা বস্তুর প্রত্যক্ষ হলে আমরা সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে থাকি এবং এই তুলনার ফলে সেগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয় দিকই ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়।

২। বিমূর্তকরণ (Abstraction)। উপরোক্তভাবে বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি সুস্পষ্ট হলে আমরা ক্রমশ শুধুমাত্র এই সাদৃশ্যের দিকটিকে বস্তুগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে নি; পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যের দিকগুলিকে বর্জন করি।

৩। সামান্যীকরণ (Generalisation)। উপরোক্ত সাদৃশ্যের দিকই যে সমজাতীয় বস্তুর সাধারণ-লক্ষণ বা সামান্য-লক্ষণ সে-বিষয়ে আমরা সচেতন হই। যথা, সমস্ত পরিদৃষ্ট ঘটের মধ্যে যে-বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান সেই বিষয়ই ঘটত্বের লক্ষণ—অর্থাৎ, যেখানে সেই লক্ষণ বর্তমান সেইখানেই ঘট বর্তমান, বা সমস্ত ঘটের মধ্যে এই সাদৃশ্যগত দিকের জন্যই প্রতিটি ঘটের ঘট হিসাবে পরিচয়—এই কথা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি।

৪। নামকরণ (Naming)। সমস্ত সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে উপরোক্ত সাধারণ লক্ষণ বা সামান্য লক্ষণ বোঝাবার জন্য আমরা একটি নাম বা শব্দ-সংকেত আয়ত্ত

করি। যেমন, 'ঘট' নামটি দ্বারা ঘটত্ব বা সমস্ত ঘটের সামান্য লক্ষণ বোঝাবার আয়োজন করা হয়।

৩ ॥ ভাষা ও চিন্তা (Language and Thought)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, চিন্তার প্রধানতম সাধনী বলতে ধারণা এবং এই ধারণাগুলিকে বোঝাবার জন্য সংকেত। এই সংকেত বলতে প্রধানতই অবশ্য ভাষা—সাধারণ উচ্চারিত ভাষা, লিখিত ভাষা বা এমনকি মূক ও বধিরদের অঙ্গভঙ্গিমূলক ভাষা। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর—এতো গভীর যে নিঃসংশয়ে বলা যায়, অন্তত অধিকাংশ চিন্তার পক্ষে ভাষা অপরিহার্য বা অন্তত অধিকাংশ চিন্তাই ভাষার উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল।

ভাষার উপর চিন্তার এই নির্ভরতা থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন যে চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভাষা-ব্যবহার মাত্র, যদিও চিন্তার ক্ষেত্রে এই ভাষা-ব্যবহারের দিকটি অস্ফুট বা অব্যক্ত বা উহ্য থাকে। যেমন, চিন্তাকে বলা হয়েছে 'অনুচ্চারিত কথা-কওয়া' (subvocal talking), বা 'সংহত বাক্য-ব্যবহার' (restrained talking), বা 'অস্ফুট ভাষা-ব্যবহার' (implicit language activity)।

এই মতের সমর্থনে বলা যায়, অন্তত অধিকাংশ চিন্তার ক্ষেত্রে যেসব প্রতীক ব্যবহৃত হয় সেগুলি ভাষা-স্বরূপই—অর্থাৎ, উচ্চারিত শব্দ, লিখিত শব্দ-সংকেত বা অঙ্গভঙ্গিমূলক শব্দ-সংকেত। দৈনন্দিন জীবনের যে-কোন একটি চিন্তার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি তার মধ্যে ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের পরিচয় কত সুস্পষ্ট। অনেক সময় চিন্তা করা বলতে যেন নিজের সঙ্গে কথা কওয়াই—চলতি ভাষায় যেমন বলা হয়, 'মনে মনে কথা কওয়া', বা 'আপন মনে কথা কওয়া।' শিশুদের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা প্রায়ই কথা কইতে কইতে চিন্তা করছে—অর্থাৎ, পরিণত বয়সে চিন্তার সময় আমরা ভাষার দিকটি যেমন অনুচ্চারিত রাখি শিশুরা সবসময় তা রাখে না, তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই চিন্তা করে; অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলেই তারা ক্রমশ চিন্তার এই ভাষাগত দিকটি অনুচ্চারিত রাখতে অভ্যস্ত হয়। মূক ও বধিরদের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অঙ্গভঙ্গিমূলক ভাষা আয়ত্ত করার পর তারা যখন একা একা চিন্তা করে তখনো আঙুল প্রভৃতি নাড়িয়ে উক্ত অঙ্গভঙ্গিমূলক ভাষা আবৃত্তি করে চলে। সাধারণ ব্যক্তির দৈনন্দিন আচরণ থেকেও দেখা যায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় তারা অনেক সময় লেখার ভঙ্গিতে আঙুল নাড়ায় বা বই পড়বার ভঙ্গিতে চক্ষু-পেশী পরিচালনা করে। তাছাড়া, পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে যে নিঃশব্দে গণনা ও চিন্তা করার সময় আমরা সাধারণত জিভ ও গলার পেশীগুলিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সক্রিয় করে থাকি—

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জিভ ও গলার পেশীর এ জাতীয় সূক্ষ্ম ক্রিয়া পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব, চিন্তার সঙ্গে ভাষার নিকট সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেকে যেভাবে দাবি করেছেন যে, চিন্তা প্রকৃতপক্ষে অনুচ্চারিত বা অস্ফুট ভাষা ব্যবহার মাত্রই, সে দাবি অপরাপর মনোবিজ্ঞানীর মতে সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য হলেও অত্যন্ত উচ্চচিন্তার দৃষ্টান্তে ভাষা ব্যবহারের পরিচয় সংশয়াতীত নয় এবং অত্যন্ত নিম্নস্তরের চিন্তাক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার বস্তুত অনুপস্থিত। যেমন, অত্যন্ত উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ে চিন্তার পরিচয় দেখা যায় যে-বিষয়কে ব্যক্ত করার জন্য অর্থপূর্ণ ভাষা বা শব্দের ব্যবহার সম্ভব নয়; এই কারণে উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে নানা প্রকার সংকেতের ব্যবহার দেখা যায় এবং এই সংকেতগুলি ভাষা হিসাবে অর্থহীন। আবার জন্তু-জানোয়ারের নানা আচরণ থেকে অনুমান হয় যে তারা পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা উদ্ভাবনী শক্তি—অতএব কোন একরকম অস্ফুট চিন্তারও—পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে কুকুর ও বাঁদর ধরনের প্রাণী অন্তত স্থূল ও নিম্নস্তরের চিন্তার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু অবশ্যই তারা ভাষা ব্যবহার জানে না। তাদের উক্ত নিম্নস্তরের চিন্তা প্রতিরূপ-নির্ভর বলেই বিবেচিত। ফলে জন্তু-জানোয়ারের আচরণ থেকে অনুমান হয়, ভাষা ব্যবহার ব্যতিরেকেও প্রতিরূপ-ব্যবহারের সাহায্যেই কোন একরকম অস্ফুট চিন্তা সম্ভবপর।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, যদিও সাধারণ চিন্তা ভাষা ব্যবহারের উপর একান্তই নির্ভরশীল তবুও চিন্তামাত্রকেই অনুচ্চারিত বা অস্ফুট ভাষা ব্যবহার বলে বিবেচনা করায় অতিশয়োক্তির আশংকা ঘটে।

৪ ॥ বিশ্বাসের স্বরূপ ও কারণ (Nature and Grounds of Belief)

চিন্তার সাহায্যে আমরা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হই সে-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে—কিংবা যা আবিষ্কার করি বা উদ্ভাবন করি তার সম্বন্ধে—আমাদের মধ্যে একরকম নিশ্চয়তা-বোধও জন্মায়। এ-জাতীয় নিশ্চয়তা-বোধকে বিশ্বাস (Belief) বলা হয়। অবশ্য সমস্ত বিশ্বাসের মূলেই সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত চিন্তার পরিচয় নেই; আমরা একটু পরেই দেখবো, চিন্তা ছাড়া আরো নানা কারণে আমরা নানা বিষয়ে বিশ্বাস করে থাকি। কিন্তু বিশ্বাসের বিবিধ কারণ আলোচনার আগে বিশ্বাসের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন।

বিশ্বাস বলতে একরকম নিশ্চয়তা-বোধ বোঝায়—অর্থাৎ, যে-বিষয়ে বিশ্বাস করছি

সেই বিষয়ের বাস্তবতা সংক্রান্ত নিশ্চয়তা-বোধ। বিবিধ বিষয়ের বাস্তবতা সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধের—অর্থাৎ, বিবিধ বিষয়ে বিশ্বাসের—কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, ম্যালেরিয়ার কারণ একজাতীয় মশক-দংশন। অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে এ-জাতীয় নিশ্চয়তা-বোধ বর্তমান যে বাস্তব জগতে একজাতীয় মশার দংশনে বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর বিশ্বাস বলতে তাঁর কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ধারণার সঙ্গে বস্তুজগতের সংহতি সংক্রান্ত নিশ্চয়তা-বোধ, এবং এই নিশ্চয়তা-বোধের মূলে আছে তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তা। কিন্তু সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা ছাড়াও বিশ্বাস সম্ভব হতে পারে, যদিও সে-বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের সমতুল্য হবে না। যেমন, ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস। যে-ব্যক্তি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন তাঁর ক্ষেত্রেও দেখা যায় কয়েকটি ধারণার সঙ্গে বহির্বাস্তবের সংহতি সংক্রান্ত একরকম নিশ্চয়তা-বোধ বর্তমান—অর্থাৎ, তিনিও এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত যে ভূত-প্রেত প্রভৃতি বস্তুত বর্তমান আছে। কিন্তু তাঁর এই নিশ্চয়তা-বোধের মূলে বিজ্ঞানীর মত সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় নেই। কেননা, বিজ্ঞানী যে-রকম মশক-দংশন ও ম্যালেরিয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ (বা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা) করে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হন, ভূত-প্রেত-বিশ্বাসী সেইভাবে ভূত-প্রেত প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে এগুলির অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসে উপনীত হন না। অতএব দেখা যায়, সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিংবা অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আমরা অনেক সময় নানা রকম ধারণার সঙ্গে বস্তুজগতের সংহতি সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধে উপনীত হই এবং সেই নিশ্চয়তা-বোধকে বিশ্বাস বলে।

এই আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধ বা বিশ্বাসের নির্দিষ্ট লক্ষণ (Definition) নির্ণয়ের সম্ভাবনায় মনোবিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন, জেমস্ (James) মন্তব্য করেছেন, বিশ্বাস বা বাস্তবতা-বোধ সম্বন্ধে শুধুমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে তা এক অনুপম অনুভূতি-বিশেষ। তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা ধারণার বাস্তবতা সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে-ব্যক্তি বিশ্বাস করেন একজাতীয় বীজাণুর আক্রমণে বসন্ত রোগ হয়, তিনি সময়ে বসন্তর টীকা নিতে যান ; যিনি বিশ্বাস করেন শিতলাদেবীর প্রভাবে বসন্ত রোগ হয় তিনি শিতলাদেবীর পূজা দিতে যান। আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের গুরুত্ব সংক্রান্ত বহু দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই ; তার তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানকে আচরণ বলা হয় এবং এই আদান-প্রদানের রূপটি বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের ধারণার সঙ্গে বহির্জগতের সংহতি

সংক্রান্ত নিশ্চয়তা-বোধের উপর। এই কারণে মনোবিজ্ঞানে বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নানা কারণে আমাদের মধ্যে নানা রকম বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। এখানে কয়েকটি প্রধান কারণের আলোচনা করা যাক।

আমাদের বিশ্বাসের প্রধানতম উৎস বলতে প্রত্যক্ষই। এই কারণে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাসের সবচেয়ে অমোঘ প্রমাণ হিসাবে আমরা সাধারণত প্রত্যক্ষরই নজির দেখাই: যথা—'স্বচক্ষে দেখেছি', 'নিজের কানে শুনেছি', ইত্যাদি। বিশ্বাসের আর একটি উৎস বলতে অনেক সময় স্মৃতির উল্লেখ করা হয়। কিন্তু স্মৃতিমূলক বিশ্বাসকে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষমূলকই বলা যায়, কারণ অতীত-প্রত্যক্ষর পুনরুৎপাদনকেই স্মৃতি বলা হয়। কিন্তু আমাদের সমস্ত বিশ্বাসই প্রত্যক্ষমূলক নয়। প্রত্যক্ষ ছাড়াও বিশ্বাসের আর একটি প্রধান উৎস বলতে অনুমান ও আপ্ত-বচন। যেমন, পাহাড়ে ধুঁয়ো প্রত্যক্ষ করেই আমরা বিশ্বাস করি পাহাড়ে আগুন বর্তমান; এই আগুন প্রত্যক্ষগোচর নয়, কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস অনুমান-লব্ধ। তেমনি, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যে নির্ভর করেও আমরা নানা বিষয়ে বিশ্বাস করে থাকি। যেমন, মিশরের পিরামিড প্রত্যক্ষ না করেও নির্ভরযোগ্য পরিব্রাজকের কথায় নির্ভর করে আমরা পিরামিডের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বিশ্বাসের আর একটি উৎস হল অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ (Inseparable Association)—অর্থাৎ, বহু দৃষ্টান্তে একাধিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে ঘটলে আমরা সেই বিষয়গুলির মধ্যে কোন একরকম বাস্তব সম্বন্ধে বিশ্বাসী হই; কিন্তু এ-জাতীয় বিশ্বাস অনেক সময় বিজ্ঞানসম্মত হলেও অনেক সময়েই অবৈজ্ঞানিক হতে পারে। যেমন, মেঘ ও বৃষ্টির সম্বন্ধ সংক্রান্ত আমাদের বিশ্বাসটি বিজ্ঞানসম্মত; কিন্তু আকাশে ধূমকেতু-দর্শন ও পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটা—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংক্রান্ত লৌকিক বিশ্বাসটি অবৈজ্ঞানিক। এ-জাতীয় অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের আরো কয়েকটি কারণ হিসাবে অভিভাবন (Suggestion), আবেগ-অনুভূতি এবং সামাজিক পরিবেশের উল্লেখ করা যায়। যেমন, খবরের কাগজ ও রাজনৈতিক প্রচার মূলক বক্তৃতায় বারবার একই অসত্য কথা শুনতে শুনতে অভিভাবনের প্রভাবে আমরা সেই অসত্যকে অনেক সময় সত্য বলেই স্বীকার করি বা বিশ্বাস করি। তেমনি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহমমতা প্রভৃতি আবেগ-অনুভূতির প্রভাবেও আমরা অনেক সময় নিজ সন্তানের অবাস্তব নির্দোষীতায় বিশ্বাস করি। আবার, সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নানা ব্যবস্থার ফলে আমাদের মনে নানা রকম অমূলক বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুভূতি (Feeling) ও আবেগ (Emotion)

১॥ অনুভূতির স্বরূপ (Nature of Feeling)

দৈনন্দিন জীবনে অনুভূতি শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনেক সময় বলি, 'অন্ধকারে একটি মসৃণ ও শীতল বস্তুর অনুভূতি হল'। এখানে অনুভূতি শব্দ বস্তুত একরকম স্পর্শ-সংবেদনেরই বোধক। কিন্তু যখন বলি, 'সুখের অনুভূতি', 'দুঃখের অনুভূতি', 'শোকের অনুভূতি', 'ভয়ের অনুভূতি', ইত্যাদি, তখন অনুভূতি শব্দের অর্থ তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক ও নিশ্চেষ্ট এবং প্রায়ই সুখদুঃখাত্মক বা উত্তেজনা-মূলক কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থা। এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার কয়েকটি মূর্ত দৃষ্টান্ত—

সুখ, আনন্দ, মজা, স্ফূর্তি, প্রফুল্লতা, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, আত্মহারা-ভাব…
দুঃখ, বিষাদ, অসন্তোষ, শোক, বিরাগ, হতাশা…
প্রত্যাশা, আগ্রহ, সাহস…
বিরক্তি, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ…
উৎকণা, দুশ্চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক…
স্নেহ, মমতা, প্রেম, কামনা…

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুভূতি নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা হয়েছে, এগুলি—(১) তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক, (২) তুলনায় নিশ্চেষ্টতার পরিচায়ক, (৩) সাধারণত সুখ-দুঃখাত্মক, এবং (৪) প্রায়ই উত্তেজনামূলক। একে একে বৈশিষ্ট্যগুলির তাৎপর্য দেখা যাক।

(১) অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক। কিসের তুলনায়? বিশেষত সংবেদন ও প্রত্যক্ষর তুলনায়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে প্রধানতই বহির্বস্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে; তাই সংবেদন ও প্রত্যক্ষ মূলতই বস্তুকেন্দ্রিক। যেমন, সামনে বাঘ থাকলে বাঘেরই প্রত্যক্ষ হবে, অপর কোন কিছুর প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে বহির্বস্তু প্রত্যক্ষকারীর উপর একরকম বাধ্যবাধকতার ভাব প্রয়োগ করে। কিন্তু ব্যাঘ্রান্বেষী শিকারী জঙ্গলে বাঘ দেখলে উৎফুল্ল বা আনন্দিত হন; সেই বাঘ দেখেই পথিক ভীত বা

আতঙ্কিত হন। অতএব, আনন্দের অনুভূতি বা আতঙ্কের অনুভূতি শুধুমাত্র বহির্জগতের বস্তুটির উপরই নির্ভর করে না ; তা বহুলাংশে নির্ভর করে অনুভবকারীর উপর। এই কারণে সংবেদন ও প্রত্যক্ষর তুলনায় অনুভূতিকে আত্মকেন্দ্রিক বলা হয়। কিন্তু অনুভূতিকে এইভাবে তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক বলে বিবেচনা করলেও এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণত অনুভূতি অনেকটা পরগাছার মতো—অর্থাৎ, এগুলি কোন-না-কোন সংবেদন বা কোন-না-কোন ধারণাকে আশ্রয় করে থাকে। যেমন, 'খেতে ভাল লাগল'—এখানে ভাল লাগার অনুভূতিটি রাসন ও ঘ্রাণ সংবেদনের উপর নির্ভরশীল ; কিংবা, সাপ দেখে ভয় পেলাম—এখানে সর্প-প্রত্যক্ষ বিপদের ধারণা উদ্বুদ্ধ করে এবং ভয়ের অনুভূতিটি সেই বিপদের ধারণার উপরই নির্ভরশীল। অতএব, আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও সাধারণত তা সংবেদন বা ধারণার উপর নির্ভরশীলও।

(২) অনুভূতি তুলনায় নিশ্চেষ্টতারও পরিচায়ক। কিসের তুলনায়? ইচ্ছা, সংকল্প, কর্ম প্রভৃতির তুলনায়। ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি মূলতই আভ্যন্তরীণ চেষ্টার পরিচায়ক। কিন্তু কোন একটি সংবাদ আমাদের মধ্যে শোকের সঞ্চার করবে না আনন্দের সঞ্চার করবে তা আমাদের চেষ্টা বা প্রয়াসের উপর নির্ভর করে না। বস্তুত আমরা অনেক সময় বিশেষ চেষ্টা বা প্রয়াস করেও শোক বা বিষাদের অনুভূতি কাটাতে বা দূর করতে পারি না। তাই অনুভূতি নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিশ্চেষ্টতারই পরিচায়ক। কিন্তু এইখানে মনে রাখা দরকার যে আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে অনুভূতি তুলনায় নিষ্ক্রিয়তার বা নিশ্চেষ্টতার পরিচায়ক হলেও অনুভূতির প্রভাবে এবং অনুভূতির আকর্ষণে বা বিকর্ষণে আমরা প্রায়ই কর্মে প্রণোদিত হই। যেমন, ভয় পেলে আমরা দৌড়ে পালাই, (গান শুনে) ভাল লাগার আকর্ষণে গানের আসরে যাই, খারাপ লাগার বিকর্ষণে দুর্গন্ধ পেলে নাকে রুমাল চাপা দিই।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতিগুলি সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক। যেমন, সুখাদ্য খেতে ভাল লাগে। এখানে রাসন ও ঘ্রাণ সংবেদন ছাড়াও 'ভাল লাগা' বলে যে-বাড়তি আভ্যন্তরীণ অবস্থা তা এক রকম অনুভূতি। এই অনুভূতিটি সুখাত্মক। তেমনি, তেতো ওষুধ খেতে খারাপ লাগে। এখানে 'খারাপ লাগা' বলে অনুভূতিটি দুঃখাত্মক।

(৪) অনুভূতি অনেক সময় আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার পরিচায়ক। যেমন, ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতির দৃষ্টান্তে আমাদের অভ্যন্তরে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হয়।

অতএব সংক্ষেপে বলা হয়েছে, অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক ও নিশ্চেষ্ট এবং

প্রায়ই সুখদুঃখাত্মক বা উত্তেজনামূলক আভ্যন্তরীণ অবস্থাবিশেষ। কিন্তু এই উক্তিকে অনুভূতির সংজ্ঞা বলে বিবেচনা না-করে এক রকম বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। বস্তুত অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে অনুভূতি এমনই জটিল আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে তার নিখুঁত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়।

২॥ অনুভূতি সম্বন্ধে ভুণ্ড্ট্-এর 'ত্রিমাপ মত' (Wundt's Tridimensional Theory of Feeling)

আমাদের বহু বিচিত্র অনুভূতির জটিলতাকে বিজ্ঞানসুলভ ও তুলনায় সহজভাবে বোঝবার উদ্দেশ্যে আধুনিক পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ভুণ্ড্ট্ (Wundt) একটি মত প্রস্তাব করেছিলেন। এই মতকে অনুভূতি সংক্রান্ত 'ত্রিমাপ মত' বলা হয়। একটি তুলনার সাহায্যে মতটি বোঝা সহজ হবে। আকাশের একটি উড়ন্ত বিমান ঠিক কোথায় আছে—অর্থাৎ তার অবস্থিতি-নির্দেশক হিসাবে—তিন রকম মাপ বা ডাইমেন্‌সনের (Dimension) উল্লেখ প্রয়োজন। যথা: ল্যাটিটিউড্ (Latitude), লন্‌জিটিউড্ (Longitude) এবং উচ্চতা (Altitude)। একটি উড়োজাহাজ বর্তমানে কত ল্যাটিটিউড্, কত লন্‌জিটিউড্ এবং কত উচ্চতায় আছে তা জানতে পারলে আমরা উড়োজাহাজটির অবস্থিতি সংক্রান্ত সুনিশ্চিত ধারণা পাব। ভুণ্ড্ট্ মনে করেন, অনেকটা এইভাবেই তিন রকম মাপের সাহায্যে আমরা যে-কোন অনুভূতির স্বরূপ নির্ভুল বা নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে পারবো। অনুভূতির ক্ষেত্রে এই তিন রকম মাপ বলতে কী কী? ভুণ্ড্ট্ বলেন, (১) সুখ-দুঃখের (Pleasantness-Unpleasantness) মাপ, (২) উত্তেজনা-অসাড়তার (Excitement-Numbness) মাপ এবং (৩) টান-মুক্তির (Tenseness-Release) মাপ। অর্থাৎ, ভুণ্ড্ট্-এর মতে সমস্ত অনুভূতিকেই এই তিনভাবে মাপা যায়। কল্পনা করা যাক, আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে এমনভাবে সারিবদ্ধ করা সম্ভব যার এক প্রান্তে চরম সুখ ও অপর প্রান্তে চরম দুঃখ—চরম সুখের পর তুলনায় কম সুখ, তারপর তুলনায় আরো কম সুখ,......ইত্যাদি, ইত্যাদি; এইভাবে সুখের মাত্রা কমতে কমতে সারিটির মাঝামাঝি কোন এক নিরপেক্ষ অনুভূতি, যা না-সুখ না-দুঃখ; তারপর এই সারিতে ক্রমবর্ধমান দুঃখের অনুভূতিগুলি যেন পরপর সাজানো এবং এই সারির শেষ প্রান্তে চরম দুঃখের অনুভূতি। ভুণ্ড্ট্ বলবেন, আমাদের যে-কোন অনুভূতির স্থান এই জাতীয় সারির কোথাও না কোথাও হতে বাধ্য এবং কোন-একটি অনুভূতির প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে জানা দরকার সেই অনুভূতিটির স্থান এ-জাতীয় সারির ঠিক কোথায়—অর্থাৎ, তা কতটা সুখের বা কতটা দুঃখের।

এইভাবে, সুখ-দুঃখের মাপের সাহায্যে অনুভূতিটিকে মাপা সম্ভব এবং মাপা প্রয়োজনও। ভুণ্ড্ট্-এর মতে একইভাবে উত্তেজনা-অসাড়তা এবং টান-মুক্তির মাপের সাহায্যেও প্রতি অনুভূতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব এবং পাওয়া প্রয়োজনও অর্থাৎ, জানা দরকার প্রতিটি অনুভূতি উত্তেজনার বা অসাড়তার কতটা কাছাকাছি এবং তা টান বা মুক্তিরও কতটা কাছাকাছি। এই তিন দিক থেকে কোন অনুভূতির পরিচয় পেলে পর অনুভূতিটির স্বরূপ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ড্ট্-এর এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন কিন্তু উড্ওয়ার্থ মন্তব্য করছেন, মতবাদটির কিছু মূল্য স্বীকার করতে হবে, যদিও একথা মনে করা যায় না যে ভুণ্ড্ট্-এর এই সহজ সরল পরিকল্পনাটির সঙ্গে অনুভূতি সংক্রান্ত সমস্ত জটিল তথ্যই সহজে খাপ খেয়ে যায়। কেননা, অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য ভুণ্ড্ট্-প্রস্তাবিত তিনটি মাপ ছাড়াও আরো মাপের প্রয়োজন হতে পারে যেমন, জানা-অজানা বা চেনা-অচেনার (Familiarity-Strangeness) দিক থেকেও উপরোক্তভাবে অনুভূতির মাপ সম্ভব।

৩ ॥ অনুভূতির সর্ত (Conditions of Feeling); সুখ-দুঃখানুভূতির নিয়ম (Laws of Pleasure and Pain)

ভুণ্ড্ট্-এর উপরোক্ত মত মনোবিজ্ঞানী মহলে সর্ববাদী সম্মত না-হলেও অন্তত এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে অনুভূতি অল্প-বিস্তর সুখাত্মক বা অল্প-বিস্তর দুঃখাত্মক। অর্থাৎ, সাধারণত অনুভূতি মূলতই সুখের অনুভূতি বা দুঃখের অনুভূতি অতএব প্রশ্ন ওঠে, কোন অনুভূতি কেন মূলত সুখের অনুভূতি হয়, আবার কোন অনুভূতি কেন মূলত দুঃখের অনুভূতি হয় ?

সুখ-দুঃখের কারণ ব্যাখ্যায় সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা মোটের উপর তিনটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। যথা :

(১) উদ্দীপন সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Stimulation)। অর্থাৎ, উদ্দীপনের তীব্রতা পরিমিত হলে সুখানুভূতি হয় ; উদ্দীপনের তীব্রতা অপরিমিত হলে—অর্থাৎ উদ্দীপক অত্যধিক তীব্র বা অত্যন্ত দুর্বল হলে—দুঃখানুভূতি হয়। যেমন, খাবারে নুন পরিমিত হলে ভাল লাগে ; কিন্তু নুন খুব বেশী হলে বা খুব কম হলে খারাপ লাগে। কিংবা, নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা আরামদায়ক; কিন্তু অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্ম পীড়াদায়ক।

(২) পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Change)। অর্থাৎ, উদ্দীপনের বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন সুখদায়ক, বৈচিত্র্যহীনতা বা পরিবর্তনের অভাব অপ্রীতিকর বা দুঃখদায়ক। যেমন, অনেকক্ষণ একঘেঁয়ে সুর শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু সুরের

বৈচিত্র্য প্রীতিকর হয়। কিংবা, চলতি কথায় যেমন বলা হয়, শুধু মিষ্টি খেতে খেতে 'মুখ মেড়ে যায়'; তখন মিষ্টির পর একটু ঝাল বা টক খেতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার যে উদ্দীপনের পরিবর্তন অতিক্রুত বা এলোমেলো ভাবে ঘটলে তাও আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক বা দুঃখকর হয়। যেমন, কেউ যদি রেডিওতে এলোমেলোভাবে স্টেসন বদলে চলেন তাহলে শব্দ-সংবেদন আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হয়।

(৩) সামঞ্জস্যের নিয়ম (Law of Harmony)। অর্থাৎ, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ছন্দবদ্ধ উদ্দীপন প্রীতিকর হয়, উদ্দীপনে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটলে তা অপ্রীতিকর হয়। যেমন, খাদ্যদ্রব্যে নুন, মিষ্টি প্রভৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে তা ভাল লাগে; না-থাকলে খারাপ লাগে। তেমনি, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ছন্দবদ্ধ ধ্বনি প্রীতিকর হয়; কিন্তু অনেকে একসঙ্গে নানা স্বরে চীৎকার করলে ধ্বনি পীড়াদায়ক হয়।

৪॥ সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত মতবাদ (Theories of Pleasure and Pain)

উপরোক্ত নিয়মগুলি থেকে আমরা মোটের উপর বুঝতে পারি, কী কী সর্ত মানলে একটি উদ্দীপন প্রীতি বা অপ্রীতির সঞ্চার করে, অর্থাৎ সুখানুভূতি দেয় বা দুঃখানুভূতি দেয়। কিন্তু তা থেকে সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতির মূল কারণ ব্যাখ্যাত হয় না। যথা: উদ্দীপক পরিমিত হলে আমরা সুখানুভূতি পাই। কিন্তু কেন পাই? কিংবা, অতি তীব্র বা অতি দুর্বল উদ্দীপক আমাদের কাছে অপ্রীতিকর। কিন্তু কেন অপ্রীতিকর? উপরোক্ত নিয়মগুলি থেকে এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, অনুভূতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আরো মৌলিক প্রশ্ন বাকি থাকে। সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির সর্তগুলি মোটের উপর বোঝা গেলেও সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির প্রকৃত কারণ বোঝা যায় না। যে-সর্তগুলি মানলে অনুভূতি সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক হচ্ছে সেই সর্তগুলি মানার ফলে অনুভূতি কেন সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক হচ্ছে—এই প্রশ্নেরও মীমাংসা প্রয়োজন।

কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিজ্ঞানীরা একমত নন। মোটের উপর বলা যায়, তিনটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সমাধান প্রস্তাবিত হয়েছে। যথা:—(১) 'বিশুদ্ধ' মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ, (২) শরীরবিজ্ঞানের—বিশেষত স্নায়ুবিজ্ঞানের—দৃষ্টিকোণ, এবং (৩) জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ।

'বিশুদ্ধ' মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্টাউট (Stout) বলছেন, যা প্রয়াস বা ইচ্ছার সহায়ক তাইই সুখদায়ক; যা প্রয়াস বা ইচ্ছার পরিপন্থী তাইই দুঃখদায়ক। শরীরবিজ্ঞানের—বিশেষত স্নায়ুবিজ্ঞানের—দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে,

প্রয়াসমাত্রেই কোন-না-কোন ভাবে স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে ; যা-কিছু এই ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় তাইই আমাদের কাছে সুখদায়ক, যা-কিছু এই ভারসাম্যের বিরোধিতা করে তাইই দুঃখদায়ক। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দাবি করা হয়েছে, জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তির সহায়ক হলেই একটি উদ্দীপন সুখদায়ক হয়, জীবনীশক্তির পরিপন্থী উদ্দীপনগুলি আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক।

এই তিনটি মতবাদের কোন-একটির উপর ঐকান্তিকভাবে নির্ভর করা সম্ভব না-হলেও তিনটির মূলেই যে সত্য বর্তমান তাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কর্ম-প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হলে আমরা সুখ অনুভব করি, বাধাপ্রাপ্ত হলে অনুভব করি দুঃখ ; সাধারণভাবে এই উক্তি স্বীকারযোগ্য হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে কর্ম-প্রবৃত্তি কোন 'বিশুদ্ধ' মানসিক অবস্থা নয়—শরীরের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের উপর তা নির্ভরশীল। অতএব, সুখ ও দুঃখানুভূতির ব্যাখ্যায় কোন 'বিশুদ্ধ' মানসিক মতবাদের পরিবর্তে সুখ-দুঃখ জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্নায়ুতন্ত্রমূলক ভিত্তির কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। অতএব, উপরোক্ত দ্বিতীয় মতটিও সুখদুঃখানুভূতির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করে। তেমনি মানবজাতি প্রাণিজগতেরই অন্তর্ভুক্ত ; তাই মানুষের দেহযন্ত্রকে (অতএব স্নায়ুতন্ত্রকেও) পূর্ণতরভাবে বোঝার জন্য সামগ্রিক প্রাণিজগতের নিয়ম—বিশেষত ক্রমবিবর্তনের নিয়ম—মনে রাখা প্রয়োজন। অতএব উপরোক্ত তৃতীয় মতটিকেও প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টি যেমন প্রথমটির পরিপূরক তেমনিই তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টির পরিপূরক। তিনটির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কিন্তু কোন একটির উপরও একান্তভাবে নির্ভর করা ঠিক নয়।

৫ ॥ সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা

দার্শনিকদের মধ্যে সুখ ও দুঃখ প্রসঙ্গে একরকম বিতর্ক বা মতান্তর আছে। সম্প্রদায়বিশেষের দার্শনিকেরা দাবি করেন, জগতে দুঃখই মৌলিক, দুঃখই সত্য। সর্বং দুঃখং। দুঃখের সাময়িক অভাবকেই আমরা সুখ বলে মনে করি। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা দুঃখবাদী নামে খ্যাত। কিন্তু সম্প্রদায়ান্তরের দার্শনিকেরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, সুখই মৌলিক, সুখই সত্য। সুখের সাময়িক অভাবকে আমরা দুঃখ বলে মনে করি। স্বভাবতই এই দার্শনিকেরা সুখবাদী নামে খ্যাত। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-তর্ক প্রাসঙ্গিক নয়।

আমাদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা হিসাবে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সত্য, উভয়ই মৌলিক ; একটিকে অপরটির অভাবমাত্র বিবেচনা করার কারণ নেই।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত প্রকৃতপক্ষে প্রাসঙ্গিক সমস্যা বলতে প্রধানত দুটি :—(১) সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ কোন অনুভূতি সম্ভব কি না? (২) কোন অনুভূতিকে সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ বলা যায় কি না?

(১) নিরপেক্ষ অনুভূতির সমস্যা। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ভুণ্ড্‌ট্‌-এর (Wundt) মতে সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ অনুভূতি সম্ভব। কেননা তিনি অনুভূতির ত্রিবিধ মাপের মধ্যে প্রথম মাপটির ব্যাখ্যায় সমস্ত অনুভূতিকে এমন এক সারিতে সাজাবার প্রস্তাব করেছেন যার একপ্রান্তে (চরম) সুখ, অপরপ্রান্তে (চরম) দুঃখ, এবং এই সারির মাঝামাঝি যে-অনুভূতি তা না-সুখের, না-দুঃখের—অর্থাৎ, তা সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ। কিন্তু অনুভূতির ত্রি-মাপ সম্বন্ধীয় মতটির মূল্য স্বীকার করেও এবং অনুভূতিগুলিকে এ-জাতীয় সুখ-দুঃখের কোন সারিতে সাজাবার কল্পনা সুবিধাজনক বলে গ্রহণ করেও বলা যায়, অনুভূতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার নিয়মও বর্তমান। এই নিয়ম অনুসারে, অতি-তীব্র সুখের অনুভূতির তুলনায় কম-তীব্র সুখের অনুভূতি আপেক্ষিকভাবে দুঃখকর, বা, অতি-তীব্র দুঃখের অনুভূতির তুলনায় অল্প-তীব্র দুঃখের অনুভূতি আপেক্ষিকভাবে সুখকর। অতএব, উপরোক্ত সারির মধ্যবর্তী তথাকথিত নিরপেক্ষ অনুভূতি আমাদের কাছে তীব্র সুখানুভূতির তুলনায় দুঃখানুভূতি বলেই প্রতীত হবে, আবার তীব্র দুঃখানুভূতির তুলনায় সুখানুভূতি বলেই প্রতীত হবে। ফলে, বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসাবে কোন অনুভূতিই আমাদের কাছে সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ নয় ; বরং কম-বেশি সুখের বা দুঃখের অনুভূতিই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতের আলোচনা প্রয়োজন। বেন্ (Bain) প্রমুখ চিন্তাশীলেরা দাবি করেছেন, বিস্ময়ানুভূতি সম্বন্ধে সুখ-দুঃখের বিচারই প্রাসঙ্গিক নয়। অর্থাৎ, বিস্ময়বোধ একরকমের অনুভূতি হলেও তা না-সুখের, না-দুঃখের। এই অর্থে বিস্ময়ানুভূতি সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ। কিন্তু এইভাবে বিস্ময়ানুভূতিকে সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করা যায় কি না—সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, অবস্থাভেদে বিস্ময়ানুভূতি বস্তুত সুখেরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে। বিদেশ থেকে বন্ধুর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে আমরা বিস্ময়বোধ করি ; সার্কাসে অসামান্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখতে দেখতে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এ-জাতীয় বিস্ময় অবশ্যই সুখকর। বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে বা প্রিয় খেলোয়াড়ের আকস্মিক ভ্রমজনিত পরাজয়েও আমরা বিস্ময়বোধ করি ; কিন্তু সে-বিস্ময় বেদনা-

দায়ক বা দুঃখানুভূতিই। অতএব, অবস্থাভেদে বিস্ময়ানুভূতি হয় সুখানুভূতি না-হয় দুঃখানুভূতিই—সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ অনুভূতি নয়।

(২) মিশ্র অনুভূতির সমস্যা। অনেকের মতেই সুখ ও দুঃখ একান্তভাবেই পরস্পর-বিরোধী ; তাই আগুন আর জল যেমন একত্রে থাকে না তেমনি কোন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির একত্র সমাবেশ বা মিশ্রণ সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall), স্টাউট্ (Stout) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এ-জাতীয় মতের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতির মিশ্রণ বস্তুত দেখা যায়। যেমন, জাহাজ ছাড়ার সময় উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রী ছাত্রের অভ্যন্তরে একদিকে যেমন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে যাবার বেদনা জাগে অপরদিকে তেমনি বিদেশ-দর্শন এবং উচ্চ-শিক্ষালাভের সম্ভাবনা-জনিত সুখেরও অনুভূতি হয়। অতএব, সুখ-দুঃখকে আগুন ও জলের মতো পরস্পর-বিরোধী বিবেচনা করে উভয়ের একত্র সমাবেশ বা মিশ্রণকে অসম্ভব বলার কারণ নেই। বস্তুত কবি ও অন্যান্য সাহিত্যিকেরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেই নানা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

৬ ॥ আবেগ (Emotion)

অনুভূতিকে অনেক সময় দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—(১) সংবেদনা-শ্রয়ী অনুভূতি (Sense-feeling) এবং (২) আবেগ (Emotion)। সংবেদনাশ্রয়ী অনুভূতি সংবেদনের উপর নির্ভরশীল, আবেগ নির্ভর করে ভাবনার (Idea) উপর। যেমন, সুস্বাদু খাবার খেয়ে ভাল লাগে। এই 'ভাল লাগা' বা সুখানুভূতি রাসন-সংবেদন ও ঘ্রাণ-সংবেদনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিপদের ধারণা থেকে আমরা ভয় পাই, অপমানের ধারণা থেকে আমাদের ক্রোধ হয়। অতএব ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে আবেগ বলা হবে। অবশ্য আবেগও পরোক্ষভাবে বা শেষ পর্যন্ত কোন সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। যেমন, সাপ দেখে ভয় পেলাম, অপমানজনক কথা শুনে ক্রোধ হল। অর্থাৎ, সর্প-সংবেদন বিপদের ধারণা উদ্বুদ্ধ করল এবং বিপদের এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হল ভয়। কিংবা, শব্দ-সংবেদন উদ্বুদ্ধ করল অপমানের ধারণা এবং অপমানের এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হল ক্রোধ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবেগ এইভাবে শেষ পর্যন্ত কোন সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ধারণাকেই তার প্রকৃত কারণ বলা প্রয়োজন। চিড়িয়াখানায় সাপ দেখে আমরা ভয় পাই না ; কেননা সাপের এই সংবেদন আমাদের মধ্যে বিপদের ভাবনা উদ্রেক করে না। কিন্তু খোলা মাঠে বা জঙ্গলে সাপ দেখলে আমরা ভয়

পাই। কেননা, সাপের সেই সংবেদন বিপদের ভাবনা উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, সাপের সংবেদনই ভয় নামের আবেগটির কারণ নয়। আবেগটির প্রকৃত কারণ হল বিপদের ভাবনা বা ধারণা। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আবেগ পরোক্ষভাবেও সংবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন, মৃত বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে শোক হয়। এখানে শুধুমাত্র ভাবনাই শোকের কারণ।

সংবেদনাশ্রয়ী অনুভূতি তুলনায় সরল আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সাধারণত তা সুখ-দুঃখ জাতীয়ই। কিন্তু আবেগ অত্যন্ত জটিল আভ্যন্তরীণ অবস্থা—সরল সুখ-দুঃখ ছাড়াও আবেগের সময় আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাছাড়া, আবেগের সঙ্গে কর্মপ্রবৃত্তির সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। যেমন, মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিলে—অর্থাৎ, কর্মপ্রবৃত্তি ব্যাহত হলে—জীবজন্তু ক্রুদ্ধ হয়। কর্মপ্রবৃত্তির উপর আবেগের এ-জাতীয় নির্ভরতার দিক থেকেই স্টাউট্ (Stout) মন্তব্য করেছেন, আবেগগুলি পরগাছা বা পরজীবীর মতোই।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে আবেগের সঙ্গে নানারকম দৈহিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন চলতি কথায় বলি, 'রাগে থরথর করে কাঁপছি', 'ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে', ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবেগের স্বরূপ বোঝার জন্য দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার এই সম্বন্ধের দিকটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৭ ॥ আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন

আবেগের অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে কত জটিল ও গভীর পরিবর্তন ঘটে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় ৪০০০ মার্কিন বৈমানিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নিদারুণ বিপদের অবস্থায় তাঁদের কী রকম শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। উত্তরে তাঁরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। যথা : শতকরা ৮৬ জন বলেন, হৃৎযন্ত্র এবং ধমনী 'ধড়াস-ধড়াস্' (pounding) করার অভিজ্ঞতা হয়; শতকরা ৮৩ জন বলেন, পেশী টানটান (tense) হয়ে যায়; শতকরা ৮০ জন মুখ ও গলা শুকিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; শতকরা ৭৯ জন বলেন, শরীর ঘর্মাক্ত হয় (nervous perspiration বা 'cold sweat'); শতকরা ৭৬ জনের 'পেট ঘুলিয়ে ওঠার' অভিজ্ঞতা হয়; শতকরা ৬৫ জন বলেন, বারবার মূত্রত্যাগের প্রয়াস হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায়, 'ভয়' নামের আবেগের সঙ্গে কত রকম শারীরিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ও প্রকট। রাগ, শোক প্রভৃতি আবেগ-অবস্থা পরীক্ষা

করলেও এ-জাতীয় নানা শারীরিক পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। আবেগের সঙ্গে বর্তমান থাকে বলেই এই জাতীয় দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে 'আবেগ-সহচর' আখ্যা দেওয়া যায়।

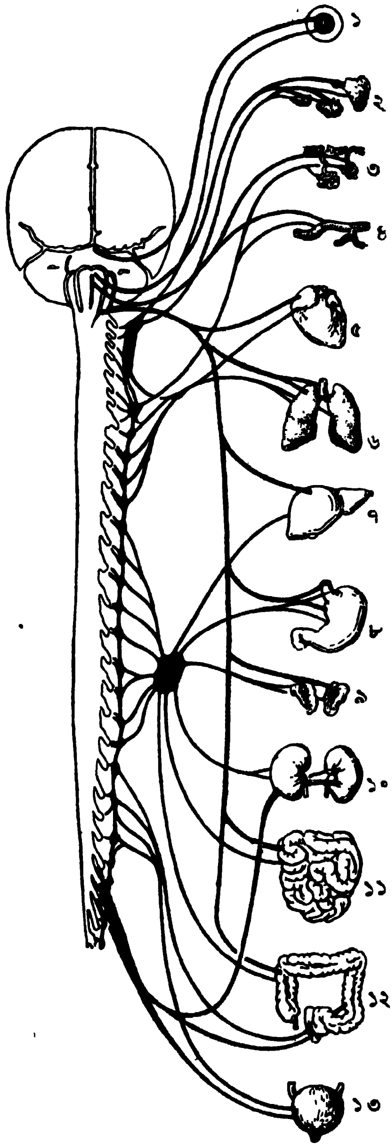
আবেগ-সহচর এই শারীরিক পরিবর্তনগুলি প্রধানতই 'স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র'র (Autonomic Nervous System) উপর নির্ভরশীল বা স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের একাংশকে স্বতঃক্রিয় (Autonomic) আখ্যা দেওয়া হয়, কেননা স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System) থেকে মোটের উপর স্বাধীনভাবেই কাজ করে। তাই স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ শরীরে যে-সব পরিবর্তন সৃষ্টি করে সেগুলিকেও স্বাধীন বা স্বতঃক্রিয় পরিবর্তন (Autonomic Changes) আখ্যা দেওয়া হয়।

অনেকগুলি বহির্মুখী স্নায়ু মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের নানা অংশ থেকে শরীরের নানা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এই স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র গঠন করেছে। স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রটি প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত—এক ভাগের নাম সিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র (Sympathetic System), অপর ভাগের নাম প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র (Para-sympathetic System)। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অংশ মিলে প্রথম বা সিম্‌প্যাথেটিক্ ভাগটি গঠিত; স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যবর্তী অংশটি দ্বারাই দ্বিতীয় বা প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ ভাগটি গঠিত। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থান থেকে যে-বহির্মুখী স্নায়ুগুলি শরীরের নানা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত সেগুলি মিলে সিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র গঠিত; অপরপক্ষে, সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ থেকে যে-বহির্মুখী স্নায়ুগুলি শরীরের ঐ বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত সেগুলি মিলে প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল, শরীরের এই আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির সঙ্গে স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বিবিধ যোগাযোগ বর্তমান—অর্থাৎ, এই অঙ্গগুলির সঙ্গে সাধারণত একদিকে সিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্রের স্নায়ুগুলি সংযুক্ত, অপরদিকে আবার প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্রের স্নায়ুগুলিও সংযুক্ত। অতএব, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের উভয় ভাগই এই অঙ্গগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে বা এই অঙ্গগুলিকে পরিচালিত করে। কিন্তু একই রকম প্রভাব নয়; আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির উপর সিম্‌প্যাথেটিক্ এবং প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্রের প্রভাব সাধারণত পরস্পরবিরোধী বা বিপরীত ধরনের। যেমন, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দু'টি ভাগের মধ্যে যখন সিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র তুলনায় বেশী প্রভাবশালী হয় তখন লালা-গ্রন্থিগুলির (Salivary Glands) কার্য অবদমিত হয় (লালা ক্ষরণ বন্ধ হয়—তাই গলা ও মুখ শুকিয়ে যায়), হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করে);

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র

লাল রঙের রেখাগুলির সাহায্যে সিম্‌প্যাথেটিক্ (Sympathetic) এবং কালো রেখাগুলির সাহায্যে প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ (Para-sympathetic) তন্ত্রর স্নায়ু বোঝান হচ্ছে। সিম্‌প্যাথেটিক্ ও প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্রর স্নায়ুগুলি যে-সব অঙ্গর উপর পরস্পর-বিরোধী প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির তালিকা :

(১) চোখের তারারন্ধ্র (Pupil)
(২) লালা-গ্রন্থি (Salivary Glands)
(৩) স্বেদ-গ্রন্থি (Sweat Glands)
(৪) রক্তবাহ (Blood Vessels)
(৫) হৃৎযন্ত্র (Heart)
(৬) ফুসফুস (Lungs)
(৭) যকৃৎ (Liver)
(৮) পাকস্থলী (Stomach)
(৯) আড্রীনাল্ গ্রন্থি (Adrenal Gland)
(১০) কিড্‌নি (Kidneys)
(১১) ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine)
(১২) কোলোন্ (Colon)
(১৩) মূত্রবস্তি (Bladder)



যে-সব শিরা-উপশিরা বা রক্তবাহ (Blood Vessel) দিয়ে রক্ত পেটের ভিতরকার পচনতন্ত্র (Digestive System) পর্যন্ত পরিচালিত হয় সেগুলি সংকুচিত হয় (Vasoconstriction)—ফলে সাময়িকভাবে স্তিমিত হয় হজমের কাজ ; যে-সব শিরা-উপশিরা বা রক্তবাহ (Blood Vessel) দিয়ে বহিরাবয়বের পেশীগুলিতে রক্তচলাচলের ব্যবস্থা সেগুলি বিস্ফারিত হয়, ফলে বহিরাবয়বের পেশীগুলির সক্রিয়তা—অতএব, অবয়ব-পরিচালনাও—সাময়িকভাবে বেড়ে যায় ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। অপরপক্ষে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্র তুলনায় বেশী সক্রিয় বা প্রভাবশালী হলে শরীরের উপরোক্ত অঙ্গগুলির উপর বিপরীত প্রভাব দেখা দেয় : লালা উৎপাদক গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হয়, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া তুলনায় শান্ত হয়, পচনতন্ত্রের রক্তবাহগুলি বিস্ফারিত হয় (Vasodilation) ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। (কিন্তু মনে রাখা দরকার, সিম্প্যাথেটিক্ ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের প্রভাব মোটের উপর বা সাধারণভাবে পরস্পরবিরোধী হলেও এই পরস্পরবিরোধিতা ঐকান্তিক নয়।)

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আবেগের অবস্থায়—অন্তত ভয় ও ক্রোধের অবস্থায়—যে-সব শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলি প্রধানতই সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের প্রভাবসূচক। যেমন, গলা শুকিয়ে যায়, কেননা সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুর প্রভাবে লালা-গ্রন্থিগুলির কাজ অবদমিত হয় ; বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করে, নাড়ি দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) বেড়ে যায়, কারণ সিম্প্যাথেটিক্ গ্রন্থির প্রভাবে হৃৎযন্ত্রের কাজ খুব বেড়ে যায় এবং অবয়বগুলির পেশী সংলগ্ন রক্তবাহগুলি বিস্ফারিত হয় ; হজমের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত বা অবদমিত হয় (এবং পেট ঘুলিয়ে ওঠে), কারণ পাকস্থলী (Stomach), অন্ত্র (Intestine) প্রভৃতি পচনতন্ত্রের (Digestive System) অঙ্গ সংলগ্ন রক্তবাহগুলি সংকুচিত হয় ; সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুর প্রভাবেই অনেক সময় চোখের তারারন্ধ্র (Pupil) বিস্ফারিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসেরও নানা পরিবর্তন ঘটে, মূত্রবস্তির (Bladder) পেশীগুলি (Spincters) শ্লথ হয় (ফলে মূত্রত্যাগের প্রয়াস দেখা দেয়) এবং যে-গ্রন্থিগুলি থেকে ঘাম উৎপাদিত হয় সেগুলির ক্রিয়াও অনেক সময় খুব বেড়ে যায় (ফলে শরীর ঘেমে ওঠে)।

আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্র পরিচালিত আড্রীনল্ গ্রন্থি (Adrenal Gland) নামে কিড্নি (Kidneys) সংলগ্ন একজোড়া এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির প্রক্রিয়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের শরীরের একরকম গ্রন্থিকে (Gland) এণ্ডোক্রিন্ বা নালীবিহীন (Endocrine বা Ductless) গ্রন্থি আখ্যা দেওয়া হয়। পরে—ব্যক্তিত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে—এগুলির কথা অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বিচার করা যাবে। আপাতত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি-

গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে শরীরের ভিতর প্রবাহিত রক্ত (এবং লসিকা বা Lymph) থেকে রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করে এগুলি হর্মোন (Hormone) নামের নানারকম অত্যন্ত উত্তেজক বা শক্তিশালী নতুন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে এবং তা সরাসরি রক্তের মধ্যেই প্রত্যর্পণ করে। ফলে, রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হর্মোনগুলি অচিরে সমস্ত দেহময় ছড়িয়ে পড়ে এবং এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ বলেই শরীরে অত্যন্ত গভীর ও মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্ট হয়।

এ-জাতীয় একজোড়া এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির নাম অ্যাড্রীনল্ (Adrenal Gland)। প্রতিটি অ্যাড্রীনল্ গ্রন্থিকে মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ করা হয়—বাইরের দিককার ভাগ বা ছাল (Cortex বা Bark) এবং ভিতর দিককার ভাগ বা শাঁস (Medulla)। এই ভিতর দিককার অংশ বা শাঁস থেকে একরকম হর্মোন উৎপন্ন হয়; তার নাম অ্যাড্রীনলিন্ (Adrenalin বা Adrenin)।

আবেগ-সহচর এক জাতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তনের কারণ হল, সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের সক্রিয়তার ফলে অ্যাড্রীনল্ গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রীনলিন্ হর্মোন উৎপাদন। হর্মোনটি বিশেষ উত্তেজক, এবং অন্যান্য হর্মোনের মতো এটিও সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিলে যায় বলেই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরের নানা অঙ্গ পর্যন্ত পরিচালিত হয় এবং সেই অঙ্গগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন: অ্যাড্রীনলিন্-এর প্রভাবে যকৃৎ (Liver) আমাদের রক্তের মধ্যে চিনি জাতীয় পদার্থ বেশী করে যোগান দেয় এবং তারই ফলে মস্তিষ্ক এবং পেশীগুলিতে বেশী করে শক্তির (Energy) যোগান হয়। অ্যাড্রীনলিনের প্রভাবে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়াও অনেক বেড়ে যায়; অর্থাৎ আবেগ-অবস্থায় সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের সরাসরি প্রভাব হৃৎযন্ত্রকে যেভাবে সক্রিয় করার আয়োজন করে অ্যাড্রীনলিন্ তার বিশেষ সহায়ক হয়। এই রকম আরো নানাভাবে নানা অঙ্গের উপর অ্যাড্রীনলিনের এমন প্রভাব দেখা যায় যা বস্তুত সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের প্রভাবের সহায়কই।

পরিশেষে আবেগ-সহচর আর একরকম শারীরিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতিকালে এই পরিবর্তন নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। পরিবর্তনটিকে বলা হয় 'গ্যাল্ভানিক স্কিন্ রেস্পন্স' (Galvanic Skin Response, বা সংক্ষেপে GSR) এবং পরিবর্তনটির স্বরূপ হল, গায়ের চামড়ার উপর এক জাতীয় বৈদ্যুতিক পরিবর্তন। 'রেসিস্টেন্স মিটার' (Resistance Meter) বা 'ভোল্ট মিটার' (Voltmeter) নামের যন্ত্রের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক পরিবর্তন মাপা হয়।

৮ ॥ মিথ্যা-আবিষ্কারক যন্ত্র (The 'Lie' Detector)

অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'মিথ্যা-আবিষ্কারক' (Lie Detector) নামে যন্ত্রের কথা অনেক সময় শোনা যায়। বস্তুত সম্প্রতি নানারকম 'মিথ্যা-আবিষ্কারক' যন্ত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা হয়েছে। এ-জাতীয় যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল, অপরাধী অপরাধের কথা অস্বীকার করলেও যন্ত্র-সাহায্যে তার অপরাধ আবিষ্কার করা। আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনগুলির কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে কীভাবে এই চেষ্টা করা হয়। মিথ্যা-আবিষ্কারক যন্ত্র বলতে আসলে এ-জাতীয় শারীরিক পরিবর্তন মাপবার অনেকগুলি যন্ত্রের একত্র সমাবেশ। যথা: রক্ত চাপে পরিবর্তন মাপার যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন মাপার যন্ত্র, 'গ্যাল্‌ভানিক স্কিন্ রেস্‌পন্স' বা GSR মাপার যন্ত্র। অপরাধবিজ্ঞানীদের ধারণায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যদি অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে সেই অপরাধ সংক্রান্ত নানান কথা শোনাতে থাকলে তার অভ্যন্তরে ভয় নামের আবেগ উদ্বুদ্ধ হবে; অতএব, তার মধ্যে এই আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পর্কিত শারীরিক পরিবর্তনগুলিও ঘটতে বাধ্য হবে এবং উপরোক্ত যন্ত্রগুলির সাহায্যে শারীরিক পরিবর্তনগুলি মাপা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিকে যদি একটি অপরাধ সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ শোনাতে শোনাতে দেখা যায় এই যন্ত্রগুলি বাস্তবিকই সিম্‌প্যাথেটিক্ তন্ত্র প্রভাবিত আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তন প্রদর্শন করছে তাহলে বোঝা যাবে ব্যক্তিটি বাস্তবিকই অপরাধী। অপরাধবিজ্ঞানীদের পক্ষে এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে অপরাধ আবিষ্কারের চেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে।

৯ ॥ আবেগ সংক্রান্ত মতবাদ: (ক) জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ (James-Lange Theory), (খ) ক্যানন্-বার্ড মতবাদ (Canon-Bard Theory)

আবেগ একরকম আভ্যন্তরীণ অবস্থা বা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইতিপূর্বে দেখেছি, এই আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে নানারকম শারীরিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। শারীরিক পরিবর্তনগুলিকে তাই আবেগ-সহচর বলা হয়েছে। অবশ্যই এই শারীরিক পরিবর্তনগুলিই আবেগ নয়। যেমন, ভয় নামের আবেগের অবস্থায় বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু 'বুক ধড়ফড় করা' ও 'ভয় পাওয়া' এক নয়। তবুও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অতএব, মনোবিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কের স্বরূপটি সম্যকভাবে বুঝতে চান।

অবৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই সম্পর্ককে একভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি। যেমন চলতি কথায় বলি, 'ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে', 'শোকে

কেঁদে আকুল হচ্ছে', 'রাগে থরথর করে কাঁপছে', ইত্যাদি। অর্থাৎ, ভয় হল কারণ, বুক ধড়ফড় করা হল কার্য; শোক কারণ, কান্না কার্য; রাগ কারণ, কম্পন কার্য, সংক্ষেপে, আবেগ কারণ, শারীরিক পরিবর্তনগুলি কার্য, কিংবা যা একই কথা, আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনগুলি আবেগেরই পরিণাম।

কিন্তু এ-জাতীয় প্রচলিত ধারণার প্রায় সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে জেম্‌স্ (James) এবং লাঙ্গে (Lange) আবেগ সংক্রান্ত একটি নূতন মতবাদ প্রস্তাব করেন। উভয়েই অবশ্য পরস্পর-নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে এই নূতন মতবাদে উপনীত হন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক সাদৃশ্য বর্তমান বলেই নব-মতবাদটি যুগ্মভাবে 'জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদ' (James-Lange Theory) নামেই উল্লিখিত হয়।

জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদের মূল কথা হল, আবেগ-সহচব শারীরিক পরিবর্তনগুলি আবেগেরই পরিণাম বা কায (effect) নয়; পক্ষান্তরে, এই শারীরিক পরিবর্তন-গুলিকেই কারণ বলে বিবেচনা করা প্রয়োজন; অর্থাৎ এগুলিরই পরিণাম হিসাবে আবেগ নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উদ্ভব হয। যেমন, স্থূলভাবে বললে, এই মতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, কান্নার কারণ শোক নয়, বস্তুত কান্নাই শোকের কারণ; কিংবা, ভযে বুক ধডফড় করে না-বলে আসলে বলা উচিত বুক ধডফড করে বলেই ভয হয। কিন্তু এমন স্থূলভাবে ব্যাখ্যা না-কবে জেম্‌স্-লাঙ্গে মতবাদটি আরো বিশদভাবে বোঝা প্রযোজন।

জেম্‌স্-এর মতে, উত্তেজনামূলক ঘটনা (exciting fact) প্রত্যক্ষর ফলে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে নানারকম ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই, এই শারীরিক পরিবর্তনগুলির অঙ্গীয সংবেদনও (Organic Sensation —পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য) সৃষ্ট হয। প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গীয় সংবেদনকেই আমরা আবেগ বলি। জেম্‌স্ যেমন বলছেন, "আমার মতবাদ অনুসারে উত্তেজনামূলক ঘটনা প্রত্যক্ষর ফলে সরাসরিভাবে নানা শারীরিক পরিবর্তন সৃষ্ট হয়; এই পরিবর্তনগুলির অনুভূতিই হল আবেগ। প্রচলিত ধারণা অনুসারে, সম্পত্তি লোকসান হলে আমরা দুঃখিত হই, ফলে কাঁদি; ভালুক দেখলে আমরা ভয় পাই, তাই দৌড়োই; প্রতিদ্বন্দ্বী অপমান করলে আমাদের ক্রোধ হয়, তাই মারি। এখানে যে-মত সমর্থন করতে চাই তার দিক থেকে বলা দরকার, ঘটনার পারম্পর্যকে এভাবে ভাবা ঠিক নয়; একটি মানসিক অবস্থা সরাসরিভাবে আর একটি মানসিক অবস্থাব উদ্রেক করে না, উভয় মানসিক অবস্থার মধ্যে (যথা: উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং আবেগ—উভয়ের মধ্যে) শারীরিক পরিবর্তনগুলি বর্তমান থাকা প্রয়োজন, অতএব, বিচারসঙ্গতভাবে বললে বলা উচিত, আমরা কাঁদি বলেই শোক অনুভব

করি, মারি বলেই ক্রুদ্ধ হই, কাঁপি বলেই ভয় পাই ; পক্ষান্তরে একথা বলা ভুল যে শোক, ক্রোধ বা ভয় হয় বলেই আমরা কাঁদি, মারি বা কাঁপি। প্রত্যক্ষর পরে শারীরিক পরিবর্তনগুলি না-ঘটলে প্রত্যক্ষটি ফ্যাকাসে, বর্ণহীন এবং আবেগের উত্তাপহীন এক নিছক জ্ঞানের রূপ গ্রহণ করতো। ফলে ভালুক দেখলে আমরা বিচার করতে পারতাম যে এ-অবস্থায় দৌড়ে পালানোই ভাল, অপমানিত হয়ে বিচার করতে পারতাম যে এ-অবস্থায় মারাই উচিত—কিন্তু না পেতাম ভয়, না হতো রাগ।" (স্বাধীন তর্জমা)।

প্রচলিত ধারণার সঙ্গে জেম্‌স্‌-এর মতের পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বলা যায় :

প্রচলিত ধারণা

উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ→আবেগ→শারীরিক পরিবর্তন।

জেম্‌স্‌-লাঙ্গের মত

উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ→শারীরিক পরিবর্তন→অঙ্গীয় সংবেদন = আবেগ।

অতএব, স্নায়ুতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে জেম্‌স্‌-লাঙ্গের এই মতটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ ঘটলে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্র (Viscera : অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতি বক্ষ ও উদরের মধ্যস্থ অঙ্গগুলি) প্রভৃতি অঙ্গে স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হয়। ফলে এই অঙ্গগুলিতে বিবিধ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই অঙ্গগুলির সঙ্গে শুধু বহির্মুখী স্নায়ুই সংযুক্ত নয়, এগুলির সঙ্গে অন্তর্মুখী স্নায়ুরও সংযোগ আছে। অতএব, অঙ্গ-গুলিতে পরিবর্তন ঘটলে তৎসংলগ্ন গ্রাহক স্নায়ুকোষেও স্নায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় এবং অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে সেই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ফলে সৃষ্ট হয় অঙ্গীয় সংবেদন ; এই অঙ্গীয় সংবেদনকেই আমরা আবেগ বলি।

এই মতের সমর্থনে জেম্‌স্‌ নিজে অবশ্য শরীরবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা বা বিশ্লেষণ উত্থাপন করেন নি ; তার বদলে তিনি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতার নজির দিয়েছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি আবেগ-সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট দেহভঙ্গি (posture) গ্রহণ না-করে তাহলে তার অভ্যন্তরে আবেগের অভিজ্ঞতা হয় না : শোক-সংবাদ পাবার পরও আমি যদি মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারি তাহলে শোকসন্তপ্ত হবো না, পক্ষান্তরে মুহ্যমান ভঙ্গি গ্রহণ করলেই আমি শোকগ্রস্ত হবো। তাছাড়া, জেম্‌স্‌ বলেছেন, অভিনেতাদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে সার্থক অভিনয়ের সময়—অর্থাৎ, আবেগ-সহচর পরিবর্তনগুলি সার্থক-ভাবে শরীরে ফুটিয়ে তোলবার সময়—অভিনেতারা প্রকৃতপক্ষে আবেগ-আবিষ্ট হন।

অর্থাৎ, এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি সৃষ্ট হলে আবেগও উদ্বুদ্ধ হয়। জেম্স্ আরো বলেছেন, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি শারীরিক (বিশেষত আন্তরযন্ত্রীয়) পরিবর্তনগুলির কথা বাদ দিয়ে কোন আবেগের কথা কল্পনা করা যায় না; অতএব, এ-জাতীয় পরিবর্তনকেই আবেগের অন্যতম কারণ মনে করা প্রয়োজন।

অবশ্যই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও সহজবুদ্ধির এ-জাতীয় নজিরকে জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদের পক্ষে চরম প্রমাণ বলে বিবেচনা করা যায় না। এবং এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মতবাদটিকে অনেকভাবে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মান্-এর (Munn) মন্তব্যটি বিশেষ মূল্যবান বলে প্রতীত হয়। মান্ বলছেন, জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদের পক্ষে প্রদর্শিত নজিরগুলিকে চরম বা চূড়ান্ত প্রমাণ বলে বিবেচনা করার সুযোগ না-থাকলেও মনে রাখা দরকার, এই মতবাদের বিপক্ষে প্রদর্শিত নজিরগুলিকেও মতবাদটির চরম অপ্রমাণসূচক বিবেচনা করা যায় না। যেমন মতবাদটির বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে :—

ঘাড়ের কাছ থেকে সুষুম্নাকাণ্ড কেটে ফেলার পরও জীবজন্তুর মধ্যে আবেগমূলক আচরণ (emotional behaviour) পরিলক্ষিত হয়। দাবি করা হয়েছে যে এ-জাতীয় পরীক্ষালব্ধ দৃষ্টান্ত থেকে জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়; কেননা সুষুম্নাকাণ্ড এ-ভাবে কেটে ফেললে পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্র সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে গুরুমস্তিষ্ক পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হবার সম্ভাবনা দূর হয়, ফলে 'জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ'-স্বীকৃত শারীরিক পরিবর্তনের অঙ্গীয় সংবেদনের সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু এ-জাতীয় পরীক্ষা প্রধানতই মানবেতর জীবজন্তুর উপর করা হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের পূর্বে বা পরে তাদের ভাবাবেগ সংক্রান্ত কোন অনুমানই নিঃসন্দেহ হতে পারে না। অবশ্য জেম্স্-লাঙ্গে মতের বিরুদ্ধে মানবীয় দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, দাবি করা হয়েছে যে দুর্ঘটনার ফলে ঘাড় ভেঙে গেলেও —অতএব, ঘাড়ের কাছাকাছি সুষুম্নাকাণ্ড খণ্ডিত হলে পরও—রোগীবিশেষের মধ্যে আবেগের অভিজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ-জাতীয় পরিদর্শনকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করলেও মানতে হবে যে ঘাড়ের কাছাকাছি সুষুম্নাকাণ্ড খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও— এবং মানবেতর জীবজন্তুর দৃষ্টান্তে ঘাড়ের কাছে সুষুম্নাকাণ্ড অস্ত্রোপচারের সাহায্যে খণ্ডিত করে দেওয়া সত্ত্বেও—গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে বিবিধ গ্রন্থি, পেশী এবং আন্তর-যন্ত্রের স্নায়বিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; কেননা, স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রের কয়েকটি স্নায়ু সরাসরিভাবে (অর্থাৎ, সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যস্থতা বাদ দিয়েই) গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে এ-জাতীয় বিবিধ অঙ্গের যোগাযোগ রক্ষা করে।

জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতের বিরুদ্ধে উপরোক্ত পরীক্ষা ও পরিদর্শনমূলক আপত্তি ছাড়াও বিবিধ সহজ বুদ্ধিমূলক (common sense) ও এমনকি দার্শনিক বিচারমূলক (philosophical) যুক্তিও উত্থাপিত হয়েছে ; পক্ষান্তরে মতবাদটির সমর্থকেরা সে-জাতীয় আপত্তি ও যুক্তির নানা উত্তরও উদ্ভাবন করেছেন। এই মতদ্বন্দ্বের জটিলতায় প্রবেশ করে মতবাদটির মূল্যায়ন করার প্রয়াস অবশ্যই বিতর্কমূলক হবে। কিন্তু অন্তত একটি বিষয় অবশ্য স্বীকার্য : জেম্‌স্‌ ও লাঙ্গে ঠিক যে-অর্থে আবেগকে দৈহিক পরিবর্তনের পরিণাম মনে করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে স্বীকারযোগ্য হোক আর নাই হোক, তাঁদের এই মতবাদটির প্রভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছেন এবং আবেগকে কোন এক রকম বিশুদ্ধ মানসিক বিষয় বলে বিবেচনা করার পরিবর্তে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের দৈহিক ভিত্তি সংক্রান্ত গভীরতর গবেষণায় প্রণোদিত হয়েছেন।

এ-জাতীয় গবেষণার ফলাফল হিসাবে সম্প্রতি ক্যাননৃ (Canon) ও বার্ড (Bard) আবেগ সংক্রান্ত একটি নূতন মতবাদ প্রস্তাব করেছেন ; উভয়ের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হিসাবে মতবাদটিকে অনেক সময় ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদ (Canon-Bard Theory) নামে উল্লেখ করা হয়। মতবাদটি থ্যালামিক মতবাদ (Thalamic Theory) নামেও প্রচলিত। কেননা, মধ্য মস্তিষ্কর (Interbrain – পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য) একটি অংশের নাম হাইপোথ্যালামাস্‌ (Hypothalamus) এবং ক্যানন্‌ ও বার্ড আবেগের ব্যাখ্যায় হাইপোথ্যালামাসের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে হাইপোথ্যালামাস্‌ উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনার ফলেই একাধারে আবেগের অভিজ্ঞতা (emotional experience) এবং আবেগমূলক আচরণ (emotional behaviour) দেখা দেয়। অতএব, জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদের সঙ্গে ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথম মতে আবেগমূলক আচরণই আবেগমূলক অভিজ্ঞতার কারণ, কেননা এই মতে আবেগ আসলে দৈহিক পরিবর্তনগুলিরই সংবেদন-বিশেষ ; তুলনায় দ্বিতীয় মতে আবেগের অভিজ্ঞতা ও আবেগমূলক আচরণ বস্তুত পরস্পর-নিরপেক্ষ, কেননা উভয়ই হাইপোথ্যালামাসের উদ্দীপনার উপর নির্ভরশীল। অতএব, প্রচলিত ধারণা, জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ এবং ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি :—

১ ॥ প্রচলিত ধারণা

উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি→আবেগ→দৈহিক পরিবর্তন।

২ ॥ জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ

উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি→দৈহিক পরিবর্তন→আবেগ।

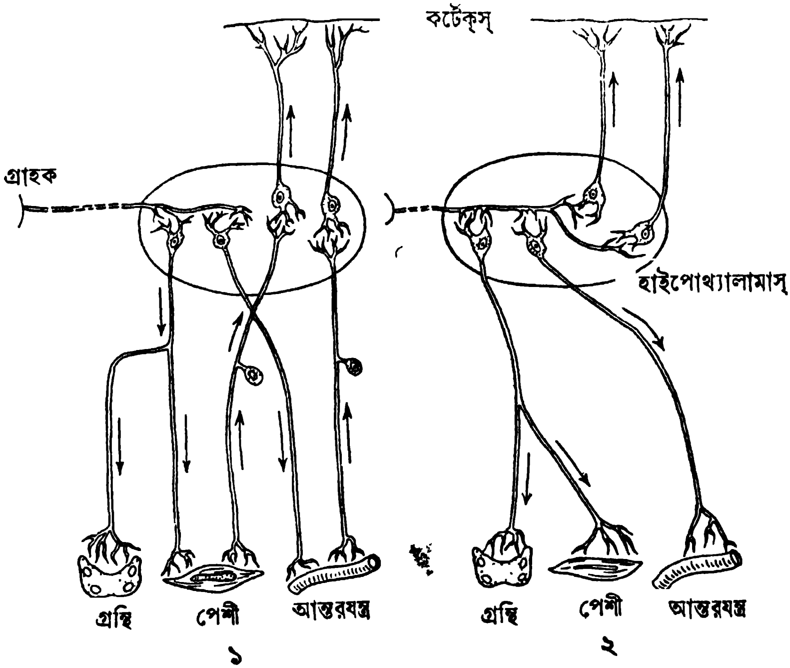
৩ ॥ ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদ

উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি→হাইপোথ্যালামাস্‌ উদ্দীপনা

↓

আবেগের অভিজ্ঞতা ↓ আবেগমূলক আচরণ বা দৈহিক পরিবর্তন।

কিংবা, স্নায়ুতন্ত্রর পরিভাষা ব্যবহার করে জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ এবং ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ অনুসারে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযন্ত্র পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হয়,



১ নং চিত্রে জেম্‌স্‌-লাঙ্গে মতবাদ এবং ২ নং চিত্রে ক্যানন্‌-বার্ড মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে

ফলে এই অঙ্গগুলিতে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই অঙ্গগুলি সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু বর্তমান; অতএব গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযন্ত্রে পরিবর্তন ঘটলে তৎসংলগ্ন অন্তর্মুখী

স্নায়ুগুলিতেও স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় এবং সেই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয় গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স্-এ। এইভাবে কর্টেক্স্-এ গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযন্ত্রর পরিবর্তন সংক্রান্ত স্নায়বিক শক্তি পৌঁছুলে আমাদের যে অঙ্গীয় সংবেদন ঘটে তারই নাম আবেগ।

অপরপক্ষে, ক্যাননৃ-বার্ড মতবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় বা গ্রাহকের সাহায্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি হাইপোথ্যালামাস্ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ফলে উদ্দীপিত হয় হাইপোথ্যালামাস্। হাইপোথ্যালামাস্ থেকে স্নায়বিক শক্তি একই সঙ্গে দ্বিবিধ পথে দুইদিকে পরিচালিত হয়। যথা: (১) অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হয় কর্টেক্স্ পর্যন্ত; এইভাবে কর্টেক্স্ পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হওয়ার ফলেই উদ্ভব হয় আবেগের অভিজ্ঞতা। (২) কিন্তু একই সঙ্গে হাইপোথ্যালামাস্ থেকে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে শরীরের গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযন্ত্র পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হয়; ফলে শরীরের এই অঙ্গগুলিতে নানা রকম পরিবর্তনও দেখা দেয়; এ-জাতীয় পরিবর্তনগুলিই আবেগমূলক আচরণ বলে উল্লিখিত। অতএব, আবেগমূলক আচরণের পরিণামেই আবেগের অভিজ্ঞতা ঘটে না; আবেগমূলক আচরণ এবং আবেগের অভিজ্ঞতা উভয়েরই কারণ হল হাইপোথ্যালামাসের উদ্দীপনা। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ক্যানন্-বার্ড মতবাদ অনুসারে সময়ের দিক থেকে আবেগমূলক অভিজ্ঞতা বস্তুত আবেগমূলক আচরণের সামান্য পূর্ববর্তী বলেই বিবেচিত; তার কারণ, পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তর-যন্ত্রর তুলনায় কর্টেক্স্ হাইপোথ্যালামাসের নিকটবর্তী; অতএব, হাইপোথ্যালামাস্ থেকে স্নায়বিক উত্তেজনা পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্রে পৌঁছুবার কিছু পূর্বেই কর্টেক্স্-এ পৌঁছুবার কথা।

মান্ (Munn) প্রমুখ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই দুটি মতবাদের কোন একটিকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করেন না, আবার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানও করেন না। আবেগের অভিজ্ঞতাকালে আমাদের অবশ্যই নানা প্রকার শারীরিক পরিবর্তন,—অতএব তার অভিজ্ঞতাও—হয়। অতএব, জেম্স্ ও লাঙ্গে যে-ভাবে শারীরিক পরিবর্তনগুলিকেই আবেগের কারণ বলেন তা সম্পূর্ণ স্বীকারযোগ্য না-হলেও এটুকু স্বীকার করা প্রয়োজন যে এ-জাতীয় শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আবেগকে প্রভাবিত করে। তাই জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অপরপক্ষে, ক্যানন্ ও বার্ডের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হওয়া কঠিন যে হাইপোথ্যালা-মাস্ই আবেগের একমাত্র উৎস; কিন্তু হাইপোথ্যালামাস্ যে আবেগের অভিজ্ঞতার

উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, ক্যানন্-বার্ড মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষাও করা যায় না। ফলে মান্ সিদ্ধান্ত করছেন, আবেগের পূর্ণতর ব্যাখ্যায় যে নব মতবাদই প্রস্তাবিত হোক না কেন তা উপরোক্ত দুটি মতবাদের কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

১০ ॥ মেজাজ (Emotional Mood), স্বভাব (Emotional Disposition), এবং ধাত (Temperament)

আবেগ (Emotion) এবং মেজাজের (Emotional Mood) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে স্টাউট্ (Stout) বলছেন, আবেগ কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে থাকে এবং তা তুলনায় স্বল্পক্ষণ স্থায়ী, বা সাময়িক অনুভূতির প্রকট বিকাশ রূপে প্রতীত হয় ; পক্ষান্তরে মেজাজ তুলনায় দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী, তা কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে না এবং তা অনুভূতির প্রকট বিকাশ রূপেও প্রতীত হয় না, কিন্তু তা যে-কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে আকস্মিকভাবে প্রকটরূপে প্রকাশিত হতে পারে। চলতি কথায় আমরা যেমন বলি, 'লোকটির মেজাজ গরম হয়ে রয়েছে'। এখানে 'গরম মেজাজ' হিসাবে যে-অবস্থা উল্লিখিত হয় তার সঙ্গে ক্রোধ নামক আবেগের পার্থক্য দেখা যেতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, ক্রোধের বিকাশ অত্যন্ত প্রকট এবং ক্রোধের বিকাশ খুব দীর্ঘস্থায়ী নয় ; আবেগটি বিকশিত হয়ে স্বল্পক্ষণের মধ্যেই যেন নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে। কিন্তু যে-ব্যক্তির 'মেজাজ গরম' হয়ে আছে সে কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ে রাগ করে নেই, যদিও যে-কোন সামান্য কারণেই রেগে যেতে পারে এবং প্রকৃত ক্রোধের তুলনায় তার এই 'মেজাজ গরম' ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্রোধে লম্ফ-ঝম্ফ করে একটি ব্যক্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে যায় ; কিন্তু সারা দিন ধরেই একজনের মেজাজ গরম হয়ে থাকতে পারে।

মেজাজের তুলনায় আরো অনেক দীর্ঘস্থায়ী কোন নির্দিষ্ট আবেগ-প্রবণতাকে স্বভাব (Emotional Disposition) বলা হয়। চলতি কথায় যেমন বলা হয়, 'লোকটি রাগী প্রকৃতির বা রাগী স্বভাবের'। অর্থাৎ, রাগ বা ক্রোধ নামের আবেগের প্রতি লোকটির যেন স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এ-জাতীয় আবেগ-প্রবণতা ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে একটি চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালে অনেক সময় তাকে 'ধাত' (Temperament) বলা হয়।

১১ ॥ আবেগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Emotions)

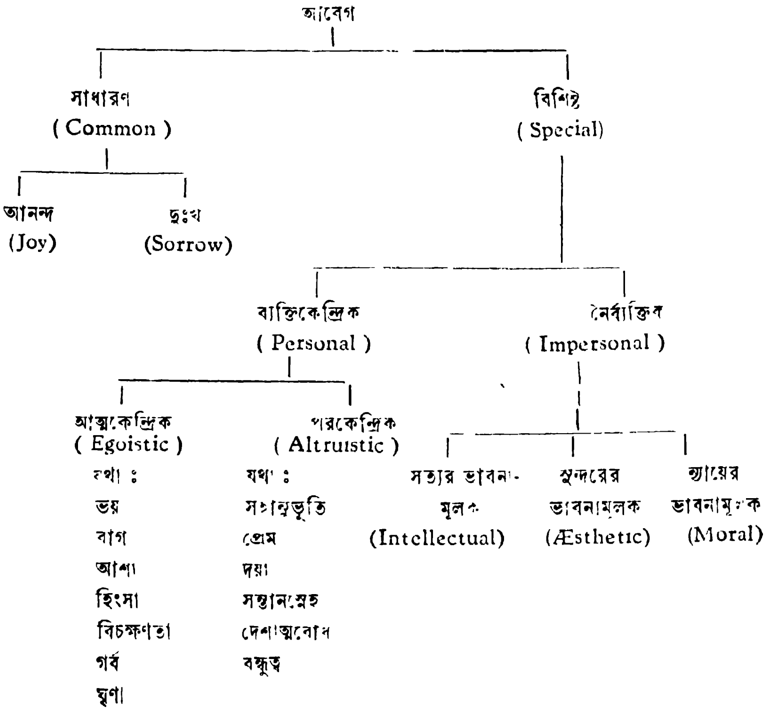
আবেগগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রস্তাব হয়েছে—(১) সাধারণ (Common) এবং (২) বিশিষ্ট (Special)। সাধারণ আবেগ বলতে প্রধানত বোঝায় আনন্দ (Joy) ও দুঃখ (Sorrow); এগুলিকে 'সাধারণ আবেগ' বলা হয়েছে, কেননা কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি সমস্ত আবেগমূলক অবস্থার সঙ্গে আনন্দ বা দুঃখ অল্পবিস্তর মিশ্রিত থাকে। যে-কোন আবেগের অবস্থা অল্পবিস্তর আনন্দজনক, না-হয় অল্পবিস্তর দুঃখজনক। অপরপক্ষে, ভয়, রাগ, আশা, শোক প্রভৃতি আবেগগুলিব নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বর্তমান ; তাই এগুলিকে বিশিষ্ট আবেগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিশিষ্ট আবেগগুলিকে আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Porsonal) এবং (২) নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)। যে-আবেগ-গুলি ব্যক্তিবিশেষের বা সাধারণভাবে সকলের মূর্ত মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা হয়। যেমন, ভয় নামের আবেগটি ব্যক্তির অমঙ্গল আশঙ্কার বা বিপদের ভাবনার সঙ্গে জড়িত ; অতএব, এটিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা হবে। তেমনি, দেশাত্মপ্রেমের আবেগটি সাধারণভাবে সমস্ত দেশবাসীর মূর্ত কল্যাণের ভাবনার সঙ্গে জড়িত ; অতএব, এই আবেগকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর আবেগের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই ; তার পরিবর্তে এই শ্রেণীর আবেগগুলি অমূর্ত ভাবনা বা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ-প্রণোদিত। নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ হিসাবে প্রধানত উল্লেখ করা হয় তিনটি : সত্য (Truth), সুন্দর (Beauty) এবং ন্যায় (Goodness)। তাই সত্যের বিচারে দার্শনিক যে-আনন্দ লাভ করেন—বা তাঁর মধ্যে যে-আবেগ উদ্বুদ্ধ হয়—তাকে নৈর্ব্যক্তিক আবেগ বলা হবে। তেমনি সৌন্দর্যের সাধনায় শিল্পী এবং সৌন্দর্য-উপভোগের সময় শিল্পানুরাগী যে-আবেগ উপভোগ করেন, বা মহৎ কার্য সম্পাদনে এবং মহত্ত্বের চিন্তায় আমরা যে-আভ্যন্তরীণ তৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করি সেগুলিকেও নৈর্ব্যক্তিক আবেগ আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Personal) আবেগকেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে : (১) আত্মকেন্দ্রিক (Egoistic) এবং (২) পরকেন্দ্রিক (Altruistic)। ব্যক্তির নিজের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে জড়িত আবেগকে আত্মকেন্দ্রিক বলা হয়। যথা : ভয়, রাগ, আশা, হিংসা, বিচক্ষণতা, গর্ব, ঘৃণা। অপরপক্ষে, অপরের বা অন্যান্য মানুষের—বা এমনকি অন্যান্য জীবের—মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে জড়িত

আবেগকে পরকেন্দ্রিক বলা হয়। যথা: সহানুভূতি, প্রেম, দয়া, সন্তানস্নেহ, দেশাত্মবোধ ও বন্ধুত্ব।

অতএব, আবেগের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ সহজে মনে রাখার জন্য আমরা নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করতে পারি :—



১২ ॥ আবেগ ও সহজাত-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত ম্যাকডুগ্যালের মত (McDougall's Theory of Emotion and Instinct)

সহজাত-প্রবৃত্তি (Instinct) সম্বন্ধে ম্যাকডুগ্যালের মত আমরা পরে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আলোচনা করবো। আপাতত এই মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা প্রয়োজন ; কেননা ম্যাকডুগ্যাল দাবি করেন যে সহজাত-প্রবৃত্তির কথা বাদ দিয়ে আবেগের প্রকৃত পরিচয় বোঝা সম্ভব নয়।

তাঁর মতে সহজাত-প্রবৃত্তির মূলত তিনটি দিক আছে। যথা, সহজাত-প্রবৃত্তির ফলে আমরা—

(১) কয়েকটি বিষয়ের প্রতি স্বভাবতই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকি ;

(২) এ-জাতীয় বিষয়ের উপস্থিতিতে স্বভাবতই কয়েক রকম আবেগের উত্তেজনা অনুভব করি ;

(৩) এই বিষয়গুলির প্রতি কয়েক রকম নির্দিষ্ট আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়।

যেমন, ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে একটি সহজাত-প্রবৃত্তি হল নিষ্কৃতি-প্রবৃত্তি (Instinct of Escape)। এই সহজাত-প্রবৃত্তির ফলে আমরা বিপদের আশঙ্কাজনক বিষয়ের প্রতি স্বভাবতই বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকি ; দ্বিতীয়ত, এ-জাতীয় বিষয়ের উপস্থিতিতে স্বভাবতই ভয় নামের আবেগ অনুভব করি ; এবং তৃতীয়ত, এই নিষ্কৃতি-প্রবৃত্তির ফলেই আমরা পলায়নমূলক বা আত্মরক্ষামূলক আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখাই।

অতএব, এই মতে আবেগ আসলে সহজাত-প্রবৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত একটি দিক। কিংবা, সহজাত-প্রবৃত্তির যেমন একটি জ্ঞানের দিক (যথা : কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ-প্রবণতা) এবং একটি আচরণের দিক (যথা : কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নির্দিষ্ট আচরণ-প্রবণতা) আছে, তেমনিই একটি অনুভূতির দিকও বর্তমান, এই অনুভূতির দিকটিই হল আবেগ। অতএব, সহজাত-প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হলে সেই সঙ্গে আবেগও উদ্বুদ্ধ হয়, প্রতিটি সহজাত-প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এক এক রকমের নির্দিষ্ট আবেগও বর্তমান।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলেন, মূল সহজাত-প্রবৃত্তি মোটের উপর চৌদ্দটি ; তার মধ্যে শেষটি ছাড়া বাকি সবগুলিই মানব এবং মানবেতর প্রাণী উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। স্বভাবতই তাঁর মতে এই চৌদ্দ রকম সহজাত-প্রবৃত্তির সঙ্গে চৌদ্দ রকম আবেগও সম্পর্কিত ; মূল সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগকেও মৌলিক আবেগ বলা হবে। এই মূল ১৪টি সহজাত-প্রবৃত্তি ও তৎসম্পর্কিত আবেগের তালিকা হল :—

সহজাত-প্রবৃত্তি	আবেগ
১ ॥ নিষ্কৃতি (Escape)→	ভয় (Fear)
২ ॥ সংঘাত (Combat)→	ক্রোধ (Anger)
৩ ॥ বিকর্ষণ (Repulsion)→	ঘৃণা (Hatred)
৪ ॥ বাৎসল্য (Paternal Instinct)→	মমতা (Tender Emotion)
৫ ॥ আবেদন (Appeal)→	বেদনা (Distress)
৬ ॥ যৌন (Sex Instinct)→	কাম (Lust)

সহজাত-প্রবৃত্তি	আবেগ
৭ ॥ কৌতূহল (Curiosity)→	বিস্ময় (Wonder)
৮ ॥ সমর্পণ (Submission)→	নম্রতা (Humility)
৯ ॥ আত্ম-জাহির (Self-assertion)→	গর্ব (Feeling of Superiority)
১০ ॥ যুথাচার (Gregraious Instinct)→	নিঃসঙ্গতা (Loneliness)
১১ ॥ খাদ্যান্বেষণ (Food-seeking)→	ক্ষুধা (Hunger)
১২ ॥ সঞ্চয় (Hoarding)→	স্বত্ব (Ownership)
১৩ ॥ গঠন (Construction)→	সৃজনী (Creativeness)
১৪ ॥ হাস্য (Laughter)→	আমোদ (Amusement)

এই মূল সহজাত-প্রবৃত্তি ও তৎসংলগ্ন আবেগগুলির কথা মনে রেখে আবেগের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত বোঝবার চেষ্টা করা যায়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রস্তাব করেন, আবেগগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন। যথা :—(১) মুখ্য (Primary), (২) গৌণ (Secondary), এবং (৩) উদ্ভূত (Derivative)। প্রতি আবেগই সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত। কোন একটি নির্দিষ্ট সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল মুখ্য (Primary) আখ্যা দেন। যেমন, নিষ্কৃতি নামের নির্দিষ্ট সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগ ভয়। কিন্তু একাধিক সহজাত-প্রবৃত্তির যুগপৎ প্রভাবে যে-আবেগ উদ্বুদ্ধ হয় ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে তা গৌণ। যেমন, ভীত-বিস্ময় (Awe); প্রকৃতপক্ষে এই আবেগটি তিনটি মূল আবেগের মিশ্রিত পরিণাম। যথা: (ক) কৌতূহল নামের সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগ 'বিস্ময়', (খ) সমর্পণের অঙ্গীভূত 'নম্রতা', (গ) নিষ্কৃতির অঙ্গীভূত 'ভয়'। তৃতীয়ত, ইচ্ছার অতীত বা ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণতা বিষয়ক আবেগগুলিকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল উদ্ভূত (Derivative) আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, অনুশোচনা এবং দুশ্চিন্তা। অনুশোচনা (Remorse) হল ইচ্ছার অতীত পরিপূর্ণতা বিষয়ক একটি আবেগ। তেমনি, দুশ্চিন্তা (Anxiety) হল ইচ্ছার ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণতা বিষয়ক একটি আবেগ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ম্যাক্‌ডুগ্যালের এই মতটি অবশ্যই সর্ববাদী-সম্মত হতে পারেনি। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সহজাত-প্রবৃত্তিকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল এমনই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন যে তা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। তাঁর ১৪টি মূল সহজাত-প্রবৃত্তির তালিকায় গঠন, সঞ্চয় প্রভৃতিও উল্লিখিত হয়েছে; এগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত-প্রবৃত্তি, না,

অভিজ্ঞতালব্ধ বা শিক্ষার পরিণাম—তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। স্বভাবতই, এ-জাতীয় তথাকথিত সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত হিসাবে উল্লিখিত আবেগগুলিকেও মৌলিক বলে স্বীকার করা কঠিন। যেমন, ওয়াট্‌সনের মতে মূল বা মৌলিক 'আবেগ' বলতে মাত্র তিনটি : ভয়, ক্রোধ ও প্রেম। পরিশেষে, মনে রাখা দরকার, বিশেষত মানব আচরণের ক্ষেত্রে ম্যাক্‌ডুগ্যাল সহজাত-প্রবৃত্তির যতখানি গুরুত্ব কল্পনা করেছেন অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর মতে তা অতিরঞ্জিতই।

১৩ ॥ কয়েকটি আত্মকেন্দ্রিক আবেগের পরিচয়

(ক) ভয় (Fear)

যখন কোন ভবিষ্যৎ বিপদ বা অমঙ্গলের আশঙ্কা ঘটে অথচ তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন থাকে না তখন ভয় উদ্বুদ্ধ হয়। ভয়ের সঙ্গে নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় ; ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৫) সেগুলির পরিচয় দেখা হয়েছে। ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে এই আবেগটি নিষ্কৃতি-প্রয়াস নামের সহজাত-প্রবৃত্তির (Instinct of Escape) অঙ্গীভূত এবং প্রাণীদের আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক।

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক কারণে ভয় পায় ; অতএব ভয়কে কোন রকম অসুস্থতার লক্ষণ বলা ঠিক নয়। যে-কোন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি নিরস্ত্র অবস্থায় জঙ্গলে খোলা-বাঘের সামনে পড়লে ভয় পাবে ; কেননা তার সামনে বিপদের সম্ভাবনা এবং এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এ-জাতীয় বাস্তব কারণের অভাব সত্ত্বেও অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে অনেকে ভয় পাচ্ছে। স্বাভাবিক ভয়ের সঙ্গে এ-জাতীয় অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ভয়ের পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়টিকে বলা হয় **আতঙ্ক (Phobia)**।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানা রকম আতঙ্কের উল্লেখ করেন। যথা :

বদ্ধস্থান-আতঙ্ক (Claustrophobia) : কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বদ্ধস্থানে (যেমন বন্ধ ঘরে বা বন্ধ গাড়িতে) থাকতে—বা এমনকি বদ্ধস্থানে থাকবার কল্পনায়—আতঙ্কিত বোধ করে।

উচ্চস্থান-আতঙ্ক (Acrophobia) : ব্যক্তিবিশেষের আচরণে দেখা যায়, কোন উচ্চস্থানে অবস্থান করতে—বা উচ্চস্থানে অবস্থান করার কল্পনায়—ব্যক্তিটি আতঙ্কিত হচ্ছে।

ভীড়-আতঙ্ক (Ochlophobia) : ভীড়ের মধ্যে যেতে বা এমনকি অন্যান্য ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার কল্পনাতেই অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

ভয় এবং আতঙ্কর সঙ্গে **উৎকণ্ঠার** (Anxiety) পার্থক্য করা প্রয়োজন। আতঙ্কের মতই উৎকণ্ঠারও কোন বাস্তব বা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে না। কিন্তু আতঙ্কের বিষয় সুনির্দিষ্ট—বদ্ধস্থান, উচ্চস্থান, ভীড়, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, উৎকণ্ঠার কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকে না। তাই উৎকণ্ঠাকে এক রকম ভাসমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-জাতীয় ভাসমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবিধ প্রকারের বিষয়কে অবলম্বন করার প্রবণতা দেখাতে পারে, নাও পারে। যেমন, চলতি কথায় অনেকে বর্ণনা করেন, বুকের মধ্যেটায় ভয়ে গুরগুর করছে—কিন্তু 'কিসের ভয়' বা 'কেন ভয়', এ-জাতীয় প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন না। ভাসমান মুক্ত উৎকণ্ঠা (Free Floating Anxiety) অত্যন্ত প্রবল হলে তা এক রকম রোগ লক্ষণ বলেই বিবেচিত হয় ; এই রোগের নাম দেওয়া হয় উৎকণ্ঠা-উদ্বায়ু (Anxiety Neurosis)।

আতঙ্ক এবং উৎকণ্ঠার প্রকৃত কারণ নিয়ে আধুনিক অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানে (Abnormal Psychology) অনেক আলোচনা হয়েছে।

(খ) ক্রোধ (Anger)

সাধারণত কর্মপ্রবৃত্তি ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধের উদ্ভব হয়। যেমন, কুকুরের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিলে বা শিশুকে জোর করে খেলাধুলো থেকে সরিয়ে আনলে তারা ক্রুদ্ধ হয়। ক্ষতিকারক ঘটনা বা ক্ষতিকারক ভাবনা কর্মপ্রবৃত্তিকে বাধা দেয় ; অতএব, এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে ক্রোধ দেখা দেয়। অপরের অপমানজনক আচরণ আমার আত্মসম্মানের বা আত্মমর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর ; তাই অপমানিত হলে আমি বিশেষ ক্রুদ্ধ হই।

ভয়ের সঙ্গে যেমন নিষ্কৃতি বা পলায়নের প্রবণতা দেখা দেয় তেমনি ক্রোধের সঙ্গে দেখা দেয় আক্রমণের প্রবণতা। কোন ব্যক্তি আমার কাজে বাধা দিলে,—আমার ক্ষতি করলে বা আমাকে অপমানিত করলে,—আমি রেগে গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে যাই। ক্রোধের সঙ্গে যে-সব শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলিও এ-জাতীয় আক্রমণাত্মক আচরণের সহায়ক হয়। যেমন : হাতের মুঠো পাকানো, হাত-পা ছোঁড়া, ইত্যাদি।

(গ) আশা (Hope)

ভয়ের বিপরীত আবেগকে আশা বলে। কেননা, ভয় এবং আশা উভয়ই ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক হলেও ভবিষ্যতের কোন অমঙ্গল-সম্ভাবনা থেকেই ভয় হয়, ভবিষ্যতের কোন মঙ্গল-সম্ভাবনাই আশার কারণ। স্বভাবতই ভয়ের মতো আশা কোন

পীড়াদায়ক বা অস্বস্তিকর অবস্থা নয়; আশা প্রকৃতপক্ষে সুখ বা স্বস্তিদায়ক অবস্থাই।

১৪ ॥ কয়েকটি পরকেন্দ্রিক আবেগ

(ক) সহানুভূতি (Sympathy)

দয়া, ভালবাসা, মমতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সমস্ত পরকেন্দ্রিক আবেগের মূলেই আছে সহানুভূতি। অপরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে কোন এক ভাবে অনুভব করাকেই সহ + অনুভূতি—বা সহানুভূতি—বলা হয়। সহানুভূতির উৎস কী? যূথবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে অপরের আচরণ অনুকরণ করবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা দেখা যায়; এইভাবে অপরের আচরণ অনুকরণ করতে করতে অপরের আচরণের মূলে আবেগ-অনুভূতি জাতীয় যে-আভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্তমান তারও আস্বাদ পাওয়া যায়; সেই আস্বাদকেই সহানুভূতি বলে।

সহানুভূতির এক রকম চরম দৃষ্টান্তকে অনেক সময় **সমানানুভূতি (Empathy)** বলা হয়। সমান + অনুভূতি—বা সমানানুভূতির—দৃষ্টান্তে সাময়িকভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে অপর কোন ব্যক্তির বা জীবের সঙ্গে এক রকমের একাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে অপরের অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবেই অনুভূত হয়। যেমন, অপরের যন্ত্রণা দেখতে দেখতে ব্যক্তিবিশেষ নিজেও প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।

(খ) প্রেম (Love)

প্রেম শব্দটিকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন, সংকীর্ণ অর্থে প্রেম বলতে শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণই বোঝায়। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে প্রেম শব্দ নানা রকম কোমল ও অনেক সময় শ্রদ্ধামূলক অনুভূতির বোধকও। যেমন: ভ্রাতৃপ্রেম, সন্তানপ্রেম, পিতৃপ্রেম, দেশ-প্রেম, ইত্যাদি। কিন্তু প্রেম বা ভালবাসা শব্দকে সংকীর্ণ বা ব্যাপক যে-কোন অর্থেই গ্রহণ করা হোকনা কেন, এটি মূলতই এক রকম পরকেন্দ্রিক আবেগ। এই আবেগের প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষ নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল বা সুখ-দুঃখর পরিবর্তে অপরের মঙ্গল বা সুখ সাধনের প্রয়াস করে। যেমন, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ের দৃষ্টান্তে উভয়েই প্রধানত পরস্পরের পরিতুষ্টি প্রয়াস করে, ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্তে নিজ স্বার্থের পরিবর্তে ভ্রাতার সুখ বা মঙ্গলই কাম্য হয়, দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে মানুষ দেশবাসীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে—এমনকি প্রাণ দিতেও—দ্বিধা করে না।

প্রেমের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে তা ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের মতো সাময়িক অবস্থামাত্র নয়। প্রেম মূলতই দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরীণ অবস্থা। এই কারণে প্রেমকে স্বভাবের (Emotional Disposition) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রেমের বিপরীত আবেগ হল **ঘৃণা (Hate)**। ঘৃণা এক রকম আত্মকেন্দ্রিক আবেগ এবং তার উদ্দেশ্য অপরের সন্তুষ্টিসাধনের পরিবর্তে অপরের অমঙ্গল সাধনই। ক্রোধ বা ভয়ের মতো ঘৃণাও অনেক সময় সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থামাত্র; কিন্তু অনেক সময় আবার তা প্রেমের মতই দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে।

১৫ ॥ কয়েকটি নৈর্ব্যক্তিক আবেগ

নৈর্ব্যক্তিক আবেগগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—সত্যাশ্রয়ী, সদাশ্রয়ী (নৈতিক) এবং সৌন্দর্যাশ্রয়ী। এর মধ্যে তৃতীয়টি নিয়ে নন্দনতত্ত্বে (Æsthetics) অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় আলঙ্কারীকেরা সৌন্দর্যাশ্রয়ী আবেগকে 'রস' আখ্যা দিয়েছেন; আমরাও এখানে সেই পরিভাষা গ্রহণ করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি 'রস' বিশেষ চিত্তাকর্ষক। যথা: **(১) বিরাট্-রস (Emotion of the Sublime)** এবং **(২) হাস্য-রস (Emotion of the Ludicrous)**।

বিরাট্-এর ভাবনা থেকে বিস্ময় ও বিনয়ের যে-মিশ্র আবেগ উদ্বুদ্ধ হয় তারই নাম বিরাট্-রস। যেমন, মহাসিন্ধুর ভাবনা কবির মধ্যে বিরাট্-রসের সঞ্চার করে। কেননা এ-জাতীয় বিরাটের ভাবনা একদিকে তাঁর মধ্যে বিস্ময় উদ্রেক করে এবং অপরদিকে তাঁর নিজস্ব ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়ে উদ্রেক করে বিনয়।

হাস্য-রসকে মোটের উপর বিরাট্-রসের বিপরীত বলা যায়। কেননা অদ্ভুত বা সামঞ্জস্যহীনের ভাবনাই হাস্য-রসের উৎস। যেমন, সার্কাসের ভাঁড় মাথায় টুপি পরার বদলে জুতো পরার চেষ্টা করলে আমাদের হাসি পায়। স্বভাবতই হাস্য-রসের দৃষ্টান্তে বিস্ময় বা বিনয়বোধের অবকাশ নেই। কেননা, অদ্ভুত বা সামঞ্জস্যহীন বস্তু বা ব্যক্তির তুলনায় আবেগ-অনুভবকারী নিজেকে অনেক বেশি বড় বা বিজ্ঞ মনে করে।

হাস্য-রসের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে অবশ্য বিবিধ মত প্রস্তাবিত হয়েছে। স্পেনসর (Spencer) বলেন, হাসির প্রকৃত কারণ হল অবরুদ্ধ শারীরিক শক্তির আকস্মিক বিকাশ। যেমন, শিশুর সামনে বাঘের মুখোস পরে কেউ উপস্থিত

হলে প্রথমাবস্থায় শিশুর মধ্যে আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনায় অনেকখানি শারীরিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়; কিন্তু মুখোস খুলে ফেললেই বিপদের আশঙ্কা কেটে যায়—অতএব, শিশুর অবরুদ্ধ শারীরিক শক্তি এই অবস্থায় হাস্যোচ্ছল রূপে প্রকাশ পায়। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ (Bergson) কিন্তু হাসির একটি সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অপরের আচরণে অসঙ্গতি বা দোষ-ত্রুটি দেখে আমরা হাসি, কেননা এই হাসির সাহায্যে তার আচরণ সংশোধিত হয়। ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে, হাসির সাহায্যে আমরা দুঃখের ভারলাঘব প্রয়াস করি—লঘু ক্ষতির দুঃখকে হেসে উড়িয়েদি। ফ্রয়েড্ (Freud) অবশ্য সমস্ত আচরণের চরম তাৎপর্য হিসাবে নির্জ্ঞান কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুমান করতে চান: অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হাসিরও একটি ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছেন।

২॥ উদ্দেশ্য (Motive), প্ররোচক (Incentive) এবং উদ্দীপক (Stimulus)

মনোবিজ্ঞানের ব্যবহৃত উদ্দেশ্য (Motive) শব্দটির সম্যক অর্থাবগতির জন্য উড্‌ওয়ার্থ তার সঙ্গে প্ররোচক (Incentive) এবং উদ্দীপকের (Stimulus) পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন।

উদ্দেশ্য ও প্ররোচক এক নয়। উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তির অভ্যন্তরে, প্ররোচক থাকে ব্যক্তির বাইরে। যেমন, একটি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তে নির্দিষ্ট পুরস্কারটিকেই প্ররোচক বলা হবে ; কিন্তু যাঁরা এই পুরস্কার-লাভের আশায় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন তাঁদের সকলের আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা বা উদ্দেশ্য এক না-হতেও পারে। ধরা যাক, প্রতিযোগিতাটির পুরস্কার হল একশো টাকা। একজন হয়ত অর্থাভাবের তাড়নায় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ; তাঁর উদ্দেশ্য হল অর্থলাভ নামে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত যশলাভের তাড়নায় একই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ; অতএব তাঁর উদ্দেশ্য বলতে যশলাভের আকর্ষণে আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। এই দুই ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রণোদিত আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা বস্তুত দ্বিবিধ ; অথচ উভয়েরই আচরণের প্ররোচক অভিন্ন : একশো টাকার পুরস্কার, বহির্জগতের কোন বাস্তব বিষয়।

তেমনি, উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক এক নয়। পুরস্কার-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তে নানা ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন এবং প্রতিযোগিতা-কালে প্রত্যেকের সামনে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে ; অতএব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে নূতন নূতন উদ্দীপক আসছে। প্রত্যেকের মধ্যেই নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে নির্দিষ্ট প্রতিবেদন (Response) দেখা দিচ্ছে। যেমন, টেনিস্ খেলার প্রতিযোগিতায় দুই ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। উভয়েই প্রতি পদে নূতন নূতন উদ্দীপক পাচ্ছেন এবং এই উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে উভয়ের মধ্যেই নূতন নূতন প্রতিবেদন দেখা দিচ্ছে। এইভাবে দুজনে দ্বিবিধ উদ্দীপক→প্রতিবেদনের পারম্পর্য উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতার পুরস্কার (প্ররোচক) লাভ করতে চান। কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে ; আমরা যেমন ইতিপূর্বে দেখলাম, একই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন।

৩ ॥ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর প্রকারভেদ (Different kinds of Needs and Motives)

অভাববোধ বা প্রয়োজনের (Need) উপর নির্ভর করে আচরণের লক্ষ্য (Goal) এবং বিভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হবার আকর্ষণে বিভিন্ন উদ্দেশ্যর (Motive) উদ্ভব হয়। অতএব, প্রয়োজনের প্রকারভেদ অনুসারে উদ্দেশ্যরও প্রকারভেদ ঘটে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চায়, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জল চায়; অতএব তাদের মধ্যে উদ্ভব হয় বিভিন্ন লক্ষ্য-প্রণোদিত বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা বা উদ্দেশ্য।

অবশ্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম প্রভৃতি প্রয়োজন—এবং এ-জাতীয় প্রয়োজন-নিবৃত্তির তাগিদে বিভিন্ন উদ্দেশ্যও—অপেক্ষাকৃত সরল; এগুলি মানব ও মানবেতর প্রাণী উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। তাই এগুলিকে শারীরিক বা জৈব (Physiological or Biological) আখ্যা দেওয়া হয়। মানব-আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাছাড়াও বহু বিচিত্র ও জটিল প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, যে-প্রয়োজনের তাগিদে একজন ব্যক্তি কবিযশপ্রার্থী হয়েছেন তা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাম প্রভৃতির মতো নিছক জৈব নয়, সরলও নয়। বস্তুত মানুষ কত জটিল প্রয়োজন বোধ করে—অতএব মানুষের ক্ষেত্রে কত রকমের জটিল উদ্দেশ্যর পরিচয় পাওয়া যায়—তার সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর স্বতন্ত্র আলোচনার পরিবর্তে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর মূল বা প্রধান শ্রেণীগুলির আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। অতএব, মনোবিজ্ঞানীরা এই শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে তাঁরা একমত হতে পারেননি। অর্থাৎ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত করার প্রস্তাব হয়েছে। একটি প্রস্তাব অনুসারে এগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা বাঞ্ছনীয়—(১) দৈহিক (জৈব) এবং (২) মানসিক। অপর প্রস্তাব অনুসারে এগুলিকে (১) শিক্ষা-নিরপেক্ষ (Unlearned) এবং (২) শিক্ষালব্ধ (Learned)—এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা উচিত। তৃতীয় প্রস্তাব অনুসারে উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন মূলত দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—(১) ব্যক্তিগত (Individual) এবং (২) সামাজিক (Social)।

আমাদের মন্তব্য হল, এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথমটি অত্যন্ত অসন্তোষজনক। কেননা, স্থূল অর্থে নিছক জৈব ছাড়াও বিবিধ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকারযোগ্য হলেও মানুষের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণভাবে দেহ-নিরপেক্ষ বা দেহাতিরিক্ত অর্থে মানসিক হতে পারে না। তাই এগুলিকে দৈহিক ও মানসিক নামের দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। উপরোক্ত দ্বিতীয় এবং

তৃতীয় প্রস্তাবের পক্ষে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বর্তমান। কিন্তু এই দ্বিবিধ শ্রেণী-বিভাগকে পরস্পরবিরোধী—বা এর মধ্যে কোন একটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ—বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। কেননা আমাদের কোন কোন শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যর মতই শিক্ষালব্ধ নানা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ব্যক্তিগতও হতে পারে, সামাজিকও হতে পারে।

অতএব, আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর কোন একটি শ্রেণীবিভাগকেই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। বস্তুত বহু বিচিত্র মানবীয় প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যকে কোন এক রকম পূর্বপরিকল্পিত শ্রেণীবিভাগের কাঠামোর মধ্যে সংকুলিত করা সম্ভব নয়। তাই উপরোক্ত বিবিধ প্রস্তাবের কোন একটিকে চরম সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে আমরা এখানে কয়েক রকম মুখ্য বা প্রধান মানবীয় প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর পরিচয় পাবার প্রয়াস করবো।

৪ ॥ দৈহিক প্রেষণা (Physiological Motivation)

দৈহিক প্রেষণার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

শরীর-গঠনের কয়েক রকম অস্বাভাবিক লক্ষণের চিকিৎসাকল্পে আমেরিকার এক হাসপাতালে একটি তিন বছরের শিশুকে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের সাধারণ খাদ্য সাতদিন ধরে খেতে দেবার পর শিশুটি মারা যায়। শবব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল, তার আড্রীনাল্ গ্রন্থির (Adrenal Glands) অস্বাভাবিক অবস্থা। স্বাভাবিক অবস্থায় এই গ্রন্থির একটি কাজ হল, শরীরের লবণ-সংরক্ষণ—অর্থাৎ, মূত্রের সঙ্গে শরীর থেকে লবণ যাতে বেরিয়ে না-যায় তার ব্যবস্থা। অতএব বোঝা গেল, সাত দিন ধরে হাসপাতালের সাধারণ খাদ্য থেকে শিশুটির শরীরে যে-পরিমাণ লবণ সংগৃহীত হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি পরিমাণ লবণ উক্ত গ্রন্থির অসুস্থতার দরুন তার শরীর থেকে ক্ষয় হচ্ছিল। শিশুটির পিতামাতার কাছ থেকেও জানা গেল, জন্মের পর থেকেই মিষ্টি খাদ্যর প্রতি তার তীব্র বিতৃষ্ণা এবং নোন্‌তা খাদ্যর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। শিশুটির যখন আঠারো মাস বয়স তখন একদিন তার মা দেখেন, খাবার টেবিল থেকে লবণদানি তুলে নিয়ে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো সে থাবা-থাবা নুন খাচ্ছে। তারপর থেকেই রান্নাঘরে লবণদানির দিকে হাত বাড়িয়ে সে পরিত্রাহী কান্না শুরু করতো এবং লবণদানিটি হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই থামতো না। তার পিতামাতা আরো লক্ষ্য করেন, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে তার দারুন অরুচি দূর করার একটি উপায় হল, খাদ্যে স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় তিনচার গুণ বেশি নুন দেওয়া এবং তাছাড়াও তাকে এক চামচ করে নুন খেতে দেওয়া।

অসুস্থ শিশুটির এই দৃষ্টান্ত বিচার করে আমরা দৈহিক প্রেষণার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝতে পারি। যথা: (১) অভাব বা প্রয়োজন-বোধ—শিশুটির শরীরে লবণের তীব্র অভাব অনুভূত হয়। (২) তার ফলে শরীরে লবণ গ্রহণের প্রতি তার মধ্যে তাড়না বা নোদনা দেখা দেয়। (৩) সেই নোদনার ফলে পরিস্ফুট হয় কয়েক রকম সাধন-সহায়ক আচরণ—যথা, লবণপাত্র গ্রহণের প্রয়াস। (৪) সমস্ত আচরণটির লক্ষ্য হল লবণ। (৫) এই লক্ষ্য লাভ করার পর সাময়িকভাবে শিশুটির আচরণে তৃপ্তির বা অভাব-উপশমের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

৫ ॥ দৈহিক প্রেষণা ও 'হোমিওস্টাসিস্' (Homeostasis)

দৈহিক প্রেষণার উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি অবশ্যই অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থার দৃষ্টান্ত। কিন্তু সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেও মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে বহুবিধ দৈহিক প্রেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত রকম প্রেষণার মতই দৈহিক প্রেষণারও উৎস কোন অভাব বা প্রয়োজন-বোধ—দৈহিক প্রেষণার দৃষ্টান্তে সে-অভাবের উৎস অবশ্যই শরীরের অভ্যন্তর। অতএব দৈহিক প্রেষণার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আলোচনা করার আগে শরীরের আভ্যন্তরীণ অভাব সংক্রান্ত কিছুটা সাধারণ ধারণার প্রয়োজন।

বাঁচতে হলে শরীরের পক্ষে অনেক রকম সর্ত স্বীকার করা দরকার। যেমন: শরীরের তাপ (Temperature), রক্ত-চাপ (Blood-pressure) প্রভৃতি এক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকা দরকার—তাপ বা রক্ত-চাপ খুব বেশি বেড়ে গেলে বা খুব কমে গেলে বাঁচা অসম্ভব। তেমনি রক্তে চিনির (Blood-sugar) পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া দরকার, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (Carbon Dioxide) পরিমাণ খুব বেশি হওয়া মারাত্মক; ইত্যাদি, ইত্যাদি। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজন এই শারীরিক সর্তগুলি পালনের উদ্দেশ্যে শরীরের অভ্যন্তরেই যেন এক রকম ব্যবস্থা বা আয়োজন বর্তমান। সেই ব্যবস্থার পরিচয় পাবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'হোমিওস্টাসিস্' (Homeostasis) শব্দটি বোঝা দরকার। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবলীর মধ্যে ভারসাম্য বা সঙ্গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শরীরের অভ্যন্তরেই কোন এক রকম প্রয়াস বা প্রবণতা বর্তমান; তারই নাম দেওয়া হয় হোমিওস্টাসিস্।

শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার উদ্দেশ্যে নানা রকম হোমিওস্টাটিক্ ব্যবস্থার কথা শারীরবিজ্ঞানে সুবিদিত। যথা, স্বাভাবিকভাবে শরীরের তাপ (Body Temperature) ৯৮·৬ ডিগ্রি ফারেন্হাইট হওয়া দরকার। এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাপমাত্রা পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণত আমাদের শরীরের তাপ

মোটের উপর এর কাছাকাছি থাকে। কেননা, প্রয়োজনমতো শরীরের তাপ কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই বর্তমান। যেমন, প্রচণ্ড গরমে আমরা ঘেমে উঠি, প্রচণ্ড শীতে আমরা কাঁপতে থাকি; অর্থাৎ, প্রচণ্ড গরমে শরীরের তাপ খুব বেড়ে যাবার উপক্রম হলে আমরা যখন ঘেমে উঠি তখন শরীর থেকেই জলীয় পদার্থ (ঘাম) বেরিয়ে শরীরকে শীতল করে, প্রচণ্ড শীতে আমরা কাঁপতে থাকি বলেই শরীরের ভিতরকার দাহ্যবস্তু তাড়াতাড়ি দগ্ধ হয়ে উত্তাপের যোগান দেয়।

কিন্তু এভাবে শরীরের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির সাহায্যে শারীরিক প্রয়োজন বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হলেও অনেক সময় তা হয় না। যেমন, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির ক্ষেত্রে শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাবার জন্য শরীরের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিই যথেষ্ট নয়—শরীরের বাইরে থেকে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে এই প্রয়োজন মেটাতে হয়। 'নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের' (Regulatory Behaviour) সাহায্যে আমরা এ-জাতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। অর্থাৎ, শারীরিক প্রয়োজনের (Physiological Needs) মধ্যে যেগুলি মেটাবার পক্ষে লক্ষ্য হল বহির্জগতের কোন বস্তু বা বিষয়—কিংবা, যেগুলি মেটাবার পক্ষে শরীরের আভ্যন্তরীণ হোমিওস্টাটিক্ ব্যবস্থাই পর্যাপ্ত নয়—সেগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের সাহায্যে মিটিয়ে থাকি। এই সব নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণকেই দৈহিক বা শারীরিক প্রেষণার (Physiological Motivation) প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। অতএব, শারীরিক প্রেষণার লক্ষণ হল: (১) শরীরের অভ্যন্তরে কোন প্রয়োজন বা অভাব-বোধ, (২) তৎজনিত তাড়না বা নোদনা, (৩) এই নোদনার প্রভাবে সাধন-সহায়ক আচরণ, (৪) সে-আচরণের লক্ষ্য বহির্জগতের কোন বস্তু, (৫) উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার পর তৃপ্তি।

৬ ॥ কয়েক রকম দৈহিক প্রেষণা।

(ক) ক্ষুধা (Hunger)

যে-দৈহিক প্রেষণার উৎস শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যবস্তুর অভাব বা প্রয়োজন এবং বহির্জগতের খাদ্যবস্তুই যার লক্ষ্য সেই দৈহিক প্রেষণাকে ক্ষুধা বলা হয়। শরীরের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি এবং সক্রিয়তার জন্য প্রতিনিয়তই খাদ্যর দরকার হয়; অতএব একবার খাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে খাদ্যবস্তুটি শরীরের উপরোক্ত দরকারগুলি মেটাতে খরচ হয়ে যায়; এই অবস্থায় নতুন করে খাদ্যের অভাব ঘটে। এ-জাতীয় অভাব ঘটলে আমরা চলতি কথায় বলি, 'ক্ষিদে পেয়েছে'; অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাব অনুভূত হচ্ছে। উক্ত অভাববোধ থেকেই প্রেষণাটির সূত্রপাত। কিন্তু প্রশ্ন হল,

শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যর এই অভাব বা প্রয়োজন-বোধের অভিজ্ঞতা হয় কীভাবে ? অনেকে বলেন, পাকস্থলীর সংকোচন (stomach contractions) থেকেই এই অভাববোধের অভিজ্ঞতা ঘটে। ওয়াল্টার ক্যানন্ (Walter Canon) নামের জনৈক শারীরবিজ্ঞানী পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে চান, ক্ষুধার সময় পাকস্থলীতে সত্যিই সংকোচন হয়। তাছাড়া, চলতি কথাতেও আমরা অনেক সময় বলি, 'ক্ষিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে' ; অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে পাওয়া কোন এক রকম অঙ্গীয় সংবেদন থেকেই শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাবের অভিজ্ঞতা ঘটে। কিন্তু পাকস্থলীর সংকোচনকেই খাদ্যাভাব-বোধের একমাত্র কারণ বলা যায় না। কেননা, চিকিৎসা-প্রসঙ্গে অনেক ব্যক্তির পাকস্থলী অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ক্ষুধার লক্ষণ অটুট থাকতে দেখা গিয়েছে। পরীক্ষামূলক-ভাবেও দেখা গিয়েছে, ইঁদুরের পাকস্থলী কেটে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ক্ষুধার্ত আচরণের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। অতএব, অনুমান করা হয়েছে, শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাবের ফলে নানা রকম জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ; এই পরিবর্তনগুলি থেকেই খাদ্যাভাবের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। অবশ্য, শারীরবিজ্ঞান-মূলক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-জাতীয় রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয়নি। অতএব স্বীকার করা দরকার, খাদ্যাভাবের অভিজ্ঞতা ঠিক কেন ঘটে সে-প্রশ্ন এখনো অনেকাংশে অমীমাংসিত।

ক্ষুধা প্রসঙ্গে আরো চিত্তাকর্ষক বিষয়কে বলা হয় **'বিশিষ্ট ক্ষুধা'** (**Specific Hunger**)। অর্থাৎ, জীবদেহের অভ্যন্তরে শুধু যে সাধারণভাবে খাদ্যর অভাব সূচিত হয় তাইই নয় ; শরীরের জন্য যে-নির্দিষ্ট বস্তুর প্রয়োজন ঠিক সেইটির জন্য এক রকম নির্দিষ্ট অভাব-বোধও সূচিত হয়। বিশিষ্ট ক্ষুধার একটি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে বিচার করেছি : আড্রীনাল্ গ্রন্থির অসুস্থতার ফলে শিশুটির শরীর থেকে অত্যধিক পরিমাণ লবণ-ক্ষয় ঘটে, ফলে তার শরীরের অভ্যন্তরে লবণের প্রয়োজনও অত্যন্ত বেড়ে যায়। শিশুটির আচরণে এই অভাব-বোধের তাড়না খুবই সুস্পষ্ট। ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেও ঠিক একই বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ইঁদুরের আড্রীনাল্ গ্রন্থি কেটে বাদ দেবার পর তার সামনে সাধারণ পানীয় জল এবং নুনগোলা জল রেখে দেখা গিয়েছে, সাধারণ জলের পরিবর্তে ইঁদুর নুনগোলা জলই পান করছে। অর্থাৎ, মানব ও মানবেতর জীব শুধু যে শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাব বোধ করে তাইই নয়, শরীরের জন্য যে-নির্দিষ্ট বস্তুর প্রয়োজন খাদ্য হিসাবে বিশেষ করে তারই অভাব বোধ করে এবং লক্ষ্য হিসাবে বিশেষ করে সেই বস্তুই বেছে নেয়। 'বিশিষ্ট ক্ষুধা'র আর একজাতীয় চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা

যায়। গর্ভাবস্থায় মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে স্নেহপদার্থ (Fat), প্রোটিন (Protin) এবং কয়েক রকম খনিজ পদার্থের (Minerals) আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন অনেক বেড়ে যায় ; অতএব, এই অবস্থায় উক্ত পদার্থগুলি খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করার প্রেষণাও পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় এই প্রেষণা এমনই তীব্র হয় যে এগুলির প্রতি আকর্ষণ অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে, সাধারণ খাদ্যদ্রব্য থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খনিজ-পদার্থ সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে কোন কোন গর্ভবতী নারী এমনকি দেয়ালের চুনবালি বা মাটি খেতে চেয়েছে। আমাদের দেশেও অনেক সময় এই অবস্থায় মাটির খুরি চিবোবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

দৃষ্টান্তবিশেষে 'বিশিষ্ট ক্ষুধা'র মতই 'বিশিষ্ট বিতৃষ্ণা'ও (Specific Food Aversions) পরিলক্ষিত হয়। যেমন, প্যারাথাইরয়েড্ (Parathyroid) নামের এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি (Endocrine Glands—পরে এগুলির বিস্তৃততর আলোচনা করা হবে) থেকে উৎপন্ন হর্মোন (Hormone) শরীরের ক্যাল্‌সিয়াম্ (Calcium) এবং ফস্‌ফরাসের (Phosphorus) প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি শরীর থেকে বাদ দিলে একদিকে অভাব ঘটে ক্যাল্‌সিয়াম্-এর, অপরদিকে কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফস্‌ফরাস্ জমা হতে থাকে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে জীবজন্তুর শরীর থেকে প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি কেটে বাদ দেবার পর একদিকে যেমন ক্যাল্‌সিয়াম্ যুক্ত খাদ্যর প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয় অপরদিকে তেমনি তীব্র হয় ফস্‌ফরাস্-যুক্ত খাদ্যর প্রতি বিতৃষ্ণা।

(খ) তৃষ্ণা (Thirst)

ঘাম, লালা, মূত্র প্রভৃতি রূপে আমাদের শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায় ; অতএব শরীরের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হয় জলের অভাব বা প্রয়োজন। এই অভাব বা প্রয়োজন থেকে যে-দৈহিক প্রেষণার সূত্রপাত তারই নাম তৃষ্ণা। ক্ষুধার মতই তৃষ্ণার ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক প্রশ্ন হল : শরীরের অভ্যন্তরে এই জলাভাব সংক্রান্ত বোধ বা অভিজ্ঞতা হয় কী ভাবে ? কিছুদিন আগে পর্যন্ত শারীরবিজ্ঞানীরা অনুমান করতেন, শরীরে জলাভাব ঘটলে আমাদের মুখ ও গলা শুকিয়ে যায় এবং এই অবস্থায় আমরা মুখ ও গলা থেকে যে-অস্বস্তিকর অঙ্গীয় সংবেদন পাই তা দূর করার জন্যই জলপানে প্রবৃত্ত হই। অর্থাৎ, গলা প্রভৃতির শুষ্ক অবস্থা থেকেই শরীরে জলাভাবের বোধ বা অভিজ্ঞতা ঘটে। চলতি কথাতেও আমরা বলে থাকি, 'তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে'।

গলার শুষ্কতাকে সাধারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে তৃষ্ণার নির্দেশক বলে স্বীকার করলেও এই শুষ্কতাকেই তৃষ্ণার একমাত্র নির্দেশক বলা যায় না। প্রমাণ হিসাবে, লালা-

গ্রন্থি (Salivary Gland) বিহীন জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়। লালা-গ্রন্থির অভাববশত এই ব্যক্তির গলা ও মুখ সর্বদাই শুষ্ক থাকতো ; শুষ্কতার অস্বস্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিটি বারবার জল পানও করতো। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, তাছাড়াও ব্যক্তিটির মাঝে মাঝে জলপিপাসা বা তৃষ্ণা দেখা দিত এবং তখন সে জৈব প্রয়োজন সাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলই পান করতো। অতএব এই জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে, গলার শুষ্কতা ছাড়াও অন্য কোন ভাবে শরীরের অভ্যন্তরে জলাভাব সূচিত হয়।

সম্প্রতি কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করেও• বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চেয়েছেন। যে-নালিটির ভিতর দিয়ে গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় যায় তার নাম ইসোফেগাস (Esophagus)। কুকুরের উপর অস্ত্রোপচার করে গলার পাশ দিয়ে এই নালির এক প্রান্ত বাইরের দিকে বের করে দেওয়া হল, যাতে কুকুর জল পান করলে ইসোফেগাস দিয়ে সেই জল পাকস্থলী পর্যন্ত না-গিয়ে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আয়োজন রাখা হল, পাকস্থলীতে সরাসরি খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দেবার। এ-জাতীয় কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য ও পানীয় পেয়ে কুকুরের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হল। এই অবস্থায় কুকুরকে জল দিয়ে দেখা গেল, শরীরের পক্ষে যে-পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেই পরিমাণ জলই কুকুর পান করছে,—যদিও সবটুকু জলই তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, পাকস্থলী পর্যন্ত একটুও জল যাচ্ছে না। দেখা গেল, এই পরিমাণ জলপানের পর কুকুরটি থেমে যাচ্ছে ; কিন্তু তার অল্পক্ষণ পরেই সে আবার জল পান করছে, আবার থেমে যাচ্ছে, আবার জল পান করছে—যতক্ষণ-পর্যন্ত-না সরাসরি ব্যবস্থা অনুসারে তার পাকস্থলীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কুকুর বারবার এইভাবে জল পান করছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, জৈব প্রয়োজনের চরিতার্থতা ছাড়াও কুকুরটির মুখের মধ্যেই এমন কোন ব্যবস্থা বর্তমান যার সাহায্যে দেহের পক্ষে প্রয়োজন জলের পরিমাণ নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব ; কেননা, জল বাস্তবিকই পাকস্থলীতে পৌঁছুলে পর জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রতিবারই জল শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কুকুর মাত্র সেই পরিমাণ জলই পান করছে যা তার দৈহিক প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত। পরীক্ষার দ্বিতীয় স্তরে, সরাসরি ব্যবস্থা অনুসারে কুকুরের পাকস্থলীতে তার দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল ভরে দিয়ে তাকে আবার মুখ দিয়ে জল পান করতে দেওয়া হল। দেখা গেল, এই অবস্থাতেও কুকুর শুরুর দিকে মুখ দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলই পান করছে—

যদিও এই জলের সবটুকুই তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি পদ্ধতিতে পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ভরে দেবার ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পরে দেখা যায়, কুকুর আর মুখ দিয়ে জল পান করছে না। অর্থাৎ, পাকস্থলীতে জল পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরে কুকুরের তৃষ্ণা-নিবারণ ঘটে। বোঝা গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় মুখ দিয়ে জল পান করার কিছুক্ষণ পরে শরীর থেকে জলাভাবের তাড়না দূর হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, পাকস্থলীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল পৌঁছুবার পর জলাভাবের তাড়না দূর হয় কেন? এ-প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর অবশ্য এখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনুমান করা হয়েছে, জলাভাবের অবস্থায় শরীরের জীবকোষগুলি থেকে জল বেরিয়ে যায় এবং হাইপোথ্যালামাসের (Hypothalamus) কেন্দ্র-বিশেষ জীবকোষগুলির জলক্ষয় সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর। হাইপোথ্যালামাসের এ-জাতীয় কেন্দ্রর সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান্য কেন্দ্রর অবশ্যই যোগাযোগ আছে; তারই ফলে মস্তিষ্ক-পরিচালিত আচরণের দ্বারা শরীরের জীবকোষগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের কাজ সমাধা হয়। জীবকোষগুলিতে জল সংগ্রহ হলে পর হাইপোথ্যালামাসের উক্ত কেন্দ্রগুলিতেও প্রশমিত হয় জলাভাবের স্পর্শকাতরতা।

৭॥ দৈহিক নোদনা ও সহজ-প্রবৃত্তি (Physiological Drive and Instinct)

আমাদের দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মনোবিজ্ঞানের নানা সাবেকী বইতেও সহজ-প্রবৃত্তি (Instinct) শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা স্বভাবতই সহজ-প্রবৃত্তি শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। অতএব, তাঁরা প্রস্তাব করছেন, নিম্নোক্ত দুটি লক্ষণই সহজ-প্রবৃত্তির প্রধানতম পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথা :—(১) শারীরিক বা দৈহিক নোদনা (Physiological Drive), (২) জটিল, শিক্ষা-নিরপেক্ষ (Unlearned) এবং বাঁধাধরা ধাঁচের (pattern) কার্য পরম্পরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার অয়োজন।

সহজ-প্রবৃত্তির স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাতীয় সাধারণ দৈহিক প্রেষণার সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যেতে পারে। দেহের অভ্যন্তরে কোন অভাব-বোধেই দৈহিক প্রেষণার উৎস; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাতীয় সাধারণ দৈহিক প্রেষণার ক্ষেত্রে যে সাধন-সহায়ক আচরণের (Instrumental Behaviour) মাধ্যমে অভাব-নিবারক লক্ষ্যে উপনীত হবার আয়োজন তা সাধারণত (ক) বিশেষ জটিল নয়, (খ) শিক্ষা-নিরপেক্ষ নয়, এবং (গ) কোন নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ধাঁচের পরিচায়ক নয়।

অপরপক্ষে, দৈহিক অভাব-বোধ থেকেই সহজ-প্রবৃত্তির সূত্রপাত হলেও যে সাধন-সহায়ক আচরণের মাধ্যমে অভাব-নিবারক লক্ষ্যে উপনীত হবার আয়োজন তা (ক) জটিল, (খ) শিক্ষা-নিরপেক্ষ এবং (গ) নির্দিষ্ট ধাঁচের পরিচায়ক।

সহজ-প্রবৃত্তির কথা আমরা পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। আপাতত মাত্র একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। যথা : মাতৃত্ব-আচরণ (Maternal Behaviour)। মানব এবং নানা মানবেতর প্রাণীর মধ্যে এই মাতৃত্ব-আচরণের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মাতৃত্ব-আচরণ বলতে বস্তুত বিবিধ আচরণ-পরম্পরাই বোঝায় : গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন পর্যন্ত নানা প্রকার জটিল কিন্তু বাঁধাধরা ধাঁচের কার্যাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয় এই মাতৃত্ব-আচরণ। যেমন, সন্তান-জন্মের আগে থাকতেই ইঁদুর খড়কুটো প্রভৃতি সংগ্রহ করে সন্তানের জন্য বাসা বা নীড় রচনার উদ্দেশ্যে; সেইখানে সন্তানের জন্ম দেয়; জন্মদানের পর সন্তানদের শরীর চেটে-পুটে সাফ করে; সন্তানদের স্তন্য-দান করে এবং অন্যান্য নানাভাবে তাদের রক্ষা ও প্রতিপালন করে। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, এ-জাতীয় আচরণ-পারম্পর্য অত্যন্ত জটিল হলেও বস্তুত শিক্ষা-নিরপেক্ষ। কোন মেয়ে-ইঁদুরকেই শিক্ষার মাধ্যমে এ-জাতীয় আচরণ আয়ত্ত করতে হয় না। দ্বিতীয়ত, এ-জাতীয় আচরণ-পারম্পর্যর মধ্যে একটা বাঁধাধরা ধাঁচের পরিচয়ও পাওয়া যায় : সমস্ত মেয়ে-ইঁদুরই গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন পর্যন্ত মোটের উপর একইভাবে পরপর নানা কাজ করে যায়। এই মাতৃত্ব-আচরণের উৎসেও কোন এক রকম শারীরিক নোদনা অনুমিত হয়েছে; তাকে মাতৃত্ব-নোদনা (Maternal Drive) আখ্যা দেওয়া হয়। মাতৃত্ব-নোদনার শারীরিক ব্যাখ্যা হিসাবে বিশেষত প্রোল্যাক্টিন্ (Prolactin) নামের এক রকম হর্মোনের (Hormone) উল্লেখ করা হয়। শরীরের বিবিধ এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি (Endocrine Glands) থেকে নানা রকম উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; সেগুলিকেই হর্মোন্ বলে। মাথার ভিতর পিটুইটারি (Pituitary) নামের এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি থেকে নানা রকম হর্মোন্ উৎপন্ন হয়; তারই মধ্যে এক রকম হর্মোনের নাম প্রোল্যাক্টিন্। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের পিটুইটারি গ্রন্থি প্রোল্যাক্টিন্ উৎপাদন করে। প্রোল্যাক্টিনের প্রভাবেই গর্ভাবস্থায় স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুগ্ধ উৎপাদন ছাড়াও প্রোল্যাক্টিনের আরো নানা প্রভাব আছে এবং মাতৃত্ব-নোদনাও এ-জাতীয় প্রভাবেরই পরিচায়ক বলে অনুমিত হয়েছে। সেই অনুমানের প্রমাণ হিসাবে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার উল্লেখ করা যায় : এক জায়গায় একটি ইঁদুর বাচ্চা পেড়েছে; সেখান থেকে মা-ইঁদুরকে সরিয়ে দিয়ে অপর একটি মেয়ে-ইঁদুরের

শরীরে প্রোল্যাক্‌টিন্ ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে ইঁদুর বাচ্চাগুলির সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল। দেখা গেল, সাধারণ অবস্থায় এই মেয়ে-ইঁদুরটির মধ্যে মাতৃত্ব-আচরণের পরিচয় না-থাকলেও প্রোল্যাক্‌টিন্ ইন্‌জেক্‌সনের প্রভাবে তা সুপরিস্ফুট হয়—অর্থাৎ, ইন্‌-জেক্‌সনের প্রভাবে মেয়ে-ইঁদুরটি ইঁদুর বাচ্চাগুলিকে ঠিক মায়ের মতই রক্ষা ও প্রতি-পালনের কাজ করে চলেছে। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, মাতৃত্ব-আচরণের উৎসে যে মাতৃত্ব-নোদনা তার প্রধানতম শারীরিক কারণ হল প্রোল্যাক্‌টিন্ নামের হর্মোনেরই প্রভাব।

৮॥ শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণা (Unlearned Motives)

ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক প্রেষণা এবং মাতৃত্ব-আচরণ প্রভৃতি সহজ-প্রবৃত্তিকে অবশ্যই শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণার দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। এগুলিকে কোন মতেই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফল বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে অনেক প্রেষণাই শিক্ষা-নিরপেক্ষ (Unlearned)। অতএব, শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণার মূল লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণার মূল লক্ষণ হল :

(ক) সার্বিকতা (Universality) : যে-প্রেষণা সমজাতীয় সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান তাকে স্বভাবতই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার পরিণাম বলা সম্ভব নয় ; কারণ সমজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়, অতএব অভিজ্ঞতার পরিণাম বা ফলাফলের মধ্যেও বৈচিত্র্যর পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষালব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রেষণাও সমজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নভাবেই পরিস্ফুট হবার কথা। অপরপক্ষে, সমজাতীয় সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই যে-প্রেষণাগুলি একই-ভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি কোন প্রাণী-বিশেষেরই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার পরিণাম বা শিক্ষার ফল হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, এই সার্বিকতাকেই শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণার একটি লক্ষণ বলা যায়।

(খ) আজন্ম বর্তমানতা (Presence from Birth) : শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো যে-সব আচরণ জন্মক্ষণ থেকে পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার পরিণাম বলে কল্পনা করার কারণ নেই। অতএব জন্মের সময় থেকে যে-প্রেষণাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে শিক্ষা-নিরপেক্ষ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। অবশ্য, শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণাকে সনাক্ত করার জন্য এই লক্ষণটির উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। কেননা, শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণা

নির্দিষ্ট শারীরিক পরিণতিলাভের পরে পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষত মানবেতর প্রাণীদের যৌন প্রেষণার উল্লেখ করা যায়।

(গ) পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তর্নিহিত স্থায়ী প্রবণতা : আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, আহার নামের আচরণের দিক থেকে একটি পরিণত বয়সের ব্যক্তির সঙ্গে একটি শিশুর অনেক পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের দিক থেকে বলা যায়, শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত আহার নামের আচরণ বিশেষ পরিবর্তনশীল। তবুও এই পরিবর্তনের মূলে এক রকম স্থায়ী প্রবণতাও অবশ্যই বর্তমান। যথা : সকলের ক্ষেত্রেই আহার বলতে বোঝায় ক্ষুধা→ক্ষুন্নিবৃত্তি। পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তর্নিহিত এ-জাতীয় স্থায়ী প্রবণতাও অভিজ্ঞতালব্ধ বা শিক্ষালব্ধ নয়; পক্ষান্তরে, আচরণটির পরিবর্তনের দিকটিই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালব্ধ। অতএব বলা যায়, যে-প্রেষণা পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তর্নিহিত স্থায়ী প্রবণতার পরিচায়ক সে-প্রেষণাও শিক্ষা-নিরপেক্ষ।

৯॥ শিক্ষালব্ধ বা অধীত প্রেষণা (Learned or Acquired Motivation)

ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রেষণার উৎসে কোন অভাব-বোধ বা প্রয়োজন বর্তমান এবং নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে উপনীত হলে এই অভাব-বোধের উপশম হয়। অতএব, প্রেষণার প্রধানতম দুটি লক্ষণ বলতে : (ক) অভাব-বোধ (Need) এবং (খ) লক্ষ্য (Goal)।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাতীয় বহু প্রেষণাই অবশ্য জন্মগত বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত প্রেষণাই এ-জাতীয় নয়। অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় বা শিক্ষালাভের ফলে বিবিধ নূতন লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াস দেখা দেয়, ফলে উদ্ভব হয় নূতন জাতীয় প্রেষণারও। এই নূতন জাতীয় প্রেষণাকে স্বভাবতই শিক্ষালব্ধ বা অধীত প্রেষণা (Learned or Acquired Motive) আখ্যা দেওয়া হয়।

অভিজ্ঞতা লাভ বা শিক্ষার প্রভাবে প্রেষণার লক্ষ্য দু'ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। যথা :—(১) একই অভাব-বোধ দূর করার জন্য নূতন লক্ষ্য নির্বাচিত হওয়া সম্ভব; (২) কোন সহজাত-প্রেষণার আদি বা মূল লক্ষ্যর সঙ্গে সংযোজিত হতে পারে একটি গৌণ (Secondary) লক্ষ্য।

প্রথমত দেখা যাক, একই অভাব-বোধ দূর করার জন্য কীভাবে নূতন লক্ষ্য নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে। ক্ষুধা নামের দৈহিক প্রেষণার দৃষ্টান্তটি দেখা যাক। যে-অভাব-বোধ থেকে ক্ষুধার উৎপত্তি তা মেটাবার জন্য অবশ্যই খাদ্য নামের লক্ষ্যে

উপনীত হওয়া দরকার ; কিন্তু এই লক্ষ্য বলতে কোন এক রকম নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তু লাভই অনিবার্য নয়—বিভিন্ন খাদ্যবস্তু লাভ করে একই ক্ষুধার নিবৃত্তি সম্ভব। অতএব এই বিবিধ খাদ্যবস্তুর প্রতিটিকেই সম্ভবপর লক্ষ্য (possible goals) আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু মানব ও মানবেতর প্রাণী উভয়ের দৃষ্টান্তেই দেখা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে এই বিবিধ সম্ভবপর লক্ষ্যর মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভের অভিজ্ঞতা ঘটলে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যটিই একমাত্র লক্ষ্য বা প্রধানতম লক্ষ্যর রূপ গ্রহণ করে। যেমন, ক্ষুধা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আজন্ম নিরামিষাশী ব্যক্তির লক্ষ্য আমিষ খাদ্য নয় ; পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলে একমাত্র নিরামিষ খাদ্যদ্রব্য লাভই তাঁর লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। তেমনি আবার, চলতি কথায় যেমন বলা হয়, 'মাছ-ভাত না-হলে বাঙালীর যেন পেটই ভরে না'। অতএব দেখা যাচ্ছে, ক্ষুধা নামের প্রেষণার লক্ষ্য ঠিক কীরকম খাদ্যদ্রব্য তা বহুলাংশেই নির্ভর করছে শিক্ষা বা পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর। অবশ্যই আজন্ম-নিরামিষাশী ব্যক্তিও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমশই আমিষ ভক্ষণে অভ্যস্ত হতে পারেন। তেমনি আমিষাশী ব্যক্তিও অভিজ্ঞতার ফলে আমিষ আহার পরিত্যাগ করে ক্রমশ শুধুমাত্র নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হতে পারেন। অর্থাৎ, শিক্ষার প্রভাবে তখন তাঁর ক্ষুধার লক্ষ্য বলতে আমিষ আহারের পরিবর্তে নিরামিষ আহার হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফলে প্রেষণার লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে পারে। একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নূতন লক্ষ্য স্বীকৃত হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞতার প্রভাবে প্রায়ই দেখা যায়, কোন মৌলিক বা মূল লক্ষ্য চরিতার্থ করার একটি নির্দিষ্ট উপায়ই ক্রমশ বা কালক্রমে আচরণের লক্ষ্য হতে পারে। এ-জাতীয় লক্ষণকে গৌণ (Secondary) আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, ক্ষিদে পেলে শিশু কান্না শুরু করে ; কান্না শুনে তার মা তাকে কোলে তুলে খেতে দেবেন। অর্থাৎ, শিশুর এই কান্না হল ক্ষুন্নিবৃত্তির সাধন-সহায়ক আচরণ (Instrumental Behaviour)। এ-আচরণের লক্ষ্য অবশ্য খাদ্যলাভ। কিন্তু শিশুকে খাদ্য দেবার জন্য মা তাকে কোলে তুলে নেন। অতএব, মার কোলে ওঠা শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির একটি উপায় বিশেষ। অবশ্যই, মার কোলে-ওঠাও শিশুর পক্ষে সুখকর। তাই অভিজ্ঞতার ফলে মার কোলে-ওঠা বলে উপায়টিই শিশুর কাছে একটি নূতন লক্ষ্যে পরিণত হয় ; তখন ক্ষিদে না-পেলেও শুধু কোলে ওঠার জন্যই শিশু কাঁদতে থাকে। অর্থাৎ, শিশুর কাছে মুখ্য বা মৌলিক লক্ষ্য ছিল খাদ্য-লাভ ; এই লক্ষ্য-সিদ্ধির একটি উপায়ই অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমশ একটি নূতন লক্ষ্যে পরিণত হয়। এই নূতন লক্ষ্যটিকে গৌণ বলা হয়। কোলে-ওঠার জন্য শিশুর কান্না যে-প্রেষণার সাধন-

সহায়ক আচরণ সেই প্রেষণাকে স্বভাবতই শিক্ষা-সাপেক্ষ বা অধীত (Learned or Acquired) আখ্যা দেওয়া হবে।

এ-জাতীয় গৌণ লক্ষ্য আয়ত্ত করার মূল নিয়মটি আমাদের নানাবিধ সামাজিক আচরণের ব্যাখ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। সেই নিয়ম হল: কোন একটি মুখ্য বা মৌলিক লক্ষ্যর সঙ্গে সাধারণত সেই লক্ষ্য লাভের উপায় হিসাবে কোন সর্ত বা অবস্থা বর্তমান থাকে; কালক্রমে ঐ মুখ্য লক্ষ্যটি লাভ করবার অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত সর্ত বা অবস্থাই এক স্বতন্ত্র লক্ষ্য (গৌণ লক্ষ্য) হিসাবে গৃহীত হয়।

গৌণ লক্ষ্য আয়ত্ত করার গুরুত্ব সংক্রান্ত সিম্পাঞ্জী নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়। চিম্পোম্যাট (Chimpomat) নামে এক রকম যন্ত্র তৈরী করা হল, তার একটি খাঁজের (slot) মধ্যে এক রকম খেলার ঘুঁটি (poker chip) পুরে দিলে যন্ত্রটির অন্য গর্ত দিয়ে আঙুর বা অন্য কোন রকম ফল বেরিয়ে আসবে। ক্ষুধার্ত সিম্পাঞ্জীকে এই কায়দাটি শেখানো হল —অর্থাৎ, শেখানো হল কীভাবে খাঁজের মধ্যে ঘুঁটি ফেললে গর্ত থেকে খাবার পাওয়া যায়। দেখা গেল, সিম্পাঞ্জীরা খুব তাড়াতাড়ি এই কায়দাটি শিখে ফেলতে পারে। কিন্তু আরো চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, কায়দাটি শেখবার পর সিম্পাঞ্জীরা স্পষ্টতই ঘুঁটিগুলির উপর বিশেষ মূল্য আরোপ করতেও শেখে। যেমন: ক্রমশই দেখা যায়, আঙুর পাবার জন্য যতখানি শ্রমসাধ্য কাজ করতে তারা প্রস্তুত এ-জাতীয় ঘুঁটি সংগ্রহ করার জন্যও ততখানিই শ্রমসাধ্য কাজ তারা করে থাকে। জনৈক পরীক্ষক লক্ষ্য করেন, একটা ভারি বাক্সর নীচে ঘুঁটি রেখে দিলে সিম্পাঞ্জী অত্যন্ত কষ্ট সহকারে বাক্সটা সরিয়ে ঘুঁটি সংগ্রহ করছে। এমনকি, যখন ঘুঁটির বদলে ফল বা খাদ্যদ্রব্য পাবার আশু সম্ভাবনা নেই, সেই অবস্থাতেও দেখা যায় প্রচুর কষ্ট করে বাক্স সরিয়ে সিম্পাঞ্জী ঘুঁটি সংগ্রহ করছে—এমনকি সিম্পাজীরা ধৈর্য সহকারে ঘুঁটি জমিয়ে রাখছে, যাতে ভবিষ্যতে সুযোগসুবিধা মতো এই ঘুঁটি যন্ত্রের খাঁজে ফেলে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া সম্ভব হয়।

এই পরীক্ষারই পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষক আরো জটিল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি সিম্পাঞ্জীদের শেখান, খাদ্যদ্রব্য পেতে হলে লাল ঘুঁটি ব্যবহার করতে হবে; পানীয় জল পেতে হলে নীল ঘুঁটি ব্যবহার করতে হবে; খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে স্বাধীনভাবে দৌড় ঝাঁপ করতে হলে সাদা ঘুঁটি ব্যবহার করতে হবে। দেখা যায়, উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যখন যে-প্রয়োজন

সবচেয়ে প্রবল তখন সিম্পাঞ্জীরা সেই প্রয়োজনের সাধক নির্দিষ্ট ঘুঁটি সংগ্রহ করার জন্যেই সবচেয়ে বেশি শ্রমসাধ্য কাজ করতে প্রস্তুত। এই পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ঘুঁটিগুলি প্রথমাবস্থায় লক্ষ্য হিসাবে মূল্যহীন বস্তু হলেও কোন জৈব বা দৈহিক লক্ষ্য লাভের উপায় হিসাবে অভিজ্ঞতায় বর্তমান থাকার ফলে ক্রমশ এগুলিই এক রকম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সিম্পাঞ্জীদের কাছে মুখ্য লক্ষ্য ছিল খাদ্য-বস্তু; কিন্তু ঘুঁটিগুলিই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফলে গৌণ লক্ষ্যে পরিণত হল।

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, মানবেতর প্রাণীদের মধ্যেও শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ নানা রকম গৌণ লক্ষ্য গ্রহণের পরিচয় দেখা যায়। এ-জাতীয় গৌণ লক্ষ্য-প্রণোদিত প্রেষণাকে শিক্ষালব্ধ বা অধীত প্রেষণা বলা হবে। কিন্তু মানব-আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ প্রেষণার গুরুত্ব তুলনায় অনেক বেশি। কেননা আমাদের নানাবিধ আচরণ সামাজিক প্রেষণার পরিচায়ক; সামাজিক প্রেষণাগুলি অবশ্যই সহজাত বা জন্মগত নয়। অপরপক্ষে, জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রধান পার্থক্য সামাজিক আচরণের দিক থেকেই। মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সামাজিক আচরণ তা যদি শিক্ষালব্ধ প্রেষণারই পরিচায়ক হয় তাহলে মানব-আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ প্রেষণার গুরুত্ব আসলে কতখানি তা অনুমান করা কঠিন নয়।

কোন কোন আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মানুষের সামাজিক প্রেষণাগুলির তালিকা প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রেষণা এতো বিবিধ ও বিচিত্র যে এ-জাতীয় কোন তালিকা সুদীর্ঘ হলেও পূর্ণাঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে না। অন্যেরা প্রস্তাব করেছেন, যে-প্রয়োজন বা অভাব-বোধ সামাজিক প্রেষণার উৎস সেগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করতে হবে। তাঁদের মতে এ-জাতীয় প্রয়োজনকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যুক্তিসংগত। যথা: (১) পরসাহচর্যমূলক প্রয়োজন (Affiliative Needs) এবং (২) আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজন (Status Needs)। পরসাহচর্যমূলক প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত হিসাবে নির্ভরতা (Dependency), বন্ধুত্ব (Companionship), প্রণয় (Sexual Affiliation) প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়; সমাজের অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে বিবিধভাবে সহযোগিতার প্রয়োজনই এগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। এ-জাতীয় প্রয়োজনের মূল বৈশিষ্ট্য যেহেতু এক ব্যক্তির পক্ষে সমাজের অপরাপর ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখা বা বশে রাখা বা তুলনায় হেয় করা সেই হেতু কেউ কেউ মন্তব্য করেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজনগুলি বস্তুত অসামাজিক। তাই এগুলিকে

সামাজিক প্রয়োজনের প্রকার বিশেষ বলে বিবেচনা না-করে বরং সমাজবিরোধী অর্থে আত্মকেন্দ্রিক বলেই বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। সমাজের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকলে এ-জাতীয় প্রয়োজনেরও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জনমানবহীন দ্বীপে রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর মতো একমাত্র কোন অধিবাসীর পক্ষে প্রভাব-প্রতিপত্তি বা যশলাভের প্রয়োজন অনুভব করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা মানেই সমাজে বর্তমান অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় বেশি শক্তিশালী বা বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষা; যশের আকাঙ্ক্ষা মানেই হল সমাজে বর্তমান অন্যান্য ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ, মূল্যায়নের দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হলেও এ-জাতীয় প্রয়োজন যেহেতু শুধুমাত্র সামাজিক পরিবেশেই সম্ভবপর সেই হেতু ব্যাপক অর্থে এগুলিকেও সামাজিক প্রয়োজনের প্রকার বিশেষ বলা যায়।

১০ ॥ অবচেতন প্রেষণা (Unconscious Motives)

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সম্প্রদায়গুলির পরিচয় পরে দেখা যাবে। আপাতত মনে রাখা দরকার, সম্প্রদায়-ভেদে সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মৌলিক বিষয়ে গভীর মতভেদও বর্তমান। প্রেষণা-প্রসঙ্গে এ-জাতীয় মতভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, একটি সম্প্রদায়ের নাম মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)। এই সম্প্রদায়-মতে মানব মনের প্রধানত দুটি স্তর—চেতন (Conscious) এবং অবচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious)। উভয় স্তরের মধ্যে নির্জ্ঞান স্তরটিই তুলনায় প্রায় অসীম প্রভাবশালী; বস্তুত আমাদের চেতন স্তরে যে-ঘটনাই ঘটুক না কেন তা মূলতই নির্জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেকটা পুতুল-নাচের মতো। পুতুল-নাচের সময় আমরা দেখি, মঞ্চস্থ পুতুলগুলি নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করছে; কিন্তু এ-জাতীয় কোন অঙ্গভঙ্গি পুতুলগুলির স্বেচ্ছাকৃত নয়। মঞ্চের আড়ালে যে-কলকাঠি নাড়া হচ্ছে তার দ্বারাই পুতুলদের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনি সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ সচেতনভাবে নানাবিধ আচরণ করে থাকে। মনঃসমীক্ষণ-মতে কিন্তু এই আচরণের কোনটিই প্রকৃতপক্ষে তার চেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; সমস্ত আচরণই মূলত নির্জ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত। অবশ্যই সাধারণত আমাদের নিজেদের মনের এই নির্জ্ঞান স্তর আমাদের নিজেদের কাছে অজ্ঞাত; মনঃসমীক্ষণ-মতে অস্বাভাবিক উপায়ে আমাদের কাছে অজ্ঞেয়ও। একমাত্র মনোবিকলন নামের নির্দিষ্ট পদ্ধতির

সাহায্যে কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের নির্জ্ঞান সংক্রান্ত সম্যক অভিজ্ঞতা সম্ভব। মনঃসমীক্ষণবাদীরা আরো দাবি করেন, এই নির্জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় হল, অন্ধ আপোষহীন যৌন কামনা-বাসনাই। অতএব তাঁদের মতে, এ-জাতীয় অন্ধ যৌন কামনাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত সচেতন আচরণের প্রধানতম নির্ণায়ক।

অতএব, মনঃসমীক্ষণ-মতে নির্জ্ঞান প্রেষণাই মুখ্য; চেতন প্রেষণা তারই গৌণ অভিব্যক্তি মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। কোন ব্যক্তি হয়ত অস্ত্রোপচারক হতে চান এবং সে-উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ প্রয়াস করছেন। মনঃসমীক্ষণ-মতে, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন—এবং এমনকি তিনি নিজে সচেতনভাবে তাঁর এই প্রেষণাটিকে যে-ভাবেই বুঝুন না কেন,—বস্তুতপক্ষে তাঁর নির্জ্ঞানে এক জাতীয় যৌন নোদনা বর্তমান; এই নোদনার নাম ধর্ষকাম (Sadism)। যৌন মনস্তত্ত্ব অনুসারে, অপর ব্যক্তি বা জীবজন্তুকে পীড়ন করেও এক রকম যৌন চরিতার্থতা লাভ করা সম্ভব এবং এই চরিতার্থতার পিছনে যে-নোদনা তারই নাম ধর্ষকাম। মনঃসমীক্ষণ-মতে নির্জ্ঞান মনের এ-জাতীয় নোদনার ফলেই জনৈক ব্যক্তি অস্ত্রোপচারক হবার প্রয়াস করেন।

সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে নির্জ্ঞান সংক্রান্ত এই সম্প্রদায়ের মতবাদ পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিচার করা যাবে। আপাতত অচেতন প্রেষণা প্রসঙ্গে মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানী এবং অ-মনোবিজ্ঞানী (যথা, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি) মহলে মনঃসমীক্ষণ সংক্রান্ত প্রভূত উৎসাহ দেখা গিয়েছিল; অতএব নির্জ্ঞান—এবং এই নির্জ্ঞানই কীভাবে চেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এ-বিষয়ে—সুবিশাল আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এ-জাতীয় উৎসাহ এবং আলোচনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাও প্রস্তাবিত হয়েছে। উড্‌ওয়ার্থ যেমন মন্তব্য করছেন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'অচেতন' শব্দটি যথেষ্ট রহস্য সৃষ্টির কারণ হয়েছে: This word, 'unconscious', is responsible for a good deal of mystification in psychology. বস্তুত, মনঃসমীক্ষণবাদীদের বিরুদ্ধে অনেকেরই বক্তব্য এই যে নির্জ্ঞানের উপর তাঁরা যে-গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিকই এবং যৌন বাসনাকেও তাঁরা মাত্রারিক্তভাবেই সর্বশক্তিশালী বলে কল্পনা করেছেন।

অতএব বলা যায়, মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত অচেতন প্রেষণার কথা বিশেষ বিতর্কমূলক। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানীরা যে-অর্থে অচেতন প্রেষণার উল্লেখ করেন এবং তার উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করেন তা স্বীকার না করলেও এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রেষণা প্রায়ই এমন জটিল ও ঘোরালো যে তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ বা এমনকি অনেক সময় অস্পষ্টভাবেও সচেতন হতে পারি না। তবুও এ-জাতীয় প্রেষণার নানা দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঠিক কী উদ্দেশ্যে, কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য আমি একটি লক্ষ্যে উপনীত হতে চাইছি—এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে সব সময় আমার পক্ষে সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। অতএব আমাকে স্বীকার করতে হবে, এ-জাতীয় ক্ষেত্রে আমার প্রেষণা সম্বন্ধে আমি সচেতন নই। এই অর্থে আলোচ্য প্রেষণাকে অচেতন (Not-conscious) আখ্যা দেওয়া বিতর্ক-সাপেক্ষ হবে না। কিন্তু এই অর্থে অচেতন প্রেষণার অস্তিত্ব স্বীকার করা মানেই মনঃসমীক্ষণবাদীদের অর্থে অচেতন বা নির্জ্ঞান প্রেষণা স্বীকার করা নয়।

১১ ॥ প্রেষণার সংঘাত (Conflict of Motivations)

ব্যক্তির মতই ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অত্যন্ত জটিল। এই জটিল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোজনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির পক্ষে বিচিত্র অভাব বোধ করা এবং বিবিধ লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সেই অভাববোধের নিরসন প্রয়াস অনিবার্য। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ব্যক্তির প্রেষণা বিবিধ ও বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। একই ব্যক্তির এ-জাতীয় নানাবিধ প্রেষণার মধ্যে সংঘাত বা দ্বন্দ্বর সম্ভাবনা বর্তমান। বস্তুত, অনেক দৃষ্টান্তে একই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধী বা অন্তত পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন নানা প্রেষণার পারচয় পরিদৃষ্ট হয়।

প্রেষণা-সংঘাতের প্রথম পরিণাম হল অনিশ্চয়তার অবস্থা (State of Indecision)। এ-জাতীয় অবস্থা অনেক সময় তীব্র অস্বস্তিকর বা বিশেষ অস্থিরতার পরিচায়ক হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী প্রেষণার মধ্যে কোন একটির পক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তির বা অস্থিরতার উপশম হয় না।

দুটি বিরোধী প্রেষণার মধ্যে একটি যদি কোন বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চায় এবং অপরটি যদি ভয়, লজ্জা বা আলস্যর প্রভাবে সেই কাজ থেকে বিমুখ করতে চায় তাহলে প্রেষণা-সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তার অবস্থা রূপায়িত হয় দ্বিধা (Hesitancy) হিসাবে। যেমন, জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বা শীতকালে

স্নানের সময় গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালবার ঠিক আগে অনেকেই দ্বিধার পরিচয় দেন। এ-অবস্থায় কর্ম-প্রবণ প্রেষণাটি কোন প্রকারে কর্ম-নিবারক প্রেষণার চেয়ে শক্তিশালী না-হলে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

প্রেষণা-সংঘাতজনিত আরো জটিল অনিশ্চয়তার অবস্থাকে অব্যবস্থিত-ভাব (Vacillation) বলা হয়। ব্যক্তির সামনে দুটি সমান প্রীতিকর বা সমান অপ্রীতিকর লক্ষ্য উপস্থিত থাকলে কোন একটির সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয় এবং তখনই এ-জাতীয় অব্যবস্থিত-ভাব দেখা যায়। উভয় লক্ষ্যের মধ্যে কোন একটিকে বর্জন করে অপরটিকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না-করা পর্যন্ত এই অব্যবস্থিত-ভাবের প্রশমন হয় না। যেমন, কোন ছাত্রের পক্ষে হয়ত দুটি ভাল কলেজে ভর্তি হবার সম্ভাবনা বর্তমান; দুটি কলেজই বিশেষ আকর্ষণীয়, অতএব কোন্‌টিকে ছেড়ে কোন্‌টিতে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় এ-বিষয়ে ছাত্রের পক্ষে মনঃস্থির করা সহজ নয়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যন্ত ছাত্রটির অব্যবস্থিত-ভাব। কিন্তু সাধারণত আমরা এ-জাতীয় অব্যবস্থিত-ভাব কাটিয়ে উঠি। যেমন ছাত্রটি উভয় কলেজের মধ্যে কোন একটিকেই বেছে নেয়। তখন সে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

অব্যবস্থিত অবস্থা এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অবস্থা—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হলেও প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উপনীত হবার পদ্ধতি সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। এই পদ্ধতির আদর্শ বলতে অবশ্য বিচার-বিবেচনা (Deliberation); অর্থাৎ, সম্মুখস্থ উভয় লক্ষ্যর মধ্যে প্রতিটি লক্ষ্যর লাভ-লোকসান বা সুবিধা-অসুবিধা যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করা এবং এই বিচারের ভিত্তিতে যে-লক্ষ্যর লাভ বা সুবিধা বেশি সেই লক্ষ্যটিকেই সচেতনভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু বাস্তবভাবে প্রায়ই এ-জাতীয় সুস্পষ্ট বিচার-বিবেচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, কোন্ লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রকৃত সুবিধাই বা কী এবং অসুবিধাই বা কী তা লক্ষ্যটিতে উপনীত হবার আগে সুস্পষ্টভাবে জানা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়। সম্ভবত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে আংশিক বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করে থাকি এবং এই আংশিক বিচারের ভিত্তিতেই উভয় লক্ষ্যর মধ্যে কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য আমাদের কাছে শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, সম্মুখস্থ দুটি লক্ষ্যর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করা শ্রেয় বা যুক্তিসঙ্গত এ-বিষয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করেও কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না; বরং যতই চিন্তা করা যাচ্ছে ততই যেন উভয় লক্ষ্যরই পক্ষে এবং বিপক্ষে নূতন নূতন যুক্তি আবিষ্কার করে আমরা গভীর থেকে গভীরতর

অব্যবস্থিত অবস্থায় নিমগ্ন হচ্ছি। এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কাজ হল, সাময়িকভাবে বিষয়টিকে ভুলে যাওয়া—অর্থাৎ, এ-নিয়ে আর মাথা না-ঘামানো। অনেক সময় দেখা যায়, একটি ভুলে-যাওয়া নাম মনে করার হাজার চেষ্টা করলেও নামটি কিছুতে মনে পড়ে না; এমনকি যত বেশি করে নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করা যায় ততই যেন স্মৃতি-বিভ্রম বাড়তে থাকে। এ-অবস্থায় সাময়িকভাবে নামটি মনে করার প্রয়াস ছেড়ে বরং অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত; কেননা প্রায়ই দেখা যায়, সাময়িকভাবে নামটি মনে করার চেষ্টা ছেড়ে অন্য বিষয়ে 'মন দিলে' হঠাৎ যেন আপনা-আপনিই নামটি 'মনে পড়ে' যায়। দুটি লক্ষ্যের টানা-পোড়েনে আমরা যখন বিশেষ অব্যবস্থিত অবস্থায় মগ্ন হই তখনো অনেকটা একইভাবে অব্যবস্থিত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ, এ-অবস্থায় দুটি লক্ষ্যর পক্ষে ও বিপক্ষে আরো মাথা না-ঘামিয়ে সাময়িক-ভাবে বিষয়টি ভুলে থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রায়ই দেখা যায়, এইভাবে কিছু সময় বিষয়টিকে ভুলে থাকতে পারলে অকস্মাৎ উভয় লক্ষ্যর মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় তা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়; স্বভাবতই তখন আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা থাকে না।

কখনো বা আবার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব আমাদের মধ্যে এমনই তীব্র অস্বস্তির সৃষ্টি করে যে আমরা বিরক্ত হয়ে 'যা থাকে বরাতে' বলে দুটি লক্ষ্যর মধ্যে যে-কোন একটিকে যা-হোক তা-হোক করে স্বীকার করে নিয়ে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এইভাবে একটি লক্ষ্য গ্রহণ করাকে স্বভাবতই যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত (Arbitrary Decision) বলা হয়।

১২॥ বর্জিত প্রেষণার পরিণাম

প্রেষণা-সংঘাত প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা ওঠে। আমরা ইতিপূর্বে দেখলাম, দুটি লক্ষ্যর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে বিচারমূলকভাবে হোক আর নাই হোক, সে-দুটির মধ্যে আমরা একটিকে গ্রহণ করি এবং অপরটিকে বর্জন করি। প্রশ্ন হল, এই বর্জিত লক্ষ্যর আকর্ষণে যে-প্রেষণা পূর্বে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার গতি কী হয়? এককথায় এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা বর্জিত প্রেষণার গতি নানা রকম হতে পারে। কয়েকটি সম্ভাবনা এখানে উল্লেখ করা যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, নিজেদের অতীত বিচার করে আমরা বুঝতে পারি দুটি প্রেষণার মধ্যে যেটিকে বর্জন করা হয়েছিল সেটি প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীন বা শিশু-সুলভই ছিল; অর্থাৎ সাময়িকভাবে সেটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন এক রকম

মোহর সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও বস্তুত সেটিকে বর্জন করে আমরা তখন ঠিকই করেছিলাম ; অতএব বর্তমানে এ-বিষয়ে আমাদের কোন আক্ষেপই নেই। এ-ক্ষেত্রে বলা যাবে, বর্জিত প্রেষণাটি প্রকৃতপক্ষে মরেই গিয়েছে ; অর্থাৎ প্রেষণা হিসাবে বর্তমানে তা শক্তিহীন বা অন্তঃসারশূন্য।

কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই বর্জিত প্রেষণার শক্তি এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে অতীতে কোন একটি প্রেষণাকে বর্জন করা সত্ত্বেও বস্তুত প্রেষণাটি এমনই গভীর ছিল যে বর্তমানেও তার শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি ; অর্থাৎ বর্তমানেও তা আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবেই বর্তমান। এই সক্রিয়তা অবশ্য প্রকট হতে পারে, আবার প্রকট না-হতেও পারে। যথা, অতীতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেকের দৃষ্টান্তে হয়ত আজীবন আক্ষেপ থেকে যায়। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে বলা হবে, অতীত প্রেষণার সক্রিয়তা প্রকটভাবেই বর্তমান। কিন্তু অনেক দৃষ্টান্তে এই সক্রিয়তা প্রচ্ছন্নও (Disguised) হতে পারে। বর্জিত প্রেষণার প্রচ্ছন্ন সক্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে হিতোপদেশের শৃগালের গল্প উল্লেখ করা যায়। আঙুর ফল শৃগালের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি ; অথচ আঙুর ফলের প্রতি শৃগালের তীব্র আকর্ষণও বর্তমান। এ-ক্ষেত্রে আঙুরের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করে শৃগাল বলেছিল, দ্রাক্ষাফল অম্লরসে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ, দ্রাক্ষা-ফলের প্রতি শৃগালের আপাত-বিতৃষ্ণাটি বস্তুত দ্রাক্ষাফলের প্রতি তীব্র আকর্ষণেরই প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের মধ্যে অনেকের আচরণ বিচার করলেই দেখা যায়, যে-লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি অথচ যে-লক্ষ্যর আকর্ষণও তীব্রভাবেই অনুভূত হচ্ছে সেই লক্ষ্যর প্রতি এ-জাতীয় একটি আপাত-অবজ্ঞা প্রকাশ করে আমরা যেন এক রকম আত্ম-সন্তোষ লাভ করে থাকি। মনোবিজ্ঞানে এ-জাতীয় আচরণকে অনেকে 'আত্মরক্ষামূলক আয়োজন' বা Defense Mechanism আখ্যা দিয়েছেন।

বর্জিত প্রেষণার গতি সংক্রান্ত মনঃসমীক্ষণবাদীদের একটি নিজস্ব মতবাদ আছে। তাঁরা দাবি করেন, বর্জিত প্রেষণা মনের অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত (Repressed) হয় ; কিন্তু তা শক্তিহীন বা প্রাণহীন হয়ে যায় না। বস্তুত অচেতন স্তরে অবদমিত প্রেষণাগুলি প্রধানত দুই ভাবে চরিতার্থতা লাভের আয়োজন করে। যথা : (১) ছদ্মবেশী চরিতার্থতা (Disguised satisfaction) এবং (২) উদ্গতি (Sublimation)। ছদ্মবেশী চরিতার্থতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা স্বপ্ন, দৈনন্দিন ভুলচুক, তামাসা (Wit) এবং মানসিক রোগ-লক্ষণ (Neurotic Symptoms) প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, তাঁদের মতে এ-জাতীয় সমস্ত আচরণই হল অবদমিত

বাসনার প্রচ্ছন্ন বিকাশমাত্র। কিন্তু এই অবদমিত বাসনাগুলি যখন সামাজিকভাবে প্রশংসনীয় কোন রূপে রূপায়িত হয় তখন এগুলির উদ্গতি (Sublimation) ঘটে। বর্জিত প্রেষণার পরিণতি সংক্রান্ত মনঃসমীক্ষণবাদীদের এই মতবাদটিকে স্বভাবতই স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা সম্ভব নয়; কেননা মনঃসমীক্ষণবাদের মূল প্রকল্পগুলির (Hypotheses) উপরই তা প্রতিষ্ঠিত। মনঃসমীক্ষণবাদের বিস্তৃততর আলোচনা আমরা পরে উত্থাপন করবো এবং সেই প্রসঙ্গেই স্বপ্নাদি বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বিচার করা যাবে।

নবম পরিচ্ছেদ

মনোযোগ (Attention)

১ ॥ 'মনোযোগ'-এর অর্থ (Meaning of Attention)

চলতি কথায় আমরা বলি, 'মনোযোগ দেওয়া'—মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা, মনোযোগ দিয়ে গান শোনা, খেলায় মনোযোগ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহার কিছুটা বিভ্রান্তিকর ; কেননা এ-থেকে ধারণা হতে পারে যে আমাদের কোন এক বিশেষ বৃত্তি (faculty) বা শক্তিকেই (power) মনোযোগ বলে। বস্তুত মনোযোগ বলতে কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি বা শক্তি বোঝায় না ; আসলে মনোযোগ এক রকম আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (act) বা আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (process) মাত্র। তাই 'মনোযোগ দেওয়া' না-বলে ববং বলা উচিত 'মনোযোগী হওয়া'—আমরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হই, খেলাধূলায় মনোযোগী হই, গান বাজনায় মনোযোগী হই।

অবশ্যই, 'মনোযোগী হওয়া' মানে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। অর্থাৎ, বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেই মনোযোগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব, আমরাও এখানে বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেই মনোযোগের আলোচনা করবো।

প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে মনোযোগ বলতে বোঝায় এক রকম প্রস্তুতিমূলক আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াকে সাধারণত বলা হয় 'সেট্' (Set)। এই 'সেট্' শব্দটি বহুল প্রচলিত ও সংক্ষিপ্ত, অতএব, আমাদের আলোচনাতেও এই শব্দটিই ব্যবহার করতে পারি। ইতিপূর্বে (পৃঃ ৮-১২) আচরণের ব্যাখ্যাসূত্র আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, বহির্জগৎ থেকে দেহবিশিষ্ট জীবের (O) কাছে উদ্দীপক (S) আসে, তারই প্রত্যুত্তরে দেহ-বিশিষ্ট জীবের মধ্যে প্রতিবেদন (R) দেখা দেয় ; কিন্তু সেই দেহবিশিষ্ট জীবের মধ্যে সাধারণত এক রকম আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতিরও পরিচয় থাকে, এই পূর্ব-প্রস্তুতি বোঝাবার জন্যেই আমরা আচরণের ব্যাখ্যাসূত্রে w সংকেত ব্যবহার করেছি। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ফুটবল খেলার মাঠে দু'দল খেলোয়াড় নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করেছে, রেফারি বাঁশি বাজালেই ফুটবলের উপর খেলোয়াড়দের পা চলবে। এখানে বাঁশির শব্দ হল উদ্দীপক, বলের উপর পা চলা হল প্রতিবেদন। কিন্তু

খেলোয়াড়ের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতির কথা বাদ দিলেও তার আচরণের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে না। বস্তুত বাঁশি শোনার আগে পর্যন্ত খেলোয়াডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণ উদাসীনতার বা নিশ্চলতার পরিচায়ক নয়। আমরা চলতি কথায় বলি, বাঁশি শোনার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত খেলোয়াড়ের ভিতরটা যেন টানটান হয়েছিল, খেলোয়াড় আগে থাকতে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করছিল যে বাঁশির শব্দ পাওয়া-মাত্রই সে যাতে বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—অর্থাৎ, উদ্দীপন পাওয়ামাত্রই যাতে তার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিবেদন দেখা দেয়। খেলোয়াড়ের এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে 'সেট্' আখ্যা দেওয়া হয়।

কিন্তু শুধু খেলোয়াডের কথাই নয়; দর্শকদের কথাও ভেবে দেখা যাক্। ধরা যাক্, মাঠে খুব চাঞ্চল্যকর ফুটবল খেলা হচ্ছে। হাজার হাজার উত্তেজিত দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমিও খেলা দেখছি। আমার পায়ের জুতোটায় হয়ত একটা পেরেক উঠেছে; খেলা দেখতে যাবার সময় আমি হয়ত চিনেবাদাম খেয়েছিলাম, তার ফলে পেটে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে; আমার ঠিক পিছনে যে-দুজন ভদ্রলোক রয়েছেন তাঁরা হয়ত খেলা তেমন বোঝেন না, তাই তাঁরা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলছেন; তাছাড়া অবশ্য মাঠে হাজার হাজার উত্তেজিত দর্শক দুটি দলের পক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল চিৎকার এবং অজস্র অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি করছেন। সংক্ষেপে, এই অবস্থায়, আমার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আমার কাছে বিবিধ বিচিত্র উদ্দীপক আসছে। কিন্তু আমার চোখ রয়েছে শুধুমাত্র খেলার বল আর খেলোয়াডদের উপর—অন্য কোন কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করছি না: জুতোয় পেরেক ওঠার যন্ত্রণা নয়, পেটের অস্বস্তি নয়, পিছনের লোক দুটির অবান্তর কথাবার্তা নয়, অন্যান্য দর্শকের চিৎকার বা অঙ্গভঙ্গি নয়। এ-ক্ষেত্রে বলা হবে, আমি খেলা-দেখায় বা খেলায় মনোযোগী হয়েছি—অর্থাৎ, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক উদ্দীপকই গ্রহণ করছি, উপেক্ষা করছি অপ্রাসঙ্গিক অজস্র উদ্দীপক। কিন্তু কোন্ উদ্দীপক আমার কাছে এখন প্রাসঙ্গিক এবং কোন্ উদ্দীপক আমার কাছে এখন প্রাসঙ্গিক নয়? তা নির্ভর করছে আমার আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বা 'সেট্'-এর উপর: আমি খেলা দেখবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি, তাই শুধুমাত্র খেলার প্রতিই আমার এখন মনোযোগ, অন্যান্য অজস্র বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নেই। অর্থাৎ, মনোযোগ বলতে আমার আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বা 'সেট্' এবং তারই উপর নির্ভর করছে আমার প্রত্যক্ষ।

আমাদের প্রত্যক্ষ কী ভাবে মনোযোগ বা এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। বস্তুত প্রতি মুহূর্তেই বহির্জগৎ থেকে আমাদের কাছে বিবিধ ও

বিচিত্র উদ্দীপক আসে ; কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি অনুসারে আমরা পারি-পার্শ্বিকের শুধুমাত্র নির্বাচিত বিষয় বা বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করি, সমস্ত বস্তু বা বিষয় প্রত্যক্ষ করি না। মনোযোগী হওয়া বলতে যে-জাতীয় আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বা 'সেট্' বোঝায় এখানে তার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক্। ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রী নিদ্রামগ্ন হয়েছেন : টেলিফোনে আওয়াজ হওয়ামাত্রই ডাক্তারের ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভাঙে না ; অপরপক্ষে তাঁদের শিশু সামান্য কেঁদে উঠলেই ডাক্তার-পত্নীর ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু ডাক্তারের ঘুম ভাঙে না। অর্থাৎ, ডাক্তার সহজেই টেলিফোনের শব্দ প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ প্রত্যক্ষ করেন না ; অপরপক্ষে শিশুর কান্নার শব্দ ডাক্তার-পত্নী অত্যন্ত সহজেই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু টেলিফোনের শব্দ প্রত্যক্ষ করেন না। উভয়ের মধ্যে এ-জাতীয় পার্থক্যের কারণ এই যে টেলিফোনের শব্দর প্রতি ডাক্তার বেশি মনোযোগী এবং শিশুর কান্নার শব্দর প্রতি ডাক্তার-পত্নী বেশি মনোযোগী—অর্থাৎ, এক জাতীয় প্রত্যক্ষর জন্য ডাক্তারের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বর্তমান, অপর জাতীয় প্রত্যক্ষর জন্য ডাক্তার-পত্নীর পূর্ব-প্রস্তুতি বর্তমান। একই কারণে কোন বনে-জঙ্গলে বেড়াতে গেলে সাধারণ দর্শক হিসাবে আমি যা প্রত্যক্ষ করবো এবং একজন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিশারদ যা প্রত্যক্ষ করেন তা সমান হবে না, কেননা আমাদের উভয়ের মধ্যে মনোযোগ নামের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতির তারতম্য বর্তমান।

২ ॥ মনোযোগ ও অমনোযোগ (Attention and Inattention)

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, মনোযোগ নামের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতিটি একান্তভাবেই নির্বাচনমূলক। তাই কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া মানেই তুলনায় অপরাপর বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া। চলতি কথায় যেমন বলি, লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া মানেই অন্তত সাময়িকভাবে খেলাধূলায় অমনোযোগী হওয়া, বা খেলাধূলায় যখন মনোযোগী হই তখন লেখাপড়ায় অমনোযোগ ঘটে। অতএব, মনোযোগ একদিকে যেমন প্রত্যক্ষর সহায়ক অপরদিকে তেমনি প্রত্যক্ষর পরিপন্থীও ; অর্থাৎ, কোন বিষয়ে মনোযোগী হলে সেই বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর হলেও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অস্পষ্ট হয় বা বিষয়ান্তর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষর ব্যাঘাত ঘটে। যেমন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রর সাহায্যে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে আমি যখন জীবাণু পরীক্ষা করি তখন এই মনোযোগের ফলে জীবাণু সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অবশ্যই সুস্পষ্ট হয় ; কিন্তু তখন পাশের বাড়িতে রেডিওর গান হলেও আমি সে-গান শুনতে পাই না। অর্থাৎ, জীবাণু-দর্শনে মনোযোগ সংগীত-শ্রবণের অন্তরায়

হয়। বস্তুত যাদুকরেরা ম্যাজিক দেখাবার সময় প্রায়ই সুকৌশলে মনোবিজ্ঞানের এই নিয়মটির উপরই নির্ভর করে থাকেন : কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে তাঁরা দর্শকদের এমন বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী করে তোলেন যে ম্যাজিকের প্রকৃত কৌশলটি সম্বন্ধে দর্শকেরা অমনোযোগী হন, অতএব এই কৌশলটি দর্শকদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না। পাকা খেলোয়াড়েরাও অনেক সময় একই কৌশলে বিপক্ষকে এক বিষয়ে মনোযোগী করে বস্তুত অন্য বিষয়ে অমনোযোগী করেন এবং সেই অমনোযোগের সুযোগে বিপক্ষকে পরাস্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে একটি সাবেকী প্রশ্নের আলোচনা করা যায়। প্রশ্নটি হল : ঐকান্তিক অমনোযোগ (Absolute Inattention) বলে কোন অবস্থা বাস্তবিকই সম্ভব কি? অর্থাৎ, এমন কোন অবস্থা কি বাস্তবিকই ঘটতে পারে যে-অবস্থায় আমরা একেবারে কোন বিষয়েই মনোযোগী হই না? ইতিপূর্বে দেখেছি, এক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া মানেই বিষয়ান্তর সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়া। অতএব ঘুরিয়ে বলা যায়, কোন বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া মানেই বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া। যেমন, বর্তমানে আমি খেলাধূলায় অমনোযোগী; কেননা বর্তমানে আমি লেখায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছি। আমরা সাধারণত অমনোযোগী অবস্থা বলতে এ-জাতীয় ঘটনাই বুঝে থাকি; অর্থাৎ, অমনোযোগী হওয়া মানেই কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া এবং তার প্রকৃত কারণ হল বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়াই। স্বভাবতই এ-জাতীয় অবস্থাকে ঐকান্তিক অমনোযোগের পরিচায়ক বলা যায় না। যেমন, নিকটাত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের কঠিন রোগের সময় অমরা চলতি কথায় হয়ত বলে থাকি, 'কোন বিষয়েই মনোযোগ দেওয়া এখন সম্ভব নয়'। আসলে এ-জাতীয় অবস্থায় রোগী ও রোগের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এমনই অত্যধিক মনোযোগী হই যে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এ-জাতীয় অবস্থাও ঐকান্তিক অমনোযোগের পরিচায়ক নয়, বস্তুত তা অত্যন্ত গভীর মনোযোগেরই পরিচায়ক। তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দ্রুতভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোযোগী হতে পারি; অর্থাৎ, এক বিষয় থেকে অপর বিষয়ে এবং তা থেকে তৃতীয় কোন বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুতভাবে আমাদের মনোযোগ পরিবর্তিত হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এ-জাতীয় পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ মনোযোগহীনতার অবস্থা বলে কল্পনা করা হলেও বস্তুত তা ঠিক নয়। কেননা, এ-জাতীয় অবস্থার প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা কোন-না-কোন বিষয় সম্বন্ধেই মনোযোগী হই, যদিও সেই বিষয়গুলির মধ্যে একতা বা সংহতির অভাববশত আমাদের মনোযোগেও ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দৃষ্টান্তে ঐকান্তিক অমনোযোগের অবস্থা বস্তুত সম্ভব নয়—আপাতদৃষ্টিতে যে-অবস্থা ঐকান্তিক অমনোযোগের পরিচায়ক বলে প্রতীত হতে পারে আসলে তা হয় কোন বিষয়ান্তর সম্বন্ধে গভীর মনোযোগের পরিচায়ক আর না-হয় তো বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দ্রুত পরিবর্তনশীল মনোযোগের পরিচায়ক। সাধারণ সুস্থ মানুষের কথা উল্লেখ করা হল; সিসোফ্রেনিয়া (Scizophrenia) নামের এক রকম উন্মাদ রোগের দৃষ্টান্তে প্রায়ই দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক জগতের কোন কিছু সম্বন্ধেই রোগীর কোন রকম মনোযোগ নেই। অবশ্য এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অমনোযোগের কারণ আসলে কোন কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি প্রায় ঐকান্তিক মনোযোগই হতে পারে। কিন্তু আপাতত আমাদের পক্ষে এই বিতর্কমূলক বিষয় উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই, কেননা সাধারণ ও সুস্থ ব্যক্তিদের আচরণই বর্তমানে আমাদের বিশেষ আলোচ্য।

মনোযোগ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে: একই সময়ে একই ব্যক্তির পক্ষে ক'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া সম্ভব? কিংবা, মনোযোগের পরিধি বস্তুত কতখানি? উত্তরে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। কারুর মতে মনোযোগের বিষয়বস্তু এক; কারুর মতে দুই; কারুর মতে ছয়; ইত্যাদি ইত্যাদি। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, মেঝের উপর একমুঠো মার্বেল-গুলি ছড়িয়ে দিলে একই ব্যক্তি একাধারে ছয়টির বেশি প্রত্যক্ষ করতে পারেন না,—অর্থাৎ ছয়টির প্রতি মনোযোগী হতে পারেন, তার বেশি নয়। কিন্তু এ-জাতীয় পরীক্ষা থেকেও সত্যিই প্রমাণ হয় না যে আমাদের মনোযোগের পরিধি বলতে আসলে ছয়, বা, আমরা একাধারে ছয়টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে পারি। কেননা, এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ছয়টি মার্বেল-গুলি স্বতন্ত্র বস্তু হলেও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ছয়টি স্বতন্ত্র বস্তু মিলিতভাবেই প্রত্যক্ষর এক সামগ্রিক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, ইঁটের পাঁজার দিকে চেয়ে দেখলে আমরা হয়ত কয়েক হাজার ইঁট একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারি; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যক্ষর বিষয়বস্তুকে কয়েক সহস্র মনে করা যায় না। কেননা, কয়েক হাজার ইঁট মিলিতভাবেই প্রত্যক্ষর একটি সামগ্রিক বিষয়বস্তু গঠন করে। অতএব, এ-জাতীয় দৃষ্টান্তর উপর নির্ভর করে মনোযোগের পরিধি নির্ণয় করতে যাওয়া ভুল হবে। অপরপক্ষে, আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এক-বিষয়ে মনোযোগী হওয়া মানেই বিষয়ান্তর সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, মনোযোগের বিষয় বলতে একই—কয়টি বিভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশের ফলে এই

বিষয়টি রচিত হচ্ছে তার হিসাব থেকে মনোযোগের পরিধির হিসাব করা অর্থহীন ও অবান্তর প্রয়াসমাত্র। অবশ্যই মনে রাখা দরকার, মনোযোগের বিষয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়; অর্থাৎ, একই ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোযোগী হতে পারেন। বস্তুত, দৃষ্টান্ত-বিশেষে এইভাবে দ্রুত মনোযোগ-পরিবর্তনের ক্ষমতা অসামান্য প্রতিভার লক্ষণ বলে স্বীকৃত। যেমন, কথিত আছে, জুলিয়াস সিজার একাধারে শ্রুতিলিখনের জন্য চারজনকে চারটি চিঠি বলে যেতেন এবং সেই সময়ই পঞ্চম একটি চিঠি স্বয়ং লিখতেন। এ-জাতীয় ঘটনা সত্য হলেও অবশ্যই প্রমাণ হবে না যে তিনি একাধারে বা একই-সঙ্গে পাঁচটি স্বতন্ত্র বিষয়ে—পাঁচটি স্বতন্ত্র পত্র-রচনায়—মনোযোগী হতে পারতেন। আসলে অত্যন্ত দ্রুতভাবে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ পরিবর্তনের ক্ষমতাই এ-জাতীয় আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা।

৩ ॥ মনোযোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

মনোযোগের অন্তত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যথা :—

এক : ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ (receptor adjustment),

দুই : সাধারণ দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ (postural adjustment),

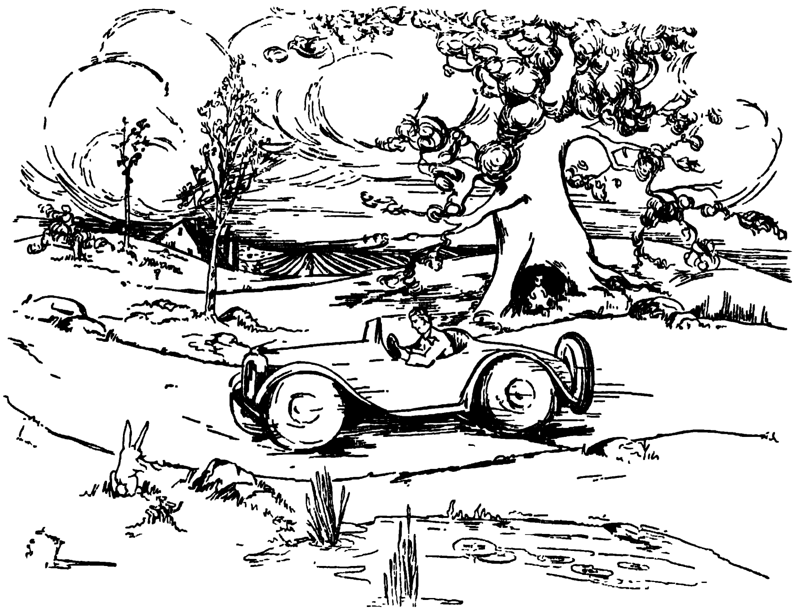
তিন : পেশীর তান বা টানটান অবস্থা (muscular tension),

চার : গ্রাহক ও পেশীর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সম্ভবত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ (some additional adjustment of the central nervous system),

পাঁচ : মনোযোগের বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ।

মনোযোগের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার জন্য পরের পৃষ্ঠায় একটি ধাঁধার ছবি দেওয়া হল। এই ছবির মধ্যে লুকোনো আছে এক দৃশ্য : একজন পুলিশ মোটর-সাইকেল-এ চেপে চলেছে। সাধারণভাবে ছবির দিকে দেখলে পুলিসের দৃশ্যটি চোখে পড়বে না। ধরা যাক্, একজনকে বলা হল, ছবির ভিতর থেকে মোটর-সাইকেল-এ উপবিষ্ট পুলিসের দৃশ্যটি খুঁজে বের করতে। স্বভাবতই সে ছবিটির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবে, বা, চলতি কথায় যেমন বলা হয়, 'মনোযোগ দিয়ে' ছবিটি পরীক্ষা করবে। এ-অবস্থায় তার আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো। প্রথমত আমরা দেখবো, ছবিটির মধ্যে থেকে আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে বের করার জন্য সে তার চোখকে ছবির উপর বিভিন্নভাবে নিবদ্ধ করছে; আমরা চলতি কথায় যেমন বলি, "তার চোখ-জোড়া

ছবির মধ্যে আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।" চোখ একটি ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক। অতএব মনোযোগী হবার প্রথম লক্ষণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ। (অপরাপর দৃষ্টান্তে মনোযোগী হবার লক্ষণ হিসাবে আমরা অপরাপর গ্রাহক-কে নিয়ন্ত্রণ করার আয়োজন করি। যেমন, চলতি কথায় বলি, "কান খাড়া করে শোনা"—অর্থাৎ, কোন শব্দের প্রতি মনোযোগী হবার জন্য আমরা কর্ণ-ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক-কে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করি।) দ্বিতীয়ত, আমরা দেখবো, ছবির ভিতর আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে পাবার জন্য দেহভঙ্গিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজন হচ্ছে। যেমন: ছবির প্রতি বিশেষ



মনোযোগী হবার জন্য ছবির উপর ঝুঁকে পড়তে হচ্ছে, সামনের দিক থেকে ছবির দিকে চেয়ে আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে না-পেলে পাশের দিক থেকে ঘুরে ছবিটি পরীক্ষা করতে হচ্ছে, তাতেও আলোচ্য দৃশ্য খুঁজে না-পেলে ছবিটিকে ঘুরিয়ে (অর্থাৎ, উল্টো দিক থেকে) পরীক্ষা করতে হচ্ছে—বস্তুত এইভাবে উল্টো দিক থেকে ছবিটিকে দেখলে পরই গাছের ডালের পাশে মোটর-সাইকেলে-বসা পুলিসকে দেখতে পাওয়া যাবে। (মনোযোগী হবার অন্যান্য দৃষ্টান্তে সাধারণ দেহভঙ্গিকে অন্যান্য নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিচয় দেখা যায়। যেমন: ফুটবল খেলা দেখার সময় বল যখন গোল-পোষ্টের কাছাকাছি এলো তখন দর্শকেরা আসন থেকে উঠে

দাঁড়ালো এবং হয়ত যথাসম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো।) তৃতীয়ত, পেশীর তান বা টানটান ভাব (muscular tension)। ছবির প্রতি মনোযোগী হবার জন্য চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই শরীরের নানা পেশীর তান বা টানটান ভাব প্রয়োজন হয়। ছবির উপর বিভিন্নভাবে চক্ষু পরিচালনা করার জন্য চক্ষু-সংলগ্ন পেশীগুলিকে নানাভাবে সক্রিয় করা প্রয়োজন; বিভিন্ন কোণ (angle) থেকে ছবিটিকে পরীক্ষা করার জন্য শরীরের নানা পেশীকে নানাভাবে সক্রিয় করা প্রয়োজন; অতএব, মনোযোগী হবার সময় শরীরের বিভিন্ন পেশীর তান বা টানটান ভাব দেখা যায়। অবশ্য এ-জাতীয় সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট পেশীর তান ছাডাও অনেক সূক্ষ্মভাবে পেশীর তান দেখা দিতে পারে। যে-ব্যক্তি ছবির মধ্যে আলোচ্য দৃশ্য খোঁজবার চেষ্টা করছে তার মুখের অবস্থা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার চোখের ভুরু কুঁচকে উঠেছে এবং মুখের অন্যান্য কয়েকটি পেশীও কঠিন আকার ধারণ করেছে। আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে পাবার পর তার মুখের ভাবে যখন আবার স্বাভাবিক স্বস্তির অবস্থা ফিরে আসে তখন আসলে মুখের এই পেশীগুলির টানটান ভাব বদলে স্বাভাবিক শিথিল অবস্থা (muscular relaxation) হয়ে যায়। চতুর্থত, স্নায়ুতন্ত্রর নিয়ন্ত্রণ। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, শরীরের প্রতিটি গ্রাহক (receptor) এবং প্রতিটি কারক (effector) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—অতএব, সহজেই বোঝা যায় বর্তমান দৃষ্টান্তে ছবির উপর ভাল করে চোখ নিয়ন্ত্রণ করার সময় এবং ছবির প্রতি বিভিন্ন দেহভঙ্গি ধারণ করার সময় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু এ-ছাড়াও, অর্থাৎ গ্রাহক ও কারকের সক্রিয়তার জন্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর সাধারণ ভূমিকা ছাডাও মনোযোগী হবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন এক রকম অতিরিক্ত ভূমিকা বর্তমান কিনা—এই প্রশ্ন নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য এবং বিতর্ক আছে। আমরা একটু পরেই এই বিতর্কের উল্লেখ করবো এবং দেখবো, এক জাতীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করে মনোযোগী হবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর এক রকম অতিরিক্তি ভূমিকা অন্তত সম্ভাবনামূলক বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। পঞ্চমত, মনোযোগী হবার ফলে মনোযোগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর হয়; এই বিষয়বস্তুর যে-সব খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য আগে প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছিল না, মনোযোগের ফলে সেগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। যেমন, বর্তমান দৃষ্টান্তে মনোযোগী হয়ে ছবিটি পরীক্ষা করার ফলে ছবির ভিতর লুকোনো মোটর-সাইকেলে উপবিষ্ট পুলিসের দৃশ্য সুস্পষ্টভাবে চোখে পডে; বস্তুত তা শেষ পর্যন্ত এমনই সুস্পষ্ট হয়—বা ছবির অন্যান্য সবকিছু থেকে এই দৃশ্যটিই যেন

আলাদা হয়ে গিয়ে এমন স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়—যে তখন ছবির দিকে চেয়ে দৃশ্যটিকে অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৪॥ মনোযোগ ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

মনোযোগী হবার সময় গ্রাহক ও দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়; উভয়বিধ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। এই অর্থে মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা কোন মনোবিজ্ঞানীই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, গ্রাহক এবং দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে-ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য তা ছাড়াও আরো কোন ভূমিকা—অর্থাৎ, মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আরো কোন রকম অতিরিক্ত ভূমিকা—স্বীকার্য কিনা? এই প্রশ্নে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একটি মতে, গ্রাহক ও দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণই মনোযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত—এ-ছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের কোন অতিরিক্ত বা বাড়তি ভূমিকা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অপর মতে, গ্রাহক ও দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা ছাড়াও মনোযোগের অনেক দৃষ্টান্তেই বিশেষত গুরুমস্তিষ্কের এক স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকারযোগ্য।

সম্মোহন সংক্রান্ত ঘটনা (Hypnotic phenomena) থেকে অনেক ক্ষেত্রে অনুমান হয়, উদ্দীপক গ্রহণ করা-না-করা অনেকাংশেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন এক রকম পূর্ব-প্রস্তুতির („Set) উপর নির্ভর করে। যেমন: কোন ব্যক্তিকে সম্মোহনের অবস্থায় (Hypnotic state) উপনীত করে তাকে বলা হল যে তার গায়ের চামড়ায় কোন স্পর্শকাতরতা (sensitiveness) নেই; তারপর দেখা গেল তার গায়ে আগুনের ছেঁকা বা 'ইলেক্‌ট্রিক সক' (electric shock) দিলেও বা আলপিন ফোটালেও তার কোনরকম যন্ত্রণার অনুভূতি হচ্ছে না, অর্থাৎ সে এ-জাতীয় উদ্দীপক গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে। এ থেকে অনুমান হতে পারে, সম্মোহনের অভিভাবন (Hypnotic suggestion) তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (বিশেষত গুরুমস্তিষ্কে) এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা উক্ত উদ্দীপক গ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল। উদ্দীপক গ্রহণের পক্ষে অনুকূল আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিকে (Set) মনোযোগ/বলা হয়েছে; অতএব, উপরোক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা যায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থাবিশেষ উদ্দীপকের প্রতি আমাদের অমনোযোগী করতে পারে। অথচ এই অবস্থায় তার গ্রাহকগুলি নিষ্ক্রিয় হয়েছে—এ-জাতীয় কোন অনুমানের কারণ নেই। কেননা সম্মোহনের অভিভাবক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের—বিশেষত গুরুমস্তিষ্কের—উপরই প্রভাব বিস্তার করে। অতএব, সম্মোহনের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান

হয়, গ্রাহকের স্বাভাবিক অবস্থা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর উদ্দীপক গ্রহণ করা বা না-করা—অতএব মনোযোগী হওয়া বা না-হওয়া—নির্ভরশীল হতে পারে। তাই মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন এক রকম স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভূমিকা অনুমিত হতে পারে।

প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time) সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকেও আলোচ্য সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত হতে পারে। এ-জাতীয় পরীক্ষার কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে ; আপাতত তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখা যাক্। পরীক্ষণ-পাত্র একটি সুইচ্-এর উপর আঙুল রাখলেন এবং তাঁকে বলা হল আলোর সংকেত বা শব্দের সংকেত—এই দুয়ের মধ্যে যে-কোন সংকেত পাওয়ামাত্রই সুইচ্ থেকে আঙুল তুলে নিতে হবে ; সংকেত-লাভ এবং আঙুল তুলে নেওয়ার (Reaction) মধ্যবর্তী সময়টিকে প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time) বলা হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া-কাল যত স্বল্পই হোক না কেন তা নিখুঁত-ভাবে মাপবার জন্য এক রকম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পরীক্ষার ফলে নিম্নোক্ত চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। একই পরীক্ষণ-পাত্র ঠিক একইভাবে সুইচের উপর আঙুল রেখে বসে আছেন। কখনো তাঁকে বলা হল, আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে এবং যখন তিনি এইভাবে আলোর সংকেত প্রত্যাশা করছেন তখন তাঁকে বাস্তবিকই আলোর সংকেত দেওয়া হল। আবার কখনো কিন্তু তাঁকে আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে বলেও বস্তুত দেওয়া হল শব্দের সংকেত। তেমনি, শব্দের সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে কখনো বা তাঁকে শব্দের সংকেতই দেওয়া হল ; আবার কখনো বা দেওয়া হল আলোর সংকেত। দেখা গেল—

(ক) আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে আলোরই সংকেত দিলে তাঁর প্রতি-ক্রিয়া-কাল কম হয় ; কিন্তু আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে বস্তুত শব্দের সংকেত দিলে তাঁর প্রতিক্রিয়া-কাল বেড়ে যায় বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে তুলনায় বেশি সময় লাগে।

(খ) তেমনি, পরীক্ষণ-পাত্র যখন শব্দের সংকেত প্রত্যাশা করছেন সেই অবস্থায় বস্তুত শব্দেরই সংকেত পেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া-কাল কম হয়, কিন্তু তিনি যখন শব্দের সংকেত প্রত্যাশা করছেন সে-অবস্থায় বস্তুত আলোর সংকেত পেলে তাঁর প্রতিক্রিয়া-কাল তুলনায় বেড়ে যায়—অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া হতে তুলনায় সময় বেশি লাগে।

উপযুক্তভাবে উদ্দীপক গ্রহণ করবার উপরই প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ভরশীল। অতএব, প্রতিক্রিয়া-কাল বেড়ে যাওয়া বা বেশি হওয়া মানেই উদ্দীপক (যথা, আলো বা শব্দের সংকেত) গ্রহণ করতে দেরি হওয়া। উদ্দীপক গ্রহণে তৎপরতা

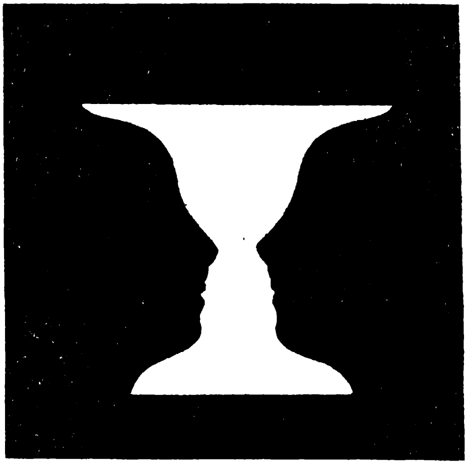
আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থার বা মনোযোগের সূচক : উদ্দীপক যত তাড়াতাড়ি গৃহীত হচ্ছে ততই এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির বা মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, উদ্দীপক গ্রহণ করতে যত দেরি হচ্ছে ততই মনোযোগের অভাব সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া-কাল থেকে মনোযোগ অনুমান করা সম্ভব : প্রতিক্রিয়া-কাল যখন বেশি তখন মনোযোগ কম, প্রতিক্রিয়া-কাল যখন কম তখন মনোযোগ বেশি। পরীক্ষার উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা গেল, একই পরীক্ষণ-পাত্র একই দেহভঙ্গি গ্রহণ করে এবং গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়কে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখলেও তার প্রত্যাশা-অপ্রত্যাশার উপর প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। এই প্রত্যাশা-অপ্রত্যাশা বলতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর—বিশেষত গুরুমস্তিষ্কর—ক্রিয়া-বিশেষই বোঝা উচিত। অতএব, অনুমান হতে পারে যে গ্রাহক ও দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন এক রকম বাড়তি বা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের উপরই মনোযোগ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

কিন্তু উপরোক্ত পরীক্ষা থেকেও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় না। কেননা, পরীক্ষণ-পাত্র যখন আলোক সংকেত প্রত্যাশা করছেন তখন তিনি বিশেষ করে তাঁর চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে কোন একভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি শব্দ-সংকেত পাওয়ার প্রত্যাশা-কালে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ করে তাঁর কর্ণ-ইন্দ্রিয়কে। অতএব, প্রত্যাশার অবস্থাও অন্তত অনেকাংশে ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল হওয়াই সম্ভব। তাই এ-ক্ষেত্রেও গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন এক রকম অতিরিক্ত ভূমিকা অবধারিতভাবে প্রমাণ হয় না। অতএব আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র এইটুকু মন্তব্যই নিরাপদ হবে যে, গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে আলোচ্য সমস্যার কোন রকম চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, যদিও সম্মোহন (Hypnosis) এবং প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time) সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে অনুমান হয়, মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর কোন এক রকম অতিরিক্ত ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।

৫ ॥ মনোযোগ-চাঞ্চল্য (Fluctuations of Attention)

ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোযোগের একটি বৈশিষ্ট্য হল মনোযোগের বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। অতএব, প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে যদি কোন রকম চঞ্চলতা বা অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে সেই ঘটনাকে মনোযোগের চঞ্চলতা বা অস্থিরতার পরিচায়কও বলা হবে। প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে নানা রকম অস্থিরতার বা চঞ্চলতার পরিচায়ক হিসাবে কয়েকটি সুপরিচিত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যায়।

ধরা যাক্‌, আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে একটা ঘড়ি রয়েছে—এতটা দূরে যে আমি অত্যন্ত মনোযোগী হলে কোনমতে ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ শুনতে পারবো। এই অবস্থায় আমি যদি খুব 'কান পেতে' শোনবার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো, এই টিক্‌টিক্‌ শব্দের প্রত্যক্ষ কিছুক্ষণের জন্য ঘটছে আবার কিছুক্ষণের জন্য মিলিয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ, শব্দটি আমি স্বল্পক্ষণ শুনতে পাচ্ছি আবার স্বল্পক্ষণ শুনতে পাচ্ছি না। তেমনি, খুব দূরের কোন ক্ষীণ নক্ষত্রের দিকে মনোযোগী হয়ে চেয়ে থাকলে দেখবো, স্বল্পক্ষণ নক্ষত্রটি আমার চোখে ধরা পড়ছে আবার স্বল্পক্ষণ তা ধরা পড়ছে না। অতএব, এ-জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষের অস্থিরতার বা চঞ্চলতার পরিচায়ক বলা যায়। প্রত্যক্ষের —অতএব মনোযোগেরও—



অস্থিরতা বা চঞ্চলতার পরিচায়ক অপর এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি ছবি দেওয়া গেল। এই ছবির সাদা অংশের প্রতি মনোযোগী হলে একটি ফুলদানির দৃশ্য প্রত্যক্ষ হবে, কালো অংশের প্রতি মনোযোগী হলে প্রত্যক্ষ হবে দুটি মুখের দৃশ্য। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, সাদা দৃশ্যটির প্রতি কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে চেয়ে থাকলেও—অর্থাৎ, অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে শুধুমাত্র সাদা দৃশ্যটি প্রত্যক্ষের প্রয়াস করলেও—স্বল্পক্ষণের মধ্যে মনোযোগ যেন স্বতঃই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সাদা দৃশ্যটির বদলে আমরা কালো দৃশ্যটিই প্রত্যক্ষ করবো। তেমনি, শুধু কালো দৃশ্যটির প্রতি একান্তভাবে মনোযোগী হবার প্রয়াস সত্ত্বেও স্বল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের মনোযোগ আপনিই পরিবর্তিত হয়—অর্থাৎ, আমরা সাদা দৃশ্যটিই প্রত্যক্ষ করি। অতএব, এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকেও মনোযোগের কোন এক রকম অস্থিরতা বা চঞ্চলতাই অনুমিত হয়।

মনোযোগ-চঞ্চলতার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কোন সর্ববাদিসম্মত সুনিশ্চিত উত্তরে উপনীত হতে পারেননি। তবুও সাধারণভাবে এখানে কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে। উপরে আমরা মনোযোগ-চাঞ্চল্যের

দু'রকম দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। প্রথম জাতীয় দৃষ্টান্তটির বৈশিষ্ট্য হল ক্ষীণ বা অত্যন্ত দুর্বল উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ—যেমন ঘড়ির অস্পষ্ট টিক্‌টিক্ শব্দ বা কোন ক্ষীণ নক্ষত্রর প্রত্যক্ষ। এ-জাতীয় দুর্বল উদ্দীপকের স্পষ্ট প্রত্যক্ষর জন্য গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে অন্তর্মুখী স্নায়ু এবং মস্তিষ্কর কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটির পক্ষে সঠিক সক্রিয়তা প্রয়োজন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ মাঝে মাঝে বিলীন হয়ে যায় বলেই অনুমান করা স্বাভাবিক যে ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কর কেন্দ্র পর্যন্ত সমগ্র গ্রাহক-যন্ত্রর (Receptive Apparatus) কোথাও-না-কোথাও উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় সক্রিয়তার অভাব ঘটে। কিন্তু গ্রাহক-যন্ত্রর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তর্মুখী স্নায়ুতে সক্রিয়তার অভাবই সবচেয়ে কষ্টকল্পিত হবে। অতএব মনে করা যেতে পারে, ক্ষীণ বা দুর্বল উদ্দীপক-প্রত্যক্ষর—অতএব মনোযোগেরও—সাময়িক অভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়র সাময়িক অক্ষমতা বা মস্তিষ্ক-কেন্দ্রর সাময়িক অকর্মণ্যতার ফলাফল হওয়াই স্বাভাবিক।

একই ছবির দিকে মনোযোগী হবার সময় কখনো কেন্দ্রীয় চিত্রটি আবার কখনো পটভূমির চিত্রটি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়। এ-জাতীয় মনোযোগ-চঞ্চলতার ব্যাখ্যা হিসাবে নানা মনোবিজ্ঞানী নানা মত দিয়েছেন। কেউ কেউ গ্রাহক, দেহভঙ্গি, রক্ত-চলাচল ব্যবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তনকেই এ-জাতীয় মনোযোগ-পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ বলে বিবেচনা করেছেন ; অপরাপর মনোবিজ্ঞানী দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রর অন্য কোন রকম পরিবর্তনই এ-জাতীয় মনোযোগ-পরিবর্তনের কারণ। গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে উপরোক্ত বিবিধ মতবাদের মধ্যে কোনটিকেই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা নিরাপদ হবে না।

৬ ॥ মনোযোগের সর্ত (Determiners of Attention)

মনোযোগ কিসের উপর নির্ভর করে ? এই প্রশ্নের গুরুত্ব শুধু তত্ত্বগত নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে প্রশ্নটির গুরুত্ব বর্তমান। যেমন, নির্বাচনের সময় নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান, বিজ্ঞাপনদাতা চেষ্টা করেন ক্রেতা-সাধারণকে নিজ পণ্যর প্রতি মনোযোগী করতে। অতএব, মনোযোগ কিসের উপর নির্ভর করে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। বস্তুত আধুনিককালে মনোযোগের সর্ত সংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তার কারণ প্রধানতই ব্যবহারিক প্রয়োজন।

সাধারণভাবে বলা যায়, মনোযোগের সর্ত দ্বিবিধ ; অর্থাৎ, প্রধানত দু'রকম কারণের উপর মনোযোগ নির্ভর করে। এক রকম সর্ত হল বাহ্য (External), এবং অপর জাতীয় সর্ত হল আভ্যন্তরীণ (Internal)। অর্থাৎ, একদিকে বহির্জগতের উদ্দীপকের নানা বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে—এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্দীপকের প্রতি আমরা স্বাভাবিকভাবে মনোযোগী হই। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবেন কিনা তা বহুলাংশে ব্যক্তিটির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরও নির্ভরশীল। মনোযোগের এই দ্বিবিধ সর্তের পরিচয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে দেখা যাক্।

মনোযোগের বাহ্য সর্ত হিসাবে প্রধানত উল্লেখ করা যায় উদ্দীপকের বা উদ্দীপকদায়ক বস্তুর চরিত্র (nature), অবস্থান (location), তীব্রতা (intensity), পরিমাণ (size), রং (colour), গতি (movement), পুনরাবৃত্তি (repetition), অভিনবত্ব (novelty), ইত্যাদি। যেমন, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরা পরীক্ষামূলকভাবে দেখেছেন, লিখিত মন্তব্যের তুলনায় ছবি—বিশেষত মানুষের ছবি—অনেক সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে। তেমনি, গদ্য-রচনার তুলনায় ছন্দোবদ্ধ রচনার প্রতি আমরা সহজে আকৃষ্ট বা মনোযোগী হই। অতএব, উদ্দীপক বা উদ্দীপকদায়ক বস্তুটির স্বীয় চরিত্রকে মনোযোগের একটি সর্ত বলা হবে। তেমনি, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরাই পরীক্ষামূলকভাবে দেখেছেন, খবরের কাগজের কোন্ পাতায়—বা পাতার ঠিক কোন্ জায়গায়—বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তা সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে : দৃশ্য বস্তুর পক্ষে মনোযোগ আকর্ষণের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থান হল চোখের ঠিক সামনের স্থানটি। তেমনি, উদ্দীপকের তীব্রতার উপরও আমাদের মনোযোগ স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরশীল ; যেমন, তীব্র আলোর প্রতি বা লাউড্-স্পীকারের প্রচণ্ড শব্দর প্রতি আমরা সাধারণত মনোযোগী হই। তেমনি, ছোট হরফের তুলনায় বড়ো হরফের প্রতি আমরা মনোযোগী হবার প্রবণতা দেখাই : ছোট পোষ্টারের পাশে বড়ো পোষ্টার পড়লে আমরা বড়োটির প্রতিই মনোযোগী হই ; অর্থাৎ, উদ্দীপক বা উদ্দীপকদায়ক বস্তুর আকার বা পরিমাণ মনোযোগ আকর্ষণের একটি সর্ত। আবার বর্ণবিহীন বস্তুর তুলনায় বর্ণ-বৈচিত্র্যময় বস্তুর প্রতি এবং স্থিতিশীল বস্তুর তুলনায় গতিশীল বস্তুর প্রতি মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হয়। মনোযোগ আকর্ষণের আরো দুটি সর্ত হল পুনরাবৃত্তি ও অভিনবত্ব, যদিও এই দুটি সর্তের মধ্যে কিছুটা বিরোধও বর্তমান। সর্বত্র একই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আমরা সেটির প্রতি মনোযোগী হতে পারি ; নির্বাচনের সময় পথে-ঘাটে অলিতে-গলিতে সর্বত্র একই নির্বাচনপ্রার্থীর

পোষ্টার দেখতে দেখতে আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারি। অতএব, পুনর বৃত্তিকে মনোযোগের একটি সর্ত বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গেই ম রাখা দরকার, পুনরাবৃত্তিই আবার মনোযোগের পরিপন্থী হতে পারে। যেম বারবার একই কথা শুনতে একঘেঁয়ে লাগে, আমরা তখন বিরক্তি বে করি এবং বিষয়টির প্রতি বস্তুত বিতৃষ্ণারই সঞ্চার হয়। এই কারণে বিজ্ঞাপ দাতারা একই বিষয় প্রচার করবার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে নানা রকম অভিনব উপ উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন। এই অভিনবত্ব আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়—অর্থা বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগী করে।

কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মনোযোগ আসলে এক রকম 'সেট' (Set বা আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। তাই উপরোক্ত বাহ্য সর্তগুলিকে এ-জাতী আভ্যন্তরীণ অবস্থা সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক বলে স্বীকার করলেও মনে রাখা দরকা এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা বহুলাংশেই আমাদের প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। পূর্ববত পরিচ্ছেদে দেখেছি, কোন অভাববোধ বা প্রয়োজনবোধেই প্রেষণার উৎস এ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সেই অভাববোধ দূর করাই প্রেষণার উদ্দেশ্য আমাদের মনোযোগ বহুলাংশেই আমাদের প্রেষণার উপর নির্ভরশীল বলেই এ মনোযোগ আমাদের আভ্যন্তরীণ অভাববোধ বা প্রয়োজনবোধের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত যেমন ধরা যাক্, একটি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে পাঁচটি বিভিন্ন রকম পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপ বর্তমান : জুতার বিজ্ঞাপন, কাপড়ের বিজ্ঞাপন, খাবারের বিজ্ঞাপন, বইএ বিজ্ঞাপন এবং সাবানের বিজ্ঞাপন। উপরোক্ত বাহ্য সর্তগুলির দিক থেকে এ পাঁচটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে খাবারের বিজ্ঞাপনটিই হয়ত ন্যূনতম আকর্ষণীয় এব তুলনামূলকভাবে সাবানের বিজ্ঞাপনটিই হয়ত সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। তবু ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি সাবানের বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রতিই অনেব বেশি মনোযোগী হবেন। অতএব স্বীকার করতে হবে, মনোযোগ শুধুমাত্র বাহ্য সর্তে উপরই নির্ভর করে না; ব্যক্তিবিশেষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার—বিশেষত প্রেষণার— উপরও মনোযোগ বহুলাংশে নির্ভরশীল। অতএব বাহ্য সর্তই মনোযোগের একমা সর্ত নয়, আভ্যন্তরীণ সর্তও মনোযোগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সর্ত।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time)

॥ প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time)

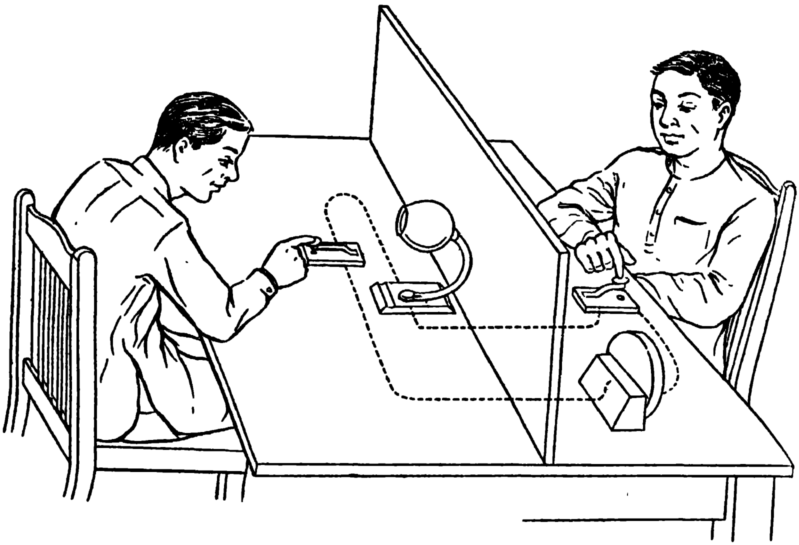
মনোবিজ্ঞানকে আমরা আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছি এবং আমরা :তিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ৮-১২), আচরণের সাধারণ বর্ণনা হল : উদ্দীপক→প্রতি-বদন। অর্থাৎ, (পূর্ব-প্রস্তুতিসম্পন্ন) জীবের কাছে বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক াসে এবং উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে জীবটির মধ্যে প্রতিবেদন দেখা দেয়। একটি সরল ষ্টান্ত দেখা যাক্ : গাড়ি চালাবার সময় আমার চোখে লাল ট্রাফিক্-আলো ।লো, উত্তরে আমি ব্রেক্ কসে গাড়ি থামিয়ে ফেললাম। এ-ক্ষেত্রে, লাল আলো ল উদ্দীপক, পা দিয়ে ব্রেক্ চাপা হল প্রতিবেদন।

কিন্তু লাল আলো চোখে পড়া এবং পা দিয়ে ব্রেক্ চাপা—এই দুটি ঘটনার ধ্যে যতো সামান্যই হোক-না-কেন সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকতে বাধ্য। গাড়ি ালাবার সময় আমি অবশ্যই চেষ্টা করছি, লাল আলো পাওয়ামাত্রই ব্রেক্ কসবো ; কন্তু যতো চেষ্টাই করি না কেন, উদ্দীপক-গ্রহণ এবং প্রতিবেদন হুবহু একই হূর্তে ঘটতে পারে না—যথেষ্ট সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকলে দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ক্ষীণ ্যবধানকেও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

সময়ের এই ব্যবধানকে প্রতিক্রিয়া-কাল আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উদ্দীপক-্রহণ ও প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী কাল বা সময়কেই প্রতিক্রিয়া-কাল বলে।

নিখুঁতভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণত যে-ধরনের পরীক্ষার ্পর নির্ভর করা হয় পরের পৃষ্ঠায় ছবির সাহায্যে তার পরিচয় দেওয়া হল। ছবির ামদিকে বসে আছেন পরীক্ষণ-পাত্র ; তাঁর সামনে একটি আলো রয়েছে এবং তিনি াঙুল দিয়ে একটি সুইচ্ চেপে রেখেছেন। তাঁকে বলা আছে, আলো জ্বলতে দখামাত্রই সুইচের উপর থেকে আঙুল তুলে নিতে হবে। অর্থাৎ, পরীক্ষণ-াত্রর কাছে উদ্দীপক হল আলো এবং প্রতিবেদন হল সুইচের উপর থেকে আঙুলের াপ অপসারণ। ছবির ডানদিকে বসে আছেন পরীক্ষক, তাঁরও আঙুল অপর একটি সুইচের উপর রয়েছে। এই সুইচ্টি টেপার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষণ-পাত্রর ামনের আলো জ্বলে উঠবে। শুধু তাই নয়। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে

পরীক্ষকের সামনের সুইচ্‌টির সঙ্গে একটি বিরাম-ঘড়িরও (Stop-watch) এমন যোগাযোগ রয়েছে যে তিনি সুইচ্‌টি টেপার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘড়িটি চলতে থাকবে।



অর্থাৎ, পরীক্ষক সুইচ্‌ টেপার ফলে দুটি ঘটনা হুবহু একই সময়ে ঘটবে। যথা : (ক) পরীক্ষণ-পাত্রর সামনে আলো জ্বলে ওঠা এবং (খ) বিরাম-ঘড়িটি চলতে শুরু করা। অপরপক্ষে, পরীক্ষণ-পাত্রর সামনের সুইচের সঙ্গেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় এই বিরাম-ঘড়ি এমনভাবে সংযুক্ত যে পরীক্ষণ-পাত্র তাঁর সুইচের উপর থেকে আঙুলের চাপ অপসারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম-ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব, পরীক্ষণ-পাত্র উদ্দীপক পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাম-ঘড়ি চলতে শুরু করবে এবং তাঁর প্রতিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব, এই ব্যবস্থার সাহায্যে নিখুঁতভাবে মাপা যাবে উদ্দীপক-লাভ এবং প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বা প্রতিক্রিয়া-কাল।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, প্রতি $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডে সাধারণ বিরাম-ঘড়ির কাঁটা এক ঘর করে নড়ে ; তাই $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডকেই সাধারণ বিরাম-ঘড়ির 'একক' বলা হয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম সময়ের ব্যবধান মাপার যন্ত্রকে বলে 'ক্রোনোস্কোপ' (Chronoscope) ; এই যন্ত্রের 'একক' (unit) হল 'মিলিসেকেণ্ড' (Millisecond)—অর্থাৎ, ·০০১ বা $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড। প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত পরীক্ষায় এ-জাতীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হলে তুলনায় নিখুঁতভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল মাপা সম্ভব।

২॥ প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য: ক্যাটেল্-পরিচালিত পরীক্ষা (Cattell's Experiments)

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, শুধু যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে তাই নয়, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রতিক্রিয়া-কাল বিভিন্ন হয়। ক্যাটেল্ (Cattell) নামক জনৈক বিজ্ঞানী প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত বহু পরীক্ষা পরিচালনা করেন; তাঁর পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য সংক্রান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এ-জাতীয় কিছু তথ্য উল্লেখ করা যাক্।

(ক) গ্রাহকের (Receptor) পার্থক্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। যথা: চক্ষুর সাহায্যে উদ্দীপক গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৫০-২০০ মিলিসেকেণ্ড, কর্ণের সাহায্যে উদ্দীপক গ্রহণের ক্ষেত্রে ১২০-১৬০ মিলিসেকেণ্ড; তেমনি, জিহ্বার ক্ষেত্রে ৩০০-১০০০ এবং নাসিকার ক্ষেত্রে ২০০-৮০০।

(খ) উদ্দীপকের তীব্রতা প্রভৃতি হ্রাস পেলে প্রতিক্রিয়া-কাল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বেড়ে যায়। যথা: উদ্দীপক যখন মোটামুটি উজ্জ্বল আলো তখন প্রতিক্রিয়া-কাল সাধারণত ১৯১ মিলিসেকেণ্ড; কিন্তু সেই আলোর উজ্জ্বলতা অর্ধেক হলে প্রতিক্রিয়া-কাল ৩ মিলিসেকেণ্ড বেড়ে যায়, উজ্জ্বলতা $\frac{১}{১০}$ করে দিলে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৭ মিলি-সেকেণ্ড বেড়ে যায়।

(গ) পরীক্ষণ-পাত্রকে উৎসাহ দিলে বা প্রশংসাসূচক কথা শোনালে তাঁর প্রতি-ক্রিয়া-কাল প্রায় ৮ মিলিসেকেণ্ড বেড়ে যায়; প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব ঘটলে শাস্তি দেওয়া হবে—এ-জাতীয় ভয় দেখালে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ মিলিসেকেণ্ড কমে যায়; পরীক্ষণ-পাত্রকে চা, কফি বা অল্প পরিমাণে মদ খাওয়ালে তাঁর প্রতিক্রিয়া-কাল কম হয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

(ঘ) অভ্যাস (practice), মনোযোগ, চিত্তবিক্ষেপ (distraction), ক্লান্তি প্রভৃতির ফলেও প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য হয়। অভ্যাসের ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল কমে যায়, তবে একবার কোন পরীক্ষায় অভ্যস্ত হলে পর আর প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য হয় না। মনোযোগের ফলে প্রতিক্রিয়া-কালের কী রকম তারতম্য ঘটে আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে তার কিছুটা পরিচয় দেখেছি। চিত্তবিক্ষেপের ফলে (যেমন, পরীক্ষার সময় পরীক্ষণ-পাত্রকে 'মনে মনে' কোন হিসাব করতে বা অঙ্ক কষতে বললে) প্রতিক্রিয়া-কাল কিছুটা বেড়ে যায়; ক্লান্তির ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল সাধারণত বেড়ে গেলেও পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে পরীক্ষণ-পাত্র পরীক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর প্রতিক্রিয়া-কালের উপর ক্লান্তির প্রভাব আর থাকে না।

(ঙ) প্রত্যাশা-কালের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। পরীক্ষণ-পাত্রকে উদ্দীপক প্রত্যাশা করতে বলা এবং প্রকৃতপক্ষে উদ্দীপক দেওয়া —উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কে প্রত্যাশা-কাল বলা হয়। প্রত্যাশা-কাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতিক্রিয়া-কাল বেড়ে যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও প্রতিক্রিয়া-কাল বেড়ে যায়।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উপরোক্ত পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের গুরুত্ব অবশ্যই সুস্পষ্ট। যেমন, কলকারখানায় বিবিধ কাজের জন্য বিবিধ ধরনের উদ্দীপকের উত্তরে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হয়। অতএব, সেই সব কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি খুবই মূল্যবান। তেমনি, মোটের উপর একই কারণে সামরিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যেও ক্যাটেল্‌-পরিচালিত পরীক্ষার বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়; সাম্প্রতিক শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাঁর নানা পরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত। বস্তুত, প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত ক্যাটেল্‌ আরো নানা রকম পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং তার ফলে মনোবিজ্ঞানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষাগুলির বর্ণনা কিছুটা জটিল হবে; কিন্তু তা বাদ দিয়েও এখানে সংক্ষেপে পরীক্ষালব্ধ কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যায়। যেমন, ক্যাটেল্‌-পরিচালিত পরীক্ষা থেকে বোঝা গিয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে কয়েকটি অক্ষর পড়তে (প্রত্যক্ষ করতে) যতটা সময় লাগে তার চেয়ে কম সময় প্রয়োজন হয় অক্ষরগুলি মিলিতভাবে কোন শব্দ গঠন করলে সেই গোটা শব্দটি পাঠ করতে। এমনকি একটি স্বতন্ত্র অক্ষর পড়বার চেয়ে কয়েকটি অক্ষর-গঠিত ছোট একটি শব্দ পড়তে তুলনায় বেশি সময় লাগে না। এর থেকে বোঝা যায়, কোন শব্দ পড়বার সময় আমরা আসলে সেই শব্দের অন্তর্ভুক্ত আলাদা আলাদা অক্ষরকে আলাদা আলাদা করে পাঠ বা প্রত্যক্ষ করি না। স্বভাবতই এ-জাতীয় তথ্য সাম্প্রতিক শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। তেমনি, ক্যাটেল-পরিচালিত পরীক্ষার ফলে এ-কথাও প্রমাণ হয়েছে যে বিদেশী ভাষার তুলনায় মাতৃভাষায় পড়া সহজসাধ্য—যতো কষ্ট করে এই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করবার আয়োজন হোক-না-কেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া

(Non-voluntary Actions)

১॥ ইচ্ছা-মূলক এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া

সাবেকী মনোবিজ্ঞানে আমাদের কার্যাবলীকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—(ক) ইচ্ছা-মূলক (Voluntary), এবং (খ) ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (Non-voluntary)। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক।

এখন আমি লিখতে বসেছি। কিন্তু তার বদলে আমি অন্যান্য নানা কাজ করতে পারতাম: গল্পের বই পড়তে পারতাম, গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতে পারতাম, রেডিও খুলে খেলার খবর শুনতে পারতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, এখন আমি কী করবো-না-করবো এ-বিষয়ে আমার সামনে নানা রকম সম্ভাবনা বর্তমান। তার মধ্যে অবশ্য একটি সম্ভাবনা হল লিখতে বসা। কিন্তু অন্যান্য সম্ভাবনার মতই এটির পক্ষেও কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই। তবুও আমি বর্তমানে অন্যান্য সম্ভাবনা বর্জন করে এই নির্দিষ্ট সম্ভাবনাটিই বেছে নিয়েছি বা স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছি। অতএব, এই কাজটি ইচ্ছা-মূলক।

কিন্তু ধরা যাক, আমার নাকে লঙ্কা-পোড়ার ধুঁয়ো এলো, ফলে আমি হাঁচলাম। 'হাঁচি' বলে আমার এই কাজটিকে স্বভাবতই ইচ্ছা-মূলক বলা যাবে না। কেননা, এ-ক্ষেত্রে হাঁচবো-কি-হাঁচবো-না—তা আমি স্বেচ্ছায় নির্বাচন করি না। বস্তুত, লঙ্কার ধোঁয়া নাকে এলে আমার পক্ষে না-হাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, তার বদলে আমি (বহুলাংশে) হাঁচতে বাধ্য। এ-জাতীয় যে-সব ক্রিয়া আমরা স্বেচ্ছায় সম্পাদন করি না—বা, যে-সব ক্রিয়া বিবিধ সম্ভাবনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনাকে নির্বাচনমূলকভাবে গ্রহণ করার পরিচায়ক নয়,—সেগুলিকে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আখ্যা দেওয়া হয়।

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া নানা রকমের হতে পারে। সাধারণত এগুলিকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা :

(ক) স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous, Automatic or Random),

(খ) প্রতিবর্ত (Reflex),
(গ) সহজ প্রবৃত্তি (Instinct),
(ঘ) ভাবগতি (Ideo-motor) এবং
(ঙ) অভ্যাস (Habit) ।

একে একে এগুলির পরিচয় দেখা যাক্ ।

২ ॥ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া (Spontaneous, Automatic or Random Action)

শিশুর প্রাথমিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনই সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত হয়। যেমন : একটি শিশু বিছানায় শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে শিশুর এ-জাতীয় কার্যও এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যর সাধক। কিন্তু এ-জাতীয় কার্যের পিছনে কোন পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অনুমান করা কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক হবে। অতএব সাধারণত বলা হয়, শিশুর এ-জাতীয় কার্য দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির (surplus energy) বিকাশমাত্র। তবুও মনে রাখা দরকার, এইভাবে আপাত-অকারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ফলে শিশুর বিবিধ স্নায়ু এবং পেশী পুষ্টিলাভ করে। অতএব, শিশুর শরীর বিকাশের পক্ষে কার্যটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বা স্বেচ্ছা-পরিকল্পিত না-হলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় ; এ-জাতীয় কার্য বাধাপ্রাপ্ত হলে শারীরিক অশান্তি ও এমনকি অসুস্থতা দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া কোন প্রকার বাহ্য উদ্দীপকের উপর নির্ভর করে না ; তাই অনুমান করা প্রয়োজন যে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক কোন-না-কোন প্রকারে দেহাভ্যন্তরেই উদ্বুদ্ধ হয়।

অনেকের মতে, রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, খাদ্যাদি পরিপাক প্রভৃতি দেহ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্যও আসলে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ারই নিদর্শন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ-জাতীয় কার্যাবলী প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (পৃঃ ৫৪-৫৭ দ্রষ্টব্য) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; অতএব এগুলিকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex Action) দৃষ্টান্ত বলেই গ্রহণ করা উচিত। অপরপক্ষে, শিশুর এলোমেলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা কোন রকম প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় ; তাই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবে এই জাতীয় ক্রিয়াকে স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) আখ্যা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩ ॥ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)

আগুনে হাত লাগলেই আমরা হাত সরিয়ে নি, নাকের ভিতর ধুলো ঢুকলে বা অন্য কোনভাবে সুড়সুড়ি লাগলে আমরা হাঁচি,—এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে আমরা

'ইচ্ছা করে হাত সরিয়েছি' বা 'ইচ্ছা করে হেঁচেছি' বলা যায় না। অতএব, এ-জাতীয় ঘটনাও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ারই দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই ক্রিয়াগুলি পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না এবং সর্বত্রই এগুলির মধ্যে একরূপতা (uniformity) পরিদৃষ্ট হয়। তার কারণ, এই ক্রিয়াগুলির মূলে স্নায়ুতন্ত্রর জন্মগত যোগাযোগ বর্তমান। অর্থাৎ, কোন অন্তর্মুখী স্নায়ুর সঙ্গে কোন বহির্মুখী স্নায়ুর সরাসরি যোগাযোগের ফলে যখন কোন গ্রাহক উদ্দীপিত হবার ফলে প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো কোন কারক সক্রিয় হয় তখন সেই ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। অন্তর্মুখী স্নায়ুর সঙ্গে বহির্মুখী স্নায়ুর এ-জাতীয় সরাসরি যোগাযোগকে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (Reflex Arc) বলে ; আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ৫৪-৫৭) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশর আলোচনা করেছি।

জন্মগত স্নায়বিক যোগাযোগের উপর প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত বলেই সাধারণত বা সহজে তা পরিবর্তিত হয় না। যেমন : চোখে আলো বেশি এলে তারারন্ধ্র ছোট হয়ে যায়, আলো কম এলে তারারন্ধ্র বড়ো হয় (পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য)। এটি একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং সাধারণত এটি পরিবর্তিত হয় না—যদিও পরে পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) আবিষ্কৃত সাপেক্ষ প্রতিবর্তর (Conditioned Reflex) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখবো, অবস্থাবিশেষে আলো ছাড়াও অন্য উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে একই প্রতিক্রিয়া,—অর্থাৎ তারারন্ধ্রর সংকোচন,—সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ৫৫-৫৭), প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ মোটের উপর স্বাধীন বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ সংগঠন হলেও তা ঐকান্তিক অর্থে বা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন নয় ; এগুলির সঙ্গে গুরুমস্তিষ্কেরও কোনএক রকম যোগাযোগ বর্তমান। তাই প্রতিবর্ত ক্রিয়া সাধারণত অপরিবর্তিত থাকলেও দৃষ্টান্ত বিশেষে পরিবর্তিতও হতে পারে। তবুও এই পরিবর্তন-সম্ভাবনাই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয় ; পক্ষান্তরে, সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়তাই তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

৪ ॥ সহজ-প্রবৃত্তি (Instinct)

সাবেকী মনোবিজ্ঞানে সহজ-প্রবৃত্তি শব্দটি অনেক সময় অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ-নিয়ে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে। স্বভাবতই সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা শব্দটিকে সুস্পষ্টতর এবং সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছেন। প্রেষণার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রধানত দুটি লক্ষণকে সমাজ-প্রবৃত্তির প্রধানতম পরিচায়ক বলে গ্রহণ করতে চান : (ক) দৈহিক নোদনা, (খ) জটিল, শিক্ষা-নিরপেক্ষ

এবং বাঁধাধরা ধাঁচের কার্য-পরম্পরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার আয়োজন। সহজ-প্রবৃত্তির এই দুটি মূল লক্ষণ আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। বর্তমানে সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত স্পষ্টতর ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে অন্যান্য ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার—বিশেষত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার—সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যাক।

বহির্জগৎ থেকে কোন উদ্দীপক গ্রহণ করা থেকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়: আগুনের ছেঁকা লাগলে হাত সরিয়েনি, চোখে আলো পড়লে তারারন্ধ্র সংকুচিত হয়। কিন্তু দৈহিক নোদনাতেই সহজ-প্রবৃত্তির উৎস, অতএব তা (অন্তত সরাসরিভাবে) বহির্জগতের কোন উদ্দীপক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, ইতিপূর্বে মাতৃত্ব-নোদনার দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি, দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন (যেমন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে প্রোলেক্‌টিন্ নামের হর্মোন উৎপাদন) থেকেই সহজ-প্রবৃত্তির সূত্রপাত। অপরপক্ষে, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোন নোদনার পরিচয় নেই। দ্বিতীয়ত, প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে একটি সরল ক্রিয়ামাত্রই; কিন্তু জটিল কার্য-পরম্পরার মাধ্যমেই সহজ-প্রবৃত্তির বিকাশ। যেমন, হাতে আগুনের ছেঁকা লাগামাত্রই হাত সরিয়ে নেওয়া একটিমাত্র ক্রিয়া এবং তা সরলই; কিন্তু সন্তান-জন্মদানের প্রস্তুতি হিসাবে ইঁদুর যখন খড়কুটা জোগাড় করে বাসা রচনা করে তখন তা বিশেষ জটিল ক্রিয়া-পারম্পর্যই। তবুও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই সহজ-প্রবৃত্তিও শিক্ষা-নিরপেক্ষ এবং বহুলাংশেই বাঁধাধরা ধাঁচের। তাই উভয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্যও বর্তমান।

৫ ॥ সহজ-প্রবৃত্তি ও আবেগ (Instinct and Emotion): ম্যাক্‌ডুগালের মত (McDougall's View)

মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায়ের নাম অভিপ্রায়বাদী বা 'হরমিক' সম্প্রদায় (Purposivism or Hormic School of Psychology)। সম্প্রদায়টির প্রধানতম প্রচারক হলেন ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall)। মানব ও মানবেতর প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যায় ম্যাক্‌ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তির উপর বিশেষ—এমনকি প্রায় ঐকান্তিক—গুরুত্ব আরোপণের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে মানব ও মানবেতর প্রাণীর সমস্ত আচরণের মূলে কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তির পরিচয় বর্তমান; বস্তুত আচরণমাত্রই কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তির পক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের পরিচায়ক। আমাদের সমস্ত চিন্তা ও সমস্ত কার্য সহজ-প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত আচরণের মূল ভিত্তি বলতে সহজ-প্রবৃত্তি।

এই মতবাদটি বোঝার জন্য প্রথমত দেখা দরকার, সহজ-প্রবৃত্তি শব্দটিকে ম্যাক্‌ডুগাল ঠিক কোন্ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই তিনটি দিক আছে। যথা: (১) প্রতি সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্রে কোন-না-কোন আবেগ (Emotion) বর্তমান; (২) প্রতি সহজ-প্রবৃত্তির লক্ষ্য হল কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধন; (৩) সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রই জন্মগত হলেও কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়। যথা: আশঙ্কাজনক কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ ঘটলে নিষ্কৃতি নামের সহজ-প্রবৃত্তি (Instinct of Escape) উদ্বুদ্ধ হয়; এই সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্র বলতে ভয় নামের আবেগ এবং ভীতিকেন্দ্রিক নিষ্কৃতি নামের সহজ-প্রবৃত্তি একটি উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক—যথা, নিরাপত্তা বা প্রাণরক্ষা।

এ-মতবাদের একটি মূল দাবি হল, সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই কেন্দ্র বলতে কোন এক আবেগ। ম্যাক্‌ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তিগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন; এই তালিকা অনুসারে মোট ১৪টি প্রধান সহজ-প্রবৃত্তি আছে। স্বভাবতই প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট আবেগও বর্তমান। ইতিপূর্বে আমরা তালিকাটির উল্লেখ করেছি।

১৪টি মূল বা প্রধান সহজ-প্রবৃত্তি ছাড়াও ম্যাক্‌ডুগাল আরো কতকগুলি গৌণ সহজ-প্রবৃত্তির উল্লেখ করেন। যথা: হাঁচা, কাসা, চুলকানো, মলমূত্র ত্যাগ, ইত্যাদি। এবং তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর মতবাদটি কীভাবে স্পষ্টতই কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক। কেননা, হাঁচি, কাসি প্রভৃতি কার্য স্পষ্টতই সরল উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে সরল প্রতিবেদন মাত্র; অর্থাৎ, এগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ামাত্র। এবং এগুলির কেন্দ্রে কোন-না-কোন আবেগের পরিচয় বড়ো জোর কাল্পনিক হতে পারে। অথচ, মানব এবং মানবেতর প্রাণীর সমস্ত আচরণের ভিত্তিতেই কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রমাণ করতে হলে এ-জাতীয় সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়াকেও যেন-তেন প্রকারে সহজ-প্রবৃত্তি বলে দাবি করতে হয়—ম্যাক্‌ডুগাল যে-রকম করেছেন। শুধু তাই নয়; আচরণ মাত্রকেই সহজ-প্রবৃত্তির পরিচায়ক বলে দাবি করার উৎসাহে ম্যাক্‌ডুগাল অত্যন্ত কৃত্রিমভাবেই মানব-আচরণের বিবিধ 'উচ্চতর' নিদর্শনকেও সহজ-প্রবৃত্তি আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া, ম্যাক্‌ডুগাল যে-ভাবে ও যে-অর্থে প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তির সঙ্গে কোন-না-কোন আবেগের সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছেন তাও অনেকাংশেই সন্দেহজনক। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ১৮৫), দেহের অভ্যন্তরে নানা রকম জটিল ও গভীর পরিবর্তনের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী; অতএব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে স্পষ্টতর-

ভাবে বোঝাই তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তার পরিবর্তে শুধু 'আবেগ' শব্দ ব্যবহার করলে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট এবং অবৈজ্ঞানিক হবার আশঙ্কা। যেমন, ম্যাক্‌ডুগালের তালিকায় উল্লিখিত প্রথম সহজ-প্রবৃত্তির নাম বাৎসল্য (Paternal Instinct); এই সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্র হিসাবে তিনি কোমলানুভূতি (Tender Feeling) নামে এক আবেগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কোমলানুভূতি' জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন সত্ত্বেও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। এ-জাতীয় কাব্যময় শব্দের ব্যবহার না করে মাতৃত্ব-আচরণের ব্যাখ্যায় পিটুইটারি গ্রন্থি উৎপাদিত প্রোলাক্‌টিন হর্মোনের প্রভাব সংক্রান্ত পরীক্ষা-মূলক তথ্য সহজ-প্রবৃত্তির স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, ম্যাগডুগাল যে-ভাবে সহজ-প্রবৃত্তির উপর প্রায় ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করে সমস্ত আচরণের ভিত্তি হিসাবেই কোন-না-কোন সহজ-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব দাবি করেছেন তা বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয় এবং তিনি যে-অর্থে প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্রে কোন-না-কোন আবেগের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন তাও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়ক নয়। এবং উপরোক্ত দাবির উপর নির্ভর করে আচরণ মাত্রকেই উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রমাণ করার উৎসাহ কোন এক দার্শনিক মতের প্রতি সুস্পষ্ট উৎসাহের পরিচায়ক হলেও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য নয়। কেননা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করা নয়; তার পরিবর্তে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে—অর্থাৎ, পরিদর্শন ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে—প্রকৃতির নানা বিভাগের নিয়ম সংক্রান্ত (মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচরণের নিয়ম সংক্রান্ত) সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। অতএব, ম্যাক্‌ডুগাল যে-ভাবে সহজ-প্রবৃত্তির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপণ করে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার পরিবর্তে অনেকেই সাবেকী মনোবিজ্ঞানে অস্পষ্টার্থে ব্যবহৃত সহজ-প্রবৃত্তি শব্দটিকেই পরিহার করার প্রস্তাব করেছেন।

৬॥ সহজ-প্রবৃত্তির উৎস এবং মানুষের সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত মতামত

ইতিপূর্বে বলেছি, সাবেকী মনোবিজ্ঞানে সহজ-প্রবৃত্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত যে-সব সমস্যা উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে এখানে তার মধ্যে বিশেষ করে দুটি উল্লেখ করা যাক। (ক) সহজ-প্রবৃত্তির উৎস কী? (খ) মানুষের সহজ-প্রবৃত্তি আছে কিনা?

(ক) সহজ-প্রবৃত্তির উৎস সংক্রান্ত প্রধানত দুটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য। একটিকে বলা হয়েছে লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদ (Theory of Lapsed Intelligence), অপরটিকে ক্রমবিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary Theory) বলা হয়।

লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদের প্রধান সমর্থক হিসাবে ভুণ্ড্ট্ (Wundt), কোপ্ (Cope) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মতে সুদূর অতীতে—অর্থাৎ, বর্তমান বংশীয় প্রাণীদের সুদূর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে—বিবিধ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয় এবং এই যান্ত্রিক অভ্যাসগুলিই বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়ে বর্তমান বংশীয় প্রাণীদের মধ্যে সহজ-প্রবৃত্তিতে রূপায়িত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে-সব ক্রিয়াকে সহজ-প্রবৃত্তি বলছি, সুদূর অতীতের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াই ছিল, কিন্তু এই ক্রিয়াগুলিই ক্রমশ যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়—অতএব, সেগুলি থেকে বিলুপ্ত হয় বুদ্ধির পরিচয়। এবং বুদ্ধির-পরিচয়-বিলুপ্ত এ-জাতীয় যান্ত্রিক অভ্যাসই বংশানুক্রমে পরবর্তী বংশীয় প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ; বর্তমানে এগুলিকেই আমরা সহজ-প্রবৃত্তি আখ্যা দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, আজ যে-কাজ সহজ-প্রবৃত্তি বলে পরিগণিত হয় এককালে তা বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল—কিন্তু বুদ্ধির এই পরিচয় এখন বিলুপ্ত হয়েছে।

এই লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদটি অবশ্যই কাল্পনিক—বাস্তব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতির পরিবর্তে এই মতবাদের সঙ্গে বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতাই প্রকট। কেননা এ-মত স্বীকার করলে কল্পনা করতে হবে যে বর্তমান পৃথিবীর পিঁপড়ে, মৌমাছি, পাখি প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর মধ্যে সহজ-প্রবৃত্তির পরিচয় বিশেষ প্রকট তাদেরই সুদূর পূর্ব-পুরুষেরা প্রখর বুদ্ধিমান ছিল : আধুনিক পিঁপড়েদের পূর্ব-পুরুষেরা সবিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পিঁপড়ে-ঢিপি গড়তে শিখেছিল, বর্তমান মৌমাছিদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মৌচাক গড়তে শিখেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি ; পূর্ব-পুরুষদের এ-জাতীয় বুদ্ধিমূলক কার্য থেকে ক্রমশ বুদ্ধির পরিচয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং কার্যগুলি নিছক যান্ত্রিক অভ্যাস হিসাবেই বর্তমান পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতিদের মধ্যে বংশগত সূত্রে সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু এ-জাতীয় কথা শুধু যে বিশেষ কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক তাই-ই নয় ; ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধীও। কেননা ক্রমবিবর্তনের মূল কথা হল, প্রাণিজগতে ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর বা উন্নত থেকে উন্নততর আচরণ দেখা দিয়েছে ; অপরপক্ষে, একদা বুদ্ধিমূলক আচরণ যদি ক্রমশ যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে স্বীকার করা দরকার যে প্রাণিজগতে ক্রমশ আচরণের অবনতিই হয়েছে। অর্থাৎ, লুপ্ত-

বুদ্ধি মতবাদ অনুসারে বুদ্ধিমান প্রাণীদের বংশধরেরা ক্রমশ বুদ্ধিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব বংশ-পরম্পরায় প্রাণীদের আচরণে উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই মত অনুসারে অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য বা গুণ প্রাণীদের মধ্যে বংশগত সূত্রে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলেও আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশের মতেই অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ বংশগতভাবে সংক্রামিত হতে পারে না।

স্পেন্‌সার্ (Spencer), ভাইস্‌মান্ (Wiesmann) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ক্রমবিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র মত প্রস্তাব করেছেন। এই মত অনুসারে প্রকৃতিতে ঘটে চলেছে অবিরাম জীবন-সংগ্রাম; বাঁচবার জন্য এ-জাতীয় অবিরাম সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিবর্ত ক্রিয়া পরম্পরার (Chain of Reflex Act) সৃষ্টি: অর্থাৎ, একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পর আর একটি, এবং তারপর অপর একটি—এইভাবে পর পর অনেকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংযোজিত হয় এবং এগুলির শেষ বা চরম পরিণাম হিসাবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার পক্ষে অনুকূল কোন ফললাভ। চরম পরিণামটি এভাবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার পক্ষে সহায়ক হয় বলেই প্রাণীদের মধ্যে উপরোক্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরম্পরা বারবার সাধিত হবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং তা বংশগতসূত্রে সংক্রামিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সহজ-প্রবৃত্তির রূপ গ্রহণ করে।

অবশ্য এই মতও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্ববাদিসম্মত নয়। কেননা, সহজ-প্রবৃত্তিকে পর পর অনেকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সারি বলে গ্রহণ করা অন্তত লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হলেও প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি ঠিক কেন এবং কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় সে-প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট উত্তর আলোচ্য মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। মতবাদের সমর্থকেরা যদি বলেন, আকস্মিকভাবে এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহলে কিন্তু উত্তরটি বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কেননা, আকস্মিকতার কল্পনা পরিহার করে নির্ভুল কারণ (cause) আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য; অতএব, আকস্মিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। তাছাড়া এই মতেও পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্য বংশগত সূত্রে উত্তর-পুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়েছে এবং আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশের মতেই এই স্বীকৃতি বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে আলোচ্য বিতর্কই অনেকাংশে অবান্তর। কেননা, সহজ-প্রবৃত্তিকে কোন এক রকম বিশেষ বৃত্তি (faculty) বা শক্তি (power) বলে কল্পনা করলে পরই এই বৃত্তির উৎস সংক্রান্ত সমস্যা প্রাসঙ্গিক হবে। সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য সহজ-প্রবৃত্তিকে কোন এক রকম বিশেষ বৃত্তি বলেই কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে সাম্প্রতিক কালে এ-জাতীয় কথা অন্তত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই পরিহার করবেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সাবেকী কালে যে-আচরণকে সহজ-প্রবৃত্তি আখ্যা দেওয়া হত বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা তার প্রধানত দুটি লক্ষণ উল্লেখ করেন: (ক) দৈহিক নোদনা, এবং (খ) জটিল ও বাঁধাধরা ধাঁজের কার্যপরম্পরার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরের অভাববোধ দূর করার আয়োজন। আমরা আরো দেখেছি, অন্তত মাতৃত্ব-নোদনা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে এ-জাতীয় জটিল ও বাঁধাধরা ধাঁজের কার্যপরম্পরার কারণ শরীরের অভ্যন্তরেই কোন-না-কোন ঘটনা— যেমন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে প্রোলেক্‌টিন নামের হর্মোন উৎপাদন। অতএব, অন্যান্য তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তেও শরীরের আভ্যন্তরীণ এ-জাতীয় কোন ঘটনাই অনুমেয়। যদিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তিরই এ-জাতীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা আমাদের জ্ঞানের এ-অভাব দূর করবে বলেই আশা করা যায়। অতএব সহজ-প্রবৃত্তিকে কোন এক রকম বিশেষ বৃত্তি বলে কল্পনা করে তার উৎস সংক্রান্ত কোন বিতর্কমূলক মতবাদের পরিবর্তে তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তিকে শরীরের আভ্যন্তরীণ ঘটনার জটিল পরিণাম বলে বিবেচনা করাই বিজ্ঞানসম্মত হবে।

সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত আর একটি সাবেকী সমস্যা এই যে, মানুষের ক্ষেত্রেও সহজ-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকারযোগ্য কিনা? সমস্যাটি বিশেষত এই কারণে উঠেছিল যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য পরিকল্পিত হয়েছে। অতএব মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে এই মত পোষণ করতেন যে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি; তুলনায় বুদ্ধিহীন মানবেতর প্রাণীরা সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই সহজ-প্রবৃত্তিকে বিশেষত মানবেতর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বলা দরকার; অর্থাৎ, মানুষের সহজ-প্রবৃত্তি এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকারযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষত ম্যাক্‌ডুগাল এই দৃষ্টিকোণের বিশেষ বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে মানবেতর প্রাণীর মতই মানব-আচরণ বহুলাংশে সহজ-প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক। বস্তুত ম্যাক্‌ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে

কোন গুণগত পার্থক্যই স্বীকার করেন না। অবশ্য ম্যাক্‌ডুগালের মত আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করিনি; আচরণের ব্যাখ্যায় তিনি সহজ-প্রবৃত্তির উপর যে-অসীম গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন এবং সহজ-প্রবৃত্তিকে যে-রকম ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু তবুও আমরা মানব এবং মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য স্বীকারযোগ্য মনে করি না; অতএব সহজ-প্রবৃত্তি শুধুমাত্র মানবেতর প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান, বা মানব-আচরণে সহজ-প্রবৃত্তির কোন স্থান নেই—এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও যুক্তিযুক্ত বা স্বীকারযোগ্য নয়। বস্তুত ক্রমবিবর্তনবাদ অনুসারে মানব এবং মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে কোন রকম গুণগত পার্থক্য স্বীকারযোগ্য হতে পারে না এবং সহজ-প্রবৃত্তিকে আমরা ইতিপূর্বে যে-অর্থে গ্রহণ করেছি সেই অর্থে সহজ-প্রবৃত্তির পরিচয় মানব এবং মানবেতর প্রাণী উভয়ের আচরণেই বর্তমান।

৭ ॥ ভাবগতি ক্রিয়া (Ideo-motor Action)

সাধারণত আর এক জাতীয় ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া হিসাবে ভাবগতি ক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়। কোন ধারণা বা ভাব (Idea) এমন তীব্র হতে পারে যে তার প্রভাবে আমরা প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো (automatically) কোন কার্য করতে পারি; এ-জাতীয় কার্যকে ভাবগতি ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, পাহাড়ের চুড়ো থেকে জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রপাতের ধারণার আকর্ষণেই মানুষ প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে; চলন্ত ট্রেনের চাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঐ চাকার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; অপরের দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাবার পর দেশলাইটি তাকে ফেরত দেবার পরিবর্তে প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো আমি তা নিজের পকেটস্থ করতে পারি; ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্যান্য ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার সঙ্গে ভাবগতি ক্রিয়ার প্রধান পার্থক্য হল, কোন ধারণা বা ভাবের অবধারিত প্রভাব—এমনই প্রভাব যে আমরা যেন তার গতিরোধ করতে পারি না। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা সহজ-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তে কোন ধারণার এ-জাতীয় প্রভাব—বা এমনকি কোন রকম প্রভাবই—স্বীকারযোগ্য নয়। কিন্তু ভাবগতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধারণার প্রভাবই চূড়ান্ত শক্তিশালী। ইচ্ছা-মূলক কার্যের ক্ষেত্রেও অবশ্য ধারণার প্রভাব বর্তমান; কিন্তু সে-ধারণা আমাদের বিচারাধীন এবং আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা বর্তমান। কিন্তু ভাবগতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোন বিচার বা গ্রহণ-

র্জনের স্বাধীনতা আমাদের নেই—ধারণাটিই যেন আমাদের কোন এক নির্দিষ্ট কার্য করতে বাধ্য করে।

৮॥ অভ্যাস (Habit)

আর এক জাতীয় ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া হল অভ্যাস (Habit)। ইচ্ছামূলক কোন ক্রিয়া বারবার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত এক রকমের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ায় পরিণত হয়; তখন তাকে অভ্যাসগত ক্রিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, আদিতে ইচ্ছা-মূলক বা চেষ্টা-মূলক হলেও কালক্রমে (অনুশীলনের ফলে) অভ্যাস এক রকম ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া হয়ে পড়ে। যেমন, ধূমপানের অভ্যাস। প্রথমাবস্থায় মানুষ ইচ্ছা করে এবং চেষ্টা করে ধূমপান করে; ধূমপান তখন এমনকি কষ্টকর বা আয়াস-সাপেক্ষ। কিন্তু কিছুকাল ধরে অনুশীলনের ফলে ধূমপান নামের ক্রিয়াটি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়—ধূমপানের অভ্যাস হলে আমরা আর ধূমপান না-করে থাকতে পারি না। কিংবা ধরা যাক, ভোরে ওঠার অভ্যাস। প্রথম প্রথম বিশেষ প্রয়াস করে ভোরে উঠতে হয়; কিন্তু দিনের পর দিন অনুশীলনের ফলে ভোরে ওঠা আর ইচ্ছা-মূলক কার্য থাকে না—এ-অবস্থায় আমরা ভোরে না-উঠে পারি না, অর্থাৎ ভোরে ওঠা তখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অভ্যাসের সঙ্গে সহজ-প্রবৃত্তির সম্পর্ক নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। জেম্‌স্ (James) বলেন, সহজ-প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব আছে—অভ্যাসের প্রভাবে সহজ-প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ বা সংকুচিত হয় এবং অভ্যাসের দ্বারাই সহজ-প্রবৃত্তির অস্থায়িতাও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপণ করেন। ফলে তাঁর মতে সহজ-প্রবৃত্তি কোন ভাবেই অভ্যাসের বশবর্তী হতে পারে না; অভ্যাসের চেয়ে সহজ-প্রবৃত্তি অনেক বেশি শক্তিশালী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি (Intelligence)

১ ॥ বুদ্ধির অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Intelligence)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা 'বুদ্ধি' শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকি অনেক সময় বুদ্ধি বলতে বুঝি স্মৃতিশক্তি। যেমন, কোন শিশু একবার শুনেই একটি ছড়া মুখস্থ করতে পারলে তাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলা হয়। আবার অনেক সময় বুদ্ধি বলতে সাধারণ জ্ঞান বা তথ্যসম্ভার বোঝায়। যে-শিশু অতি-আধুনিক উড়োজাহাজের খবর রাখে আমরা তার বুদ্ধির তারিফ করি। অন্যান্য দৃষ্টান্তে বুদ্ধি বলতে কর্মকুশলতা, বিমূর্ত চিন্তার দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বোঝানো হয়। কোন শিশু একটি বিকল খেলার এঞ্জিন নিজ চেষ্টায় সচল করতে পারলে তাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলা হয়; এক্ষেত্রে বুদ্ধির অর্থ হল কর্মকুশলতা। দার্শনিক কাণ্টকে আমরা অসামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে থাকি; এক্ষেত্রে বুদ্ধির অর্থ বিমূর্ত চিন্তার দক্ষতা। আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হয়ে অচিরে বিপদমুক্তির উপায় উদ্ভাবন করাও বুদ্ধির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত; এক্ষেত্রে বুদ্ধি বলতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই বোঝা হয়।

সাধারণ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি শব্দ এ-জাতীয় নানা অর্থের বোধক বলেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরাও কোন এক সর্ববাদি-সম্মত সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারেননি; বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছেন। আমাদের পক্ষে এখানে সেগুলির সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে আমাদের পক্ষে মনে রাখা দরকার যে মনোবিজ্ঞানকে আমরা মূলতই আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, আচরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুদ্ধি শব্দকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, বা আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচায়ক বলতে কী বোঝা উচিত?

দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যে আদানপ্রদান বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া—আচরণ বলতে মূলত তাইই বোঝায়। এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোজন (adjustment) সম্ভব হয়। প্রতিযোজনের জন্য আমরা নিত্যনূতন সমস্যার সম্মুখীন হই; আমাদের যে-ক্ষমতা

াধারণভাবে এ-জাতীয় সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয় তাকেই বুদ্ধির পরিচায়ক ালে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়।

অতএব, বুদ্ধির বিচারে প্রয়োগ বা ব্যবহারের দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বের ব্যাখ্যায় উড্ওয়ার্থ বোধশক্তি (Intellect) ও বুদ্ধির (Intelligence) াধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রস্তাব করেন। বোধশক্তি বলতে তত্ত্বগতভাবে জ্ঞানলাভের াধারণ শক্তি বোধিত হয়—প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে তত্ত্বগত জ্ঞানলাভের সাধারণ সামর্থ্য হল বোধশক্তি। এই বোধশক্তির প্রয়োগ-ূলক পরিচিতিকে বুদ্ধি বলা হয়েছে। অতএব উড্ওয়ার্থ বলছেন, বোধশক্তি যখন াজে লাগানো হয় তখন তাকে বুদ্ধি বলা হবে: Intelligence means *ntellect put to use.* বোধশক্তির সাহায্যে কোন পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করা ়লে বা কোন উদ্দেশ্যসাধন করা হলে তা বুদ্ধি পদবাচ্য হবে। অর্থাৎ, আমাদের াধারণ জ্ঞানশক্তি যখন কোন লক্ষ্যে উপনীত হবার সহায়ক হয় তখন তাকে বুদ্ধি লা হবে। প্রয়োগমূলক পরিচিতিই বুদ্ধির প্রকৃত পরিচিতি। অতএব কোন ্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যদি তাঁর জ্ঞান কাজে লাগাতে না-পারেন -যদি এই জ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব জীবনের নিত্যনূতন সমস্যা-সমাধানে অক্ষম হন -তাহলে তাঁকে জ্ঞানী বা বোধশক্তি-সম্পন্ন বলে স্বীকার করলেও বুদ্ধিমান বলা বে না, অর্থাৎ তাঁর আচরণ বুদ্ধির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হবে না।

অতএব যে-মনোবিজ্ঞানীরা আচরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা না-দিয়ে— া বুদ্ধির প্রয়োগমূলক পরিচিতিকে উপেক্ষা করে—বুদ্ধি নামের কোন এক মানসিক াক্তির বিশুদ্ধ রূপটি বর্ণনা করতে চেয়েছেন তাঁদের বক্তব্য আমাদের পক্ষে স্বীকার-যাগ্য নয়। পক্ষান্তরে যাঁরা বুদ্ধির প্রয়োগমূলক বা ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের উপরই রুত্ব আরোপণ করেন তাঁদের বক্তব্যই আমাদের কাছে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ়খের বিষয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধির প্রয়োগমূলক ারিচিতির উপরই উপযুক্ত গুরুত্ব অর্পণ করেছেন—অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে উন্নততর প্রতিযোজন-দক্ষতা হিসাবেই, বা আচরণের উন্নততর লক্ষণ হিসাবেই ুদ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে এ-জাতীয় কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা যাক।

স্টার্ণ (Stern) বলছেন, বুদ্ধি হল ব্যক্তির পক্ষে চিন্তাকে নূতন প্রয়োজনের ঙ্গে প্রতিযোজিত করার সাধারণ দক্ষতা। বার্ট-এর (Burt) মতে, তুলনায় নূতন ারিবেশের সঙ্গে নূতনভাবে প্রতিযোজনের সামর্থ্যই হল বুদ্ধি। থর্ণডাইক Throndike) ভালো প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি আখ্যা দেন। এড্ওয়ার্ড্স্-এর তে, বুদ্ধি হল প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন-ও-বৈচিত্র্য-দক্ষতা। ফ্রীম্যান (Freeman),

থার্সস্টোন (Thurstone) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরাও বুদ্ধির ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক পরিচিতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এইভাবে বুদ্ধিকে উন্নততর আচরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করলে মানব এবং মানবেতর প্রাণীর দৃষ্টান্তে আচরণের যে-বুদ্ধিপরিচিতি পাওয়া যায় এখানে তার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। প্রতিযোজনের পক্ষে উপযোগী নমনীয়তা (flexibility) এবং স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার (versatility) পরিচায়ক কর্মক্ষমতাকেই মান্ (Munn) বুদ্ধি আখ্যা দিয়েছেন। জীবদেহের ক্ষেত্রে এই কর্মক্ষমতা অনেকাংশে উড়ো-জাহাজের পক্ষে বিবিধভাবে পরিচালিত হবার যোগ্যতা (manoeuverability) ও দ্রুতগামী হবার যোগ্যতার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। দুটি উড়োজাহাজের মধ্যে একটির পক্ষে অপরটির চেয়ে তুলনায় ভালভাবে পরিচালিত হবার যোগ্যতা কেন বেশি? কারণ, বিবিধভাবে পরিচালিত হবার পক্ষে একটির গঠন অপরটির চেয়ে ভাল। তুলনীয়ভাবে, প্রাণীদের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির পার্থক্য নির্ভর করে প্রাণীদেহের গঠনের উপর,—বিশেষত উদ্দীপন-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যের উপর।

উড়োজাহাজের এই উপমাটি অবশ্যই খুব স্থূল। কেননা, তুচ্ছতম জীবদেহের সঙ্গে পৃথিবীর জটিলতম যন্ত্রেরও বহু পার্থক্য বর্তমান। এ-জাতীয় পার্থক্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, যন্ত্রের পক্ষে বিবিধভাবে পরিচালিত হবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে—যন্ত্রটি গঠনের সময়ই এই সীমা নির্ণীত হয়। পক্ষান্তরে জীবদেহের আচরণে নমনীয়তা ও স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার সম্ভাবনা জন্মের সময় থেকে স্থির নয়; জীবদেহটির পরিণতিলাভ (maturation) এবং শিক্ষালাভ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপর নির্ভর ক'রে এ-সম্ভাবনার সীমাও পরিবর্তিত হয়।

বুদ্ধি বলতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাণীদেহের কোন একটি নির্দিষ্ট অঙ্গমাত্রেরই আচরণ কুশলতা বোঝায় না; সামগ্রিকভাবে প্রাণীদেহটির আচরণ-কুশলতা বোঝায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুদ্ধি-পরিচায়ক আচরণের জন্য প্রাণীদেহের সমস্ত অঙ্গেরই সমান গুরুত্ব বর্তমান। আচরণ প্রধানতই নির্ভর করে উদ্দীপন-প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংগঠনের উপর এবং উদ্দীপন-প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংগঠনের মধ্যেও বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের উন্নতির উপরই আচরণের উন্নতিও নির্ভরশীল। অতএব বলা যায় প্রাণিজগতে ক্রমবিবর্তনের দিক থেকে জীবদেহে যতোই উন্নততর উদ্দীপন প্রতিবেদনের সংগঠন দেখা দিয়েছে—বিশেষত গুরুমস্তিষ্কের যতো উন্নতি ঘটেছে—ততোই আচরণের বুদ্ধি-পরিচায়কতাও স্পষ্টতর বা উন্নততর হয়েছে। যেমন পোকামাকড়দের সঙ্গে ইঁদুরের আচরণ তুলনা করলে দেখা যায় যে ইঁদুরদের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রতিযোজনের জন্য অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার পরি-

বর্তমান। অতএব, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইঁদুরের আচরণ তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি-পরিচায়ক বলে বিবেচিত হবে। আবার বিভিন্ন জাতের পোকা-মাকড়দের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক রকমের তুলনায় আর এক রকমের দৃষ্টান্তে স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার পরিচয় অনেক বেশি; অতএব, প্রথম জাতের তুলনায় দ্বিতীয় জাতের আচরণকে বেশি বুদ্ধি-পরিচায়ক বলা হবে।

ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে মানবেতর প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবিধ প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, মানবেতর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে আচরণের স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার দিক থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য অনেক সময় অত্যন্ত প্রকট। তার কারণ, মানুষে-মানুষে শিক্ষণ সামর্থ্যের পার্থক্য বর্তমান এবং আচরণের স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতা শিক্ষণ সামর্থ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মানুষের শিক্ষণ সামর্থ্য—অতএব মানব-আচরণে বুদ্ধি-পরিচয়ও—নানা রকম জটিল কারণের উপর নির্ভরশীল। এ-জাতীয় জটিল কারণ হিসাবে প্রতীক ব্যবহার, ধারণার বোধ, ভাষা আয়ত্ত করা ও ব্যবহার করার দক্ষতা প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। মানবেতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের দৃষ্টান্তে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রতিযোজনের জন্য এ-জাতীয় বিবিধ দক্ষতার বিশিষ্ট গুরুত্ব বর্তমান। স্বভাবতই মানব-আচরণে বুদ্ধি-পরিচয় নির্ণয় করার জন্য যে-সব অভীক্ষার (Tests) পরিকল্পনা করা হয়েছে সেইগুলির বিশেষ উদ্দেশ্য হল এ-জাতীয় বিবিধ দক্ষতা নির্ণয় করা।

২॥ বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Tests)

প্রাচীনকাল থেকে মানুষে-মানুষে বুদ্ধির তারতম্য নির্ণয়ের প্রয়াস পরিকল্পিত হয়েছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন বিজ্ঞানী এ-বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণারও আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বুদ্ধির অভীক্ষা সংক্রান্ত ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বিনে-এর (Binet) গবেষণা প্রকৃতই যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

১৮৯৬ সাল থেকেই বিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় মগ্ন ছিলেন; তখন তাঁর প্রধান চেষ্টা ছিল, উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে যে-সব শিশুরা স্কুলের অন্যান্য সহপাঠীর সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে অসমর্থ তাদের জন্য স্বতন্ত্র বা বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করা। আট বছর পরে প্যারী শহরের কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন: স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলিতে উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে পিছিয়ে-পড়া—অতএব সহপাঠীদের সঙ্গে একই শিক্ষালাভের পক্ষে অনুপযুক্ত—ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করার জন্য কোন নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নানা কারণে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতী বা বিমুখ হতে পারেন; স্বভাবতই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁদের সুপারিশের উপরই নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব, বিনে মনে করেন, উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Tests) নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। বিনে এ-জাতীয় অভীক্ষা নির্ণয়ের প্রয়াস করেন; এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন সিঁমো (Simon) নামে আর একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানী।

বুদ্ধির অভীক্ষা প্রসঙ্গে সিঁমোর সহযোগিতায় বিনে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেন; ফলে প্রকৃত সমস্যাটি তাঁদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে প্রতিভাত হয় এবং সেই সমস্যার সমাধানে তাঁরা ক্রমশই উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম হন। বুদ্ধির অভীক্ষা সংক্রান্ত স্পষ্টতর ধারণার জন্য তাঁদের গবেষণা-ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁদের গবেষণা-ইতিহাসের প্রথম ফলাফল। এই পর্যায়ে বিনে কীভাবে এবং কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হন? যে-সব ছেলেমেয়ে স্কুলের পড়াশুনোয় স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারছে তাদের পরীক্ষা করে বিনে দেখতে চান মনোযোগ, স্মৃতি, পার্থক্যকরণ (discrimination) প্রভৃতির বিভিন্ন অভীক্ষার কোন্গুলিতে এই সাধারণ-স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা বাস্তবিকই উত্তীর্ণ হচ্ছে। স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দিতে পারে এ-জাতীয় ৩০টি প্রশ্ন বিনে ও সিঁমো রচনা করেন। প্রশ্নগুলিকে সবচেয়ে সরল থেকে সবচেয়ে জটিল পর্যন্ত পরপর সাজানো হয়। স্কুলের যে-সব ছেলেমেয়েরা জড় বা নির্বুদ্ধি (Idiots, Feeble-minded) বলে সুপরিচিত তাদেরও এই তিরিশটি প্রশ্ন করে দেখা হয়, এগুলির মধ্যে কয়টির উত্তর তারা দিতে পারছে। এইভাবে বিনে নির্ণয় করতে চান, সরলতম থেকে জটিলতম তিরিশটি পরপর সাজানো প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়টির উত্তরদান ক্ষমতা জড়ত্ব বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

বুদ্ধির জড়ত্ব বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নির্ণয় করার চেষ্টা ছাড়াও প্রশ্নগুলির সাহায্যে বিনে ও সিঁমো স্কুলের বিভিন্ন ছেলেমেয়ের প্রকৃত মানসিক পরিণতিও (Mental Development) নির্ণয়ের প্রয়াস করেন। যেমন ধরা যাক, বহু ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তিন বছর বয়সের সাধারণ বা স্বাভাবিক শিশুর পক্ষে উপরোক্ত তিরিশটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম নয়টির সঠিক বা নির্ভুল উত্তর দেওয়া সম্ভব; অতএব, প্রথম নয়টি প্রশ্নের উত্তর-সামর্থ্য তিন বছরের মানসিক পরিণতির নির্ণায়ক বলে স্বীকৃত হল; এক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, কোন একটি পাঁচ

বছরের শিশুও মাত্র এই প্রথম নয়টি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছে তাহলে বলতে হবে শিশুটির বয়স পাঁচ বছর হওয়া সত্ত্বেও তার মানসিক পরিণতি হয়েছে মাত্র তিন বছরের মতো ; অতএব বলা হবে মানসিক পরিণতির দিক থেকে শিশুটি দু'বছর পিছিয়ে রয়েছে। কিংবা, দেখা গেল জড়বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধি বলে সুপরিচিত শিশুরা সাধারণত প্রথম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে ; এক্ষেত্রে বিনে এবং সিঁমো সিদ্ধান্ত করলেন, কোন-একটি শিশু যদি উপরোক্ত প্রশ্নতালিকার প্রথম ছয়টিরও সঠিক উত্তর দিতে না-পারে তাহলে শিশুটিকে জড়বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধি বলেই স্বীকার করতে হবে।

এই হল সহকারী সিঁমোর সঙ্গে বিনের গবেষণার প্রথম পর্যায়ের ফলাফল। কিন্তু এই ফলাফল নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেননি ; ১৯০৮ সালে তাঁরা গবেষণার উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হন—অর্থাৎ, উন্নততর বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কার করেন। এগুলিই 'বিনে-সিঁমো অভীক্ষা' (Binet-Simon Tests) নামে সুপরিচিত। পরে, ১৯১১ সালে, তাঁরা এই অভীক্ষাগুলিকে আরো পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করেন।

বিনে-সিঁমোর গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলের সঙ্গে পরবর্তী বা পরিশোধিত ফলাফলের প্রধানতম পার্থক্য হল :

১॥ পরবর্তী পর্যায়ের অভীক্ষা তালিকায় প্রশ্নসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে : প্রথম পর্যায়ের তালিকায় মাত্র তিরিশটি প্রশ্ন ছিল ; কিন্তু প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে শেষ পর্যন্ত চুয়ান্নটি হয়ে দাঁড়ায়।

২॥ যে-প্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষ কোন রকম তথ্য-সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল —যেগুলির উত্তর জানা-না-জানা কোন বিশিষ্ট ধরনের শিক্ষালাভের উপর নির্ভর করে—প্রাথমিক প্রশ্নতালিকা থেকে সেগুলি বর্জন করার প্রয়াস। কেননা, বুদ্ধির অভীক্ষার উদ্দেশ্য হল, শিশুর মৌলিক মানসিক পরিণতি নির্ণয় করা, কোন্ শিশু কী বিষয়ে কতটুকু তথ্য জেনেছে তা নয়।

৩॥ ঢালাও ভাবে সমস্ত শিশুকে একই প্রশ্নতালিকা অনুসারে পরীক্ষা না-করে তিন বছর থেকে শুরু করে বয়স্ক (১৫ বছরের বেশি) শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন-তালিকা নির্ণয়। অর্থাৎ, মোট ৫৪টি প্রশ্নের মধ্যে এক-এক বয়সের শিশুদের জন্য বাছাই করা কয়েকটি করে প্রশ্ন নির্ণয় করা হয় ; সাধারণত প্রতি বয়সের শিশুদের জন্য প্রশ্নগুচ্ছে পাঁচটি করে প্রশ্ন নির্ধারিত হয়, কেবল চার বছরের শিশুদের জন্য প্রশ্নসংখ্যা ৪টি। অর্থাৎ, ৩ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ৫টি প্রশ্ন, ৪ বছরের শিশুদের জন্য ৪টি প্রশ্ন, ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রতি বছর অনুসারে ৫টি করে

প্রশ্ন, বয়স্ক বা ১৫ বছরের বেশি বয়সের জন্যও ৫টি প্রশ্ন। এখানে ১৯১১ সালের 'বিনে-সিঁমো অভীক্ষা'গুলির নমুনা দেখা যাক :—

তিন বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গের নাম বলতে পারা,

২ ॥ দুটি সংখ্যা শুনে পুনরুক্তি করতে পারা,

৩ ॥ একটি ছবিতে কী কী বিভিন্ন জিনিস আঁকা আছে তা বলতে পারা,

৪ ॥ নিজের পদবী বলতে পারা,

৫ ॥ ছয়টি শব্দের বাক্য শুনে পুনরুক্তি করতে পারা।

চার বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ নিজে ছেলে-না-মেয়ে তা বলতে পারা,

২ ॥ চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি চিনতে পারা,

৩ ॥ তিনটি সংখ্যা শুনে পুনরুক্তি করতে পারা,

৪ ॥ দুটি সরল রেখার দৈর্ঘ্য তুলনা করতে পারা।

পাঁচ বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ দুটি ওজন তুলনা করতে পারা,

২ ॥ চৌকো ক্ষেত্র দেখে নিজে নিজে মোটামুটি একটি চৌকো ক্ষেত্র আঁকতে পারা,

৩ ॥ দশটি শব্দের বাক্য শুনে পুনরুক্তি করতে পারা,

৪ ॥ চারটি মুদ্রা গুণতে পারা,

৫ ॥ দু'খণ্ডে কাটা একটি চতুষ্কোণকে ঠিকমতো জুড়তে পারা।

ছয় বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলতে পারা,

২ ॥ প্রচলিত ও পরিচিত কয়েকটি শব্দের মানে বলতে পারা,

৩ ॥ তাসের রুইতনের মতো আকার দেখে আঁকতে পারা,

৪ ॥ ১৩টি মুদ্রা গুণতে পারা,

৫ ॥ বিভিন্ন ছবির মধ্যে কোন্‌টি কুৎসিত তা বলতে পারা।

সাত বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ ডান হাত ও বাঁ কান দেখাতে পারা,

২ ॥ একটি ছবিকে বর্ণনা করতে পারা,

৩ ॥ একই সঙ্গে তিন রকম ফরমাস দিলে তা করতে পারা,

৪ ॥ ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডবল-মূল্যের মুদ্রা থাকলে (যেমন, ছ'টির মধ্যে তিনটি টাকা ও তিনটি আধুলি থাকলে) মুদ্রাগুলির মোট মূল্য হিসাব করতে পারা,

৫ ॥ চারটি প্রধান বর্ণের (colour) নাম বলতে পারা।

আট বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ স্মৃতি থেকে দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে পারা,

২ ॥ পিছু হটে ২০ থেকে ০ পর্যন্ত সংখ্যা পরপর উল্লেখ করতে পারা,

৩ ॥ ছবি থেকে বাদ-দেওয়া অংশ ধরতে পারা,

৪ ॥ বার ও তারিখ বলতে পারা,

৫ ॥ পাঁচটি সংখ্যা শুনে পুনরুক্তি করতে পারা।

নয় বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :—

১ ॥ খুচরো পয়সার হিসাব করতে পারা,

২ ॥ শব্দার্থ বলতে পারা,

৩ ॥ প্রচলিত মুদ্রাগুলি চিনতে পারা,

৪ ॥ পর পর বারো মাসের নাম বলতে পারা,

৫ ॥ সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝে উত্তর দিতে পারা।

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এইভাবে বিনে-সিঁমোর অভীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নগুচ্ছ নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্যই কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ প্রশ্নাবলী উপযোগী হবে তা বিনে ও সিঁমো শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে বা কল্পনার উপর নির্ভর করে নির্ণয় করতে চাননি ; নানা বয়সের বহু শিশুকে নানা প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করে তাঁরা প্রতি বয়সের পক্ষে উপযোগী প্রশ্নাবলী নির্ণয় করেছেন। কথাটা বোঝার জন্য পাঁচ বছর বয়সের অভীক্ষাগুলির দৃষ্টান্ত দেখা যাক। উপরে দেখেছি, এই অভীক্ষা বলতে দুটি ওজনের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা, ইত্যাদি। বিনে ও সিমো এইগুলিকেই পাঁচ বছরের পক্ষে প্রাসঙ্গিক অভীক্ষা কেন বললেন ? তার কারণ, বহু শিশুকে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছিলেন, পাঁচ বছর বয়সের একটি সাধারণ শিশু এই অভীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সের একটি সাধারণ শিশু বলতে কি বোঝায়? মোটের উপর বিনে ও সিঁমো নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। বহু শিশুকে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়—(ক) পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ শিশু একটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম, (খ) চার বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগেরও কম এই

প্রশ্নটির নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম, এবং (গ) ছয় বছর বয়সের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি শিশু অনায়াসেই এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সক্ষম—তাহলে প্রশ্নটি পাঁচ বছর বয়সের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, বিনের মতে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা একটি সাধারণ পাঁচ বছর বয়সের শিশুর বুদ্ধির পরিচায়ক হবে। অতএব, পাঁচ বছর বয়সের পক্ষে উপযোগী বলে বিবেচিত হবার জন্য একটি প্রশ্ন শুধু যে পাঁচ বছর বয়সের শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগের পক্ষে মীমাংসাযোগ্য হওয়া চাই তাইই নয়,—আরো দেখা দরকার চার বছর বয়সের অধিকাংশ শিশুর পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন এবং ছয় বছর বয়সের অধিকাংশ শিশুর পক্ষে তা অত্যন্ত সহজ হচ্ছে কিনা। এই তিনটি সর্ত পূরণ করলে পর প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

৩ ॥ মানসিক বয়স (Mental Age) ও বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient)

এইভাবে বিভিন্ন বয়সের পক্ষে উপযোগী বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষা উদ্ভাবন করে বিনে ও সিঁমো 'মানসিক বয়স' (Mental Age, সংক্ষেপে M. A.-এর) ধারণায় উপনীত হন। 'মানসিক বয়স' বা M. A. বলতে কী বোঝায়? ধরা যাক, একটি শিশু পাঁচ বছর বয়সের অভীক্ষাগুলি সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলো; কিন্তু ছয় বছর বয়সের অভীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে পারলো না। এক্ষেত্রে বিনে ও সিঁমো বলবেন, শিশুটির মানসিক বয়স বা M. A. হল পাঁচ বছর। অর্থাৎ, এই অভীক্ষার সাহায্যে বোঝা গেল, শিশুটির মানসিক পরিণতি বা বুদ্ধির পরিচয় একটি সাধারণ পাঁচ বছর বয়সের শিশুর সমান। স্বভাবতই এই 'মানসিক বয়স'-এর ধারণাটিকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য 'আসল বয়স' বা 'সন-তারিখ অনুসারে বয়স' (Chronological Age বা সংক্ষেপে C. A.-এর) সঙ্গে তার পার্থক্যটি মনে রাখা দরকার। যে-শিশু পাঁচ বছর আগে জন্মেছে তার আসল বয়স বা সন-তারিখ অনুসারে বয়স পাঁচ বছর; যে-শিশু ছয় বছর আগে জন্মেছে তার আসল বয়স ছ'বছর। প্রকৃত বয়স হিসাব করবার জন্য অবশ্যই কোন রকম অভীক্ষার উপর নির্ভর করার প্রশ্ন ওঠে না।

সহজেই বোঝা যায়, প্রতিটি শিশুর মানসিক বয়স বা M. A. এবং আসল বয়স বা C. A. সমান হতে বাধ্য নয়—শিশু-বিশেষের দৃষ্টান্তে উভয়ই সমান হতেও পারে, আবার, অন্য শিশুর দৃষ্টান্তে উভয়ই সমান না-হতেও পারে। ধরা যাক, একটি শিশু দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে; অর্থাৎ, তার আসল বয়স বা C.A. হল দশ বছর। কিন্তু হয়ত দেখা গেল, এই শিশুটিই বিনে-সিঁমোর উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির মধ্যে পাঁচ বছরের অভীক্ষাগুলি সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারছে, কিন্তু ছয় বছরের

অভীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে পারছে না। অতএব বলা হবে, শিশুটির মানসিক বয়স বা M. A. মাত্র পাঁচ বছর। স্বভাবতই এ-হেন শিশুকে নেহাতই পিছিয়ে-পড়া বা বুদ্ধিহীন আখ্যা দেওয়া হবে। তুলনায়, যে-শিশুর আসল বয়স পাঁচ বছর এবং অভীক্ষা-নির্ণীত মানসিক বয়সও পাঁচ বছর তাকে সাধারণ বা স্বাভাবিক বুদ্ধিমান বলে পরিগণনা করা হবে। আবার যদি দেখা যায় কোন শিশুর আসল বয়স পাঁচ বছর হওয়া সত্ত্বেও তার মানসিক বয়স আট বছর বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তাহলে অবশ্যই শিশুটিকে প্রখর বুদ্ধিমান বলা হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিনে-সিঁমোর অভীক্ষা অনুসারে একটি শিশুর মানসিক বয়স বা M. A. নির্ণয় করতে পেরে আমরা শুধুমাত্র তারই উপর নির্ভর করে বলতে পারবো না যে শিশুটি বোকা, না, স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধিমান, না, প্রখর বুদ্ধিমান। শুধুমাত্র মানসিক বয়সের উপর নির্ভর করে বলা যায় শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ কোন্ বয়সের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে। শিশুটি প্রকৃতপক্ষে বোকা না সাধারণভাবে বুদ্ধিমান না প্রখর বুদ্ধিমান—এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তারই সমবয়স্ক (অর্থাৎ, অবশ্যই আসল বয়সের হিসাবে সমবয়স্ক) অন্যান্য সাধারণ শিশুর বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে আলোচ্য শিশুটির বুদ্ধির বিকাশের তুলনা করা প্রয়োজন। এই রকম তুলনা করে যদি দেখা যায় সমবয়স্ক সাধারণ শিশুর তুলনায় তার বুদ্ধির বিকাশ কম তাহলে তাকে বোকা বলা হবে; যদি দেখা যায় সমবয়স্ক সাধারণ শিশুর তুলনায় তার বুদ্ধির বিকাশ বেশি তাহলে তাকে প্রখর বুদ্ধিমান বলা হবে; যদি দেখা যায় তার বুদ্ধির বিকাশ সমবয়স্ক সাধারণ শিশুর বুদ্ধির বিকাশের সমান তাহলে তাকে সাধারণভাবে বুদ্ধিমান বলা হবে।

আরো পরে স্টার্ণ (Stern) নামের আর একজন মনোবিজ্ঞানী বলেন, উপরোক্ত-ভাবে শুধুমাত্র মানসিক বয়সের বা M. A.-এর ইংগিত পাওয়াই যথেষ্ট নয়, বস্তুত একটি সহজ হিসাবের সাহায্যে 'বুদ্ধির ভাগফল' বা 'বুদ্ধ্যঙ্ক' (Intelligence Quotient) বা সংক্ষেপে I. Q. নির্ণয় করে আমরা শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ সংক্রান্ত স্পষ্টতর ধারণা পেতে পারি। বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. নির্ণয়ের হিসাব হল, শিশুর 'মানসিক বয়স'কে 'আসল বয়স' দিয়ে ভাগ করা; অবশ্য শুধুমাত্র এ-ভাবে ভাগ করলে আমরা অনেক সময় দশমিক ব্যবহার করতে বাধ্য হবো, কিন্তু ভাগফলটিকে ১০০ দিয়ে গুণ করে নিলে দশমিক ব্যবহারের সম্ভাবনা পরিহার করে একটি গোটা অঙ্কই পাওয়া যাবে। অতএব, বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient বা সংক্ষেপে I. Q. নির্ণয়ের প্রণালী হল, মানসিক বয়সকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে এই ভাগফলের সঙ্গে ১০০ গুণ দেওয়া। অর্থাৎ,

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} \quad \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{আসল বয়স}} \times ১০০$$

কিংবা, আরো সংক্ষেপে,

$$\text{I. Q.} \quad \frac{\text{M. A.}}{\text{C. A.}} \times ১০০$$

অবশ্যই, বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. নির্ণয়ের জন্য প্রথমে বুদ্ধির অভীক্ষার উপর নির্ভর করতেই হবে। কেননা, শিশুটির আসল বয়স বা জন্ম-তারিখ অনুসারে বয়স (C.A.) সহজে জানা সম্ভব হলেও তার মানসিক বয়স (M. A.) নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলে I. Q.-এর হিসাব আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে।

ধরা যাক, বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে দেখা গেল একটি শিশুর মানসিক বয়স পাঁচ বছর। শিশুটির পিতামাতার কাছ থেকে জানা গিয়াছে যে তার আসল বয়সও পাঁচ বছর। এক্ষেত্রে তার বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. হবে = মানসিক বয়স ÷ আসল বয়স × ১০০ = ৫ ÷ ৫ × ১০০ = ১০০।

কিন্তু যে-শিশুর মানসিক বয়স পাঁচ বছর অথচ আসল বয়স ৭ বছর তার I. Q. হবে = ৫ ÷ ৭ × ১০০ = ·৭১ × ১০০ = ৭১।

অপরপক্ষে, যে-শিশুর মানসিক বয়স সাত বছর অথচ আসল বয়স পাঁচ বছর তার I. Q. হবে = ৭ ÷ ৫ × ১০০ = ১·৪০ × ১০০ = ১৪০।

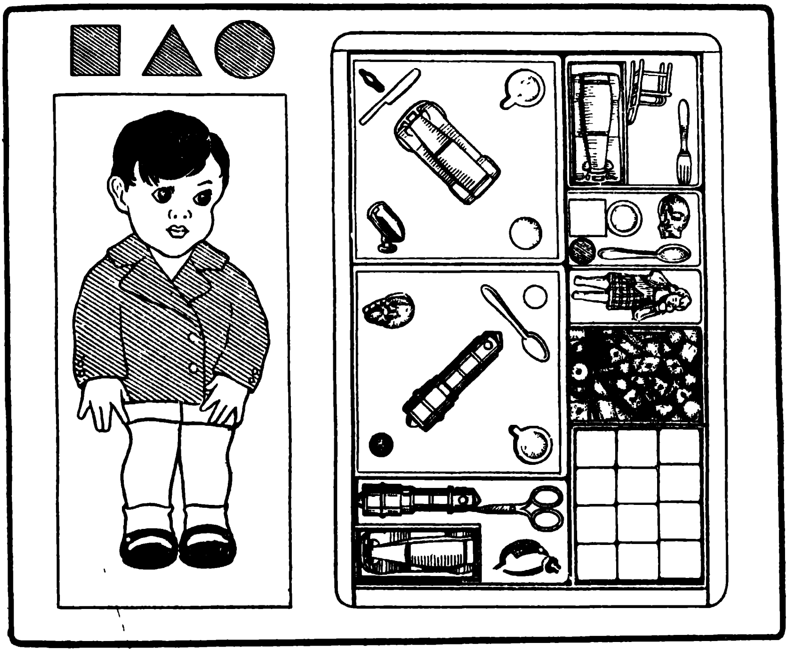
অবশ্যই, যার I. Q. ১০০ তাকে স্বাভাবিক বুদ্ধিমান বলা হবে; যার I. Q. ১০০-র কম তাকে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বুদ্ধিমান বলা হবে; যার I. Q. ১০০-র বেশি তাকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান বলা হবে।

৪ ॥ স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা (Stanford-Binet Tests)

স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford University) অধ্যাপক টার্‌মান্ (Terman) উপরোক্ত বিনে-সিঁমোর অভীক্ষাগুলি নানাভাবে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করার প্রস্তাব করেছেন। তিনি স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলে এবং মূলত বিনে-কে অনুসরণ করেই তিনি নূতন অভীক্ষাগুলি প্রস্তাবিত করেছেন বলেই এগুলিকে 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা' আখ্যা দেওয়া হয়। স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। তারপর মেরিল্-এর (Merrill) সহযোগিতায় অধ্যাপক টার্‌ম্যান্ অভীক্ষাগুলির আরো পরিবর্তন ও পরিশোধন করেন; এই পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৭ সালের সংস্করণকে তাই অনেক সময় 'টার্‌মান্-মেরিল্ অভীক্ষা' (Terman-Merrill Tests) আখ্যাও দেওয়া হয়।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষার এই সংস্করণটিই আধুনিককালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেখা যাক।

এই অভীক্ষাগুলি প্রধানতই দু'বছর থেকে শুরু করে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য পরিকল্পিত, তাছাড়াও অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আরো অভীক্ষা আছে। দুই থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত প্রতি বয়সের জন্য ছয়টি করে অভীক্ষা আছে।



স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় ব্যবহৃত বিবিধ বস্তু

অভীক্ষার জন্য নানা রকম সাধারণ জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়; ছবি থেকে সেগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে। অভীক্ষার কিছু নমুনা উল্লেখ করা যাক :—

দু'-বছর বয়সের শিশুদের জন্য :—

১ ॥ খোপ-কাটা কাঠের পাটার উপর গোল, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ—তিনটি কাঠের টুকরো ঠিকমত বসাতে পারা,

২ ॥ কয়েকটি পরিচিত জিনিসের নাম শুনে আঙুল দিয়ে সেগুলি দেখিয়ে দিতে পারা,

৩ ॥ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করতে পারা,

৪ ॥ কাঠের চৌকো টুকরো দিয়ে বাড়ি করা দেখে নিজে নিজে তা করতে পারা,

৫ ॥ ছবিতে আঁকা বিভিন্ন বস্তুর নাম বলতে পারা,

৬ ॥ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথার সঙ্গে কথা জুড়তে পারা।

আট-বছর বয়সের শিশুদের জন্য :—

১ ॥ ফর্দ থেকে আটটি শব্দের সংজ্ঞা দিতে পারা বা অর্থ বলতে পারা,

২ ॥ গল্প শুনে গল্পটি মনে রাখতে পারা,

৩ ॥ কয়েকটি অসামঞ্জস্য-মূলক উক্তির অসামঞ্জস্য ধরতে পারা,

৪ ॥ সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা (যেমন, কয়েকটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ঠিক কী তা বলতে পারা),

৫ ॥ কোন্ অবস্থায় কী করা ভাল সে-বিষয়ে উত্তর দিতে পারা (যথা, যদি তুমি অসাবধানবশত একটা জিনিস ভেঙে ফেল তাহলে কী করবে?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা),

৬ ॥ কয়েকটি বাক্য মুখস্থ করতে পারা।

৫ ॥ অভীক্ষা-পদ্ধতি

পরীক্ষার সময় শিশুটি যদি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অবস্থায় না-থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত তার I. Q.-এর যে-হিসাব পাওয়া যাবে তা খুব বেশি নির্ভরযোগ্য হবে না। অতএব, যিনি অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করবেন তাঁর প্রথম দায়িত্ব হল, শিশুর পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা—শিশু যেন কোন মতেই ভয় না-পায় বা বিচলিত বোধ না-করে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি উপায় হল, পরীক্ষার সময় শিশুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে যাতে সে মনে করতে পারে, আসলে এটা বুঝি কোন রকম মজার খেলা হচ্ছে। তাছাড়া, শিশু ঠিকই করুক আর ভুলই করুক তাকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে যাওয়া দরকার। শিশুকে কখনোই বলা হবে না, 'এটা তুমি ভুল করলে বা ভুল বললে'। পক্ষান্তরে, পরীক্ষার সময় শিশু যদি ভুল করে তাহলেও তাকে উৎসাহিত রাখার উদ্দেশ্যে বলতে হবে, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে!' বা, 'বাঃ, বেশ বলেছো!' ইত্যাদি।

এইভাবে, শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় রেখে এবং তাকে অভীক্ষা সম্বন্ধে বস্তুত উৎসাহিতই করে অভীক্ষক তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরপর অভীক্ষার বিষয়গুলি শিশুর সামনে উপস্থিত করবেন।

যদি প্রাথমিক পরিচয়েই মনে হয় শিশুটির মানসিক পরিণতি তার বাস্তব বয়সের তুলনায় অনেক কম তাহলে শিশুটির বাস্তব বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সের অভীক্ষাগুলি থেকে শুরু করা হবে। অপরপক্ষে, প্রাথমিক পরিচয়ে যদি মনে হয়

শিশুটির মানসিক পরিণতি তার বাস্তব বয়সের তুলনায় কম নয় তাহলে তার বাস্তব বয়সের চেয়ে ঠিক একবছর কম বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাগুলি থেকে শুরু করা হবে। তারপর পরপর বয়সের জন্য অভীক্ষাগুলি তাকে দেওয়া হবে—যতক্ষণ না দেখা যায় শিশুটি কোন এক নির্দিষ্ট বয়সের প্রতিটি অভীক্ষায় অসমর্থ হল।

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ধরা যাক, একটি শিশুর বাস্তব বয়স হল ৯ বছর ২ মাস এবং প্রাথমিক পরিচয়ে মনে হল তার মানসিক পরিণতি বাস্তব বয়সের তুলনায় কম নয়। অতএব, তার ক্ষেত্রে ৮ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি থেকে শুরু করা হবে। যদি দেখা যায়, ৮ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত ছয়টি অভীক্ষাতেই শিশুটি সার্থকতা প্রদর্শন করলো তাহলে তারপর তাকে দেওয়া হবে ৯ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি। শিশুটি যদি ৯ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাতেও সার্থকতা প্রদর্শন করে তাহলে তারপর তাকে দেওয়া হবে ১০ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি। ধরা যাক, শিশুটি দশবছর বয়স্কদের জন্য ছয়টি অভীক্ষার মধ্যে মাত্র ৪টিতে সামর্থ্য প্রদর্শন করল, বাকি ২টিতে অকৃতকার্য হল। এর পর তাকে দেওয়া হবে ১১ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। ধরা যাক, এই বয়সের ৬টি অভীক্ষার মধ্যে শিশুটি মাত্র দুটিতে সমর্থ হল। এরপর তাকে দেওয়া হবে ১২ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। হয়ত দেখা গেল, ১২ বছর বয়স্কদের ৬টি অভীক্ষার মধ্যে শিশুটি মাত্র একটিতে কৃতকার্য হল। কিন্তু এখানেই থামা হবে না। এর পর শিশুকে দেওয়া হবে ১৩ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। হয়ত দেখা গেল, এগুলির একটিতেও শিশু কৃতকার্য হল না। অতএব, এইখানেই থেমে যাওয়া হবে।

এবার দেখা যাক, উপরোক্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিশুটির মানসিক বয়স বা M. A. কী ভাবে হিসাব করা হবে। মনে রাখা দরকার, টারম্যান্-এর নবসংস্করণ অনুসারে ২ থেকে ১৪ পর্যন্ত প্রতি বছর বয়সের জন্য ৬টি করে অভীক্ষা ; অতএব, প্রতিটি অভীক্ষার সাফল্য দুমাস করে মানসিক পরিণতির পরিচায়ক। হিসাব শুরু করা হবে, উচ্চতম যে-বয়সের সব কয়টি অভীক্ষায় শিশু সার্থকতা প্রদর্শন করেছে সেই বয়সের থেকে। আলোচ্য শিশু ৯ বছর বয়সের সবকটি অভীক্ষায় সার্থকতা প্রদর্শন করেছে ; ১০ বছর বয়সের সবকটি অভীক্ষায় পারেনি। অতএব তার মানসিক বয়সের (M. A.) হিসাব শুরু করতে হবে ৯ বছর থেকে। ৯ বছর বয়সের সবকটি অভীক্ষায় সার্থক হয়েছে বলেই তার জন্য পুরো ৯ বছরের বা ১০৮ মাসের মানসিক বয়স স্বীকৃত হবে। তারপর ধরতে হবে ১০ বছর বয়সের অভীক্ষাগুলির কথা ; এগুলির মধ্যে আলোচ্য শিশু ৪টিতে সার্থকতা প্রদর্শন করেছে ; প্রতিটিতে সার্থকতা প্রদর্শন করা বাবদ দু'মাস করে মানসিক বয়স ধরলে ১০ বছরের

অভীক্ষাগুলি বাবদ শিশুটির মোট ৮ মাস মানসিক বয়স ধরতে হবে। এই ভাবে হিসাব চলবে। যথা, আলোচ্য দৃষ্টান্তর পুরো হিসাব হবে :

			মানসিক বয়স (M. A.)
৯ বছর বয়সের অভীক্ষা	:	সবকটিতে সার্থকতা বাবদ	১০৮ মাস
১০ " " "	:	৪টিতে " "	৮ "
১১ " " "	:	২টিতে " "	৪ "
১২ " " "	:	১টিতে " "	২ "
১৩ " " "	:	সব কটিতে অসমর্থ	০ "
			মোট—১২২ মাস।

এবার দেখা যাক, শিশুটির I. Q. (বুদ্ধ্যঙ্ক) কি হবে। শিশুটির আসল বয়স (C. A.) হল ৯ বছর ২ মাস—অর্থাৎ, ১১০ মাস। I. Q. নির্ণয়ের জন্য মানসিক বয়সকে (M. A.) আসল বয়স (C. A.) দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১০০ গুণ করতে হবে। অতএব, আলোচ্য দৃষ্টান্তর হিসাব হবে :

$$\text{I.Q.} = \frac{\text{M.A.}}{\text{C.A.}} \times 100 = \frac{122}{110} \times 100 = 110{\cdot}9 \text{ ; বা, } 111.$$

কিন্তু মনোবিজ্ঞানী এইভাবে শুধুমাত্র I. Q.-এর হিসাব করেই থেমে যাবেন না। অভীক্ষাকালে শিশুটি যে-বিষয়গুলিতে সার্থকতা প্রদর্শন করতে পেরেছে এবং যে-বিষয়গুলিতে তা পারেনি—উভয়ই ভাল করে বিশ্লেষণ করবেন। এই বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে তিনি নির্ণয় করবেন, প্রকৃতপক্ষে শিশুটি কোন্ দিক থেকে সবল এবং কোন্ দিক থেকে দুর্বল। তাছাড়া, অভীক্ষাকালে শিশুর প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধেও মনোবিজ্ঞানী সবিশেষ মনোযোগী হবেন। এর উপর নির্ভর করে তিনি শিশুটির মনস্তত্ত্বমূলক একটি বিবরণও (report) প্রস্তুত করবেন। অনেক সময় দেখা যায়, নিছক I.Q.-এর হিসাবের চেয়েও এ-জাতীয় মনস্তত্ত্বমূলক বিবরণের গুরুত্ব বেশি।

৬ ॥ স্টান্‌ফোর্ড-বিনে বুদ্ধ্যঙ্কর তাৎপর্য

প্রথমত মনে রাখা দরকার, সাম্প্রতিককালে উপরোক্ত স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা ছাড়াও আরো নানা রকম বুদ্ধির অভীক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. নির্ণয় করা সম্ভব। এবং বাস্তব ভাবে দেখা যায়, এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা অনুসারে একই শিশুর I. Q. নির্ণয় করলে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়া যায়। অতএব, মনোবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট নন যে কোন্ শিশুর কী I.Q. পাওয়া গেল ; তাঁদের

পক্ষে আরো জানা দরকার, এই I.Q. কোন্ অভীক্ষা অনুসারে নির্ণীত হয়েছে। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে শিশুটির I.Q. হল ১১১ এবং তা স্টান্‌ফোর্ড-বিনে পদ্ধতি অনুসারে পাওয়া। অতএব, শুধুমাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে শিশুটির I.Q হল ১১১; প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত শিশুটির 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে I.Q.' (Standford-Binet I.Q.) হল ১১১।

বিভিন্ন অভীক্ষা অনুসারে একই শিশুর বিভিন্ন I.Q. পাবার সম্ভাবনা কেন? তার কারণ কি আসলে এই যে কোন অভীক্ষা ভাল এবং কোন অভীক্ষা খারাপ, বা, কোন অভীক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কোন অভীক্ষা কম নির্ভরযোগ্য? উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন, এইভাবে বিভিন্ন অভীক্ষার তুলনামূলক গুরুত্ব যাচাই করার চেয়েও আলোচ্য পার্থক্যের প্রকৃত গভীরতর কারণটির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। এই গভীরতর কারণ হল, বুদ্ধির যে-কোন অভীক্ষাই গ্রহণ করা হোক-না-কেন, অভীক্ষালব্ধ I. Q.-এর মূল্য শেষ পর্যন্ত আপেক্ষিকই; কোন অভীক্ষালব্ধ I.Q. এর মূল্য চরম নয়। কিন্তু আপেক্ষিক কেন? এই প্রশ্নর উত্তর বোঝার জন্য মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভীক্ষার নির্দেশ দিলেও সকলে মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হল: বহু শিশু বা বালকবালিকাকে অনেকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যার সম্মুখীন করে দেখা যে মোটের উপর গড়পড়তার হিসাবে কোন্ বয়সের শিশুরা কোন্ ধরনের সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিতে পারছে; এ-জাতীয় পরিদর্শন এবং গড়পড়তার হিসাবের উপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করা হয় কোন্ কোন্ সমস্যার সার্থক সমাধান কোন্ বয়সের সাধারণ শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক মানসিক পরিণতির পরিচায়ক। এইভাবেই একটি নির্দিষ্ট বয়সের মানসিক পরিণতির নির্ণায়ক হিসাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে উপযুক্ত অভীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সমস্ত দেশের শিশুদেরই শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি সমান নয়। ফলে এদেশে গড়পড়তার হিসাবে একটি ৯ বছর বয়সের সাধারণ শিশুর কাছে যে-সব সমস্যার সার্থক সমাধান প্রত্যাশা করা যায় দেশান্তরের ৯ বছর বয়সের সাধারণ শিশুর কাছে সেই সমস্যারই সার্থক সমাধান প্রত্যাশা করা সমীচীন না-হতেও পারে। ফলে, কোন্ দেশের কোন্ অঞ্চলের—অথবা, কোন্ পরিবেশে প্রতিপালিত—শিশুদের পরীক্ষা করে একজন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির অভীক্ষা নির্ণয় করেছেন তা মনে রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা কোন শিশুর অভীক্ষা-লব্ধ I Q. থেকে শুধুমাত্র এইটুকুই প্রমাণ হবে যে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত গড়পড়তার হিসাবে সাধারণ শিশুর মানসিক পরিণতির

তুলনায় আলোচ্য শিশুটির মানসিক পরিণতি কী রকম। এই কারণে, যে-কোন অভীক্ষা অনুসারে I.Q. নির্ণয় করা হোক না কেন, কোন I.Q.-এরই সুনির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা বা সর্তহীন মূল্য নেই ; I.Q.-এর তাৎপর্য শেষ পর্যন্ত আপেক্ষিকই।

এই কথাটিই আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে I.Q.'-এর প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা যাক। আমরা ইতিপূর্বে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, যে-দৃষ্টান্তে একটি শিশুর 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে I.Q.' হল ১১১। এখন ভেবে দেখা যাক, ১১১ I.Q. বললে শিশুটির বিষয়ে ঠিক কি প্রমাণ হয়। শুধুমাত্র এটুকুই প্রমাণ হয় যে, টারমান্ যে-সব শিশুর পরীক্ষা করে অভীক্ষাগুলি নির্ণয় করেছিলেন সেইসব শিশুর মধ্যে ১১১ মাস বাস্তব বয়সের (C.A.-র) একটি সাধারণ শিশুর মানসিক পরিণতি এবং আলোচ্য শিশুটির মানসিক পরিণতি মোটের সমতুল্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় দাবি স্বীকারযোগ্য হবার পক্ষে আরো কয়েকটি সর্তও পূর্ণ হওয়া দরকার। যথা : (১) টারমান্-পরীক্ষিত শিশুরা যে-পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে ও যে-শিক্ষালাভ করেছে আলোচ্য শিশুটিও সেই পরিবেশেই প্রতিপালিত হয়েছে এবং সেই শিক্ষাই লাভ করেছে ; (২) আলোচ্য শিশুটিকে পরীক্ষা করার সময় সুনির্ধারিত পদ্ধতি নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা হয়েছে ; (৩) পরীক্ষার সময় শিশুটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল ; এবং (৪) শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে শিশুটির কোন রকম অক্ষমতা নেই।

অতএব দেখা গেল, অন্যান্য অভীক্ষা-লব্ধ I.Q.-এর মতোই, 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে I. Q.'-এর মূল্যও শেষ পর্যন্ত আপেক্ষিকই—যে-শিশুদের পরীক্ষা করে অভীক্ষার মান নির্ণয় করা হয়েছে তাদের মানসিক উন্নতির তুলনাতেই কোন একটি শিশুর মানসিক উন্নতি নির্ণয় করা। 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে I.Q.'-এর অন্যান্য কয়েকটি তাৎপর্য দেখা যাক।

ধরা যাক, একটি শিশুর I.Q. ১১১। তার মানে এই যে তার প্রকৃত বা আসল বয়সের চেয়েও মানসিক বয়স কিছুটা বেশি—অর্থাৎ, তার আসল বয়সের চেয়ে মানসিক পরিণতি কিছুটা এগিয়ে আছে কিংবা অন্যান্য সমবয়স্ক সাধারণ শিশুদের তুলনায় তার মানসিক পরিণতি কিছু বেশি। যদি পরপর প্রতি বছর পরীক্ষা করে দেখা যায় তার I.Q. ১১১-ই থেকে যাচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে শিশুটির ক্ষেত্রে আসল বয়সের তুলনায় মানসিক উন্নতির অগ্রগতি তার দৃষ্টান্তে টিঁকে থাকছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বছরের পর বছর তার I.Q. ১১১ থেকে যাচ্ছে বলেই শিশুটির বুদ্ধিও অপরিবর্তিত থাকছে, বা, তার বুদ্ধির ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আসল বয়সের সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে মানসিক

বয়সও বেড়ে চললে বছরের পর বছর I.Q. সমান থাকবে ; পাঁচ বছর বয়সের শিশুর মানসিক বয়সও পাঁচ বছর হলে তার I.Q. ১০০ হবে। কিন্তু এই শিশুরই আসল বয়স যখন ৬ বছর হল তখন তার মানসিক বয়সও বেড়ে গিয়ে যদি ৬ বছর না-হয় তাহলে তার I.Q. আর ১০০ থাকবে না, কমে যাবে। তার I.Q. ১০০ থাকার তাৎপর্য হল আসল বয়স আর মানসিক বয়স সমান হারে বাড়া ; I.Q. ১০০-র চেয়ে বেড়ে যাবার তাৎপর্য হল আসল বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স বেশি হারে বাড়া ; I Q. ১০০-র চেয়ে কমে যাবার তাৎপর্য হল আসল বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স কম হারে বাড়া।

জড়বুদ্ধি (Idiot) থেকে শুরু করে প্রতিভাবান (Genius বা near-Genius)-দের বোঝাবার জন্য সাধারণত I.Q.-এর এই তালিকা ব্যবহার করা হয়। যথা :—

	I. Q.
জড়বুদ্ধি (Idiot)	০ – ২৫
হাবাতে (Imbecile)	২৫ – ৫০
বোকা (Moron)	৫০ – ৭০
প্রায়-বোকা (Borderline)	৭০ – ৮০
অল্পবুদ্ধি (Low Normal)	৮০ – ৯০
স্বাভাবিক (Normal)	৯০ – ১১০
উৎকর্ষ-বুদ্ধি (Superior)	১১০ – ১২০
অত্যুৎকর্ষ-বুদ্ধি (Very Superior)	১২০ – ১৪০
প্রতিভাবান (Near Genius)	১৪০ – ও বেশি।

৭ ॥ I.Q. নির্ণয়ের ব্যবহারিক মূল্য

I.Q. নির্ণয়ের অন্তত তিনটি ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার করা প্রয়োজন।

(১) কোন শিশুর I.Q. খুবই কম হলে তাকে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একই ক্লাশে এবং একই সঙ্গে শিক্ষা দেবার আয়োজন শুধু নিরর্থকই নয়, শিশুটির পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর। এ-জাতীয় শিশুর পক্ষে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা-গ্রহণের সম্ভাবনা নেই ; বরং অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সমানে শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ হলে তুলনায় কম বুদ্ধিমান শিশুটির আত্মপ্রত্যয়ও ক্রমশই নষ্ট হবে। ফলে তারই সমান পিছিয়ে-পড়া অন্যান্য শিশুর সঙ্গে তার স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে-সব শিশুর I.Q. খুবই কম তাদের পক্ষে এমনকি সাধারণ লেখা-পড়া জাতীয় শিক্ষাই অসম্ভব হতে পারে ; তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষায়তনে একেবারে স্বতন্ত্র

ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। অতএব, শিক্ষাক্ষেত্রে এ-জাতীয় কম-বুদ্ধিমান এবং অত্যন্ত অল্পবুদ্ধিমান শিশুদের বাছাই করা প্রয়োজন। বাছাই করার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে শিশুদের I.Q. নির্ণয় করাই।

(২) যে-সব শিশুর I.Q. অত্যন্ত বেশি—বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা প্রতিভাবান বা প্রায়-প্রতিভাবান বলে প্রতিপন্ন হয়—সাধারণ শিক্ষায়তনে তাদের নিয়েও বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। ক্লাসের সাধারণ সহপাঠীদের তুলনায় তাদের কৌতূহল অপরিসীম হতে পারে; এমনকি স্কুলের সাধারণ শিক্ষক এ-জাতীয় শিশুকে শিক্ষাদানের পক্ষে অনুপযুক্ত হতে পারেন। ফলে অনেক সময় স্কুলের সাধারণ শিক্ষক প্রতিভাবান বা প্রায়-প্রতিভাবান শিশুদের প্রতি বিরক্ত হন; অনেক সময়ই তাদের বিরুদ্ধে 'গণ্ডগোল বাধানোর' অভিযোগ করেন। স্বভাবতই অন্তত আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে প্রতিভাবান শিশুদের জন্য বিশেষ যত্নসহকারে স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন বাঞ্ছনীয়। এখানে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, প্রতিভাবান শিশুর শিক্ষা তার প্রতিভাবিকাশের সহায়ক হলে সে যেমন ভবিষ্যতে মহান কীর্তির পরিচয় দিতে পারে তেমনিই কিন্তু উপযুক্ত শিশুশিক্ষার অভাবে বা ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাবে সে যদি 'বিগড়ে যায়' তাহলে ভবিষ্যতে তার প্রতিভাটি সমাজের ভয়ংকর অকল্যাণ-সাধনে অপব্যয়িত হবার আশঙ্কা। অবশ্যই প্রতিভাবান শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষার সমস্যা সহজ নয়; হলিংওয়ার্থ (Hollingworth) এ-বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিভাবানদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন এখনো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রতিভাবানদের I.Q. নির্ণয়ের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর সংঘাত বা বিরোধ-এর (conflict) প্রকৃত কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুবিশেষের প্রতিভাও হতে পারে। অতএব, বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে I.Q. নির্ণয় করে প্রতিভাবান শিশুকে সনাক্ত করা সম্ভব হলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও সচেতনভাবে এই সংঘাত এড়াবার প্রয়াস করতে পারেন। অবশ্যই প্রতিভাবান শিশু নিয়ে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যে-প্রকাণ্ড সমস্যা শুধুমাত্র I.Q. নির্ণয় করে প্রতিভাবানকে সনাক্ত করতে পারলেই তার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না।

(৩) অনেক সময় শিশুর পিতামাতা শিশুর প্রকৃত মানসিক সামর্থ্য বিচার না করেই এবং কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাবেই তার উপর এমনই শিক্ষার বোঝা চাপাতে চান যা প্রকৃতপক্ষে শিশুটির পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে I. Q. নির্ণয় করতে পারলে কোন্ বয়সের কোন্ শিশুর পক্ষে বাস্তবিকই কী শিক্ষা উপযুক্ত হবে—সেবিষয়ে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাওয়া যাবে।

৮॥ কার্যসম্পাদন-মূলক অভীক্ষা (Performance Tests)

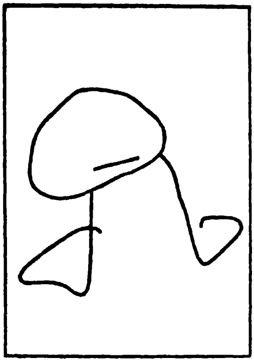
'বিনে-সিঁমো অভীক্ষা' এবং তারই পরিমার্জিত সংস্করণ 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা'তেও যে-সব প্রশ্নোত্তর প্রস্তাবিত হয়েছে তার জন্য স্বভাবতই ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োজন। কিন্তু নিরক্ষর বা বিদেশীদের কাছে অভীক্ষায় ব্যবহৃত ভাষার জ্ঞান প্রত্যাশা করা যায় না। স্বভাবতই বিশেষত তাদের জন্য এমন অভীক্ষার প্রয়োজন হয় যাতে ভাষা-জ্ঞান ও ভাষা-ব্যবহারের পটুত্বর প্রাধান্য নেই। অতএব আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রশ্নোত্তর-মূলক অভীক্ষার পরিবর্তে অন্যান্য নানা রকম বুদ্ধির অভীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন—সেগুলিতে আসলে নানা রকম কর্মসম্পাদনের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এগুলিকে সাধারণত 'কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষা' (Performance Tests) আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থ্যাৎ এগুলির সাহায্যে ভাষা-জ্ঞান এবং কোন নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সুযোগের পরিচয় বাদ দিয়েই নানা রকম কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে চিন্তাক্ষমতা প্রভৃতি বুদ্ধির কয়েকটি মৌলিক পরিচয় পরীক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতএব কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষাগুলির বিশেষ সুবিধা এই যে এগুলির সাহায্যে (ক) যে-শিশুদের মুখে এখনো কথা ফোটেনি, (খ) যারা সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, এবং (গ) যারা শুধুমাত্র বিদেশী ভাষায় অভ্যস্ত—তাদেরও বুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

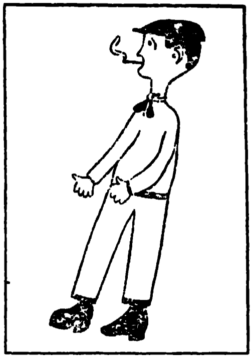
'কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষা' অবশ্য শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই পরিকল্পিত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এ-জাতীয় সমস্ত অভীক্ষার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়; তার বদলে বিশেষত শিশুদের জন্য পরিকল্পিত কয়েক রকম কর্মসম্পাদক-মূলক অভীক্ষার পরিচয় দেখা যাক।

ইতিপূর্বে দেখেছি, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনে বুদ্ধির অভীক্ষার মান নির্ণয় (standardization) করেছিলেন। বিনে-সিঁমোর অভীক্ষা সংশোধন করার সময় টার্‌মান্-ও মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সংক্ষেপে, বহু সংখ্যক শিশুর কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁরা দেখতে চান, কোন্ বয়সের শিশুরা 'সাধারণত'—বা কোন্ বয়সের 'সাধারণ' (average) শিশু কোন্ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তরদান ক্ষমতাই তাঁরা উক্ত বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক পরিণতির পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেন। কার্যসম্পাদন-মূলক অভীক্ষার মান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পার্থক্যের মধ্যে প্রধানত এই যে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বহু শিশুকে পরীক্ষা করার পরিবর্তে তাঁরা নানা রকম কর্মসম্পাদনের দক্ষতার দিক থেকে বহু শিশুকে পরীক্ষা করে অগ্রসর হন। স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার সঙ্গে কর্ম-

সম্পাদন-মূলক অভীক্ষাগুলির আর একটি পার্থক্য এই যে এগুলির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য কোন্ শিশুর কতটা সময় লাগছে এবং কোন্ শিশু নির্দিষ্ট কাজটি করার জন্য কী ভুলত্রুটি করছে—এই হিসাবগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, 'মাথা খাটিয়ে' কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ করার পক্ষে একটি 'সাধারণ' (average) তিন বছর বয়সের শিশুর পক্ষে যতোটা সময় লাগবার কথা অপর একটি চার বছর বয়সের শিশুর পক্ষে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগবার কথা। অতএব তিন বছর ও চার বছর—উভয় বয়সের অভীক্ষা হিসাবে একই নির্দিষ্ট কাজ করতে দেওয়া হল; কিন্তু যে-সময়ের মধ্যে এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে সেই সময়ের তারতম্যটুকু উভয় বয়সের অভীক্ষার অঙ্গীভূত করা হল। কিংবা, কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। একরকম অভীক্ষায় নানা আকারের খোপ কাটা কাঠের পাতলা পাটা ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে 'ফর্ম বোর্ড' (Form Board)। অভীক্ষাটি হল, বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো 'ফর্ম বোর্ড'-এর ঠিক খাপে খাপে বসাতে পারার সামর্থ্য। ৩৩ মাস বয়সের শিশুদের পক্ষে এইভাবে খাপে খাপে বসাবার জন্য নির্দিষ্ট সময় হল ২২২ সেকেণ্ড, ৩৮ মাসের শিশুদের পক্ষে নির্ধারিত সময় হল ১০৯ সেকেণ্ড, ৪৪ মাসের শিশুদের জন্য নির্ধারিত সময় হল ৭২ সেকেণ্ড, ৬৯ মাস বয়সের শিশুদের জন্য নির্ধারিত সময় হল ৩৫ সেকেণ্ড।

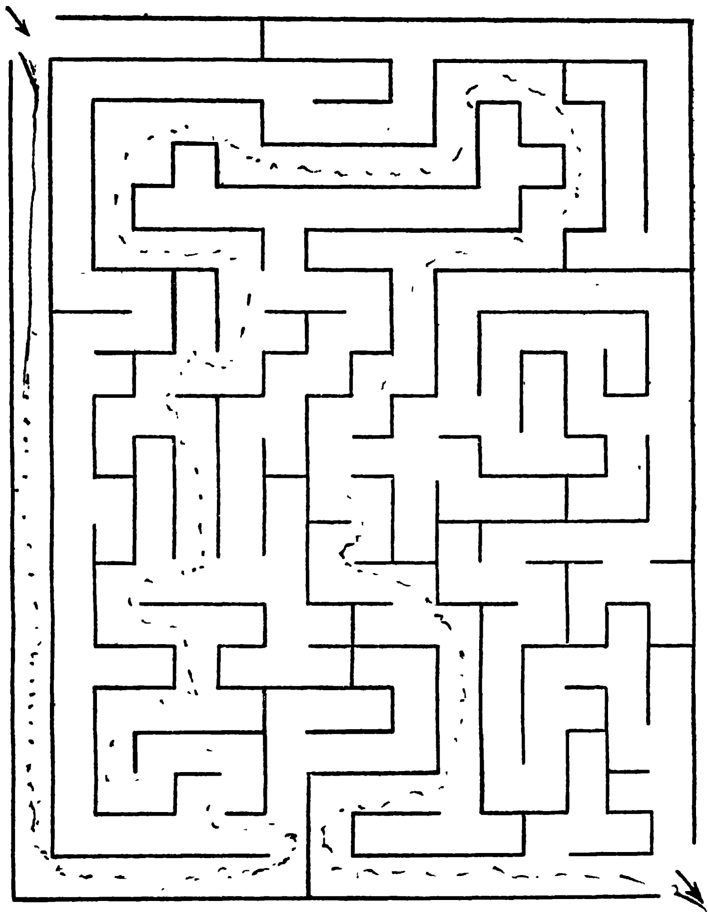
এ-জাতীয় সময়ের তারতম্যের হিসাব ছাড়াও খুঁটিনাটি (details) প্রভৃতির হিসাবের দিক থেকেও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য একই কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষা ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, কর্মসম্পাদন-মূলক একটি অভীক্ষা হল, মানুষ আঁকার দক্ষতা। শিশুকে বলা হয়, 'একটা মানুষ আঁকো—সবচেয়ে নিখুঁত-ভাবে আঁকবার চেষ্টা করতে হবে'। শিশু যে-ছবিটি আঁকবে তাতে হাত, পা, মাথা, মুখ, চোখ প্রভৃতি মানুষের চেহারার কতগুলি খুঁটিনাটি দেখানো হয়েছে তারই উপর নির্ভর করে শিশুকে নম্বর দেওয়া হবে। শিল্প হিসাবে ছবিটির ভাল-মন্দ বিচারের প্রশ্ন অবশ্যই তোলা হবে না। চার হাজার শিশুকে পরীক্ষা করে এই অভীক্ষার মান নির্ণয় করা হয়েছে। তিন থেকে তেরো বছর বয়সের শিশুদের এই অভীক্ষা দেওয়া হয়। মানুষের ছবি আঁকার সময় মোটের উপর ৫১টি খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য দেখানো যায়; তার মধ্যে কোন্ বয়সের শিশু কয়টি বৈশিষ্ট্যের ইংগিত ছবিতে দিতে পেরেছে সেই হিসাবের উপর নির্ভর করে তাদের 'মানসিক বয়স' (M. A.) নির্ণয় করা হয়। নমুনা হিসাবে এখানে এ-জাতীয় দুটি ছবি দেওয়া হল :





বাঁ দিকের ছবিটিতে শুধুমাত্র মাথা, মুখ এবং পা নির্দিষ্ট হয়েছে। এ-জাতীয় ছবি আঁকার জন্য শিশুকে যৎসামান্য পয়েন্ট দেওয়া হবে। তার মানসিক বয়স খুবই কম। ডানদিকের ছবিটি যে এঁকেছে তার আসল বয়স ৯ বছর ৩ মাস, ছবির বিবিধ বৈশিষ্ট্য থেকে তার মানসিক বয়স হিসেব করে ১৩ বছর (বা আরো বেশি) ধরা হয়েছে। অতএব তার I.Q.=১৪১ (বা বেশি)

পোর্টিয়াস্ (Porteus) নামের মনোবিজ্ঞানী আর এক রকম কার্যসম্পাদন-মূলক অভীক্ষা প্রণয়ন করেছেন। এই অভীক্ষায় ৩ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের নানা রকম গোলকধাঁধা (maze) দেওয়া হয়। ১৩ ছাড়া বাকি বয়সের শিশুদের একটি করে গোলকধাঁধা দেওয়া হয়। শিশুদের বলা হয়, গোলকধাঁধাটিতে ঢোকা থেকে শুরু করে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে সহজ পথটি পেনসিল দিয়ে আঁকতে হবে। পেনসিল বুলিয়ে গোলকধাঁধার উপর এইভাবে সবচেয়ে সোজা পথ আঁকবার সময় যদি তার পেনসিলের দাগ কোন বন্ধ-পথের চিহ্ন অতিক্রম করে তাহলে তাকে এই গোলকধাঁধারই আর একটি নূতন ছবি দিয়ে আবার শুরু থেকে আঁকতে বলা হবে। দ্বিতীয় বারেও যদি শিশু একইভাবে অসমর্থ হয় তাহলে ধরা হবে, যে-নির্দিষ্ট বয়সের অভীক্ষা হিসাবে তাকে এই গোলকধাঁধাটি দেওয়া হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট বয়সের অভীক্ষায় শিশু অসমর্থ হল। (১৪ আর ১২ বছরের অভীক্ষায় দু'বারের বদলে চারবার সুযোগ দেওয়া হয়।) পোর্টিয়াস্ দাবি করেন, এ-জাতীয় গোলকধাঁধার অভীক্ষায় মনোযোগের দীর্ঘস্থায়িত্ব (sustained attention), দূরদৃষ্টি (foresight) এবং চিন্তার মিতব্যয়িতা (prudence) প্রভৃতি বুদ্ধির যে-সব পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।



৯॥ দলগত অভীক্ষা (Group Tests)

ইতিপূর্বে যে-অভীক্ষাগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির সাহায্যে প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করার কথা। ফলে এ-জাতীয় অভীক্ষা বিশেষ সময়-সাপেক্ষ এবং অভীক্ষাগুলি উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ পারদর্শিতারও প্রয়োজন। যেমন, স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার জন্য বিশেষ পারদর্শী মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে প্রতি শিশুর পিছনে প্রায় এক ঘণ্টা করে সময় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষত মহাযুদ্ধের সময় সেনাবিভাগের বিভিন্ন কাজে ভর্তি করার জন্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকের বুদ্ধির পরীক্ষা প্রয়োজন হয়েছিল। স্বভাবতই এই অবস্থায় বিনে-সিঁমো অভীক্ষা বা স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা অনুসারে প্রতিটি

ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধি-নির্ণয়ের সম্ভাবনা ছিলেন। অতএব মনোবিজ্ঞানীরা দলগত অভীক্ষা (Group Tests) উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন—অর্থাৎ, এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন যাতে অল্প সময়ের মধ্যে একই সঙ্গে বহু ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব।

এ-জাতীয় অভীক্ষা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে প্রচলিত বিনে-সিঁমো প্রভৃতি অভীক্ষাগুলি ভাল করে বিচার করেন এবং সেগুলির মূলসূত্র অবলম্বন করেই নূতন দলগত অভীক্ষার পরিকল্পনা করেন। সেনাবিভাগের জন্য দলগত অভীক্ষা হিসাবে প্রধানত দু'রকম অভীক্ষা পরিকল্পিত হয়—একরকম হল ভাষা-ব্যবহার মূলক বা প্রশ্নোত্তর জাতীয় (verbal), আর একরকম হল ভাষা-ব্যবহার বর্জিত (non-verbal)। প্রথম ধরনের অভীক্ষার নাম দেওয়া হয় 'আর্মি আল্‌ফা' (Army Alpha) এবং দ্বিতীয় ধরনের অভীক্ষার নাম দেওয়া হয় 'আর্মি বিটা' (Army Beta)। স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় বুদ্ধির পরিচায়ক হিসাবে যে-বৈশিষ্ট্য-গুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় এই অভীক্ষাগুলিতেও মূলত সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে অভীক্ষাগুলি যাতে চিত্তাকর্ষক হয় এবং এগুলি সার্থকভাবে সম্পাদনের জন্য কোনরকম নির্দিষ্ট শিক্ষালাভের বা জ্ঞানলাভের প্রয়োজন না থাকে। তবুও এই অভীক্ষাগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি প্রয়োগ করা এবং এগুলির ফলাফল বিচার করা তুলনায় অনেক সহজ; অল্প সময়ের মধ্যেই মনোবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন।

অবশ্যই দলগত অভীক্ষার প্রয়োগ আজকাল শুধুমাত্র সেনাবিভাগের কাজে সীমাবদ্ধ নয়। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আজকাল নিয়মিতভাবে এ-জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যেই পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু কোন ছাত্র-বিশেষের দৃষ্টান্তে দলগত অভীক্ষার ফলাফলে সন্দেহ জাগলে তাকে স্বতন্ত্রভাবে স্টান্‌ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়।

এখানে দলগত অভীক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

ক ॥ ভাষা-ব্যবহার মূলক দলগত অভীক্ষা :

নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে; প্রতি প্রশ্নের কয়েকটি সম্ভবপর উত্তরও দেওয়া হয়েছে; যে-প্রশ্নের জন্য যে-উত্তর নির্ভুল মনে হবে তার পাশে দাগ দাও—

প্রশ্ন ১ : দুই ও তিনের যোগফলের দ্বিগুণ থেকে চারের চতুর্গুণের অর্ধেক বাদ দিলে কত হবে ?

সম্ভব উত্তর : ॥ ১ ॥ ॥ ২ ॥ ॥ ৩ ॥ ॥ ৪ ॥ ॥ ৫ ॥

প্রশ্ন ২ : চলন্ত মোটর গাড়ির তুলনায় চলন্ত ট্রেনের ব্রেক্ কসে গাড়ি থামানো অনেক কঠিন ; তার কারণ হল

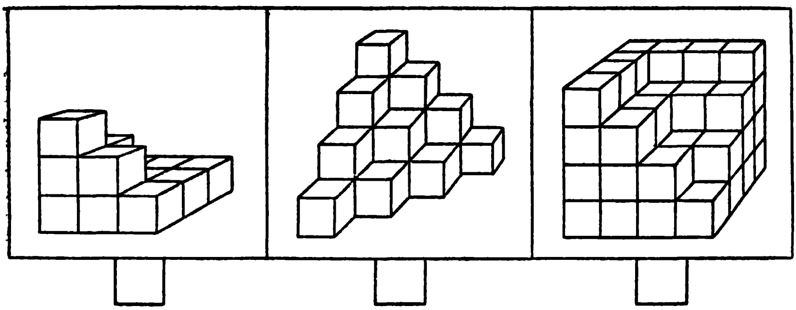
সম্ভব উত্তর : ১ ॥ ট্রেন লম্বায় দীর্ঘতর,

২ ॥ ট্রেন ওজনে বেশি,

৩ ॥ ট্রেনের ব্রেক্ অত ভাল নয়।

খ ॥ ভাষা-ব্যবহার নিরপেক্ষ দলগত পরীক্ষা :

নিচের কোন ছবিতে কটি করে কাঠের টুকরো আছে তা গুণে প্রতি ছবির নিচে চিহ্নিত জায়গায় সংখ্যা লেখো :



৮ ॥ বুদ্ধির উপাদান (Factors in Intelligence) : সাধারণ দক্ষতা ও বিশেষ দক্ষতা সংক্রান্ত স্পিয়ারমানের মত (Spearman's theory of General and Special Abilities)

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, এগুলির সাহায্যে স্মৃতি, বিচারশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধি-পরিচায়ক নানাবিধ মানসিক শক্তি পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক কতরকম বিভিন্ন দক্ষতা নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়? কিংবা, মূলত ঠিক কী মাপবার চেষ্টা করা হয়? বিভিন্ন অভীক্ষার ফলাফলকে পরিসংখ্যান পদ্ধতির (statistical methods) সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত হতে পারে।

স্পিয়ারমান (Spearman) দাবি করেন, বিভিন্ন অভীক্ষালব্ধ ফলাফলের মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক (correlation) বর্তমান। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে যে-ফলাফল পাওয়া যায় সেই ফলাফল পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় ; পক্ষান্তরে এই ফলাফলগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখা যায়। অতএব, স্পিয়ারমান

দাবি করেন, বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে একই ব্যক্তির কোন একরকম মৌলিক সামর্থ্য সংক্রান্ত ইংগিতই পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন হলেও এগুলির সাহায্যে ব্যক্তির কোন একরকম সাধারণ সামর্থ্যই (General Ability) নির্ণীত হচ্ছে। এই সাধারণ সামর্থ্য বোঝাবার জন্য স্পিয়ারমান সংক্ষেপে G সংকেত ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, নানাবিধ দক্ষতার বৈশিষ্ট্য কোন এক প্রকারে যেন মিলিত হয়ে এই সাধারণ সামর্থ্য বা G-তে পরিণত হয়েছে। এই কারণে, যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা, সংগীতে দক্ষতা, গণিতে দক্ষতা, বানানের দক্ষতা প্রভৃতি বহুবিধ বিচিত্র বিষয়ে দক্ষতার মধ্যেও কোন একরকম পারস্পরিক সম্পর্ক ধরা পড়ে ; এই পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে সাধারণ সামর্থ্য বা G-রই ইংগিত পাওয়া যায়। স্পিয়ারমানের মতে এ-জাতীয় বিবিধ ক্ষেত্রের প্রতিটিতে পারদর্শী হবার পক্ষে উক্ত G বা সাধারণ সামর্থ্য ছাডাও একরকম নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট দক্ষতারও (Special Ability) প্রয়োজন ; এই বিশিষ্ট দক্ষতা বোঝাবার জন্য স্পিয়ারমান সংক্ষেপে S সংকেত ব্যবহার করেন। যেমন, গণিতে পারদর্শী হবার পক্ষে সাধারণভাবে যথেষ্ট G ছাড়াও গণিত বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা বা গণিত বিষয়ে নির্দিষ্ট S-এরও প্রয়োজন—গণিত বিষয়ে এ-জাতীয় বিশেষ দক্ষতা বলতে হয়ত সংখ্যা-ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি নানা সামর্থ্য বোঝায়। তেমনি যন্ত্র-ব্যবহারে পারদর্শিতার জন্য সাধারণভাবে G ছাডাও আরো কোনরকম বিশিষ্ট দক্ষতা বা S প্রয়োজন।

অন্যান্য নানা মনোবিজ্ঞানী অবশ্য স্পিয়ারমানের এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি তুলেছেন। বুদ্ধি-পরিচায়ক নানা বিভিন্ন আচরণ কোন একরকম সাধারণ সামর্থ্যরই বা G-রই পরিচায়ক—এ-কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে স্পিয়ারমান G বা সাধারণ সামর্থ্য হিসাবে যার উল্লেখ করেন তাও কয়েক রকম গৌণ সামর্থ্য বা উপাদানের সমন্বয়মাত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় (Contemporary Schools of Psychology)

১ ॥ মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়

সম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানে নানা সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে এবং বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে—এমনকি মনোবিজ্ঞানের মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির বিচারেও—সম্প্রদায়ভেদে বিবিধ মত প্রস্তাবিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে শুধু পার্থক্যই নয়, অনেক সময় গভীর বিরোধও বর্তমান। এই সম্প্রদায়গুলির কিঞ্চিৎ পরিচিতি বাদ দিয়ে, বা এগুলির মূলসূত্র মনে না-রেখে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নানা বিতর্ক—বিশেষত শিক্ষা, চেতনা, স্বপ্ন, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সমস্যা সংক্রান্ত বিতর্ক—ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম সম্প্রদায় বলতে :

ক ॥ ওয়াট্‌সন্ (Watson) প্রমুখর আচরণবাদ (Behaviourism),

খ ॥ ম্যাক্‌ডুগাল (McDougall) প্রমুখর অভিপ্রায়বাদ (Purposivism, বা Hormic Psychology),

গ ॥ কফ্‌কা (Koffka) প্রমুখর গেস্টাল্টবাদ (Gestalt Psychology),

ঘ ॥ ফ্রয়েড (Freud) প্রমুখর মনঃসমীক্ষণবাদ (Psychoanalysis)।

এ-ছাড়াও অবশ্য 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' (Conditioned Reflex) সংক্রান্ত পাভ্‌লভ্-এর (Pavlov) আবিষ্কার আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করেছে, এবং ওয়াট্‌সনের আচরণবাদ বহুলাংশেই এই আবিষ্কারটিকেই অবলম্বন করতে চেয়েছে। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ মূলত যে-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তাকে যান্ত্রিক (mechanistic) আখ্যা দেওয়া হয়; অপরপক্ষে পাভ্‌লভ্ ও তাঁর অনুগামীরা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বিরোধী। অতএব পাভ্‌লভের আবিষ্কার আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক ছিল—যথা, গঠনবাদ (Structuralism) এবং ক্রিয়াবাদ (Functionalism)-এর মধ্যে বিতর্ক। এ-বিতর্ক যদিও আজ অনেকাংশেই সেকেলে (obsolete) হয়ে গিয়েছে তবুও সাম্প্রতিক সম্প্রদায়গুলির আলোচনার ঐতিহাসিক পটভূমি হিসাবে এই বিতর্ক উল্লেখযোগ্য। অতএব, এই বিতর্ক থেকেই শুরু করা যাক।

২ ॥ গঠনবাদ বনাম ক্রিয়াবাদ (Structuralism *vs.* Functionalism)

গঠনবাদের প্রধানতম সমর্থক ছিলেন ভুণ্ড্ট্ (Wundt), কুয়েল্‌পে (Kuelpe), এবিংহাউস (Ebbinghaus), টিচ্‌নার (Titchner)। এঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় হল মনের স্বরূপ ও গঠন (structure)। অর্থাৎ, মানসিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে মনের প্রকৃত রূপ এবং কীভাবে এই রূপটি গঠিত হয়েছে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে তারই আলোচনা প্রাসঙ্গিক। মনের গঠন বলতে কী বোঝায়—এই প্রশ্নের উত্তরে গঠনবাদীরা সাধারণত রসায়ন বিজ্ঞানের (Chemistry) আদর্শ উল্লেখ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিশ্লেষণ করে দেখা হয় সেগুলি কী কী মৌলিক পদার্থ দিয়ে এবং কীভাবে গঠিত। এই আদর্শ অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞানীরাও মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক উপাদানগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয় করার জন্য তাঁরা অন্তর্দর্শন (Introspection) পদ্ধতির (পৃ: ১২-১৩ দ্রষ্টব্য) উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন। এবং মনের মৌলিক উপাদানগুলি বস্তুত কীভাবে সংগঠিত হয়—সে প্রশ্নের উত্তরে গঠনবাদীরা অনুষঙ্গর নিয়মগুলির (Laws of Association) (পৃ: ১৪৩-১৪৭ দ্রষ্টব্য) উপরই নির্ভর করতে চান। এই কারণে গঠনবাদীদের আলোচনায় অন্তর্দর্শন পদ্ধতি এবং অনুষঙ্গর নিয়মগুলির উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

ক্রিয়াবাদের (Functionalism) দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উঠেছে। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে, মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হল মানসিক ক্রিয়া (mental processes বা functions) বা আচরণ (behaviour)। দাবি করা হয়েছে, গঠনবাদীরা রসায়ন বিজ্ঞানের যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে চান তা আসলে অবাস্তরই। কেননা, মন বা মানসিক উপাদান হিসাবে যাই উল্লিখিত হোক-না-কেন রাসায়নিক পদার্থর মতো তা স্থির জড়বস্তু নয়। পক্ষান্তরে গতিমুখীতা বা পরিবর্তনশীলতাই (dynamism) মানসসত্তার প্রধানতম পরিচায়ক। অতএব মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মনের স্বরূপ, উপাদান বা গঠন নয়; তার পরিবর্তে মানসক্রিয়াই—আচরণের মধ্যে যে-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে গঠনবাদীরা অন্তর্দর্শনের উপর যে-গুরুত্ব আরোপণ করতে চেয়েছেন তা স্বীকারযোগ্য নয়; বস্তুত পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্দর্শন দোষদুষ্ট। অতএব অন্তর্দর্শনের মোহ পরিত্যাগ করে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই মনোবিজ্ঞানেও পরিদর্শনমূলক পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। এবং মনের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয়ের প্রস্তাবই যেহেতু অবাস্তর সেইহেতু এই

মৌলিক উপাদানগুলি কীভাবে অনুষঙ্গর নিয়ম অনুসারে সংগঠিত হয় তার আলোচনাও মনোবিজ্ঞানে প্রাধান্য পেতে পারে না। অতএব অনুষঙ্গর নিয়মগুলির উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণের প্রশ্ন ওঠে না।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হিসাবে জেম্‌স্‌ (James), ডিউই (Dewy), এঞ্জেল (Angell), ওয়ার্ড (Ward), স্টাউট (Stout) প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। জেম্‌স্‌ নিজে অবশ্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি প্রকট সমর্থন জ্ঞাপন করেননি ; পক্ষান্তরে মোটের উপর নিরপেক্ষ ভঙ্গিতেই মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি মনের স্বরূপ এবং গঠন নিয়ে মাথা ঘামাননি, পক্ষান্তরে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল চেতনা নিয়ত-গতিশীল বা নিয়ত-পরিবর্তনশীল (Doctrine of the Stream of Consciousness), এই কারণে তিনি চেতনাপ্রবাহকে নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফলে তাঁকেও ক্রিয়াবাদের সমর্থক বলেই গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু শুধু জেম্‌স্‌-ই নন। এঞ্জেল (Angell), স্টাউট (Stout) প্রমুখ ক্রিয়াবাদের বিশিষ্ট সমর্থকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতান্তর সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ সম্প্রদায়-প্রবর্তকেরাও গঠনবাদের প্রত্যাখ্যানে প্রায় সকলেই একমত,—যদিও অবশ্যই তাঁদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নে গভীর মতবিরোধ এবং এমনকি প্রকট মতদ্বন্দ্বও বর্তমান। যেমন, আচরণবাদী ওয়াট্‌সন্‌, অভিপ্রায়বাদী ম্যাক্‌ডুগাল, গেস্টাণ্টবাদী কফ্‌কা এবং মনঃসমীক্ষণবাদী ফ্রয়েডের মধ্যে নানা বিষয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; কিন্তু গঠনবাদ প্রত্যাখ্যানে এবং নানা অর্থে ক্রিয়াবাদের মূল দাবি স্বীকারের দিক থেকে এঁদের সকলের মধ্যে সাদৃশ্যও স্বীকার্য।

অতএব এই দিক থেকেই বলা যায়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গঠনবাদের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও আজকের দিনে মতবাদটির মূল্য মোটের উপর ঐতিহাসিক মাত্র। গঠনবাদের শক্তি বস্তুত বিলীন হয়েছে। তার নানা কারণও আছে। এখানে দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত, গঠনবাদ আসলে প্রাচীন দার্শনিক সংস্কারেরই পরিচায়ক। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, দীর্ঘ যুগ ধরে মনোবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা হিসাবেই পরিগণিত হয়েছিল। এবং দার্শনিকেরা প্রথম পর্যায়ে 'আত্মা'র এবং পরবর্তী পর্যায়ে 'মনে'র স্বরূপ ও গঠন নিয়েই মাথা ঘামিয়েছিলেন। গঠনবাদীদের মধ্যে এই আদর্শের জেরই টিঁকে থেকেছে। কিন্তু এইভাবে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনেরই অঙ্গীভূত করে রাখার বিরুদ্ধে এবং দার্শনিক বিচারের পদ্ধতিতেই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালে তীব্র আপত্তি উঠেছে। দাবি করা

হয়েছে, দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে মনোবিজ্ঞানকেও অন্যান্য বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় একটি নির্ভুল বিজ্ঞানে পরিণত করতে হবে। অতএব, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিদর্শনমূলক পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিদর্শনমূলক পদ্ধতিতে মনের স্বরূপ ও মনের গঠন নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। পরিদর্শনের সাহায্যে শুধুমাত্র জানা সম্ভব, মানুষ (এবং মানবেতর প্রাণীও) কী-করে-না-করে—অর্থাৎ, মূলতই ক্রিয়া বা আচরণের দিকটিই।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক কালে প্রাণীবিজ্ঞানের (Biology)—বিশেষত জীবজগতে ক্রমবিবর্তনবাদের (Theory of Biological Evolution)—প্রভাব ও প্রসার সুদূরপ্রসারী; স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়। তাই মানুষকেও আজ আর সৃষ্টিরাজ্যের কোন এক অভাবনীয় বিস্ময় বলে কল্পনা করার সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে, এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে উন্নত থেকে উন্নততরভাবে প্রতিযোজনের ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এবং মানুষ এই সুদীর্ঘ পরিবর্তনের ফলেই সর্বোন্নত প্রাণী হিসাবে দেখা দিয়েছে। প্রাণীজগতে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে তার প্রকৃত কারণ অবশ্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সর্বোন্নত বা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোজন ক্ষমতা। অতএব, মানুষকে বাকি জীবজগতের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার সুযোগ নেই এবং মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার সুউন্নত প্রতিযোজন ক্ষমতাই স্বীকার্য। অতএব, মানুষকেও ঠিকমত বোঝবার জন্য তার মনের স্বরূপ ও গঠন নিয়ে মাথা ঘামানো নিরর্থক। কেননা, প্রতিযোজনের দিক থেকে প্রকৃত বিচার্য হল বিভিন্ন মানসিক বা আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াই। অর্থাৎ, গঠনবাদীরা যে-রকম মনকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি বিবিধ উপাদান অবিষ্কারের দাবি করেন তার পরিবর্তে 'প্রত্যক্ষ করা', 'বিচার করা', 'চিন্তা করা' প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া বা প্রক্রিয়াই মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কেননা প্রতিযোজনের দিক থেকে এ-জাতীয় বিবিধ প্রক্রিয়ার উন্নতিই মানুষের প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক। কিংবা, প্রতিযোজনের সার্থকতা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক থেকে আসা উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে সার্থক প্রতিবেদন বা প্রতিক্রিয়ার উপরই; আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৮-১২), উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে প্রতিবেদনকেই আচরণ বলা হয়। অতএব, সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে মনের প্রকৃতি ও গঠন আলোচনার পরিবর্তে আচরণ সংক্রান্ত পরিদর্শনমূলক জ্ঞানের প্রতিই পক্ষপাত ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়েছে।

৩॥ ওয়াট্‌সনের আচরণবাদ (Watson's Behaviourism)

গঠনবাদ এবং গঠনবাদী-সমর্থিত অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সাম্প্রতিক আচরণবাদীরা (Behaviourists)। এই আচরণ-বাদের প্রধানতম সমর্থক ও প্রচারক হলেন ওয়াট্‌সন্ (Watson)। সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই অবশ্য মনোবিজ্ঞানকে মূলত আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলেই গ্রহণ করেন ; কিন্তু তবুও তাঁদের সকলকে আচরণবাদী বলা হয় না। কেননা, আচরণবাদী বলতে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক রকম চূড়ান্ত মতবাদের সমর্থকদেরই বোঝানো হয়। এই চূড়ান্ত মতবাদ অনুসারে 'আত্মা'র মতোই 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতির ধারণা প্রাচীন সংস্কারের স্মারকমাত্র। অর্থাৎ, প্রাচীন ও মধ্য যুগের দার্শনিকেরা শরীরের অভ্যন্তরে আত্মা বলে যে-বস্তুর কল্পনা করেছিলেন তার অস্তিত্ব—অতএব তার বিষয়ে কোন রকম জ্ঞান—তো অবশ্যই অলীক ; কিন্তু আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা 'চেতনা', 'মন' প্রভৃতি নামান্তরের সাহায্যে আসলে একই রকম অলীক বিষয়কে আঁকড়ে থাকতে চান। সংক্ষেপে, 'মন' বা 'চেতনা' বলে কিছুর সত্তা নেই ; অতএব মনোবিজ্ঞান থেকে এগুলির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে হবে। আচরণবাদীদের মতে মানুষ নেহাতই একটি যন্ত্রের মতো ; মানব-নির্মিত অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু এই যে মানুষ নামের যন্ত্রটি তুলনায় অত্যন্ত জটিল ; স্বভাবতই এ-যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপও বিশেষ জটিলতারই পরিচায়ক। কিন্তু যতো জটিলই হোক না কেন, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই মূলত যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র। এই জটিল ক্রিয়াকেই মানুষের আচরণ (behaviour) বলা হয়। স্বভাবতই ওয়াট্‌সনের মতে এই আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় এবং এই আচরণ তাঁর মতে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বা যন্ত্রের ক্রিয়ার মতোই।

ওয়াট্‌সনের অনেক আগে দার্শনিক দেকার্থস্ (Descartes) বলেছিলেন, মানবেতর প্রাণী যন্ত্রমাত্রই। অবশ্য তিনি মানুষকেও অন্যান্য জীবজন্তুর মতো যন্ত্রমাত্র মনে করেননি। কিন্তু ওয়াট্‌সনের সময়ে জীবজন্তুর আচরণ সংক্রান্ত সুউন্নত গবেষণা হয়েছে—থর্ণডাইক (Thorndike), পাভ্‌লভ্ (Pavlov) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা। এই সব গবেষণার ফলাফলকে ওয়াট্‌সন্ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক অর্থেই গ্রহণ করতে চান এবং তিনি দাবি করেন, মানবেতর প্রাণী এবং মানুষের আচরণের মধ্যে আসলে কোন রকম মৌলিক বা গুণগত পার্থক্য নেই। এবং মানবেতর প্রাণীর আচরণ যেহেতু ওয়াট্‌সনের বিচারে নেহাতই যান্ত্রিক সেইহেতু মানব-আচরণও তাঁর কাছে যান্ত্রিক ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

আচরণবাদীরা জীবজন্তুর মতোই মানব-আচরণকে ঠিক কোন্ অর্থে যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে চান? তাঁদের মতে, আচরণ 'উদ্দীপক → প্রতিবেদন' ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ, বহির্জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে জীবদেহে যন্ত্র-চালিতের মতো প্রতিবেদন দেখা দেয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৭ এবং পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য), আধুনিক কালের অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে চান এবং এই অর্থ স্বীকৃত হলে পরই মনোবিজ্ঞানের পক্ষে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি নির্ভুল বিজ্ঞানে পরিণত হবার সম্ভাবনা। এবং 'উদ্দীপক→প্রতিবেদনই' আচরণের ব্যাখ্যায় মূলসূত্র বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু তবুও আচরণবাদীরা যে-রকম যান্ত্রিক অর্থে আচরণ বা 'উদ্দীপক → প্রতিবেদন' ক্রিয়াকে বুঝতে চান তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মানুষ শুধুমাত্র নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গর যোগফলই নয়; পক্ষান্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানুষটির এক সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাও বর্তমান। এই মানুষটি, উড্ওয়ার্থ (Woodworth) যেমন বলছেন, ভালবাসে বা ঘৃণা করে; সাফল্য অর্জন করে বা অকৃতকার্য হয়। তাকে সম্পাদন করতে হয় দায়িত্ব, সমাধান করতে হয় সমস্যা। আশপাশের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারে, বা হয়ত নাও পারে। সংক্ষেপে, আচরণ অবশ্যই 'উদ্দীপক→প্রতিবেদন' মূলক প্রক্রিয়া; কিন্তু উদ্দীপক গ্রহণ করে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানুষ এবং এই উদ্দীপক গ্রহণের ফলে তার অভ্যন্তরে চিন্তা-চেতনা, ভাব-আবেগ জাতীয় নানা ঘটনা ঘটে। এই আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই সাধারণত 'মানসিক' আখ্যা দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে অবশ্য আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট আচরণকে বিশ্লেষণ করে তিনি আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলির অস্তিত্ব অনুমান করতে পারেন—পদার্থবিজ্ঞানী যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চোখে দেখেন না, কিন্তু বিবিধ বস্তুকে মাটির দিকে পড়তে দেখে মাধ্যাকর্ষণের কথা অনুমানমূলকভাবে জানতে পারেন।

কিন্তু ওয়াট্সনের মতে, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানুষের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার কথা বস্তুত অর্থহীন। তিনি বলেন, উদ্দীপক পেলে মানুষের দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিতের মতোই প্রতিক্রিয়া করে—যেমন, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছুলেই যন্ত্রটি সক্রিয় হয়। অতএব, অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী যে-আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীকে আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা অর্থে মানসিক আখ্যা দেন সেগুলি ওয়াট্সন্-পন্থীদের আলোচনায় নিছক যান্ত্রিক ক্রিয়ারই পরিচায়ক। অতএব তাঁরা বলেন, মনোবিজ্ঞান থেকে 'সংবেদন', 'চিন্তা', 'আবেগ-অনুভূতি', 'স্মৃতি' প্রভৃতি শব্দকেই পরিহার করা প্রয়োজন; কেননা এই শব্দগুলি 'মন' বা 'চেতনা' সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কারেরই

পরিচায়ক। স্বভাবতই আচরণবাদীরা তথাকথিত 'সংবেদন', 'চিন্তা' প্রভৃতির সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছেন। যেমন, 'সংবেদনের' পরিবর্তে তাঁরা ব্যবহার করেন 'প্রতিক্রিয়া' শব্দ।

তথাকথিত 'চিন্তা' ও 'কল্পনা' আচরণবাদীদের মতে অস্ফুট পেশী-পরিচালন ছাড়া আর কিছুই নয়: শিশুরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে চিন্তা করে, অর্থাৎ নিজেদের সঙ্গেই কথা বলে; তারা যতো বড়ো হয় ততোই তাদের চিন্তার উচ্চারিত দিকটি অস্ফুট হতে থাকে; বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্য চিন্তার সময় শব্দ উচ্চারণ করে না; কিন্তু তার দৃষ্টান্তেও বাক্‌যন্ত্রের পেশীগুলি খুবই সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে; অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী যাকে চিন্তা বলেন তা আসলে বাক্‌যন্ত্রের পেশীগুলির এই ক্রিয়াই, তবে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তে এ-ক্রিয়া এমনই সূক্ষ্ম যে তা উচ্চারিত শব্দে পরিণত হয় না; অর্থাৎ, সংক্ষেপে অনুচ্চারিতভাবে কথা কওয়াকেই চিন্তা বলা হয়। তথাকথিত 'আবেগ'কেও ওয়াট্‌সন্‌ শুধুমাত্র দৈহিক পরিবর্তন হিসাবেই ব্যাখ্যা করেন: সমগ্র-ভাবে দেহযন্ত্রটির গভীর পরিবর্তনই—এবং বিশেষত আন্তরযন্ত্র (Visceral) ও গ্রন্থিসমূহের গভীর পরিবর্তনকেই—আবেগ বলা হয়।

আচরণকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক অর্থে 'উদ্দীপক→প্রতিবেদন' ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন বলেই ওয়াট্‌সন্‌-পন্থীদের মতে আচরণের ব্যাখ্যায় সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) এবং বংশগতির (Heredity) কোন রকম ভূমিকাই স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। আচরণ যদি পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে যন্ত্রচালিতের মতো প্রতিবেদনই হয় তাহলে আচরণের সবটুকু বৈশিষ্ট্যই পারিপার্শ্বিক থেকে পাওয়া উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই বোঝা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, আচরণের ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিকের (Environment) প্রভাবই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বংশগত সূত্রে লব্ধ তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে, সাবেকী মনোবিজ্ঞানের গঠনবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষত অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরো-পণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে আচরণবাদের বৈজ্ঞানিক অবদান অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া আচরণবাদীদের দৃষ্টান্তে যে-চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছে তা স্বীকার্য হতে পারে না। কেননা, মানুষকে শুধুমাত্র যন্ত্র বলে বর্ণনা করার প্রয়াস অবশ্যই অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে মূলতই আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও ওয়াট্‌সন্‌-পন্থীদের মতো আচরণকে নিছক যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে গ্রহণ করার কারণ নেই।

৪॥ ম্যাক্‌ডুগালের অভিপ্রায়বাদ (McDougall's Purposivism or Hormic Psychology)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য), ম্যাক্‌ডুগালও মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে-অর্থে এবং যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচরণকে বুঝতে চান তা উপরোক্ত ওয়াট্‌সন্‌-পন্থী বা আচরণ-বাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওয়াট্‌সনের মতে আচরণ একটি যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র; পক্ষান্তরে ম্যাক্‌ডুগালের মতে আচরণ মূলতই কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য (Purpose) সিদ্ধির উপায়। এই কারণে ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদকে অভিপ্রায়বাদ (Purposivism) আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর সম্প্রদায়টি নামান্তরে 'হমিক মনোবিজ্ঞান' (Hormic Psychology) বলেও উল্লিখিত। 'হমিক' নামটি গ্রীক শব্দ 'হরমে' (*horme*) থেকে গৃহীত হয়েছে। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, তীব্র কর্মপ্রেরণা। ম্যাক্‌ডু-গালের মতে; আচরণমাত্রেরই মূলসূত্র কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তীব্র কর্মপ্রেরণার মধ্যেই অনুমেয়; এই কারণেই তাঁর সম্প্রদায় হমিক (Hormic) নামে উল্লিখিত।

আভ্যন্তরীণ কর্ম প্রেরণাকেই মানসসত্তার মূল লক্ষণ বলে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অভিপ্রায়বাদীরা সহজ-প্রবৃত্তির (Instinct) উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপণের প্রস্তাব করেন। সাবেকী মনোবিজ্ঞানের—বিশেষত গঠনবাদের—বিরুদ্ধে অভিপ্রায়বাদীদের বিশেষ অভিযোগ এই যে সাবেকী মনোবিজ্ঞানে সহজ-প্রবৃত্তির প্রকৃত ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি এবং বিশেষত মানব মনের বিচারে সহজ-প্রবৃত্তির ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতই হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল অন্তর্দর্শন পদ্ধতি। এ-পদ্ধতি অনুসরণ করলে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা থেকে মানবেতর জীব-জন্তুর আচরণ বাদ পড়বারই কথা; কেননা, অন্তর্দর্শনের সাহায্যে অন্যান্য জীবজন্তুর মানসসত্তা সংক্রান্ত অন্তত কোন রকম সরাসরি জ্ঞান পাবার প্রশ্নই ওঠে না। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানী বড়োজোর নিজের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণই করতে পারেন এবং সে-বিশ্লেষণের ফলে তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত মানস-পরমাণুর (mental atoms) কল্পনাতে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক। গঠনবাদীদের আলোচনা বস্তুত এ-জাতীয় কল্পনাতেই পরিসমাপ্ত হয়েছে: রসায়নবিজ্ঞানীর আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয়েরই প্রয়াস করেছেন। শুধু তাই নয়; অন্তর্দর্শন পদ্ধতির ফলে মানুষ এবং মানবেতর জীব-জন্তুর মধ্যে কোন একরকম গুণগত পার্থক্যই অনুমান করা স্বাভাবিক। এই কারণে, সাবেকী মনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় মানুষের বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা; পক্ষান্তরে সহজ-প্রবৃত্তি শুধুমাত্র জীবজন্তুরই বৈশিষ্ট্য। অভিপ্রায়বাদ

অনুসারে, মানব মন সংক্রান্ত এ-জাতীয় ধারণা ঐকান্তিক সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। স্বভাবতই তাঁরা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিশেষ বিরোধিতা করেন। তাঁদের দাবি হল, অন্তর্দর্শন পদ্ধতি পরিহার করে পরিদর্শনমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে এবং পরিদর্শনমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে মানুষ এবং মানবেতর জীবজন্তুর আচরণ তুলনামূলকভাবে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো, বুদ্ধি এবং সহজ-প্রবৃত্তির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনরকম গুণগত পার্থক্য নেই ; মানব এবং মানবেতর জীবজন্তুর আচরণের মধ্যেও কোনরকম গুণগত পার্থক্য স্বীকার্য নয় ; বস্তুত মানবেতর জীবজন্তুদের মতোই মানব-আচরণের মূল উৎস বলতে বিবিধ সহজ-প্রবৃত্তিই। অতএব অভিপ্রায়বাদ অনুসারে, সহজ-প্রবৃত্তির আদিম প্রেরণা দ্বারাই পরিচালিত হয় মানব এবং মানবেতর প্রাণীর সমস্ত আচরণ। যে-বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা সাবেকী মতে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলে উল্লিখিত অভিপ্রায়বাদ অনুসারে তাও শেষ পর্যন্ত সহজ-প্রবৃত্তির ঐ আদিম তাড়নার দ্বারাই পরিচালিত। কিন্তু অবশ্যই তা যন্ত্রচালিতের মতো পরিচালিত নয় ; অর্থাৎ, সহজ-প্রবৃত্তিব আদিম তাডনাকেই অভিপ্রায়বাদীরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষ বা জীবজন্তুর কোন আচরণই যান্ত্রিক নয়। কেননা, সহজ-প্রবৃত্তির এই তাড়না কোন-না-কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই সকলকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ, সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকলেই কোন-না-কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় ; এই দিক থেকে লক্ষ্য লাভের প্রয়াসই (Goal-seeking) সমস্ত আচরণের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। এই সহজ-প্রবৃত্তিগুলি অবশ্যই বংশগত সূত্রে লব্ধ হয় ; অতএব আচরণের ব্যাখ্যায় অভিপ্রায়বাদীরা পারিপার্শ্বিকের (Environment) তুলনায় বংশগতির (Heredity) প্রভাবকেই বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আচরণবাদীদের মতোই সাবেকী মনোবিজ্ঞানের গঠনবাদ এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও অভিপ্রায়বাদীরা আচরণবাদীদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশেষ বিরোধী ; মানব এবং অন্যান্য জীবজন্তুকে যন্ত্রের মতো পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দাস বলে বিবেচনা করার পরিবর্তে তাঁরা জন্মগত সূত্রে লব্ধ সহজ-প্রবৃত্তির উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব অর্পণ করে এবং সহজ-প্রবৃত্তিকে মূলতই লক্ষ্য-লাভের উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করে তাঁরা একরকম উদ্দেশ্যমূলক মনোবিজ্ঞানের (Teleological Psychology) প্রচার করেছেন। স্বভাবতই সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিশিষ্ট মতবাদের উপরই এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ১৯৮-২০১ এবং ২৫২-২৫৪ দ্রষ্টব্য), ম্যাক্‌ডুগালের সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করেছি, এবং দেখেছি, তিনি সহজ-প্রবৃত্তির যে-তালিক

দিয়েছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে আপত্তিজনক। অর্থাৎ, সমস্ত আচরণকেই যেন-তেন-প্রকারে সহজ-প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক বলে প্রমাণ করার উৎসাহে তিনি সহজ-প্রবৃত্তিকে এমনই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন যে তা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। আসলে উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) নামের নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বই সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত ম্যাকৃডুগালের মতবাদটির মূল প্রেরণা বলে অনুমিত হয়। এইভাবে এক দার্শনিক মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহজ-প্রবৃত্তির গুরুত্ব সংক্রান্ত তিনি অতিশয়োক্তিই করেছেন, যদিও গঠনবাদ এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরোধিতার মতোই আচরণবাদীদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত হতে পারে।

৫ ॥ কফ্‌কা প্রমুখর গেস্টাণ্টবাদ (Gestault Psychology of Koffka and others)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জার্মানীতে মনোবিজ্ঞানের আর একটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ও প্রধানতম প্রচারকদের নাম কফ্‌কা (Koffka), কোয়েলার (Koehler), ভের্টহাইমের (Wertheimer) ইত্যাদি। এঁদের মতবাদকে সাধারণত গেস্টাণ্টবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। গেস্টাণ্ট (Gestault) শব্দটি অবশ্যই জার্মান; কিন্তু ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিতেও এই জার্মান শব্দটিই ব্যবহার করার কারণ হল অন্যান্য ভাষায় এর সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন—হয়ত সম্ভবই নয়। গেস্টাণ্ট শব্দের ব্যাখ্যায় ইংরেজীতে ফর্ম (form), প্যাটার্ন (pattern), কন্‌ফিগারেশন্ (configuration) প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হয়; বাংলায় আমরা 'সামগ্রিক রূপ' বা 'পূর্ণাঙ্গতা' বা 'সামঞ্জস্যতা' প্রভৃতি কথার সাহায্যে গেস্টাণ্ট শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্যের কিছুটা আভাস পেতে পারি। মোটকথা, এই সম্প্রদায়ের মূল দাবি হল মনের একটি পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক বা সামঞ্জস্যময় রূপ আছে এবং এই রূপটিই মনের স্বরূপ। অর্থাৎ, মন বলতে বিবিধ মানসিক উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়; বস্তুত, মনকে বিবিধ মানসিক উপাদানের সমষ্টি বলে কল্পনা করলে, বা, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের বিবিধ মানসিক উপাদান নির্ণয়ের প্রয়াস করলে আমরা মনের স্বরূপ উপলব্ধির সম্ভাবনা থেকেই বঞ্চিত হবো। পক্ষান্তরে মনোবিজ্ঞানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মনের এই সামগ্রিক রূপটি উদ্ধার করা, কিংবা, প্রতিটি মানসিক ঘটনার মধ্যে কীভাবে এই সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তারই অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা।

অতএব সহজেই বোঝা যায়, অভিপ্রায়বাদ এবং আচরণবাদের মতোই গেস্টাণ্ট-বাদও মূলতই সাবেকী মনোবিজ্ঞানের গঠনবাদ এবং অনুষঙ্গবাদের বিরুদ্ধে এক-রকমের বিদ্রোহই,—যদিও অবশ্যই অভিপ্রায়বাদ, আচরণবাদ এবং গেস্টাণ্টবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও বর্তমান। গেস্টাণ্টবাদীরা প্রতিটি মানসিক ঘটনাকেই অভিপ্রায়বাদীদের মতো সহজ-প্রবৃত্তির পরিচায়ক—অতএব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র—মনে করেন না ; আচরণবাদীদের মতোও প্রতিটি মানসিক ঘটনাকেই তাঁরা দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র মনে করেন না ; তবুও গঠনবাদীরা যে-ভাবে মনকে বিশ্লেষণ করে মনের বিবিধ উপাদান আবিষ্কারের প্রস্তাব করেন এবং অনুষঙ্গর নিয়মগুলির উপর যে-অসীম গুরুত্ব আরোপণ করতে চান গেস্টাণ্টবাদীরাও তার বিশেষ বিরোধিতা করেন। বস্তুত তাঁরা গঠনবাদকে একরকম 'ইঁট-সুরকির মনোবিদ্যা' (Brick-and-mortar psychology) বলে হিসাবে উপহাস করেছেন ; অর্থাৎ, একটি ইমারত যে-রকম ইঁট-চুন-সুরকি প্রভৃতি নানা রকম উপাদান দিয়ে গড়া হয় গঠনবাদের দৃষ্টিতেও মন এ-জাতীয় বিবিধ উপাদান দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, মানসসত্তার সামগ্রিক রূপটির পরিচয়ই তার প্রকৃত পরিচয়। এবং মনকে বিবিধ উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টার ফলে এই সামগ্রিক রূপটির পরিচয়ই ক্ষুণ্ণ হয়, বা প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, গঠনবাদের বিরুদ্ধে এ-জাতীয় তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও গেস্টাণ্টবাদীরা আচরণবাদী প্রভৃতির মতো সাবেকী অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে চাননি। অর্থাৎ, গেস্টাণ্ট-বাদীদের মতেও অন্তর্দর্শন সম্ভব ; কিন্তু অন্তর্দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা হল মনের সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি। তাই অন্তর্দর্শন পদ্ধতি স্বীকার করলেও গঠনবাদীরা এই পদ্ধতির যে-উদ্দেশ্য পরিকল্পনা করেছেন গেস্টাণ্টবাদীদের মতে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; কেননা গঠনবাদীদের মতে অন্তর্দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মনকে বিশ্লেষণ করে মনের বিবিধ উপাদানকে সনাক্ত করাই।

গেস্টাণ্টবাদীরা অবশ্য বিশেষত প্রত্যক্ষ (Perception) প্রসঙ্গেই নানা রকম পরীক্ষা করেছেন ; এই পরীক্ষাগুলির সাহায্যে তাঁরা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে প্রত্যক্ষ নামের মানসিক ঘটনার একটি সামগ্রিক রূপ বর্তমান এবং এই সামগ্রিক রূপটিই তার প্রকৃত রূপ। আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ১১৭-১১৮ দ্রষ্টব্য), প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাণ্টবাদীদের মতবাদ আলোচনা করেছি। বর্তমানে তাঁদের আর কয়েকটি সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

এই সম্প্রদায়ের মতে শুধু যে প্রত্যক্ষরই এক সামগ্রিক রূপ বর্তমান তাই নয়, প্রত্যক্ষকালে বা প্রত্যক্ষর আনুষঙ্গিক হিসাবে যে-সব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে

সেগুলির মধ্যেও একরকম সামগ্রিক রূপ বা একরকম 'প্যাটার্ন' (pattern) বর্তমান। গেস্টাণ্টবাদীদের এই মতটি সাধারণত 'ইসোমর্ফিসিম্' (Isomorphism) নামে উল্লিখিত। প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে সামগ্রিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন বলেই গেস্টাণ্টবাদীদের মতে গতি এবং দূরত্ব সংক্রান্তও আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই লাভ করি। অর্থাৎ, সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন সংবেদনের কয়েক রকম বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা মূলত অনুমানমূলকভাবেই গতি ও দূরত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করি; কিন্তু গেস্টাণ্টবাদীরা প্রত্যক্ষর উপাদান হিসাবে সংবেদনের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা দেখতে চান যে গতি এবং দূরত্বর জ্ঞানও সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই।

গেস্টাণ্টবাদীরা বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গবেষণা করলেও মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি সমস্যা সংক্রান্ত তাঁদের সিদ্ধান্ত আধুনিককালে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। যেমন, শিক্ষা (Learning) সংক্রান্ত তাঁদের মত উল্লেখ করা যায়। এই মতে শিক্ষা হল, সামগ্রিকভাবে একটি বিষয় বা অবস্থা সংক্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি (Insight) লাভ এবং এই অন্তর্দৃষ্টি আমরা নানা রকম ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে লাভ করি না; তার পরিবর্তে আকস্মিকভাবে আমরা এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে থাকি। তেমনি, সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গেস্টাণ্টবাদীরা চিন্তা (Thinking), সহজ-প্রবৃত্তি (Instinct) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলেই গেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের সমস্ত দাবিও সর্বস্বীকৃত নয়। অর্থাৎ, এই দাবিগুলি নিয়ে নানা রকম মতভেদ এবং বিতর্ক আছে। তবুও মোটের উপর বলা যায় সাবেকী গঠনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে গেস্টাণ্টবাদের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, যদিচ সম্প্রদায়ান্তরের অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী গেস্টাণ্টবাদীদের নানা সিদ্ধান্তের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মর্যাদা স্বীকারের পরিবর্তে এগুলিকে অনেকাংশে কবি-কল্পনাসুলভ বা অতিরঞ্জিত বলেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অন্তত এইটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাণ্টবাদীদের পরীক্ষাবলী অবশ্যই চিত্তাকর্ষক এবং প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত সাবেকী ধারণা পরিহারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

৬ ॥ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis of Freud)

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের একটি সম্প্রদায়কে মনঃসমীক্ষণ আখ্যা দেওয়া হয়। সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ছিলেন ফ্রয়েড। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ বলতে মনোবিকারের (Mental Diseases) একরকম নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিও বোঝায়। বস্তুত চিকিৎসক হিসাবেই

ফ্রয়েড তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন এবং মনোবিকারের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তাঁর আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতির নাম থেকেই সম্প্রদায়টির নামকরণ হয়েছিল। অতএব মনোবিকার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাবার পরই আমাদের পক্ষে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়টির আলোচনা সুবিধাজনক হবে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক রূপগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বিবিধ মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবো। অতএব তারপর একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আমরা মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়টির আলোচনা উত্থাপন করবো।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব (Personality)

১॥ ব্যক্তিত্বর অর্থ (Meaning of Personality)

আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখেছি, একই শব্দ দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, চলতি কথায় আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে যা-বুঝি মনোবিজ্ঞানে তা বোঝায় না। অবশ্যই মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যক্তিত্বর সমস্যা বিশেষ কঠিন এবং জটিল; সাম্প্রতিক কালে এই সমস্যা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু প্রথমে দেখা যাক, ব্যক্তিত্ব বলতে মনোবিজ্ঞানে মূলত কী বোঝায়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ব্যক্তিত্ব শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান-সম্মত অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করাই সুবিধাজনক হবে।

চলতি কথায় আমরা বলি, 'ব্যক্তিত্ব ছিল বটে বিদ্যাসাগরের! যেমন নির্ভীক পৌরুষ, তেমনি অসীম মমতা—বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুসুমের চেয়ে কোমল!' কিংবা, হয়ত বলি, 'অমুখ লোকের কোন ব্যক্তিত্বই নেই; তাই তাকে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক করা যায় না।'

এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কী বুঝি? বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ছিল—অর্থাৎ, তাঁর আচরণ ছিল বিবিধ মহৎ গুণের পরিচায়ক। ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হবার জন্য ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন; এখানেও ব্যক্তিত্ব বলতে আচরণের কয়েক রকম গুণ বা বৈশিষ্ট্যই বোঝায়—দলের অধিনায়কত্ব করার পক্ষে আচরণের যে-গুণ বা বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। কারুর আচরণে এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের আচরণেই তা পাওয়া যায় না; যাঁদের আচরণ এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচায়ক তাঁদের ব্যক্তিত্ব বর্তমান, যাঁদের আচরণে এগুলির অভাব তাঁদের ব্যক্তিত্বরও অভাব।

মনোবিজ্ঞানে কিন্তু ব্যক্তিত্বর অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতি ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব। অতএব, কারুর ব্যক্তিত্ব আছে এবং কারুর ব্যক্তিত্ব নেই—এ-জাতীয় মন্তব্য মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অবাস্তর ও অর্থহীন।

ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব বর্তমান, যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন প্রকারের। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব একরকম: তাঁর আচরণ পর্যালোচনা করে যে-প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির সামগ্রিকতাকেই বিদ্যাসাগরেব ব্যক্তিত্ব বলা হবে। অতএব বলা যায়, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা, আত্মমর্যাদা, করুণা, মমতা প্রভৃতি আচরণের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব। অপরপক্ষে আর একজনের আচরণ পর্যালোচনা করে তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যেতে পারে দুর্বলতা, কাপুরুষতা, মিথ্যাবাদিতা, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রেও কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হবে না যে এই ব্যক্তিটির কোন ব্যক্তিত্বই নেই। মনোবিজ্ঞানী শুধু বলবেন, তার ব্যক্তিত্ব ভিন্ন প্রকারের—কাপুরুষতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় বা সামগ্রিকতা। তেমনি, যার আচরণ দলের বাকি সকলকে পরিচালনা কবার দক্ষতা-সূচক তার ব্যক্তিত্ব একরকম; যাব আচরণ বাকি সকলকে পরিচালনা করার অক্ষমতা-সূচক তার ব্যক্তিত্ব অন্যরকম। একজনের ব্যক্তিত্ব অধিনায়কত্বের পক্ষে উপযোগী, অপরজনের ব্যক্তিত্ব অনুপযোগী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একজনের ব্যক্তিত্ব বর্তমান, অপরজন ব্যক্তিত্ববিহীন।

২॥ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (Personality and Character)

ব্যক্তিত্বর মনোবিজ্ঞান-সম্মত অর্থটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য চরিত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যাক। আচরণের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করে নৈতিক বিচারেব বিষয়বস্তু—অর্থাৎ, যেগুলিকে ভাল বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়—সেগুলির সামগ্রিকতাকেই ব্যক্তির চরিত্র বলা হয়। অর্থাৎ, চরিত্র মূলতই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। যার আচরণে সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতির পরিচয় তার চরিত্র ভাল; তাকে সৎচরিত্র বলা হয়। যার আচরণে মিথ্যাবাদিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতিব পরিচয় তার চরিত্র মন্দ; তাকে মন্দ-চরিত্র বলা হয়।

কিন্তু আচরণের নানা বৈশিষ্ট্যকেই না-বলা যায় ভাল, না মন্দ। অর্থাৎ, নৈতিক বিচারের পক্ষে সেগুলি প্রাসঙ্গিকই নয়। যেমন, বুদ্ধি-নির্বুদ্ধিতার বিচার, বা দক্ষতা-অদক্ষতার বিচার। বস্তুত দেখা যায়, নৈতিক বিচারের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নানা বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তিত্ব বিচারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যেমন, ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আভ্যন্তরীণ ভাবাবেগের তুলনায় বাহ্য পরিবেশের প্রতিই অনেক বেশি মনোযোগী, অপর ব্যক্তি হয়ত বাহ্য পরিবেশের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ ভাবাবেগের প্রতিই বেশি মনোযোগী। আমরা পরে দেখবো, ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপণের কারণ আছে; কিন্তু নীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে—অর্থাৎ, চরিত্র-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচরণের এ-বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই অবান্তর।

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, চরিত্র-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচরণের যে-সব বৈশিষ্ট্য-গুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বা ব্যক্তিত্ব-বিচারে সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের আচরণকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করেই তার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হয়। স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচরণের কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করার প্রশ্ন ওঠে না—নৈতিক বিচারের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও নয়। অপরপক্ষে, অবশ্যই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে শুধুমাত্র চারিত্রিক বিচারের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখার প্রশ্নও ওঠে না। এই দিক থেকে বলা যায়, চরিত্রের তুলনায় ব্যক্তিত্ব ব্যাপকতর: চরিত্র-বিচারে আচরণের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিত্ব-বিচারেও সেগুলি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বিচারের জন্য এ-ছাড়াও আচরণের অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যও মনে রাখা প্রয়োজন: নৈতিক মূল্যায়ন মনোবিজ্ঞানীর দায়িত্ব নয়, নৈতিক মানদণ্ডে তিনি ব্যক্তিত্ব বিচার করেন না।

৩ ॥ ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Traits of Personality)

বিবিধ ব্যক্তির আচরণের বিবিধ বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য যে-কোন ভাষার অভিধানে অজস্র শব্দ পাওয়া যায়। এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেই আমরা ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করতে পারি বা করে থাকি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এ-জাতীয় শব্দের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করতে চান। ধরা যাক, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বলা হল, লোকটি হাসিখুসি, মিশুক, আমুদে, দিলখোলা, দরাজ মেজাজের,……ইত্যাদি, ইত্যাদি। শব্দগুলি ব্যক্তিটির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে তার নানা আচরণ-বৈশিষ্ট্যেরই ইংগিত দেয় এবং এ-জাতীয় ইংগিত অনুসরণ করেই আমরা তার ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণায় উপনীত হই। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বলতে আচরণের এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একরকম যোগফল মাত্র নয়। অর্থাৎ, এ-কথা বলা ভুল হবে যে আলোচ্য লোকটির ব্যক্তিত্ব = হাসিখুসি + মিশুক + আমুদে + দিলখোলা + দরাজ……। কেননা, ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তিবিশেষের আচরণ-বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক এবং অখণ্ড রূপটিই বোঝানো হয়। কিংবা, গোটা মানুষটির পুরো বা সামগ্রিক

বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিত্ব বলা হয়। এ-জাতীয় সামগ্রিক পরিচয় থেকে এমনকি তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যও বাদ পড়ে না। কেননা, আমরা একটু পরে দেখবো, প্রথমত ব্যক্তিত্বর একরকম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যই। দ্বিতীয়ত, একজনের দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপরই তার প্রতি অপরের আচরণ অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং তার প্রতি অপরের এই আচরণ তার নিজের আচরণকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করে। যেমন, চলতি কথায় আমাদের দেশে বলে, কালো ছেলে অনাদরে মানুষ হয়; এবং অনাদরে মানুষ হবার ফলেই ছেলেটি লাজুক, ঘরকুনো, বিষণ্ণ হতে পারে।

অতএব, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গোটা বা পুরো মানুষটির আচরণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিত্ব বলা হয়। কিন্তু আচরণ-বৈশিষ্ট্যের এই সামগ্রিক রূপটি সরাসরিভাবে সনাক্ত করার কোন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানীর জানা নেই। তাহলে তিনি কীভাবে ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের প্রয়াস করেন?

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানী কি সারা জীবন ধরে তার সমস্ত আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাবেন এবং শেষ পর্যন্ত তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত কোন সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ধারণায় উপনীত হবেন? বলাই বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে এ-জাতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি বলতে তাহলে কী? মোটের উপর বলা যায়, ব্যক্তিবিশেষের আচরণ কয়েকটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে মনোবিজ্ঞানী প্রথমত তার ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি (Traits of Personality) সনাক্ত করতে চান এবং এই প্রলক্ষণগুলির সমন্বয়েই শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণায় উপনীত হন।

অতএব প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলতে কী বোঝায়? প্রফুল্লতা বা বিষণ্ণতার দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। ব্যক্তিত্বর একটি প্রলক্ষণ হল প্রফুল্লতা, আর একটি প্রলক্ষণ হল বিষণ্ণতা; কিংবা, এই দুটি বিরুদ্ধ প্রলক্ষণ একই সঙ্গে যুগ্ম-প্রলক্ষণ (Pair of Traits) বলেও উল্লিখিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলবেন, তার আচরণ কি প্রফুল্লতার পরিচায়ক, না বিষণ্ণতার পরিচায়ক? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে স্বভাবতই ব্যক্তিটির আচরণ সংক্রান্ত অজস্র খুঁটিনাটির কোন তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না। যেমন, কোন ব্যক্তির আচরণ প্রফুল্লতার পরিচায়ক হলে তাঁর আচরণ সম্বন্ধে আর স্বতন্ত্রভাবে হাসিখুসি, আমুদে, মিশুকে, দিলখোলা, দরাজ, ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণের প্রয়োজন হবে না; 'প্রফুল্লতা' প্রলক্ষণের সাহায্যেই তাঁর আচরণের অনেক রকম খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য

অনায়াসে ব্যক্ত হবে। শুধু তাই নয়; ব্যক্তিটির আচরণ প্রফুল্লতার পরিচায়ক কি না তা জানবার জন্যও সারা জীবন ধরে তার সমস্ত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবারও প্রয়োজন নেই—হয়ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের উপর নির্ভর করেই বা কয়েক রকম নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যক্তিটির আচরণ পর্যবেক্ষণ করেই মনোবিজ্ঞানী তা জানতে পারবেন। আমরা একটু পরেই দেখবো, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্ব-নিরূপণের উদ্দেশ্যে নানা রকম অভীক্ষা (Tests) প্রস্তাবিত হয়েছে; সেগুলিকে 'ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা' (Personality Tests) বলা হয়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্ব-নিরূপণের প্রয়াস করা হয় না। তার বদলে এগুলির সাহায্যে আসলে ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণই 'মাপবার' বা নির্ণয় করবার আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা বলতে আসলে বোঝায় ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণের অভীক্ষা।

অবশ্যই আচরণের যে-কোন বৈশিষ্ট্যকেই ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলা হবে না। প্রলক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হবার জন্য আচরণ-বৈশিষ্ট্যের পক্ষে আরো কয়েকটি সর্ত পূরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, বৈশিষ্ট্যটির পরিচয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না; সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে তা কম-বেশি হারে বণ্টিত (Distributed) হওয়া দরকার। কম-বেশি হারে বণ্টিত বলতে কী বোঝায়? সাধারণত দুটি বিরুদ্ধ বা বিপরীত প্রলক্ষণকে একই সঙ্গে যুগ্ম-প্রলক্ষণ (Pair of Traits) বলে উল্লেখ করা হয়; যেমন, আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি প্রফুল্লতা-বা-বিষণ্ণতাকে যুগ্ম-প্রলক্ষণ বলা হবে। এবার এমন একটি রেখার কল্পনা করা যাক, যার এক প্রান্তে চরম প্রফুল্লতা এবং অপর প্রান্তে চরম বিষণ্ণতা। এই রেখার প্রফুল্লতা-প্রান্ত থেকে যতোই আমরা বিষণ্ণতা-প্রান্তর প্রতি অগ্রসর হবো ততোই প্রফুল্লতার হ্রাস, রেখাটির মাঝামাঝি জায়গায় প্রফুল্লতা-ও-বিষণ্ণতার মাঝামাঝি ভাব, তারপর ক্রমশই বিষণ্ণতার বৃদ্ধি হতে হতে শেষ পর্যন্ত চরম বিষণ্ণতা। যথা :—

চরম প্রফুল্লতা	তুলনায় কম প্রফুল্লতা	প্রফুল্লতা-বিষণ্ণতাব মাঝামাঝি	তুলনায় কম বিষণ্ণতা	চরম বিষণ্ণতা

সমস্ত সাধারণ বা স্বাভাবিক মানুষের আচরণ এ-জাতীয় রেখার কোথাও না কোথাও নির্দিষ্ট হবে—কারুর আচরণ হয়ত প্রফুল্লতা-সীমার কাছাকাছি, কারুর হয়ত বিষণ্ণতা-সীমার কাছাকাছি, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির আচরণ রেখাটির মোটামুটি মাঝামাঝি পড়বার কথা। এই কারণে বলা হয়, প্রফুল্লতা-বা-বিষণ্ণতা মোটামুটি

সমস্ত মানুষের মধ্যেই কম-বেশি হারে বণ্টিত রয়েছে। এবং কম-বেশি হারে মোটামুটি সমস্ত মানুষের মধ্যে বণ্টিত বলেই প্রফুল্লতা-বা-বিষণ্ণতা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত।

ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হবার আরো দুটি সর্ত আছে। ব্যক্তিবিশেষের আচরণের যে-বৈশিষ্ট্যকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলে স্বীকার করা হবে সেই বৈশিষ্ট্যটি তার সমস্ত আচরণের মধ্যেই সুসঙ্গতভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন, কোন ব্যক্তির সমস্ত আচরণই মোটামুটিভাবে প্রফুল্লতার পরিচায়ক হলে প্রফুল্লতাকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলা হবে ; তেমনি কোন ব্যক্তির সমস্ত আচরণই মোটামুটিভাবে বিষণ্ণতার পরিচায়ক হলে বিষণ্ণতাকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলা হবে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণগুলিকে সহজে চেনা, বোঝা এবং উল্লেখ করতে পারা উচিত।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। কিংবা, ব্যক্তিত্ব-বিচারে যেহেতু দুটি করে বিরুদ্ধ প্রলক্ষণ উল্লেখ করাই সুবিধাজনক সেইহেতু বলা যায় আধুনিক কালে বিবিধ যুগ্ম-প্রলক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। যথা : বুদ্ধিমত্তা-বুদ্ধিহীনতা, পটুতা-অপটুতা, আবেগপরায়ণতা-আবেগহীনতা, সামাজিকতা-অসামাজিকতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা-সমর্পণপরায়ণতা, অন্তর্বর্তিত্ব-বহির্বর্তিত্ব (introversion-extraversion), ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইতিপূর্বেই বলেছি, ব্যক্তিত্বর অভীক্ষার (Personality Tests) সাহায্যে ব্যক্তিত্বর এ-জাতীয় বিবিধ প্রলক্ষণই সনাক্ত করবার বা 'মাপবার' আয়োজন করা হয়।

প্রশ্ন উঠবে, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলতে মোট কয়টি বা কত রকমের ? এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। আচরণের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা হিসাবে ইংরেজী ভাষার অভিধান থেকে প্রায় আঠারো হাজার শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ভাষার অভিধানেও এ-জাতীয় শব্দের সংখ্যা অবশ্যই অজস্র হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ সংখ্যাও আসলে অত্যন্ত বিশাল। কেননা, প্রথমত, অভিধানগত এ-জাতীয় বহু শব্দ আসলে একই শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র—অর্থাৎ, নানা শব্দের সাহায্যে আচরণের একই বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শব্দ বর্ণিত আচরণের নানা বৈশিষ্ট্যও একই প্রলক্ষণের পরিচায়ক হতে পারে। যেমন, আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, হাসিখুসি, মিশুক, আমুদে, দরাজ প্রভৃতি আচরণের নানা বৈশিষ্ট্য প্রফুল্লতা প্রলক্ষণটিরই পরিচায়ক।

অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণের যে-সব তালিকা প্রস্তাব করেছেন তার কোনটিই খুব সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু সকলের প্রস্তাবিত তালিকাও সমান

য়। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলতে প্রধানত কয়টি এবং কী কী—এ-বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর মতভেদ আছে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রস্তাবিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের বিভিন্ন তালিকার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট তালিকাকেই বিজ্ঞানসম্মত বা স্বীকারযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত হবে না; কেননা সে-প্রয়াসের পরিণামে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিতর্কজালে জড়িত হবার আশঙ্কা আছে। হয়ত এ-জাতীয় কোন একটি নির্দিষ্ট তালিকা সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্যও নয় এবং বাকিগুলি সামগ্রিকভাবে বর্জনীয়ও নয়। পক্ষান্তরে, এ-সম্ভাবনা বর্তমান যে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্বর বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রলক্ষণের সন্ধান পেয়েছেন, যদিও এ-জাতীয় বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রলক্ষণ বিভিন্ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব, ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের কোন একটি নির্দিষ্ট তালিকার উপর ঐকান্তিকভাবে নির্ভর করার পরিবর্তে আমরা বিভিন্ন তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিত্বর বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রলক্ষণের উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবো।

এখানে আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তিত্বর বিভিন্ন প্রলক্ষণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-সব অভীক্ষা প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলির ফলাফলের মধ্যে অনেক সময় নিকট সাদৃশ্য এবং ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্বন্ধ (Correlation) দেখা গিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে প্রফুল্লতা-বিষণ্ণতা এবং মমতা-নিষ্ঠুরতা হিসাবে উল্লিখিত যুগ্ম-প্রলক্ষণগুলির উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার সাহায্যে একদল লোককে পরীক্ষা করে হয়ত দেখা গেল প্রফুল্লতা-বিষণ্ণতার মানে সেই দলের লোকদের যার যেখানে স্থান মমতা-নিষ্ঠুরতার মানেও তাদের মোটামুটি সেই রকমেরই স্থান: যে-ব্যক্তির আচরণে প্রফুল্লতার যতোখানি পরিচয় তারই আচরণে মমতার পরিচয়ও মোটামুটি ততোখানিই; যার আচরণে বিষণ্ণতার যতোখানি পরিচয় তারই আচরণে নিষ্ঠুরতার পরিচয়ও প্রায় ততোখানিই। বিভিন্ন অভীক্ষালব্ধ ফলাফলের মধ্যে এ-জাতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে অবশ্যই অনুমান হয় যে বিভিন্ন অভীক্ষার দ্বারা আসলে বিভিন্ন প্রলক্ষণ 'মাপা'র বা নির্ণয় করার প্রয়াস হচ্ছে না; পক্ষান্তরে, বিভিন্ন নামে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রলক্ষণকে বিভিন্নভাবে 'মাপ'তে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা আসলে আরো মৌলিক কোন প্রলক্ষণেরই সন্ধান পাচ্ছেন।

অতএব আধুনিক কালে কোন কোন বিজ্ঞানী প্রস্তাব করেছেন, বিবিধ অভীক্ষার ফলাফল বিচার করে ব্যক্তিত্বর প্রকৃত মৌলিক প্রলক্ষণগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, তাঁদের ধারণায় মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময় নামান্তরের আড়ালে একই মূল

প্রলক্ষণের আভাস পেয়ে থাকেন। কিন্তু কোন্ প্রলক্ষণকে প্রকৃতপক্ষে মূল বা মৌলিক আখ্যা দেওয়া হবে এ-বিষয়ে তাঁদের মধ্যেও গভীর মতভেদ বর্তমান। অতএব, ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে শুধুমাত্র এটুকু মন্তব্যই নিরাপদ হবে যে ব্যক্তিত্বর মূল প্রলক্ষণ সংক্রান্ত এখনো কোন সর্ববাদিসম্মত তালিকা প্রস্তুত হয়নি।

৪॥ ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের বিবিধ পদ্ধতি (Different Methods of Investigating Personality): ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা (Personality Tests)

আধুনিক কালে ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে। আমরা তার মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখবো। যথা—(ক) ব্যক্তি-ইতিহাস (Case History) অনুসরণের পদ্ধতি; (খ) মূল্য-মাপক (Rating) পদ্ধতি; (গ) কাগজ-পেন্সিল ব্যবহার করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পদ্ধতি (Pencil-and-Paper Personality Measuring Devices); (ঘ) আচরণ-অভীক্ষা (Behaviour Tests); (ঙ) সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি; (চ) অবাধ অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (Free Association and Dream Analysis) পদ্ধতি; (ছ) অভিক্ষেপ (Projection) পদ্ধতি।

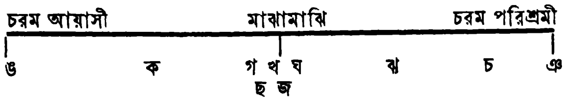
ক॥ ব্যক্তি-ইতিহাস (Case History)

ব্যক্তি-ইতিহাস পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস অনুসন্ধান করে তার ব্যক্তিত্বর উপর আলোকপাত করতে পারে এ-জাতীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা। যেমন, ব্যক্তিটির বংশ-ইতিহাস, পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতার সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার বন্ধুবান্ধব, রোগভোগ, যৌন অভিজ্ঞতা—ইত্যাদি, ইত্যাদি বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন করা। কোন ব্যক্তি সংক্রান্ত এ-জাতীয় তথ্য সার্থকভাবে সংকলিত হলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সেই ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ধারণায় উপনীত হওয়ার সুযোগ ঘটবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, তথ্যগুলি সার্থকভাবে সংকলন করার জন্যও বিশেষ নিপুণতার প্রয়োজন। একজনের জীবন-ইতিহাস সংক্রান্ত যে-কোন তথ্য এলোমেলোভাবে সংকলন করে গেলেই তা মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সহায়ক হবে না। তথ্য-সংকলনকারীর পক্ষে জানা দরকার, ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের পক্ষে কোন ধরনের তথ্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং কোন্ ধরনের তথ্য বস্তুত অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া, এ-জাতীয় তথ্য বিশেষত ব্যক্তিটির আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয় এবং

নানা কারণে তাঁদের পক্ষে নানা তথ্য গোপন করার এবং অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা থাকতে পারে এবং প্রায়ই থাকেও। তাই নির্ভুলভাবে তথ্য সংকলনের জন্য অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার প্রয়োজন হয়। এই কারণে ব্যক্তি-ইতিহাস সংগ্রহকারী কর্মীদের জন্য আজকাল বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন করা হয়।

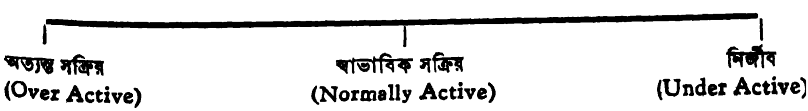
খ ॥ মূল্য-মাপক পদ্ধতি (Rating)

আমরা ইতিপূর্বে প্রফুল্লতা-বিষণ্ণতা যুগ্ম-প্রলক্ষণের আলোচনা করেছি। সেই প্রসঙ্গে দেখেছি, যদি এমন একটি সরলরেখার কল্পনা করা যায় যার এক প্রান্তে চরম প্রফুল্লতা এবং অপর প্রান্তে চরম বিষণ্ণতা তাহলে এই রেখারই কোথাও-না-কোথাও সমস্ত স্বাভাবিক ব্যক্তির অবস্থিতি নির্ণয় করা যাবে, যদিও অবশ্য দেখা যাবে অধিকাংশ সাধারণ ব্যক্তির অবস্থিতি হবে এই রেখাটিরই মোটামুটি মাঝামাঝি কোন জায়গায়। যে-পদ্ধতিতে এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একই প্রলক্ষণের কম-বেশি পরিচয় নির্দিষ্ট করা হয় তাকেই মূল্য-মাপক পদ্ধতি (Rating) আখ্যা দেওয়া হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ধরা যাক, ক, খ, গ, ঘ,…নামের দশজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখা হল আয়াসী-পরিশ্রমী যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিচয় কার মধ্যে কতোখানি এবং মূল্য-মাপক পদ্ধতি অনুসারে সেই পরীক্ষার ফলাফল নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা হল :



অর্থাৎ, এখানে দেখা যাচ্ছে আয়াসী-পরিশ্রমীর মূল্য-মাপকে ঙ নামের ব্যক্তিটি চরম আয়াসী এবং ঞ নামের ব্যক্তিটি চরম পরিশ্রমী হিসাবে অবস্থিত হল ; খ, গ, ঘ, ছ, জ নামের পাঁচজন ব্যক্তির স্থান মোটামুটি আয়াসী-পরিশ্রমীর মাঝামাঝি কোথাও ; ক নামের ব্যক্তিটির স্থান আয়াসীর দিকে, ঝ নামের ব্যক্তিটির স্থান পরিশ্রমীর দিকে ; কিন্তু ঙ বা ঞ-র মতো ক বা ঝ চরম আয়াসী বা চরম পরিশ্রমী নয়।

এ-পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশুদেরও নানা রকম ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের দিক থেকে মূল্যায়ন (Rating) সম্ভব। যেমন, একদল শিশুকে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা হল, নিম্নোক্ত রেখা দু'টিতে কার-কোথায়-স্থান :



অত্যন্ত সহযোগী (Exceptionally Cooperative)	স্বাভাবিক সহযোগী (Normally Cooperative)	অসহযোগী (Non-Cooperative)

সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুদের বিভিন্ন প্রলক্ষণের মূল্যায়ন (Rating) করা হয়। বিবিধ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের নির্ণায়ক হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন রচনা করা হল। যেমন : শিশুটি কি অন্যান্য সমবয়স্কদের জ্বালাতন (tease) করে? শিশুটি কি সক্রিয়ভাবে জিনিসপত্র পাড়বার চেষ্টা করে? শিশুটির চেহারা কি আকর্ষণীয়? ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে (বা যাঁরা শিশুদের আচরণ পরিদর্শন করে মনোবিজ্ঞানীকে তথ্য সরবরাহ করবেন তাঁদের) বলে দেওয়া হল, প্রতিটি প্রশ্ন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক শিশুর আচরণই নিম্নোক্ত সাত রকম সম্ভাবনার মধ্যে কোন একরকম সম্ভাবনার পরিচায়ক হবার কথা ; কোন্ শিশুর আচরণ কোন্ সম্ভাবনাটির পরিচায়ক তার জবাব হিসাবে সেই সম্ভাবনাটির পাশে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অভিমত প্রকাশ করে বলবেন : 'সংশয়মূলক' (Doubtful), বা, 'মোটামুটি সুনিশ্চিত' (Fairly Certain), বা, 'খুবই সুনিশ্চিত' (Very Certain)। আলোচ্য সাত রকম সম্ভাবনা হল :

১। প্রলক্ষণটির পরিচয় অনুপস্থিত (Trait Absent),
২। প্রলক্ষণটির পবিচয় অত্যন্ত ক্ষীণ (Very Slight),
৩। প্রলক্ষণটির পরিচয় ক্ষীণ (Slight),
৪। প্রলক্ষণটির পরিচয় স্বাভাবিক (Average),
৫। প্রলক্ষণটির পরিচয় সুস্পষ্ট (Marked),
৬। প্রলক্ষণটির পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট (Very Marked),
৭। প্রলক্ষণটির পরিচয় চরম (Extreme)।

স্বভাবতই একটি শিশুর দৃষ্টান্তে এই সাত রকম সম্ভাবনার মধ্যে কোন্ নির্দিষ্ট সম্ভাবনাটি কোন্ অর্থে (অর্থাৎ, 'সংশয়মূলক', বা, 'মোটামুটি সুনিশ্চিত', বা, 'খুবই সুনিশ্চিত'—এই তিন রকম অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থে) স্বীকার্য—তা জানতে পারলে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হবে শিশুটির মধ্যে আলোচ্য প্রলক্ষণের পরিচয় কতখানি। অর্থাৎ, তিনি আলোচ্য প্রলক্ষণের দিক থেকে শিশুটির ব্যক্তিত্বর মূল্যায়ন করতে পারবেন।

অবশ্যই এই মূল্য-মাপক পদ্ধতির সাহায্যে শুধুমাত্র শিশুদেরই ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের মূল্যায়ন করা হয় না ; পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদেরও বিবিধ প্রলক্ষণেরও মূল্যায়ন করা হয়।

গ॥ কাগজ-পেন্‌সিল ব্যবহার করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পদ্ধতি
(Pencil-and-Paper Personality Measuring Devices)

এই পদ্ধতি বলতে আসলে প্রশ্নোত্তর-মূলক নানা রকম ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা। এগুলিকে 'কাগজ-পেন্‌সিল ব্যবহারমূলক' আখ্যা দেবার কারণ হল, যাঁর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে তিনি (এই অভীক্ষাগুলির দৃষ্টান্তে) কাগজের উপর পেন্‌সিলের সাহায্যে উত্তর দেন। কাগজ বলতে সাধারণত ছাপানো প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষাপত্র (Test form)। উত্তর দু'রকমের হতে পারে। এক : প্রশ্নের পাশে সরাসরি 'হাঁ' বা 'না' লিখে দেওয়া। দুই : প্রশ্নে উল্লিখিত একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা চিহ্নিত করা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, অভীক্ষাগুলি আসলে কী রকম এবং এগুলির সাহায্যে ব্যক্তিত্বের কোন্ ধরনের প্রলক্ষণ পরিমাপের প্রস্তাব করা হয়।

জর্জ ওয়াসিংটন অভীক্ষা

বহুলভাবে প্রচলিত একরকম ব্যক্তিত্বর অভীক্ষার নাম 'সামাজিক বুদ্ধি সংক্রান্ত জর্জ ওয়াসিংটন অভীক্ষা' (George Washington Test of Social Intelligence)। অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলেমিশে বা তাল রেখে চলবার দক্ষতাকে সামাজিক বুদ্ধি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জনপ্রিয় ব্যক্তিরা এই অভীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। মোটের উপর সামাজিক আচরণের পাঁচ রকম বৈশিষ্ট্য এই অভীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। যথা : (১) সামাজিক পরিস্থিতি বিচার, (২) বক্তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা, (৩) অপরাপর ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করা, (৪) অন্যান্য ব্যক্তির নাম এবং চেহারা মনে রাখা, (৫) হাসিতামাসার বোধ (Sense of Humour)। কোন্ ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে এই পাঁচ রকম বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয় তাই দেখা যাক :

১। সামাজিক পরিস্থিতি বিচার :—

যাঁর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁকে বলা হল : জনৈক যুবক তার তরুণী বান্ধবীকে সিনেমা দেখাবার নিমন্ত্রণ করেছিল। সিনেমায় পৌঁছে সে আবিষ্কার করল, ভুল করে বাড়িতে মানি-ব্যাগ ফেলে এসেছে। এক্ষেত্রে যুবকটির পক্ষে কী করা সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় হবে ? [নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলির মধ্যে যেটি আপনার মতে বাঞ্ছনীয় তার পাশে টিক্ চিহ্ন দিন] :

—নিজের ঘড়ি বাঁধা রেখে ধারে টিকিট কেনা।
—ধার করবার জন্য কোন বন্ধুকে খোঁজার চেষ্টা।
—বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপন্থা নির্ণয় করা।
—কোন অজুহাতে বাড়ি ফিরে টাকা আনা।

২। বক্তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা :—

যাঁর ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হচ্ছে তাঁকে ১৮টি শব্দর একটি তালিকা দেওয়া হল প্রতিটি শব্দর সঙ্গে ১-১৮ পর্যন্ত এক একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হল। যথা (১) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, (২) নৈরাশ্য, (৩) সপ্রশংস, (৪) ভালবাসা, (৫) হিংসুটে, (৬) সন্দেহ প্রবণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাঁর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁকে বলা হল নিম্নোক্ত উক্তিগুলির বক্তাদের প্রকৃত মনোভাব কী তা উপরোক্ত শব্দগুলির থেকে একটি করে শব্দ বেছে সনাক্ত করতে হবে ; অর্থাৎ, প্রতিটি উক্তির পাশে ব্রাকেট চিহ্নিত জায়গায় উপরোক্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত শব্দর নম্বরটি বসাতে হবে। উক্তিগুলির নমুনা :—

[ ] লোকটির তাস বিলি করা দেখে তাসটা নিজে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

[ ] আর আমি কিনা এই নেমন্তন্ন বাড়ির জন্যই দিন গুণছিলাম।

৩। অপরাপর ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করা :—

যাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাঁকে বলা হল নিম্নোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে যেটি সত্যি তার পাশের T চিহ্নতে দাগ দিতে হবে, যেটি মিথ্যা তার পাশের F চিহ্নতে দাগ দিতে হবে।

T F—দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা থাকলে তাদের উভয়ের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখার জন্য তাদের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার চেষ্টা করাই ভাল।

T F—অধিকাংশ লোকই তাদের নিজেদের দোষের সরাসরি সমালোচনা পছন্দ করে।

৪। অন্যান্য ব্যক্তির নাম ও চেহারা মনে রাখা :—

যাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাঁকে প্রথমে একই জায়গায় পাশাপাশি বা ঘেঁষাঘেঁষিভাবে বসানো বারোটি মুখের ছবি দেখানো হল ; প্রতিটি মুখের সঙ্গে একটি করে নামও এই ছবির তালিকায় উল্লিখিত আছে। আধ ঘণ্টা পরে আরো অনেক বেশি সংখ্যক মুখের ছবির তালিকা তাঁকে দেখানো হল— অর্থাৎ, এই নূতন তালিকাটিতে আরো অনেকগুলি নূতন ছবির মধ্যে পুরোনো তালিকার ১২টি ছবি মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আছে। নূতন তালিকা থেকে পুরোনো তালিকার মুখগুলি চিনে বের করতে হবে এবং তাদের নামও উল্লেখ করতে হবে।

৫। হাসিতামাসার বোধ :—

যাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাঁকে প্রশ্ন করা হল নিম্নোক্ত উক্তির নিম্নোক্ত উত্তরগুলির মধ্যে কোন্ উত্তরটি সেরা রসিকতার পরিচায়ক ?

উক্তি : 'ওহে, আর কেক্ খেলে তোমার পেট ফেটে যাবে!'

উত্তর : (১) 'কেন, আগে তো আমি এতোই খেয়েছি!'

(২) 'না হে, আমার পেট বেশ মজবুত আছে।'

(৩) 'ফাটাই ভাল; তাহলে আমি আরো গিলতে পারবো!'

(৪) 'আরো কিছু কেক্ আমার দিকে বাড়িয়ে দাও এবং নিজে কেটে পড়ো।'

আল্‌পোর্ট এ.-এস্. রিয়াক্‌সান্ স্টাডি

আর একরকম বহুল প্রচলিত ব্যক্তিত্ব অভীক্ষাকে 'আল্‌পোর্ট এ.-এস. রিয়াক্‌সান্ স্টাডি' (Allport A.-S. Reaction Study) বলা হয়। এই অভীক্ষার সাহায্যে কর্তৃত্ব-সমর্পণত্ব (Ascendency-Submission, অতএব, সংক্ষেপে A.-S.) নামের যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় দু'রকম ফর্ম (form) বা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়—পুরুষদের জন্যে একরকম, মেয়েদের জন্য আর একরকম। প্রত্যেক ফর্মেই নিম্নোক্ত ধরনের নানাবিধ প্রশ্ন থাকে। যথা :—

ক। সাধারণত আপনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলতে কি—

—আপনার বয়ঃকনিষ্ঠরা ?

—আপনার বয়ঃজ্যেষ্ঠরা ?

—আপনার সমবয়সীরা ?

খ। কোন নির্বোধ জমায়েৎ-এ (party-তে) কোনমতে কিছুটা প্রাণসঞ্চার করার চেষ্টা দরকার। এ-বিষয়ে আপনার মাথায় একটা পরিকল্পনা এল। আপনি কি পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করার জন্য আগুয়ান হন ?

—প্রত্যেকবার।

—মাঝে মাঝে।

—কখনোই নয়।

প্রেসি X-O অভীক্ষা

আর একরকম ব্যক্তিত্বের অভীক্ষার নাম প্রেসি X-O অভীক্ষা (Pressey X-O Test)। এই পরীক্ষার সাহায্যে ভাবাবেগের নির্দেশ পাওয়া যায়। এই অভীক্ষার তিনটি প্রধান অংশ উল্লেখ করা যাক।

এক। যাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাঁকে নিম্নোক্ত শব্দতালিকা দেওয়া হল :

—"চোষা (suck), নীচতা (meanness), খাওয়া (eat), কুৎসিত (ugly), কালো (black)"...

এবং তাঁকে বলা হল, এই শব্দতালিকার মধ্যে যেগুলি তাঁর কাছে অপ্রীতিকর সগুলি পেন্‌সিল দিয়ে কেটে দিতে। তারপর, দ্বিতীয় দফায় তাঁকে আবার বলা

হল, এই শব্দতালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করতে এবং এর মধ্যে যে-শব্দ তাঁর কাছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর সেটির চারপাশে পেন্‌সিল দিয়ে গোল করে দাগ দিতে।

দুই। তাঁকে আর একরকম শব্দতালিকা দেওয়া হল; তাতে পর পর কয়েকটি পংক্তি হিসাবে শব্দগুলি সাজানো। প্রতি পংক্তিরই সবচেয়ে বাঁ দিকের শব্দটি বড়ো হরফে ছাপা; তার পরের শব্দগুলি ছোট হরফে ছাপা। যেমন :—

মেয়ে	স্বাস্থ্য	দেহগঠন	অন্যায়	নরম	ওঠা
ডাক্তার	চীৎকার	নবজাত	মাথা	বিক্রি	দুর্নীতি

তাঁকে বলা হল, প্রতি পংক্তিতে বাঁ দিকের বড় হরফের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের ছোট হরফের যে-শব্দগুলির সম্পর্ক বা অনুষঙ্গ (association) বর্তমান সেগুলি পেন্‌সিল দিয়ে কেটে দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় দফায় তাঁকে বলা হল, প্রতি পংক্তি পুনর্বিবেচনা করে পংক্তিটির বাঁ দিকের বড় হরফের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের ছোট হরফের শব্দগুলির মধ্যে যে-নির্দিষ্ট শব্দটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ (association) বর্তমান সেই নির্দিষ্ট শব্দটির চারপাশে পেন্‌সিল দিয়ে গোল চিহ্ন করে দিতে হবে।

তিন। যাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাঁকে কতকগুলি শব্দতালিকা দেওয়া হল। যথা :—

ভিক্ষাচাওয়া	দিব্বিগালা	ধূমপান করা	ফষ্টিনষ্টি করা	থুতু ফেলা
ময়লা	কুঁড়ে	আত্মম্ভরী	দুর্ধর্ষ	অশ্লীল

প্রথম দফায় তিনি প্রতিটি শব্দতালিকা থেকে তাঁর অভিরুচিমতো অন্যায়সূচক সমস্ত শব্দ পেন্‌সিল দিয়ে কেটে দেবেন। দ্বিতীয় দফায় প্রতিটি শব্দতালিকা পুনর্বিবেচনা করে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-নির্দিষ্ট শব্দ তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অন্যায়সূচক সেই নির্দিষ্ট শব্দটির চারপাশে পেন্‌সিল দিয়ে গোল চিহ্ন দেবেন।

রুট্‌-এর অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত অভীক্ষা

আধুনিক কালে অনেকেই বলেন, ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ্ম-প্রলক্ষণ হল অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত (Introversion-Extraversion)। এই যুগ্ম-প্রলক্ষণ পরিমাপের উদ্দেশ্যে আজকাল বহুলভাবে প্রচলিত একটি অভীক্ষাকে 'রুট্‌-এর অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত অভীক্ষা' (Root's Introversion-Extraversion Test) আখ্যা দেওয়া হয়। অভীক্ষাটির বিবরণ দেখার আগে 'অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত' নামে উল্লিখিত যুগ্ম-প্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ পরিচয় বাঞ্ছনীয় হবে।

অন্তর্বৃত্তত্ব-বহির্বৃত্তত্ব (Introversion-Extraversion)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে য়ুঙ্ (Jung) সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন ব্যক্তিত্ব প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে : অন্তর্বৃত্ত (Introvert) এবং বহির্বৃত্ত (Extravert)। অতএব, তাঁর মতে ব্যক্তিত্বর সবচেয়ে মৌলিক প্রলক্ষণ হল অন্তর্বৃত্তত্ব-বহির্বৃত্তত্ব (Introversion-Extraversion)।

অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ ; নিজের আভ্যন্তরীণ চিন্তা-চেতনা, ভাব-আবেগ নিয়েই সে বিভোর ; পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে—বাহ্য বস্তু, পারিপার্শ্বিক, সমাজ, অপরাপর ব্যক্তি, জীবনসংগ্রাম, ইত্যাদি সম্বন্ধে—সে উদাসীন , সে তার বাঁধাধরা বা নির্দিষ্ট নীতির প্রতিই নিষ্ঠাশীল এবং ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই বেশি মনোযোগী। সে সহজে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলমেশা করে না এবং নূতন পরিবেশের সঙ্গে সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না ; অতএব সে কর্মবিমুখ ও বাস্তববিমুখ ; ধন, মান, যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা তার অল্প ; এই বাস্তববিমুখীতা ও আত্মবিহ্বলতার সমর্থনে সে অনেক সময় কতকগুলি 'আত্মরক্ষাসূচক ব্যবস্থা' (Defence Mechanism) গড়ে নেয়,—এ-জাতীয় ব্যবস্থা প্রায়ই 'অলীক কল্পনা'র (Phantasy) রূপ নেয়।

বহির্বৃত্ত ব্যক্তি বাহ্যকেন্দ্রিক—অর্থাৎ, নিজের ভাব-আবেগ কল্পনা প্রভৃতিব চেয়েও কর্মকোলাহল মুখর বহির্বিশ্বই তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ; অতএব সে বাহ্যবস্তু, পারিপার্শ্বিক, সমাজ, অপবাপর ব্যক্তি, জীবনসংগ্রাম, ইত্যাদির প্রতিই বেশি মনোযোগী ; বাঁধাধরা বা অনড় অচল কতকগুলি নীতিকে আঁকড়ে থাকার বদলে সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে চায় এবং নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব পরিবর্তে দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতে চায় ; অতএব সে বিশেষভাবে সামাজিক এবং কর্ম-উদ্দীপনা প্রবণ ; সে ধন, মান, যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাশীল ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্য, য়ুঙ্-এর মতে যদিও মনোবিকারের রোগীদের মধ্যে চূড়ান্ত অন্তর্বৃত্ত ও চূড়ান্ত বহির্বৃত্ত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ লোক বা বেশির ভাগ লোক চূড়ান্ত অন্তর্বৃত্তও নয় চূড়ান্ত বহির্বৃত্তও নয়—অর্থাৎ, বেশির ভাগ সাধাবণ লোক এই দুটি চরম প্রান্তের মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় পড়ে ; অতএব য়ুঙ্ তাদের উভয়বৃত্ত (Ambivert) আখ্যা দিয়েছেন।

য়ুঙ্ নিজে যে-অভীক্ষার উপর নির্ভর করে অন্তর্বৃত্তত্ব-বহির্বৃত্তত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস করেছিলেন তাকে বলা হয় শব্দ-অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)। এই অভীক্ষার মূল কথা হল, অভীক্ষণপাত্রকে উদ্দীপক (Stimulus) হিসাবে

পরপর একটি করে শব্দ দেওয়া হবে ; শব্দটি পেয়ে তাঁর মনে যে-ধারণা বা ভাবের উদয় হয় (অর্থাৎ, শব্দটি তাঁর মধ্যে যে-অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে) প্রতিবেদন (Response) হিসাবে তিনি তার উল্লেখ করবেন ; প্রতিক্রিয়া-কালও (Reaction Time) নির্ণয় করা হবে। য়ুঙ্গ দাবি করেছিলেন, বিভিন্ন শব্দর প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া-কালের হিসাব থেকে অভীক্ষণ পাত্রর অন্তর্বৃর্তত্ব-বহির্বৃর্তত্ব অনুমান করা সম্ভব।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে য়ুঙ্গ-প্রস্তাবিত এই শব্দ-অনুষঙ্গ অভীক্ষা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত না-হলেও নানাভাবে তার প্রভাব ও গুরুত্ব আধুনিক কালে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আমরা ইতিপূর্বে কয়েক রকম অভীক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, ব্যক্তিত্বের বিবিধ প্রলক্ষণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন অভীক্ষণপাত্রর মনে কোন্ শব্দর সঙ্গে কোন্ শব্দর অনুষঙ্গ বর্তমান তা নির্ণয় করা। কিন্তু বর্তমানে এই আলোচনা সুদীর্ঘ করার পরিবর্তে অন্তর্বৃর্তত্ব-বহির্বৃর্তত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আধুনিক কালে বহুলভাবে প্রচলিত রুট্-এর (Root) অভীক্ষার পরিচয় দেখবো।

রুট্-এর অন্তর্বৃর্তত্ব-বহির্বৃর্তত্ব অভীক্ষা (Root's Introversion-Extraversion Test)

এই অভীক্ষায় অভীক্ষণপাত্রকে পরপর নানা রকম প্রশ্ন দেওয়া হবে। প্রতি প্রশ্নেরই পাঁচটি করে সম্ভবপর উত্তরও উল্লেখ করা হবে। উত্তরগুলির মধ্যে কোন্‌টি তাঁর নিজের কাছে বিশেষ অভিপ্রেত অভীক্ষণপাত্র তা নির্বাচিত উত্তরটির পাশে পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে সনাক্ত করবেন। উত্তরগুলির মধ্যে প্রথমটি অন্তর্বৃর্তত্বর পরিচায়ক, শেষটি বহির্বৃর্তত্বর পরিচায়ক, মধ্যম বা তৃতীয় উত্তরটি উভয়বৃর্তত্বর পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। যথা :—

প্রশ্ন : ১ :

কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি কি নেতৃত্ব করতে চান ?

৫টি সম্ভব উত্তর :

—চাই ; কিন্তু আমি তা এড়িয়ে যাই।

—নেতৃত্ব করতে চাই না।

—এ-বিষয়ে কখনো বিশেষ চিন্তা করিনি।

—সামাজিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্বপদ স্বীকার করবো।

—সামাজিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করতে খুব ভাল লাগে।

প্রশ্ন : ২ :

ছুটির সময়টুকু কীভাবে কাটাতে চান ?

৫টি সম্ভব উত্তর :

—ছুটির সময়টুকু বরাবরই বই পড়ে এবং পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করে কাটাই।
—ছুটির সময়টুকু বই পড়ে এবং পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করে কাটাতে ভাল লাগে।
—ছুটির সময়টুকুকে পড়া এবং কায়িক শ্রমের কাজে ভাগ করেনি।
—ছুটির সময়টুকু কাজকর্ম বা কায়িক শ্রমে অতিবাহিত করতেই ভাল লাগে।
—ছুটির প্রায় সবটাই খেলাধুলো, শিকার প্রভৃতি নিয়ে কাটাই।

কাগজ-পেন্‌সিল ব্যবহারমূলক কয়েক রকম প্রচলিত অভীক্ষার পরিচয় দেখা গেল। এবারে ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের বাকি কয়েক রকম পদ্ধতির পরিচয় দেখা যাক।

ঘ॥ আচরণ-অভীক্ষা (Behaviour Tests)

উপরের অভীক্ষাগুলিতে দেখা গেল, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভীক্ষণপাত্র সাধারণত কী করা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করেন তারই নির্দেশ তিনি নিজে দেন। কিন্তু আর একরকম অভীক্ষা প্রস্তাবিত হয়েছে যেগুলির দৃষ্টান্তে পরীক্ষক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করেন কোন এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভীক্ষণ-পাত্র বাস্তবিকই কী করে থাকেন। অভীক্ষণপাত্রর বাস্তব আচরণ পর্যবেক্ষণমূলক এ-জাতীয় অভীক্ষাগুলিকে আচরণ-অভীক্ষা (Behaviour Tests) আখ্যা দেওয়া হয়। আচরণ-অভীক্ষার দুটি নমুনা দেখা যাক :—

১। অন্তর্বর্তিত্ব-বহির্বর্তিত্বর আচরণ-অভীক্ষা (Behaviour Test for Introversion-Extraversion) :

একদল শিশুকে যাদুঘর দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। যাদুঘর ঘুরে দেখবার সময় প্রত্যেক শিশুর আচরণের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা হল : সে কোন্ পথ দিয়ে ঘুরছে, প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সে কতক্ষণ করে মনোযোগ দিচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যে-শিশু যাদুঘরের এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায়—একটি দর্শনীয় বস্তু থেকে আর একটির কাছে—মন্থরভাবে অগ্রসর হচ্ছে, দর্শনীয় বস্তুগুলির প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দিতে চাইছে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তার আচরণ স্বভাবতই অন্তর্বর্তিত্বর পরিচায়ক হবে ; কেননা তার আচরণ থেকে বহির্জগৎ এবং বাহ্য পরি-বেশের প্রতি উদাসীনতাই অনুমিত হবে, অতএব অনুমিত হবে তার আত্মবিহ্বলতা। অপরপক্ষে, যে-শিশু বিভিন্ন দর্শনীয় বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ প্রদর্শন

করছে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চটপট যাতায়াত করছে, একটি দর্শনীয় বস্তুর কাছে ফিরে এসে সেটি আবার নূতন করে পরীক্ষা করছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তার আচরণ স্বভাবতই বহির্বর্তিত্বর পরিচায়ক হবে।

আচরণ পরিদর্শন করে অন্তর্বর্তিত্ব-বহির্বর্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য এ-জাতীয় আরো নানা অভীক্ষা প্রস্তাবিত হয়েছে।

২। সাধুত্বর অভীক্ষা (Honesty Test) :

একই কাগজের উপর ছোট-বড় মাপের অনেকগুলি গোলক বা বৃত্তের (circle) ছবি ছাপানো হল। অনেকগুলি শিশুকে এ-জাতীয় ছাপা কাগজ পরীক্ষা করে দেখতে দেবার পর তাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বলা হল আন্দাজে যতোগুলি সম্ভব গোলকের (circle) কেন্দ্রে কোন এক নির্দিষ্ট নম্বর লেখবার চেষ্টা করতে। হিসাব করে রাখা হল, প্রকৃত চোখ বাঁধা অবস্থায় এইভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কয়টি গোলকের কেন্দ্র নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে—অর্থাৎ, অনেক শিশুর মধ্যে কেউ কম সংখ্যক গোলকের কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারছে, কেউ বেশি সংখ্যকের পারছে ; কিন্তু যে-শিশু সবচেয়ে বেশি সংখ্যকের কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারছে সে-ও আসলে মোট কয়টির পারছে। তারপর আর এক দল শিশুকে একই রকম ছাপানো কাগজ দিয়ে বলা হল, চোখ বন্ধ করে একই পদ্ধতিতে যতোগুলি গোলকের কেন্দ্র নির্ণয় করা সম্ভব তাই-ই চেষ্টা করো—অর্থাৎ, তাদের চোখ বেঁধে দেওয়া হল না, কিন্তু তারা সত্যিই চোখ বন্ধ করে এই চেষ্টা করবে, না, লুকিয়ে দেখে দেখে এই চেষ্টা করবে, সেটুকু তাদের সাধুত্বর উপরই নির্ভরশীল হবে। পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে চোখ বাঁধা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি যতোগুলি গোলকের কেন্দ্র সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল কোন শিশু যদি 'চোখ বন্ধ করে'ও তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক গোলকের কেন্দ্র সনাক্ত করছে তাহলে বোঝা যাবে যে শিশুটির আচরণ আসলে অসাধুতারই পরিচায়ক, কেননা চোখ বন্ধ করে রাখবার ভাণ করলেও সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে দেখে দেখে এই কাজ করেছে।

অবশ্য এ-জাতীয় আচরণ-অভীক্ষার নানা অসুবিধা আছে। প্রথমত, অভীক্ষাগুলির জন্য বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, ছোটদের নিয়ে এই জাতীয় অভীক্ষাগুলি সার্থক হলেও পরিণত বয়সের ব্যক্তিরা প্রায়ই পরীক্ষকের 'ফন্দিটুকু ধরে ফেলেন'। তৃতীয়ত, এ-জাতীয় অভীক্ষার উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ সংক্রান্ত অনেক সময় কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যেমন :

ব্যক্তিবিশেষ হয়ত অচেনা লোকদের ঠকিয়ে আনন্দ পেতে পারে ; কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে সে সচরাচর ঠকায় না ; এক্ষেত্রে তার আচরণকে সাধারণভাবে প্রতারণাপরায়ণ বলা ঠিক হবে না।

৬। সাক্ষাৎকার (Interviews)

শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রায় সর্বত্রই সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়, যদিচ সাক্ষাৎগ্রহণকারী (Interviewer) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানী নন—উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বা এই জাতীয় কোন ব্যক্তি। মনোবিজ্ঞানীও অনেক সময় ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন—অর্থাৎ, সাক্ষাৎপ্রদানকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথনের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে চান। স্বভাবতই কলকারখানায় বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যেভাবে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন তা মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়।

মনোবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তিত্ব নিরূপণের (বা ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ নিরূপণের) উদ্দেশ্যে সন্তোষজনক সাক্ষাৎকার-পদ্ধতি পূর্ব-পরিকল্পিত প্রণালী (pre-planned) সঙ্গত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সাক্ষাৎকার-লব্ধ তথ্যগুলি নির্দিষ্ট মানের (standard) সাহায্যে বিচার্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগেই মনোবিজ্ঞানী তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করবেন এবং কোন্ প্রশ্নের পর কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তাও আগে থাকতেই স্থির করে রাখবেন। এইভাবে অগ্রসর হলে যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে তাঁদের সকলকেই মোটামুটি একইভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। সাক্ষাৎকার-লব্ধ তথ্য অনেক সময় পরিমাপক-পদ্ধতি অনুসারে বিচার করা হয়।

অবশ্য মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের অনুগামীরাও যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাকেও একরকম সাক্ষাৎকার-পদ্ধতিই বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা কোন রকম পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে রোগীকে বা সাক্ষাৎদানকারীকে প্রশ্নাবলীর সাহায্যে পরীক্ষা করেন না। তার পরিবর্তে তাঁরা 'অবাধ অনুষঙ্গ' (Free Association) পদ্ধতি অনুসরণ করে রোগীর সমস্ত বক্তব্যই শুনে যান—আপাতদৃষ্টিতে সে-বক্তব্য যতো এলোমেলো, অবান্তর এবং অর্থহীনই হোক না কেন। কিন্তু এই পদ্ধতিকে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতিরই প্রকারভেদ না-বলে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয়।

চ। অবাধ-অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (Free Association & Dream Analysis)

আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এ পদ্ধতির পরিচয় দেখবো।

ছ। অভিক্ষেপ-পদ্ধতি (Projective Methods)

ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের একরকম পদ্ধতিকে 'অভিক্ষেপ-পদ্ধতি' আখ্যা দেওয়া হয় কেননা এগুলির সাহায্যে অভীক্ষণপাত্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নিজে ব্যক্তিত্ব অভিক্ষেপণ (project) করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সমর্থকের দাবি করেন, ব্যক্তিবিশেষ এ-ভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নিজের ব্যক্তি অভিক্ষেপণ করলে সেই ব্যক্তিত্বর প্রকৃত গভীর পরিচয়টি (depth of the personality) উদ্ধার করা সম্ভব। সম্প্রতিকালে নানা রকমের অভিক্ষেপ-পদ্ধতি প্রস্তাবি হয়েছে; সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বহুলভাবে প্রচলিত বলতে দু'টি। যথা : (১ রোর্‌শাক্ (Rorschach) প্রস্তাবিত অভীক্ষা, (২) 'কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষ (Thematic Apperception Test)। এই পদ্ধতি দু'টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখ যাক।

১। রোর্‌শাক্ অভীক্ষা (Rorschach Tests)

অভীক্ষণপাত্রকে পরপর দশটি 'কালির ছাপ' (Ink blots) দেখানো হয় অর্থাৎ, এই দশটি ছাপের মধ্যে এক এক বার তাঁকে একটি করে ছাপ দেখানো হ এবং কোন্ ছাপটির পর কোন্‌টি দেখানো হবে তারও বাঁধাধরা ব্যবস্থা আছে। প্রতি ব্যক্তিকেই যদিও একই কালির ছাপ দেখানো হয় (অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে বাঁধাধর দশটি কালির ছাপই ব্যবহার করা হয়) তবুও ছাপগুলি আসলে কোন ছবি নয়— অর্থহীন ছাপমাত্র : ব্লটিং কাগজে খানিকটা কালি ঢেলে কাগজটা ভাঁজ ক নিলে যে-রকম ছাপ পড়ে সেই রকমই। কিন্তু ছাপগুলি প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হলে অভীক্ষণপাত্রকে প্রশ্ন করা হয় : এগুলিতে কী দেখছেন ? বা, এগুলি কিসে ছবি বলে মনে হচ্ছে ? ছাপগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেওয়া হয়।

একই কালির ছাপে বিভিন্ন ব্যক্তি অবশ্যই বিভিন্ন বিষয় "দেখে" থাকেন তাঁদের উত্তরগুলি মোটের উপর তিন দিক থেকে বিচার করা হয়। যথা :

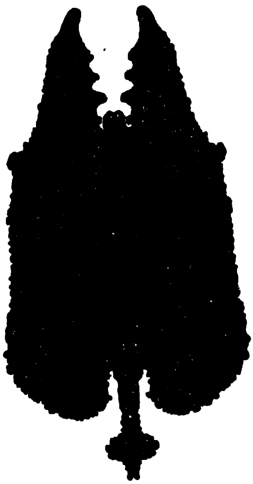
(১) অভীক্ষণপাত্র পুরো ছাপটিকে বর্ণনা করছেন, না, ছাপটির অংশবিশেষ বর্ণন করছেন, বা ছাপের কোন্ অংশটুকুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করছেন

(২) তাঁর বর্ণনাটি ছাপের রং বা গড়ন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কিনা।

(৩) ছাপের মধ্যে তিনি ঠিক কী বিষয়বস্তু কল্পনা করছেন ?—মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, শরীরের অংশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, নানা বিষয়বস্তু নানা ব্যক্তি একই ছবিতে কল্পনা করে থাকেন।

এই পদ্ধতির সমর্থকেরা দাবি করেন, অর্থহীন কালির ছাপগুলিতে ব্যক্তিবিশেষ "যা দেখছেন" তা আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বর অভিক্ষেপণ (Projection) মাত্র ; এবং উপরোক্ত তিন দিক থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়াকে বিচার করলে এই ব্যক্তিত্বর পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে আলোচ্য পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি কালির ছাপ মুদ্রিত করা হল। দু'জন অভীক্ষণপাত্র এই একই কালির ছাপের প্রতি দু'রকম প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছেন। একজন বলছেন, "এটা আসলে হল একজোড়া বুড়ি ডাইনীর ছবি, ডাইনী দুটো পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। গুটিপোকারা যে-রকম গুটির মধ্যে থাকে ডাইনী দুটোও সেই রকম ভাবে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে!" অপর একজন বলছেন, "এটা হল একটা মরা পাখীর মাথা: উপরের হাঁ করা দিকটা হল পাখীর ঠোঁট, তার মধ্যেকার কাঁক্‌রা-কাটা জায়গাটা পাখীর দাঁত। তলায় গোলমতো যে-অংশটা ঝুলছে ওটা ছুরির বাঁটের মতো। মাঝ বরাবর যে-কালো দাগটা চলেছে ওটা হল ছুরিটার ফলা। পাখীর খুলিটা যেন চেপ্‌টে থ্যাব্‌ড়া করে দেওয়া হয়েছে।"



অতএব দেখা যাচ্ছে, একই কালির ছাপে দুই ব্যক্তি দু'রকম বিষয় "দেখতে" পাচ্ছেন এবং প্রথম ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে ছাপটাতে তাঁর বিষয়বস্তু কল্পনা করছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাপটার বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে করে দেখছেন এবং তার মধ্যে আলাদা আলাদা বিষয়ের কল্পনা করছেন। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি একই ছাপকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করবেন, বা, একই ছাপের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় কল্পনা করবেন। পদ্ধতিটির সমর্থকেরা দাবি করেন, এ-জাতীয় বিভিন্ন কল্পনার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বর 'অভিক্ষেপন' (projection) ঘটে ; অতএব

কল্পনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁদের ব্যক্তিত্বর সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্বর এ-জাতীয় নিদর্শন হিসাবে নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

অভীক্ষাটির সমালোচনায় অন্যেরা বলেন, একই ছাপের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার জন্য অভীক্ষার সমর্থকেরা কোন নির্দিষ্ট মান নির্ণয় করতে পারেননি ; ফলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এ-জাতীয় প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই কারণে অভীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন।

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষা (Thematic Apperception Test)

অভীক্ষণপাত্রকে পরপর অনেকগুলি ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলি দু'টি শ্রেণীতে বিভক্তভাবে দেখানোর ব্যবস্থা, প্রতি শ্রেণীতে দশটি করে ছবি থাকে। অভীক্ষণ-পাত্র প্রত্যেকটি ছবির ব্যাখ্যা দেবেন। ছবিগুলি এমনভাবে আঁকা যে প্রত্যেকটিরই নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে এবং প্রতি ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিত্বর বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক ছবির এক একরকম ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেন। ব্যাখ্যাগুলি কাহিনী জাতীয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতি ব্যক্তি এক একটি ছবিতে এক একটি কাহিনী বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এইজন্য অভীক্ষাটিকে 'কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষা' (Thematic Apperception Test) আখ্যা দেওয়া হয়। সর্বশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে অভীক্ষণপাত্রকে বস্তুত কোন ছবি দেখানো হয় না ; ছবির বদলে দেখানো হয় একটি ফাঁকা বা সাদা কার্ড। এবং অভীক্ষণপাত্রকে বলা হয়, এই সাদা কাগজে আপনি যে-কোন কাহিনীর ছবি কল্পনা করুন এবং তা সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

অভীক্ষাটির সমর্থকেরা দাবি করেন, বিভিন্ন ছবিতে বর্ণিত কোন চরিত্রের সঙ্গে অভীক্ষণপাত্র সাময়িকভাবে একাত্মতা (Identity) স্থাপন করেন। অতএব, তিনি চিত্র-বর্ণিত চরিত্রটির উপর নিজের ব্যক্তিত্বর অভিক্ষেপণ করেন। ফলে, বিভিন্ন ছবি দেখতে দেখতে তাঁরা যে-সব কাহিনীর অবতারণা করেন সেগুলির মধ্যে তাঁদের নিজেদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, ব্যর্থতা-সাফল্য প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। স্বভাবতই এই কাহিনীগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁদের ব্যক্তিত্বর সুগভীর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

এ-জাতীয় ছবির দু'টি নমুনা দেখা যাক। পাশের ছবিতে পিছন দিকে জনৈকা বৃদ্ধা, সামনের দিকে জনৈকা তরুণী ; চিবুকে হাত রেখে বৃদ্ধা কী যেন ভাবছে। ছবিটির অর্থ কী ? ছবিটির মধ্যে কোন্ কাহিনীর ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে ? এই

প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করবেন। বৃদ্ধার সঙ্গে একাত্মভাব স্থাপন করে কেউ হয়ত বলবেন, তরুণীর দিকে চেয়ে বৃদ্ধা নিজের জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করছেন। তরুণীর সঙ্গে একাত্মবোধ স্থাপন করে অপর ব্যক্তি হয়ত বলবেন, তরুণীটি বৃদ্ধার কঠিন শাসনে আবদ্ধ আছে; অতএব সে মনে-মনে এই শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। দুই ব্যক্তির পক্ষে একই ছবিতে এ-জাতীয় দু'টি কাহিনীর কল্পনা থেকে অনুমান করা হবে, প্রথম ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম গভীর ব্যর্থতা বোধের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে কোন একরকম বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।



আর একটি ছবির দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ছবিটি দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বলা হল, "এমন এক কাহিনী রচনা করুন ছবিটি যে-কাহিনীকে রূপ দিচ্ছে। ছবিতে যে-ঘটনা দেখছেন তার কারণ কী, চিত্রিত চরিত্রটি কী ভাবছে, কোন্ ধরনের ভাবাবেগ তার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত এই তরুণীটির ভাগ্যে কী ঘটবে—সমস্ত কথা সবিস্তারে বলুন।" বিভিন্ন ব্যক্তি এই ছবি দেখে বিভিন্ন উত্তর দেবেন। নমুনা হিসাবে মনোবিজ্ঞান-ক্লাসের চারজন ছাত্রছাত্রী প্রদত্ত চারটি উত্তর এখানে উল্লেখ করা যাক। যথা :—

এক : মেয়েটির গা-গুলিয়ে উঠেছে। হয়ত মেয়েটি এমন কিছু খেয়েছে যার ফলে তার বমি পাচ্ছে। কিংবা, হয়ত তার জীবনে কোন একরকম আশাভঙ্গই এই অবস্থার কারণ। যাই হোক, মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়বে।

দুই : মেয়েটি ভয়ানক এক অন্যায় করে বসেছে এবং সে-কথা তার মাকে বলতে হবে ; ফলে তার এই দুরবস্থা। মেয়েটিকে ওর মা খুবই বিশ্বাস করতো ; মার সেই বিশ্বাসভঙ্গ করবার ফলেই মেয়েটি নিজে এ-ভাবে ভেঙে পড়েছে।

তিন : মেয়েটির অবস্থা ছিল নেহাতই দরিদ্র ; অনেক চেষ্টায় সে তার সাধারণ সঙ্গীদের চে বড়ো হয়েছিল ; কিন্তু মেয়েটি শেষ পর্যন্ত দেখলো সামাজিক চাপে আবার তাকে দারিদ্র্যে অবস্থাতেই ফিরতে হয়েছে।

চার : রাগের মাথায় মেয়েটি তার স্বামীকে খুন করে ফেলেছে ; কিন্তু এখন তার হুঁস ফিরে এবং অনুতাপের বশে নিজে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থ করেছে।

অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন ছবির ব্যাখ্যা উদ্ভাবন প্রসঙ্গে একই ব্যক্তি বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আত্মহত্যা, বিরোধ, আশাভঙ্গ, ব্যর্থ প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি



ধারণা উল্লেখ করছেন অভীক্ষাটির সমর্থকের দাবি করে, ব্যক্তিবিশে এইভাবে তাঁর নিজে অন্তর্নিহিত কোন গভী বাসনার বা আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা-বিহ্বলতা ইংগিত দিয়ে থাকে যদিও তিনি নিজে সে বিষয়ে সচেতন নন কিন্তু অভীক্ষাটির সম লোচকদের প্রধানত আপত্তি এই অভীক্ষাটির বিশ্লেষ অংশে (অর্থা উপাখ্যানগুলি বিশ্লেষ করে ব্যক্তিত্ব নিরূপণে সময়) মনোবিজ্ঞানীরা কোন নির্দিষ্ট মান (Standard) অনুসরণ করেন না। ফ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

আধুনিককালে আরো নানা রকম অভিক্ষেপ-পদ্ধতি (Projective Method প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলিই মোটের উপর উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির মতই বিভিন্ন ব্যক্তিকে নানা রকম ছবি, গল্প প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয় এবং সে ব্যাখ্যা অবলম্বন করে তাঁদের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত নানা রকম সিদ্ধান্ত করা হয়।

॥ ব্যক্তিত্বর উপাদান (Factors of Personality)

প্রশ্ন হল: ব্যক্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করে, কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? উত্তরে প্রধানত দু'রকম উপাদানের উল্লেখ করা প্রয়োজন—(১) দৈহিক ও জৈব, (২) সামাজিক। অবশ্য এই দ্বিবিধ উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেকে দৈহিক (ও জৈব) উপাদানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন; যেমন অনেকে দাবি করেন ব্যক্তিত্ব মূলত এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির উপরই নির্ভরশীল। অন্যেরা আবার সামাজিক বা পারিপার্শ্বিকের উপরই প্রায় ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণ করতে চান; তাঁদের মতে সামাজিক প্রভাব দ্বারাই ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্যই কোন একরকম উপাদানের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপণের পরিবর্তে—কিংবা, তুলনামূলকভাবে কোন্ উপাদানের গুরুত্ব বেশি সে-বিচারে প্রবৃত্ত হবার পরিবর্তে—উপরোক্ত দ্বিবিধ উপাদানেরই গুরুত্ব স্বীকার করাও সম্ভব। আমরা মোটের উপর এই তৃতীয় মতটি অনুসরণ করেই ব্যক্তিত্বর দ্বিবিধ উপাদানের আলোচনা করবো।

৬॥ ব্যক্তিত্বর দৈহিক ও জৈব উপাদান (Physiological and Biological Factors of Personality)

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যক্তির চেহারা,—তার দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য, গায়ের রং, ইত্যাদি—অপরের প্রতি তার আচরণ এবং তার প্রতি অপরের আচরণও প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, দেহের বাহ্য বৈশিষ্ট্যের কথাও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়। কিন্তু শরীরের এ-জাতীয় বাহ্য বৈশিষ্ট্যের চেয়েও আভ্যন্তরীণ সর্তের উপরই ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি গভীরভাবে নির্ভর করে। অনেক সময় অবশ্য বহির্জগৎ থেকে বিবিধ উপাদান শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শরীরের ভিতর এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন পানীয়, খাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। মদ্য পান করলে শরীরের অভ্যন্তরে যে-পরিবর্তন ঘটে তার ফলে অন্তত সাময়িকভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশেষ পরিবর্তিত হয়। তেমনি, শরীরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনের অভাব ঘটলে মানুষের আচরণ শ্লথ, নির্জীব এবং প্রায়ই খুব অল্পে উত্তেজনা-প্রবণ হতে পারে। উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় উঠবার সময় বা বিমানযোগে আকাশের খুব উঁচুতে উঠলে শরীরের মধ্যে অক্সিজেন্ সরবরাহের বিশেষ অভাব ঘটে। ফলে আচরণেও গভীর ও মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়—অর্থাৎ, পরিবর্তিত হয় ব্যক্তিত্ব।

এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ব্যক্তিত্বর উপ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে,—যদিও এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি সরাসরিভা বহির্জগৎ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ব্যক্তিত্বর উপর বিশেষ প্রভাবশীল শরীরে অন্যান্য অনেক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণ শরীরের মধ্যেই অবস্থিত। কেনন শরীরের ভিতরই নানা রকম রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন হয় এবং এই রাসায়নি পদার্থগুলি রক্তের সঙ্গে শরীরময় পরিচালিত হয়ে আমাদের আচরণকে বিশেষভা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে থাকে।

শরীরের অভ্যন্তরে এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলিতে (Endocrine Glands) এ রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। অতএব, এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির উপর আমাদে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর শারীরিক সর্ত বলতে প্রধানত এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি ও সেগুলির প্রক্রিয়া।

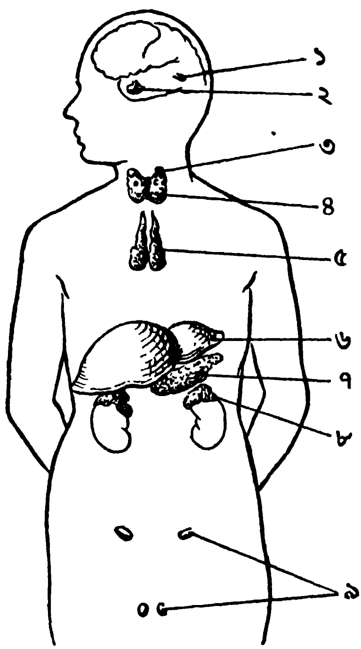
৭ ॥ এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি (Endocrine Glands) ও হর্মোন (Hormone)

শরীরের প্রধান এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির নাম এবং শরীরের কোথায় কোথা সেগুলির অবস্থিতি তার পরিচয় পরের পৃষ্ঠার ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে। এগুলি বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

শরীরের সমস্ত গ্রন্থিকেই সাধারণভাবে কলকারখানার সঙ্গে তুলনা করা যে পারে। কলকারখানায় কাঁচা মাল থেকে নানা রকম পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় কাপড়ের কারখানায় তুলো থেকে উৎপাদিত হয় কাপড। খানিকটা একইভা শরীরের গ্রন্থিগুলিতে কাঁচা মাল হিসাবে রক্ত থেকে সংগৃহীত হয় নানা রক রাসায়নিক পদার্থ, এবং সেই রাসায়নিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় নূতন ধরনে রাসায়নিক পদার্থ। যেমন, আমাদের চোয়ালের কাছে একরকম গ্রন্থি আছে সেগুলিকে 'লালা গ্রন্থি' (Salivary Glands) বলে। রক্ত-প্রবাহ থেকে কয়ে রকম রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার ক এই গ্রন্থিগুলি লালা (Saliva) নামের নূতন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। লা গ্রন্থি থেকে সেই লালা আমাদের মুখের মধ্যে সরবরাহ হয়।

শরীরের সমস্ত গ্রন্থির কাজ এইভাবে কলকারখানার কাজের সঙ্গে তুলনী হলেও গ্রন্থিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (১) নালিযুক্ত গ্রন্থি (Gland with Ducts) এবং (২) নালিবিহীন গ্রন্থি (Ductless Glands) বা এণ্ডোক্রিন্ গ্রা (Endocrine Glands)। নালিযুক্ত গ্রন্থির নাম থেকেই বোঝা যায়, এগুলি

ঙ্গে নালি (Duct) সংযুক্ত থাকে; ফলে এ-জাতীয় গ্রন্থিতে যে-পদার্থ উৎপন্ন হয় তা গ্রন্থি-সংলগ্ন নালি দিয়ে শরীরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে পরিবাহিত হয়। যেমন, লালা-গ্রন্থিতে উৎপন্ন লালা গ্রন্থি-সংলগ্ন নালি দিয়ে মুখের মধ্যে পরিবাহিত হয়, শরীরের অন্য কোন স্থানে যায় না। কিন্তু নালিবিহীন বা এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির সঙ্গে এরকম নালি সংযুক্ত নয়; ফলে এ-জাতীয় গ্রন্থিতে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থ শরীরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরিবাহিত হয় না। তার পরিবর্তে এই পদার্থ সরাসরি রক্তস্রোতের মধ্যেই প্রত্যর্পিত হয়। অর্থাৎ, এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলি শরীরের ভিতরে প্রবহমান রক্ত থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করে, তা থেকে নূতন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে এবং এই নূতন রাসায়নিক পদার্থকে রক্তস্রোতের মধ্যেই প্রত্যর্পণ করে। মনে রাখা দরকার, শিরা-উপশিরা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত সর্বদাই শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পরিবাহিত হয় এবং এই পরিবহণের বেগ অত্যন্ত দ্রুত। ফলে, রক্তস্রোতের মধ্যে কোন পদার্থ মিশ্রিত হলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সেই পদার্থটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে যাবে। হিসাবে দেখা গিয়েছে, শরীরের যে-কোন অঙ্গ থেকে রক্তস্রোতের মধ্যে কোন পদার্থ সরবরাহ হলে প্রায় পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই পদার্থটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।



শরীরের বিভিন্ন এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি

১ : পিনিয়াল (Pineal),
২ : পিটুইটারি (Pituitary),
৩ : থাইরইড্ (Thyroid),
৪ : প্যারাথাইরইড্ (Parathyroid),
৫ : থাইমাস্ (Thymus),
৬ : লিভার (Liver),
৭ : প্যান্ক্রিয়াস্ (Pancreas),
৮ : অ্যাড্রিনাল (Adrenal),
৯ : যৌন-গ্রন্থি (Gonad)—স্ত্রী-অঙ্গে ওভারি (Ovaries) এবং পুরুষ-অঙ্গে শুক্রাশয় (Testes)।

এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলিতে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি রক্তস্রোতের মধ্যে প্রত্যর্পিত হয় বলেই অত্যন্ত অল্প সময়ের ভিতর তা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে পৌঁছে যায়। এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থগুলি

সাধারণত অত্যন্ত শক্তিশালী; অর্থাৎ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সেগুলির বিশেষ প্রভাব আছে। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় হর্মোন (Hormone) —গ্রীক ভাষায় উত্তেজক সূচক শব্দ থেকে নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। শরীরে বিভিন্ন এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি থেকে ভিন্ন ভিন্ন হর্মোন উৎপাদিত হয়—অনেক সময় একই এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের হর্মোন উৎপাদিত হয়। এই সব নানা রকম হর্মোন রক্তস্রোতের মাধ্যমে শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পরিবাহিত হয়ে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে—এবং অনেক সময় সামগ্রিকভাবে পুরো শরীরে—গভীর পরিবর্তন সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্যান্‌ক্রিয়াস্-এর (Pancreas) কথা উল্লেখ করা যাক। এটি একাধারে নালিযুক্ত গ্রন্থি এবং এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির কাজ করে। অর্থাৎ, এটি থেকে দু'রকম রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। একরকম পদার্থকে বলে 'প্যান্‌ক্রিয়াস্ জুস্'; এটি হর্মোন নয়—প্যান্‌ক্রিয়াস্-সংযুক্ত নালি দিয়ে এটি অন্ত্রে (Intestine) পরিচালিত হয়ে খাদ্যাদি হজমের (Digestion) সহায়তা করে। কিন্তু এই প্যান্‌ক্রিয়াস্ থেকেই একরকম হার্মোন-ও উৎপন্ন হয়। তার নাম ইন্‌সুলিন (Insulin)। এই হর্মোন সরাসরি রক্তস্রোতের মধ্যে মিশে যায় এবং অচিরেই রক্তস্রোতের মাধ্যমে তা শরীরের সমস্ত পেশিতে সরবরাহ হয়। পেশিগুলির ক্রিয়ার জন্য চিনি (বা শর্করা জাতীয় পদার্থ: sugar) দহন হওয়া (burn বা oxidize) প্রয়োজন। অর্থাৎ, চলতি কথায়, রক্ত থেকে পাওয়া 'চিনি পুড়িয়ে' পেশিগুলির কর্মক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান হয়—যেমন কয়লা পুড়িয়ে এঞ্জিনের জন্য যোগান হয় শক্তির। অতএব, পেশিগুলির সক্রিয়তার পক্ষে চিনির দহন অপরিহার্য। এবং এই 'চিনি পোড়ানো'র জন্য ইন্‌সুলিনের প্রয়োজনও অপরিহার্য। প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থিতে ইন্‌সুলিন উৎপাদনের ঘাটতি হলে রক্তে চিনি জমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা কিড্‌নি (Kidneys) দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়: শরীরের এই অবস্থাকেই ডাইবেটিস (Diabetes) রোগ বলে। অতএব বোঝা যায়, প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থিতে ইন্‌সুলিন নামের হর্মোন উৎপাদনের তারতম্য সামগ্রিকভাবে শরীরের অবস্থাকে—অতএব ব্যক্তির আচরণকেও—বিশেষ প্রভাবিত করে। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার পক্ষে যে-পরিমাণ ইন্‌সুলিন উৎপাদনের প্রয়োজন প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি থেকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ইন্‌সুলিন উৎপন্ন হলে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও উদ্বেগপ্রবণ হয়ে পড়ে; ইন্‌সুলিন উৎপাদন আরো বেশি হলে প্রবল মানসিক অশান্তি এবং শেষ পর্যন্ত প্রলাপ ও অচৈতন্য অবস্থা সৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে, এই হর্মোনটির ঘাটতি হলেও নানা রকম অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আকারের দিক থেকে এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলি অবশ্যই খুব ছোট, শরীরের অন্যান্য
র তুলনায় নগণ্যই। কিন্তু এগুলিকে শরীরের নানা স্থানে অবস্থিত বিশেষ
শালী 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা' বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্বর আলোচনায়
'কারখানাগুলি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এগুলিতে উৎপন্ন নানা
র হর্মোন আমাদের আচরণকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকটির
চয় দেখা যাক।

ক ॥ থাইরইড্ গ্রন্থিদ্বয় (Thyroid Glands)

থাইরইড্ থেকে উৎপন্ন হর্মোনের নাম থাইরক্সিন্ (Thyroxin)। রাসায়নিক
ষণের ফলে দেখা গিয়েছে, এই হর্মোনের বিশেষ উপাদান হল আইয়োডিন্
line)। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল থেকে শরীরে সূক্ষ্ম পরিমাণে
ইয়োডিন্ সংগৃহীত হয়; থাইরইড্ গ্রন্থিদ্বয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও
ইট্রোজেনের সঙ্গে এই আইয়োডিনের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে যে নূতন
ায়নিক মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করে তারই নাম থাইরক্সিন্। তাই যে-সব
লের পানীয় জলে আইয়োডিনের অভাব সেই অঞ্চলের লোকদের শরীরে
য়াজনীয় পরিমাণ থাইরক্সিন্ উৎপাদিত হয় না; আধুনিক চিকিৎসকেরা এ-
তীয় অঞ্চলের লোকদের জন্য লবণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আইয়োডিন্ যোগ করেন।
দেহ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য দেহাভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে 'বিপাক'
'মেটাবলিস্‌ম্' (Metabolism) আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ
ত্বপূর্ণ দিক হল অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্ নিষ্ক্রমণ।
টাবলিস্‌ম্' বিশেষত থাইরইড্ গ্রন্থি উৎপন্ন থাইরক্সিনের উপর নির্ভর করে:
ইরইড্ গ্রন্থির কাজ শ্লথ হলে মন্দীভূত হয় মেটাবলিস্‌ম্: শরীরে অক্সিজেন
ণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড্ নিষ্ক্রমণ কমে যায়। থাইরইডের কাজ মাত্রাতিরিক্ত
ল মেটাবলিস্‌ম্ অত্যন্ত বেড়ে যায়।

থাইরইডের ক্রিয়া অত্যন্ত বেশি হলে ব্যক্তিটির আচরণ অত্যন্ত ছটপটে,
টখিটে, উদ্বেগগ্রস্ততা ও অস্থিরতার পরিচায়ক হয়। ব্যক্তিটির যদি 'বাড়ের বয়েস'
কে তাহলে তার শরীরের বাড় খুব বেশি হয়—বিশেষত তার দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক
। কিন্তু তার 'মানসিক বয়স' (Mental Age) বা বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) আনুপাতিক-
াবে বাড়ে না।

থাইরইড্ গ্রন্থি ধ্বংস বা নষ্ট বা রোগগ্রস্ত হলে ব্যক্তিটির স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতা
াস পায়; তার পেশী ও মস্তিষ্কর জড়তা দেখা দেয়। ব্যক্তিটি তখন জবুথুবু

হয়ে পড়ে, তার আচরণ নির্বোধের মতো হয়। জন্ম-সময় থেকে থাইরইড্ গ্রন্থির অসুস্থতা থাকলে শরীরের বাড় এবং বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হয়। এরই চরম দৃষ্টান্ত হল 'বামন' (Cretin): বয়স-বৃদ্ধি সত্ত্বেও শরীর-বৃদ্ধি ও বুদ্ধি-বিকাশের বিশেষ অভাব এই বামনদের মধ্যে দেখা যায়।

কিন্তু এ-জাতীয় চরম দৃষ্টান্তের কথা বাদ দিলেও থাইরইড্ গ্রন্থির সক্রিয়তার হ্রাস-বৃদ্ধির উপরই অনেক সময় সক্রিয়তা-নির্জীবতা নামের ব্যক্তিত্বর যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিচয় নির্ভর করে। অবশ্যই মনে রাখা দরকার, এই যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিচয় অন্যান্য কারণের উপরও নির্ভর করতে পারে। তাই এই যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিচয় থেকেই সরাসরিভাবে থাইরইড্ গ্রন্থির সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা অনুমান করা যায় না।

খ ॥ প্যারাথাইরইড্ (Parathyroids)

থাইরইড্ গ্রন্থির খুবই কাছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র চারটি এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি আছে এগুলিকে প্যারাথাইরইড্ গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থিগুলির কাজ থাইরইড্ গ্রন্থির অনেকটা বিপরীত। থাইরইড্ গ্রন্থির হর্মোন শরীরের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে, বা, সৃষ্টি করে শারীরিক চাঞ্চল্য ; পক্ষান্তরে প্যারাথাইরইড্ গ্রন্থির হর্মোন শরীরের শান্তভাব বজায় রাখে। এ-হর্মোনের অভাবে বা ঘাটতিতে স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ উত্তেজিত ভাব (E. citation) দেখা দেয়। আবার এ-হর্মোনের আধিক্য আচরণকে অত্যন্ত শ্লথ করে, ব্যক্তিটি কুঁড়ে বা অলস বা জবুথবু হয়ে যায়। অবশ্য প্যারাথাইরইড হর্মোনের খুব বেশি ঘাটতি বা অভাবের দৃষ্টান্ত তুলনায় কম।

গ ॥ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal Glands)

প্রতিটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির প্রধানত দু'টি করে অংশ : (১) বাইরের দিকের অংশ (খোসা, bark, cortex), (২) ভিতর দিকের অংশ (শাঁস, pith, marrow গড়ন ও প্রক্রিয়া উভয় দিক থেকেই দু'টি অংশের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান—বস্তুত এই দুই অংশকে দু'রকম স্বতন্ত্র এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে। বাইরের বা খোসার দিকের অংশ থেকে যে-হর্মোন উৎপন্ন হয় তার নাম কর্টিন (Cortin) ভিতর বা শাঁসের অংশ থেকে উৎপন্ন হর্মোনকে বলে অ্যাড্রিনিন্ (Adrenin)।

অ্যাড্রিনিন্ অত্যন্ত শক্তিশালী হর্মোন। রক্তের মধ্যে যৎসামান্য পরিমাণে এই হর্মোন মিশলে নিম্নোক্ত ফলাফল দেখা দেয় :—

বুক ধড়ফড় করে (অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত জোরে ও দ্রুতভাবে সক্রিয় হয়),

রক্ত-চাপ (Blood pressure) খুব বেড়ে যায়,

পাকযন্ত্রর (Stomach এবং Intestine-এর) কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়,

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়,

লিভারে সংরক্ষিত চিনি (Sugar) রক্তর মধ্যে বেশি পরিমাণে সরবরাহ হয়,

পেশী সহজে ক্লান্ত হয় না,

ঘাম দেয়,

চোখের তারারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়।

আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৬-৮৮ দ্রষ্টব্য) 'স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র'র (Autonomic Nervous System) আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, 'সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্র'র (Sympathetic System) প্রভাবেও শরীরে উপরোক্ত ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। পার্থক্যের মধ্যে প্রধানত এই যে সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রর প্রভাবে শরীরের এ-জাতীয় পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি ঘটে এবং পরিবর্তনগুলির স্থায়িত্বও খুব দীর্ঘ হয় না; পক্ষান্তরে, রক্তে অ্যাড্রিনিন্ সরবরাহের ফলে উক্ত পরিবর্তনগুলি তুলনায় ধীরে ধীরে দেখা দেয়, কিন্তু এগুলি তুলনায় দীর্ঘস্থায়ীও হয়। অতএব, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির ভিতরাংশকে (Adrenal Medulla) সিম্প্যাথেটিক্ তন্ত্রর সহযোগী বা পরিপূরক বলা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৮) এই কথা উল্লেখ করেছি।

কর্টিন (Cortin) নামের হর্মোনটির সাহায্যে আমাদের শরীর নানা রকম জীবাণুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন করে। যক্ষ্মারোগে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির বহিরাংশ ধ্বংস হলে—অর্থাৎ, শরীরে কর্টিনের উৎপাদন বন্ধ হলে—একরকম কঠিন রোগ দেখা দেয়। রোগটির আবিষ্কারকের নাম থেকে একে 'এ্যাডিসন্‌স্ ডিসিস্' (Addison's disease) আখ্যা দেওয়া হয়। রোগটির লক্ষণ হল: শরীরের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও কাজকর্মে উৎসাহের অভাব, যৌন বাসনার অভাব, বিপাক বা 'মেটাবলিসম্'-এর ঘাটতি, নানা রকম সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা'র অসামর্থ্য। রোগীর চামড়া কালো হয়ে যায়, সে শীত ও গরম সহ্য করতে পারে না, তার অনিদ্রা (Insomnia) দেখা দেয়। তার আচরণে চিন্তাক্ষমতার হ্রাস, স্বল্পে বিরক্তিভাব এবং সহযোগীতার অভাব দেখা দেয়। কর্টিন ইন্‌জেক্‌সন দিলে এই উপসর্গগুলি দূর হয়।

শরীরে কর্টিনের সরবরাহ অতিরিক্ত হলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পুরুষালী লক্ষণ বৃদ্ধি পায়—মেয়েদের শরীরের স্বাভাবিক কমনীয়তার অভাব হয়, তাদের গলার স্বর মোটা হয় এবং এমনকি মুখে দাড়ি দেখা দেয়।

ঘ॥ যৌন গ্রন্থি (The Gonads)

পুরুষ-দেহে যৌন গ্রন্থিদ্বয়ের নাম শুক্রাশয় (Testes), নারীদেহে যৌনগ্রন্থিদ্বয়ের

নাম ওভারি (Ovaries)। এগুলির প্রধান কাজ অবশ্য জননকোষ (Reproductive Cells) উৎপাদন—শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয় শুক্রজীবাণু (Spermatozoon), ওভারি-তে উৎপন্ন হয় ডিম্বকোষ (Ovum)। কিন্তু এছাড়াও যৌন গ্রন্থিগুলিতে নানা রকম হর্মোনেরও উৎপাদন হয়—শরীরের বাড়-বৃদ্ধি এবং আচরণের উপর এই হর্মোন-গুলির বিশেষ প্রভাব বর্তমান। এ-জাতীয় হর্মোনের মধ্যে অনেকগুলিই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দেহেই উৎপন্ন হয়—স্ত্রী-সুলভ হর্মোনের প্রাধান্য হলে আচরণে মেয়েলী ভাব বাড়ে, পুরুষ-সুলভ হর্মোনের প্রাধান্যের ফলে আচরণে পুরুষালী ভাব বাড়ে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই যৌন আচরণ যৌন গ্রন্থি উৎপন্ন হর্মোনের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। অবশ্য জীবজন্তুর যৌন আচরণ যে-রকম প্রকটভাবে শুধুমাত্র যৌন হর্মোনের উপরই নির্ভরশীল মানুষের যৌন আচরণ সে-রকম নয়; কেননা মানুষের দৃষ্টান্তে সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রথাও যৌন আচরণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

৬॥ পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland)

মস্তিষ্কের মধ্যে এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্তভাবে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রন্থিকে পিটুইটারি গ্রন্থি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আকারে তুচ্ছ হলেও এটিকে সাধারণত 'মাষ্টার গ্লাণ্ড' (Master Gland) বা এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিদের প্রভু-বিশেষ বলেই বর্ণনা করা হয়। কেননা পিটুইটারি গ্রন্থিতে উৎপন্ন নানা রকম হর্মোন অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করে—অর্থাৎ, অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিদের ক্রিয়া বহুলাংশেই পিটুইটারি হর্মোনের উপর নির্ভরশীল।

পিটুইটারি গ্রন্থির প্রধানত দু'টি ভাগ। একটিকে বলে পিছনের ভাগ বা 'পস্টিরিয়ার লোব্' (Posterior Lobe), অপরটিকে বলে সামনের ভাগ বা 'এ্যান্টিরিয়ার লোব্' (Anterior Lobe)। পিটুইটারি গ্রন্থির এই সামনের ভাগ বা 'এ্যান্টিরিয়ার লোব্' থেকে উৎপন্ন হর্মোন (অর্থাৎ, 'এ্যান্টিরিয়ার-পিটুইটারি হর্মোন') থাইরইড্, যৌন গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স্ এবং সম্ভবত অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির কাজও নিয়ন্ত্রিত করে; উক্ত হর্মোনের অভাবে অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধিও হয় না, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাও দেখা দেয় না। তাছাড়া, পিটুইটারি গ্রন্থির এই ভাগটির উপরই সাধারণ দেহবৃদ্ধিও বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিশু বয়সে এইটি থেকে অত্যধিক পরিমাণে হর্মোন উৎপন্ন হলে শরীরের অস্থি, পেশী প্রভৃতির অসম্ভব বেশি বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং শিশুটির চেহারা শেষ পর্যন্ত সাত ফুট থেকে নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা দৈত্যের মতো হতে পারে। কিন্তু এ-জাতীয় অতি-সক্রিয়তার

পরে গ্রন্থিটি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে; ফলে চেহারা দৈত্যের মতো হলেও লোকটি পেশীতে বল পায় না এবং অল্পকালের মধ্যে মারা যায়। এ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারির কাজ অস্বাভাবিক রকমের কম হলে লোকটির চেহারা একরকমের বামন-এর মতো হয়; এ-জাতীয় বামনকে বলে মিজেট (Midget); কিন্তু এই বামনেরা থাইরইড্ হর্মোনের অভাবজনিত বামনদের (Cretin) মতো কুৎসিত ও নির্বোধ হয় না—এদের চেহারা মোটের উপর আকর্ষণীয় হয় এবং এদের মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

চ॥ এণ্ডোক্রিন্ ভারসাম্য (Endocrine Balance)

আচরণের বৈশিষ্ট্যের উপর পিটুইটারি গ্রন্থিটির প্রত্যক্ষ প্রভাব সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন। তার একটি কারণ হল, এই গ্রন্থিটির প্রভাব বহুলাংশেই পরোক্ষ—পিটুইটারি গ্রন্থির প্রধানতম কাজ হল অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলিকে 'পরিচালনা' করা। তবুও বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন, পিটুইটারির সামান্য বেশি সক্রিয়তার (moderate over-activity) ফলে ব্যক্তির শরীরে ও আচরণে নানা বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়: শরীরের পেশীগুলি অত্যধিক সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তিটির আচরণে কর্মোদ্যম, উৎসাহ, আত্মসংযম প্রভৃতির পরিচয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থির ক্রিয়া স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে ব্যক্তিটির আচরণে উদ্যম-অভাব, শ্লথভাব, সহজ-হতাশা প্রভৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার, আচরণের এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ শুধুমাত্র পিটুইটারি হর্মোনের আধিক্য বা ঘাটতি না-হতেও পারে। সামগ্রিকভাবে শরীরে হর্মোনের ভারসাম্যের অভাব হলেও এ-জাতীয় লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সাধারণ স্বাভাবিক আচরণের জন্য শরীরের মধ্যে যে-পরিমাণে বিভিন্ন হর্মোনের প্রয়োজন প্রতিটি এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থি থেকে ঠিক সেই পরিমাণ হর্মোন উৎপন্ন হলে শরীরের এণ্ডোক্রিন্ ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ভারসাম্য ব্যক্তিত্বর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু আচরণের উপর বিভিন্ন এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থির প্রভাব এবং এই গ্রন্থিগুলির কার্যের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বস্তুত এমনই জটিল যে আচরণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই শরীরে কোন একরকম নির্দিষ্ট হর্মোনের আধিক্য বা অভাব নির্ণয় করা যায় না। অতএব, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব-বিচারের ভিত্তিতে গ্রন্থি-চিকিৎসার (Glandular Treatment) নির্দেশ দেওয়া অসম্ভব। যেমন: নিজের মধ্যে কর্মোদ্যমের অভাব অনুভূত হলেই কল্পনা করা অসঙ্গত হবে যে এ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি হর্মোন ইন্‌জেক্‌সন্ নিলেই এ-অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

এইখানে আরো একটি কথা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। আমাদের আচরণ-বৈশিষ্ট্যের—অতএব ব্যক্তিত্বর—উপর এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী হলেও হর্মোনই ব্যক্তিত্বর একমাত্র উপাদান নয়। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ব্যক্তিত্বর উপাদান প্রধানত দ্বিবিধ : শারীরিক ও সামাজিক। শারীরিক উপাদানের মধ্যে প্রধান অবশ্যই এণ্ডোক্রিন্-তন্ত্র (Endocrine System)। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের মতেই এ-ছাড়াও শরীরের আকৃতি বা গড়নের সঙ্গেও ব্যক্তিত্বর সম্পর্ক অনুমিত হতে পারে। অতএব, ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপাদান সংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপনের আগে আমরা শরীরের গড়নের সঙ্গে ব্যক্তিত্বর সম্পর্ক সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখবো।

৮॥ শরীরের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব

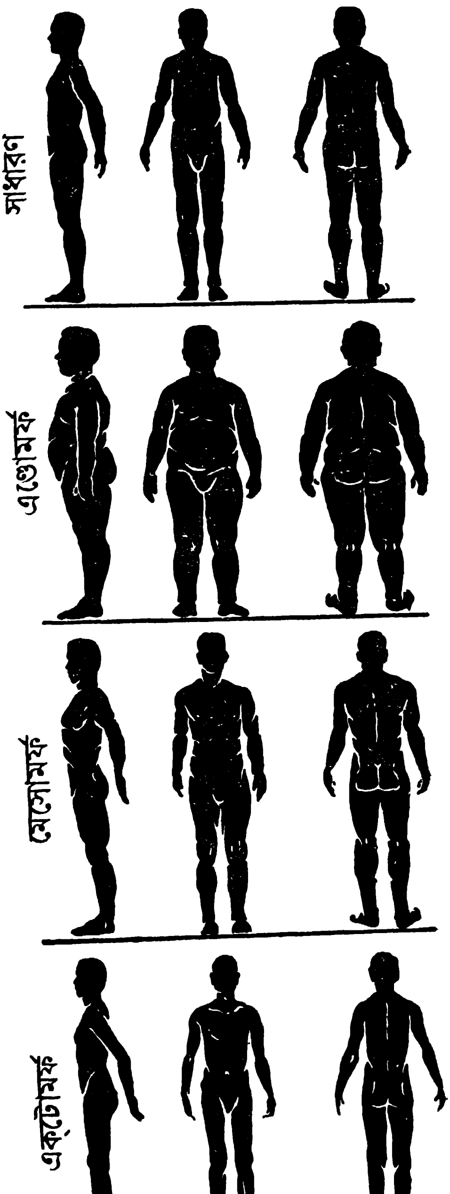
বহুদিন ধরেই অনেকে বিশ্বাস করেছেন যে সাধারণভাবে শরীরের গড়ন বা আকৃতি থেকে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর ইংগিত পাওয়া যায়। বস্তুত এ-জাতীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারেরা অনেক সময় বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তির চেহারা বিভিন্নভাবে কল্পনা করেছেন এবং নাটকাদির পাত্রপাত্রীর মুখে বিভিন্ন মন্তব্যও উদ্ভাবন করেছেন। সেক্‌স্‌পীয়র-এর 'জুলিয়াস্ সিসার' নাটকে সিসার যেমন বলেছেন :

> Let me have men about me that are fat,
> Sleek-headed men, and such as sleep o' nights.
> Yond Cassius has a lean and hungry look.
> He thinks too much. Such men are dangerous.

মোটের উপর একই বিশ্বাস অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে বিভিন্ন আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর সম্পর্ক প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ-জাতীয় অধিকাংশ প্রয়াসই অতিসারল্য দোষদুষ্ট হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতিকালে এই সমস্যাটি নিয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হয়েছে ; আমরা এখানে তারই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো।

এই প্রয়াস অনুসারে, শরীরের আকৃতি হিসাবে কয়েকটি বাঁধাধরা আদল বা 'টাইপ' (Type) কল্পনা করা হয়নি ; অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের আকৃতিকেই কোন-না-কোন 'টাইপ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তার পরিবর্তে সমস্ত মানুষের দেহগঠনের মোটের উপর তিন রকম উপাদান বা 'কম্পোনেণ্ট' (Component) নির্ণয় করা হয়েছে : গড়পড়তার দিক থেকে সাধারণ (average) মানুষের দেহ-

গঠনে এই তিন রকম 'কম্পোনেণ্ট' মোটের উপর সামঞ্জস্যময়ভাবে বর্তমান থাকে, যদিও ব্যক্তি-বিশেষের দেহগঠনে এই তিন রকম উপাদানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উপাদানের পরিচয়ই অত্যন্ত প্রকট হতে পারে। আকৃতির এই তিন রকম উপা-দানের বা 'কম্পোনেণ্ট'-এর নাম দেওয়া হয়েছে : (১) 'এণ্ডোমর্ফি' (Endomorphy), (২) 'মেসো-মর্ফি' (Mesomorphy) এবং (৩) 'এ ক্ টো ম র্ফি' (Ecto-morphy)। অতএব, যার দেহ-গঠনে এণ্ডোমর্ফির পরিচয় অত্যন্ত প্রকট তাকে বলা হবে 'এণ্ডোমর্ফ' (Endomorph); যার দেহ-গঠনে মেসোমর্ফির পরিচয়ই সর্ব-প্রকট তাকে বলা হবে 'মেসোমর্ফ' (Mesomorph) ; যার আকৃতিতে এক্‌টোমর্ফির পরিচয়ই সর্ব-প্রকট তাকে বলা হবে 'এক্‌টোমর্ফ' (Ectomorph)। সা ধা র ণ (average) মানুষের আকৃতিতে অবশ্য তিন রকম উপাদান বা 'কম্পোনেণ্ট' সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বর্তমান। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের আকৃতি চূড়ান্ত এণ্ডোমর্ফ, বা, চূড়ান্ত মেসোমর্ফ, বা, চূড়ান্ত এক্‌টোমর্ফ হতে পারে ; যদিও অবশ্যই এ-জাতীয় চূড়ান্ত



অপেক্ষাকৃত বিরল। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছবিতে সব-উপরে সাধারণ (average) মা ~র আকৃতি বর্ণিত হয়েছে: পাশের দিক, সামনের দিক এবং পিছন দিক থেকে এ-জ. ~য় মানুষের তিনটি চিত্র বসানো হয়েছে। তার নীচের সারিতে একইভাবে চূড়ান্ত এণ্ডোমর্ফ-এর দেহগঠন তিন দিক থেকে দেখানো হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সারিতে চূড়ান্ত মেসোমর্ফ এবং চূড়ান্ত এক্টোমর্ফ-কে তিন দিক থেকে আঁকা হয়েছে।

অবশ্যই, এণ্ডোমর্ফি, মেসোমর্ফি ও এক্টোমর্ফির সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা কিছুটা জটিল। আমরা মোটামুটিভাবে এখানে উল্লেখ করতে পারি যে এণ্ডোমর্ফির প্রধানতম লক্ষণ হল ভুঁড়ি, গায়ে চর্বির আধিক্য, ইত্যাদি। মেসোমর্ফির প্রধানতম লক্ষণ হল পেশী, হাড় প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি—চওড়া হাড়, মজবুত পেশী ইত্যাদি। এক্টোমর্ফির বিশেষ লক্ষণ হল সরু সরু বা ছিপছিপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সহজ কথায়, ভুঁড়িওয়ালা মোটা মানুষের শরীরে এণ্ডোমর্ফির প্রাধান্য; লম্বা-চওড়া চেহারায় মেসোমর্ফির প্রাধান্য, ছিপছিপে রোগা চেহারায় এক্টোমর্ফির প্রাধান্য।

আগেই বলেছি, চরম এণ্ডোমর্ফ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। অধিকাংশের দেহগঠনেই এণ্ডোমর্ফি প্রভৃতি উপাদান বা 'কম্পোনেণ্ট'গুলির কম বেশি পরিচয় বর্তমান। অতএব চেষ্টা করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের দেহগঠনে এই ত্রিবিধ উপাদানের কোন্‌টির পরিচয় কতখানি তা হিসাব করা বা তার মূল্যায়ন করা; এই জাতীয় হিসাবের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহগঠনের বা আকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যাবে। হিসাব-পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে দেখা যাক। প্রতিটি উপাদানের দিক থেকে একজন সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে পারে ৭; সবচেয়ে কম নম্বর পেতে পারে ১। গড়পড়তার দিক থেকে সাধারণ (average) মানুষকে প্রতিটি কম্পোনেণ্ট-এর দিক থেকে ৪ নম্বর দেওয়া হবে। এই হিসাবে যাঁরা পারদর্শী তাঁরা প্রতি ব্যক্তির (বিবস্ত্র) ফটোগ্রাফ থেকে তাঁর দেহগঠনে কোন্ উপাদান কতখানি বর্তমান তার পরিচয় দিতে পারেন। যেমন ধরা যাক, হিসাব করে একজনের মূল্যায়ন (Rating) করা হল ৪-৫-২। অর্থাৎ, তাঁর মধ্যে এণ্ডোমর্ফির পরিচয় ৪, মেসোমর্ফির পরিচয় ৫, এক্টোমর্ফির পরিচয় ২। এইভাবে মূল্যায়ন করে ব্যক্তিটির যে-পরিচয় নির্ণীত হয় তাকে বলে 'সোমাটোটাইপ' (Somatotype)।

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত প্রতিটি ব্যক্তির আকৃতি বা দেহগঠন-বৈশিষ্ট্য বিচারের পদ্ধতিটি উল্লেখ করা হল। এবার দেখা যাক, এই পদ্ধতির সমর্থকেরা কী ভাবে ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে চান। তাঁরা ব্যক্তিত্বের সমস্ত রকম

প্রলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান না। তার বদলে তাঁরা ব্যক্তিত্বর শুধুমাত্র সেই প্রলক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলি মিলিতভাবে মেজাজ বা 'টেম্পারামেণ্ট' (Temperament) বলে উল্লিখিত হয়। তাঁদের মতে এই 'টেম্পারামেণ্ট'-এর তিন রকম উপাদান বা 'কম্পোনেণ্ট' (Component) বর্তমান। যথা : (১) 'ভিসেরোটোনিয়া' (Viscerotonia), (২) 'সোমাটোটোনিয়া' (Somatotonia) এবং (৩) 'সেরিব্রোটোনিয়া' (Cerebrotonia)। এই তিন রকম উপাদান মোটের উপর কী কী প্রলক্ষণের পরিচায়ক তা নিম্নোক্ত তালিকা থেকে বোঝা যাবে :—

১। ভিসেরোটোনিয়া (Viscerotonia)

ক। দেহভঙ্গি ও গতিবিধিতে শিথিলতা (Relaxation)
খ। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ
গ। মন্থর প্রতিবেদন
ঘ। আদবকায়দা-প্রিয়তা
ঙ। সামাজিকতা-প্রিয়তা
চ। আবেগের সমতা
ছ। সহিষ্ণুতা
জ। আত্মপ্রসাদ
ঝ। ভাবাবেগের সহজ ও শান্ত অভিব্যক্তি।

২। সোমাটোটোনিয়া (Somatotonia)

ক। দেহভঙ্গি ও গতিবিধিতে দৃঢ়তা (Assertiveness)
খ। দুঃসাহসিক অভিযান-প্রিয়তা
গ। উদ্যম
ঘ। শারীরিক শ্রম বা ব্যায়ামের প্রতি আকর্ষণ
ঙ। ভাগ্যপরীক্ষার উৎসাহ
চ। হালচাল বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট
ছ। মারামারির ব্যাপারে শারীরিক সাহস
জ। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উৎসাহ
ঝ। উচ্চকণ্ঠে কথা কওয়া
ঞ। মাতব্বরী ভাব।

৩। সেরিব্রোটোনিয়া (Cerebrotonia)

ক। দেহভঙ্গি ও গতিবিধির সংযম (Restraint)
খ। অত্যন্ত দ্রুত প্রতিবেদন
গ। গোপন-প্রিয়তা (Love of privacy)

ঘ। মানসিক প্রয়াসের আতিশয্য (Overattentionality, ইত্যাদি)

ঙ। ভাবাবেগ গোপনতার প্রবণতা

চ। চোখমুখের ভঙ্গিতে আত্ম-সচেতনতার ভাব

ছ। সমাজ সম্বন্ধে আশঙ্কা

জ। সামাজিকতায় বাধা বোধ

ঝ। নিম্নস্বরে কথা বলা

ঞ। হালচালে ছেলেমানুষের মত একাগ্রতা।

আলোচ্য পদ্ধতির সমর্থকেরা প্রতি ব্যক্তিকেই 'টেম্পারামেণ্ট'-এর উপরো ত্রিবিধ উপাদানের বিচারে ১ থেকে ৭ পর্যন্ত নম্বর দেন। যেমন, কারুর টেম্পার মেণ্টের মূল্যায়ন হিসাবে হয়ত বলা হবে ৪-৩-২ ; অর্থাৎ, এই ব্যক্তিটির মে ভিসেরোটোনিয়ার পরিচয় হল ৪, সোমাটোটোনিয়ার পরিচয় ৩ এবং সেরিব্রোটে নিয়ার পরিচয় ২।

পদ্ধতিটির সমর্থকেরা আরো দাবি করেন, উপরোক্ত দ্বিবিধ উপায়ে আকৃতি দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করলে উভয় বৈশিষ্ট্যের মধে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ (correlation) দেখা যায়। অর্থাৎ, যার ব্যক্তিত্ব বিচা ভিসেরোটোনিয়ার প্রাবল্য প্রতিপন্ন হয় তারই দেহগঠনে এণ্ডোমর্ফির পরিচয় দেখা যায় প্রকট ; যার ব্যক্তিত্ব বিচারে সোমাটোটোনিয়ার যতটা পরিচয় তার দেহগঠনে মেসোমর্ফিরও আনুপাতিক পরিচয় ; যার ব্যক্তিত্ব বিচারে সেরিব্রোটো নিয়ার আধিক্য দেখা যায় তারই দেহগঠনেও দেখা যায় এক্‌টোমর্ফির প্রাধান্য এইভাবে আলোচ্য পদ্ধতির সমর্থকেরা আকৃতি-বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিপন্ন করতে চান।

অন্যেরা মন্তব্য করেন, আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর কোন একরক সম্পর্ক থাকা অবশ্যই সম্ভবপর ; কিন্তু এই সম্পর্ক ঠিক কী রকম এবং আকৃতি-বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য সত্যিই কতোখানি অনুমেয় সে-বিষয়ে গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে কোন সুনিশ্চিত মন্তব্য সম্ভব নয়। তাছাড়া, আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর সম্পর্কটুকুর আসল কারণ কী—এ-প্রশ্নও এখনো অমীমাংসিত। এ-সম্পর্কর প্রকৃত ব্যাখ্যাও বিভিন্ন হতে পারে। একরকম ব্যাখ্যাকে জৈব (Biological) আখ্যা দেওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে যে-জৈব উপাদান-গুলি (Biological factors) মানুষের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য ; অর্থাৎ আকৃতি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য একই মূল জৈব কারণের দ্বিবিধ পরিণাম। কিন্তু এই ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা

; অপর ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও বর্তমান। সে-ব্যাখ্যাকে মূলতই সামাজিক ocial) বলা হবে। যথা: ব্যক্তিবিশেষের আকৃতির উপর নির্ভর করে তার তি অপরাপর ব্যক্তির আচরণ এবং অপরাপর ব্যক্তির এ-জাতীয় আচরণের উপর র নিজের আচরণও বহুলাংশেই নির্ভরশীল।

॥ ব্যক্তিত্বর সামাজিক উপাদান

জন্মের পর থেকে কোনো শিশুই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে বা একা একা বড হয় না। কটি নির্দিষ্ট সমাজের জীব হিসাবেই সে বড়ো হয়। স্বভাবতই তার আচরণের শিষ্ট্য—অতএব ব্যক্তিত্বও—সামাজিক প্রভাবের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। শৈশব কেই তার ব্যক্তিত্ব রূপ নেয় এবং শৈশবের সামাজিক পরিবেশ বলতে প্রধানতই রিবারিক পরিবেশ। এই কারণে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বহুলাংশেই পারিবারিক রিবেশের উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই পারিবারিক পরিবেশ ছাডাও ক্রমশই বৃহত্তর মাজিক পরিবেশ বিবিধভাবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মন, যে-সমাজে একটি ব্যক্তি বড়ো হচ্ছে সেই সমাজের নীতিবোধ, আদর্শ, বোধ প্রভৃতিও তার ব্যক্তিত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তবুও এ-জাতীয় তিবোধ প্রভৃতির পরিচয়ও শিশুটি সর্বপ্রথম পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই পেয়ে কে; কেননা তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কাছ থেকেই সামাজিক তিহ্য শিশুর কাছে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ, শিশুর কাছে সামাজিক ঐতিহ্যের হক বলতে প্রধানতই তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিই। অতএব, ক্তিত্বর রূপায়ণে সামাজিক প্রভাবের মধ্যে প্রধানতম স্থান পারিবারিক ভাবের।

অবশ্যই শিশুর কাছে তার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন শুধুমাত্র সামাজিক ঐতিহ্যের হকই নন; তাঁরাও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট মানুষ—অর্থাৎ, তাঁদের আচরণেও বিবিধ বৈশিষ্ট্য র্তমান। তাই, শিশুর প্রতি তাঁদের আচরণ শিশুর আচরণকেও নানাভাবে ভাবিত করে। যেমন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মন্তব্য করেন, শুর প্রতি তার পিতামাতা যদি অত্যধিক যত্নশীল হন—অর্থাৎ, চলতি কথায় কে বলে শিশুকে খুব বেশি “তুতু করে” লালনপালন করেন—তাহলে শিশুর পক্ষে শেষ লাজুক, আবেগপ্রবণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা দেবার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, শু যদি বিশেষ অনাদরে মানুষ হয়—তার পিতামাতা যদি স্বাভাবিক স্নেহ-যত্নের রিবর্তে তার প্রতি অবহেলার ভাবই গ্রহণ করেন—তাহলে শিশুটির আচরণে ক্ষতা, হিংসা প্রভৃতির প্রতি প্রবণতা দেখা দেওয়াই সম্ভব।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিত্বর-বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেন, এ-ভূমিকা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ শিশুজীবনে প্রথম দু'বছরের মধ্যে। শিশু যদি জন্মের সময় থেকে অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয়- অর্থাৎ, যদি জন্ম থেকেই পারিবারিক বা পিতামাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়- তাহলে তার ব্যক্তিত্বে আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতির পরিচয় অনেকাংশেই ভোঁতা হ যায়। কিন্তু যে-শিশুকে দু'বছর বয়সের পরে অনাথ-আশ্রমে ভর্তি করা হয় ত ব্যক্তিত্বে এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় না।

অবশ্য মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সমর্থকেরা দাবি করেন, ব্যক্তির অত্যন্ত শৈশবে অভিজ্ঞতাই তাঁর ব্যক্তিত্বকে রূপায়িত করে। কিন্তু তাঁরা যে-অর্থে এই দা করেন,—বিশেষত শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতার উপর তাঁরা যে-রকম অপরিসী গুরুত্ব আরোপ করতে চান,—তা আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মহলে সর্ববাদিসম্মত নয়

ব্যক্তিত্বর সামাজিক উপাদান হিসাবে পারিবারিক উপাদানই অবশ্য একম উপাদান নয়। পরিবার ছাড়াও শিক্ষায়তন, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি সর্বত্রই ব্যক্তির উপ সমাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—অর্থাৎ, সামাজিক প্রভাবের দ্বারা ব্যক্তিত্ব নিরূপি হয়। স্বভাবতই তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অত্যন্ত জটিল ও বিস্তারিত হতে বাধ আমাদের পক্ষে বর্তমানে তা উত্থাপন করার সুযোগ নেই। আমরা সংক্ষেপে এটুকু মন্তব্য করতে পারি যে প্রতি স্তরে এবং প্রতি ক্ষেত্রে সমাজ ব্যক্তির উপর বিভি প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তির আচরণ, অতএব ত ব্যক্তিত্বও।

১০ ॥ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব (Normal and Abnorm Personality)

স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর অর্থই বা কী এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সহজ নয়; কেননা 'স্বাভাবিক' এবং 'অস্বাভাবিক' শ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। আমার সঙ্গে যাঁর মতের মি হচ্ছে না,—আমার কাছে আচরণের যে-আদর্শ সেই আদর্শ যিনি গ্রহণ করছে না,—আমি অনায়াসেই তাঁকে অস্বাভাবিক বলতে পারি। অবশ্য একই কার তিনিও আমাকে অস্বাভাবিক আখ্যা দিতে পারেন। সংখ্যা-গণিতের (statistic দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য গড়পড়তার হিসাবে সাধারণ (average) ব্যক্তি আচরণকেই স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হয়; এই অর্থে সাধারণ (average) ব্যা থেকে বিশেষ পার্থক্যকে অস্বাভাবিক বলা হয়। বলাই বাহুল্য, এখা

অস্বাভাবিক শব্দটি নিন্দাসূচক হবে না ; অতি-স্বাভাবিকও রূঢ় বা পারিভাষিক অর্থে অস্বাভাবিকেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সাধারণ (average) ব্যক্তির থেকে বিশেষ পৃথক ছিল ; অতএব সংখ্যা-গণিতের নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে তাঁর ব্যক্তিত্বও অস্বাভাবিক হবে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ (social point of view) থেকে অবশ্য স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর ভিন্ন অর্থ পরিকল্পিত হয়। যে-ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারেন,—ফলে জীবন যাঁর কাছে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় বলে প্রতীত হয়,—সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকেই স্বাভাবিক বলা হবে। পক্ষান্তরে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনে যিনি অক্ষম,—অতএব জীবন যাঁর কাছে আকর্ষণহীন ও এমনকি পীড়াদায়ক,—সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক বলা হবে। কিন্তু বিষয়টি আসলে আরো অনেক জটিল ; কেননা, উপরোক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে একই ব্যক্তির আচরণ পরিস্থিতি-বিশেষে স্বাভাবিক এবং পরিস্থিতি-বিশেষে অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। যেমন, দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্যান্য বিপদ-আপদের অবস্থায় ব্যক্তিত্বর কতকগুলি প্রলক্ষণ প্রকটভাবে প্রকাশিত হতে পারে যেগুলির পরিচয় সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না।

কিন্তু 'স্বাভাবিক' ও 'অস্বাভাবিক' শব্দের অর্থ-নির্ণয় সংক্রান্ত উপরোক্ত অসুবিধা সত্ত্বেও অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী বলবেন, যে-ব্যক্তির জীবনে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্য বর্তমান এবং এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যার সমস্ত আচরণের মধ্যে সংহতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং ফলে জীবন যার কাছে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্যই —তার ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া বাঞ্ছনীয় ; পক্ষান্তরে, যার জীবনে সমাজ-সম্মত কোন আদর্শ নেই, যে সর্বদাই অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাত বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় এবং এমনকি নিজেকে নিয়েও বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে,—ফলে, যার কাছে জীবন আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য নয় এবং স্বাভাবিক জীবন থেকে যে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়,—তার ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হবে। কিন্তু স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর এ-জাতীয় সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হবে না। কেননা, কোন একটি উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় সামাজিকভাবে স্বীকৃত হতে পারে ; কিন্তু অন্য সমাজব্যবস্থায় সেই উদ্দেশ্যটিই সামাজিকভাবে স্বীকারযোগ্য না-হতেও পারে। তেমনি, নানা রকম আচরণ একটি সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকতার পরিচায়ক হলেও অন্য সমাজব্যবস্থায় তা স্বাভাবিকতার পরিচায়ক না-হতেও পারে। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর সমস্যা সত্যিই বিশেষ

জটিল এবং কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হবে, বা, কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হবে সে-বিষয়ে বাঁধাধরা নিয়ম উল্লেখ করা কঠিন।

কিন্তু 'স্বাভাবিকে'র সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হলেও এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সব সময় সহজসাধ্য না-হলেও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ব্যক্তিত্বর কয়েক রকম আদল বা টাইপ্ (type) অত্যন্ত স্থূল অর্থে এবং মোটামুটি সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রকট অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক বলে স্বীকৃত। বস্তুত, ব্যক্তিত্বর এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকেই সাধারণত মানসিক অসুস্থতার বা মনোবিকারের দৃষ্টান্ত বলা হয় এবং বিবিধ উপায়ে সেগুলির চিকিৎসাও করা হয়। অতএব, অত্যন্ত প্রকট অর্থে অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর নিদর্শন হিসাবে আমরা এখানে বিবিধ মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখতে পারি।

১১॥ অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও মনোবিকার (Abnormal Personality and Mental Diseases)

মানসিক অসুখ বা মনোবিকার সংক্রান্ত নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। মনোবিকার বলতে অনেকে মনে করেন পাগল বা উন্মাদ। এবং উন্মাদ বলতেও অনেকেই অত্যন্ত ভয়াবহ আচরণ কল্পনা করেন : উন্মাদ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করছে, তেড়ে মারতে আসছে, নিজেকে রাজা-উজির মনে করছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। উন্মাদ ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অবশ্যই এ-জাতীয় আচরণ অনেক সময় দেখা যায় ; কিন্তু এ-জাতীয় আচরণ বিবিধ উন্মাদরোগের মধ্যে কোন একরকম নির্দিষ্ট রোগেরই লক্ষণ। অর্থাৎ, উন্মাদরোগও নানা রকমের হতে পারে এবং সমস্ত রকম উন্মাদরোগীর আচরণই সমজাতীয় নয়। উন্মাদ-হাসপাতালে গেলে নানা রকম রোগী দেখতে পাওয়া যায় এবং দেখা যায় তারা সকলেই এমন কিছু ভয়াবহ আচরণ করছে না ; পক্ষান্তরে দেখা যায়, অধিকাংশ রোগীই চুপচাপ রয়েছে, হয়ত আপন মনে বিড়বিড় করছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি তাদের উদাসীন ভাব ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, মানসিক রোগ বা মনোবিকার মানেই উন্মাদ রোগ নয় ; বস্তুত মনোবিকারের অধিকাংশ রোগীকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় না, নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও তারা মোটের উপর সাধারণ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে এবং করে থাকেও। অতএব, মনোবিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের পক্ষে এ-বিষয়ে নানা রকম প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে-বিভাগটিতে বিশেষত মনোবিকার বা মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয় তাকে 'সাইকিএট্রি' (Psychiatry) বলে। এই বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের 'সাইকিএট্রিস্ট' (Psychiatrist) বলে। স্বভাবতই এঁদের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকিএট্রিস্ট-রা বিবিধ মনোবিকারকে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা: (১) উদ্বায়ু (Neurosis) এবং (২) বাতুলতা (Psychosis)। সাধারণত আমরা উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগগুলিকেই উন্মাদরোগ আখ্যা দিয়ে থাকি। বাতুলতা বা 'সাইকোসিস্' তুলনায় দুরারোগ্য ও কঠিন নানান রোগ; এই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য রোগীকে মানসিক হাসপাতালে (Mental Hospital বা Mental Home) ভর্তি করাই বাঞ্ছনীয়; তার কারণ শুধু এই নয় যে এ-জাতীয় রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতির আয়োজন বিশেষত হাসপাতালেই বর্তমান, তার আরো একটি কারণ হল হাসপাতাল-ব্যবস্থার বাইরে এ-জাতীয় রোগীরা নিজেদের এবং অপরের নানা রকম ক্ষতি করতে পারে। এবং এ-জাতীয় রোগীর পক্ষে নিজের ও অপরের নানা রকম ক্ষতি করার সম্ভাবনা আছে বলেই যাতে তারা সত্যিই ক্ষতি করে না-বসে তার জন্য মানসিক হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সংক্ষেপে, বাতুলতা-রোগগ্রস্তরা বা বাতুলরা (Psychotics) সমাজ-জীবন যাপনের অনুপযুক্ত।

কিন্তু উদ্বায়ু (Neurosis) এতো কঠিন রোগ নয়; রোগীর নিজের পক্ষে এ-জাতীয় রোগ বিশেষ কষ্টকর বা পীড়াদায়ক হলেও তাকে নিয়ে সামাজিক সমস্যা অনেক কম। অর্থাৎ, উদ্বায়ুরোগ সত্ত্বেও অধিকাংশ রোগী মোটামুটিভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে, তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করবার প্রয়োজন হয় না।

বাতুলতা বা 'সাইকোসিস্'কে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) 'অর্গানিক' (Organic), বা, নির্দিষ্ট শারীরিক কারণ-জনিত; (২) 'ফাংসানাল' (Functional), বা, কোন নির্দিষ্ট দৈহিক কারণের অভাব সত্ত্বেও আচরণের বিকার। কিংবা, আরো নির্ভুলভাবে বলা উচিত, যে-সাইকোসিস্গুলির সুনির্দিষ্ট শারীরিক কারণ প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়েছে সেগুলিকে দৈহিক বা 'অর্গানিক' আখ্যা দেওয়া হয়; কিন্তু যেগুলির কোন সুস্পষ্ট শারীরিক কারণ অন্তত এখনো নির্ভুলভাবে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়নি সেগুলিকে 'ফাংসানাল' বলা হয়—অর্থাৎ, মনে করা হয় দেহযন্ত্রটির বিভিন্ন অঙ্গ অটুট থাকলেও অধুনা-অজ্ঞাত কোন কারণে তার কার্যে বিকার দেখা দিয়েছে।

অবশ্যই নিউরোসিস্ একরকমের নয়। তেমনি 'অর্গানিক সাইকোসিস্' এবং 'ফাংসানাল সাইকোসিস্' উভয়ই নানা প্রকারের হতে পারে। একে একে এগুলির পরিচয় দেখা যাক।

ক ॥ উদ্বায়ু বা নিউরোসিস্ (Neurosis)

নিউরোসিস্ বা উদ্বায়ু রোগগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) নিউরস্থেনিয়া (Neurasthenia), (২) সাইকস্থেনিয়া (Psychasthenia) এবং (৩) হিস্টিরিয়া (Hysteria)।

১। নিউরস্থেনিয়া (Neurasthenia)

নিউরস্থেনিয়াকে অনেকে মানসিক অসুস্থতার মৌলিক রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রায়ই অন্যান্য নানা রকম মনোবিকারের রোগীদের মধ্যে এই রোগটির লক্ষণ দেখা যায়; আবার, জনসাধারণের মধ্যে শতকরা অনেকের মধ্যেই নিউরস্থেনিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মতে, নিউরস্থেনিয়া রোগীর ব্যক্তিত্বে পরস্পরবিরোধী ও অপ্রিয় আবেগের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়। আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৫-১৮৮ দ্রষ্টব্য) আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনের আলোচনা করেছি; স্বভাবতই নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের মধ্যে আবেগ-সংঘাতের সহচর হিসাবে এ-জাতীয় বিবিধ শারীরিক উপসর্গও দেখা দেয়। আমরা ইতিপূর্বে আরো দেখেছি, আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনগুলি মূলতই স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অতএব অনুমান করা হয়েছে যে নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রর কার্যকলাপ কোন কারণে বিশেষ বিপথগামী হয়। এ-জাতীয় শারীরিক উপসর্গর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের অদ্ভুত ধরনের বুক ধড়ফড় করে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, পেটের অসুখ বা হজমের গোলমাল দেখা দেয়; তাদের রক্ত-চলাচল ব্যবস্থায় নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়; তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্তু সেই সঙ্গেই হাত-পা ঘামেও ভিজে যায়; মাঝে মাঝে তাদের ভয়ানক গা ঘুলিয়ে ওঠে; তারা অল্পেতেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে নানা রকম আবেগের উপসর্গও দেখা দেয়। যেমন, তারা বিশেষ উৎকণ্ঠা-প্রবণ হয়: ভয়ে বুক গুরগুর করে, মনে হয় ভয়ঙ্কর কোন সর্বনাশ আসন্ন—কিন্তু কিসের ভয়, কোন্ ধরনের সর্বনাশ, এ-জাতীয় প্রশ্নের তারা কোনরকম উত্তর দিতে পারে না। অনেক সময় তাদের মধ্যে উৎকট অনিদ্রার উপসর্গও দেখা দেয়।

স্বেচ্ছায় বা সচেতনভাবে না-হলেও নিউরস্থেনিয়ার রোগীরা দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনে সাধারণত বিমুখ হয়। এই বিমুখতার সমর্থনে (স্বেচ্ছায় বা সচেতনভাবে না-হলেও) তারা সাধারণত যে-ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাকে চলতি কথায় 'রোগের বাতিক' বলা যায়, মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই রোগ-বাতিককে বলে **হাইপোকন্ড্রিয়া** (**Hypochondria**)। অর্থাৎ, তারা নিজেদের শরীরে বিবিধ কঠিন ও দুরারোগ্য রোগ কল্পনা করতে থাকে। পেটের গোলমাল, বুকের ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে তারা সাধারণত অত্যধিক দুশ্চিন্তা করে। দায়িত্বশীল চিকিৎসক ভালো করে পরীক্ষা করে অবশ্যই তাদের বলে থাকেন যে এই উপসর্গগুলির প্রকৃতপক্ষে কোনরকম শারীরিক ভিত্তি নেই,—অর্থাৎ, এগুলি আসলে কোনরকম শারীরিক অসুখের উপসর্গ নয়। কিন্তু এ-জাতীয় মন্তব্য শুনে স্বস্তি অনুভব করার বদলে নিউরস্থেনিয়ার রোগীরা সাধারণত দায়িত্বশীল চিকিৎসকদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্নই হয়ে থাকে। 'ও ডাক্তার আসলে অসুখটা ধরতেই পারছেন না'—এ-জাতীয় মনোভাব অবলম্বন করে নিউরস্থেনিয়ার রোগীরা সাধারণত এক ডাক্তার ছেড়ে অপর ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে চায় এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা এইভাবে চিকিৎসক পরিবর্তন করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোন হাতুড়ে (quack) বা অসাধু ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে। সেই হাতুড়ে নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের শারীরিক উপসর্গ নিয়ে খুব হৈ চৈ (fuss) করলে রোগীরা যেন খুশিই হয়, কেননা এরই মধ্যে তারা নিজেদের কর্মবিমুখতার যেন একরকম সমর্থন পেয়ে যায়।

অতএব, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে নিউরস্থেনিয়ার রোগী বস্তুত একভাবে আত্মপ্রবঞ্চনাই করে থাকে। কিন্তু তাই বলে তাকে ভণ্ড বা প্রতারক আখ্যা দেওয়াও অত্যন্ত ভুল হবে। কেননা এ-জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনার আয়োজনও বস্তুত তার রোগ-লক্ষণেরই পরিচায়ক। অতএব মনোবিকার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাকে শারীরিক উপসর্গগুলি নিয়ে মাথা ঘামাতে একটুও প্রশ্রয় না-দিলেও একথা অবজ্ঞা করেন না যে নিউরস্থেনিয়াও আসলে একরকম রোগই এবং এই রোগের রোগীরাও বস্তুত বিশেষ কষ্টযন্ত্রণা পেয়ে থাকে।

২। সাইকস্থেনিয়া (Psychasthenia)

যে-উন্মায়ুরোগগুলির বিশেষ উপসর্গ হল আবেশ (Obsession), আতঙ্ক (Phobia), **অনুকর্ষ** (Compulsion), দ্বিধা (Scruple)—সেগুলিকে সাধারণভাবে সাইকস্থেনিয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব, সাইকস্থেনিয়া বলতে নানা রকম উন্মায়ুরোগই বোঝায়; স্বতন্ত্রভাবে সেগুলিকে আবেশিক-উন্মায়ু (Obsessional Neurosis), অনুকর্ষ-উন্মায়ু (Compulsion Neurosis) ইত্যাদিও বলা হয়।

অ। আবেশ (Obsession) : অনেক সময় দেখা যায়, নানা রকম অদ্ভুত অর্থহীন ও অবান্তর চিন্তা ব্যক্তিবিশেষকে যেন 'পেয়ে বসেছে' ; ব্যক্তিটি এ-জাতীয় চিন্তাকে অর্থহীন, অদ্ভুত ও অবান্তর বলে বুঝতে পারলেও এবং এ-জাতীয় চিন্তাকে পরিহার করার বিশেষ প্রয়াস করলেও এর থেকে কিছুতেই মুক্তি পান না। এ-জাতীয় চিন্তাকেই আবেশ বা 'অবসেস্‌ন্‌' (Obsession) আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির মাথায় এই চিন্তা ঘুরছে : "আমি হয়ত আত্মহত্যা করে বসবো" ; ব্যক্তিটি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে বস্তুত আত্মহত্যা করার কোন ইচ্ছা তাঁর সত্যিই নেই ; চিন্তাটি তাঁর কাছে শুধু অবাস্তবই নয়, অত্যন্ত অপ্রীতিকর এবং পীড়াদায়কও ; তিনি এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান ; কিন্তু তবুও—হাজার চেষ্টা করেও—তিনি কিছুতেই চিন্তাটি থেকে রেহাই পান না, বা, মাথা থেকে চিন্তাটি দূর করতে পারেন না।

আ। আতঙ্ক (Phobia) : আমরা ইতিপূর্বে কয়েক রকম আতঙ্কর উল্লেখ করেছি। নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তাতিরিক্ত ভয়কে আতঙ্ক আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন বদ্ধ-স্থানের আতঙ্ক, মুক্ত-স্থানের আতঙ্ক, ভীড়ের আতঙ্ক, উচ্চ-স্থানের আতঙ্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেকে আবার সম্পূর্ণ যুক্তিহীনভাবে নানাবিধ কীটপতঙ্গ বা জীবজন্তু সম্বন্ধেও আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারেন। যেমন, আরসুলার আতঙ্ক, টিকটিকির আতঙ্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য এ-জাতীয় বিবিধ আতঙ্ক স্বাভাবিক বা সুস্থ ব্যক্তিত্বর পরিচায়ক না-হলেও অনেকের মধ্যে এগুলির অল্পবিস্তর পরিচয় আমরা দেখে থাকি। এমনকি একথাও বলা যায় যে কোন বস্তু বা কোন বিষয় বা কোন পরিস্থিতি সম্বন্ধেই যুক্তিহীন বা ভিত্তিহীন কোনরকম ভয়ের লেশমাত্র পরিচয় নেই—এ-হেন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আসলে দুর্লভই। অর্থাৎ, কোন-না-কোন আতঙ্কর দুর্বল বা অনুগ্র পরিচয় প্রায় সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই কারণে সকলকেই নিউরস্থেনিয়ার রোগী বলা হবে না। আসলে কোনরকম ভিত্তিহীন আতঙ্কর পরিচয় কারুর আচরণে অত্যন্ত প্রকট হলে পরই তা রোগ-লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। যেমন, ভীড়ের আতঙ্কে কেউ হয়ত বাজারে যেতে পারেন না, নিমন্ত্রণ বাড়ী যেতে পারেন না, এমনকি হয়ত জনবহুল পথেঘাটে বেরুতে পারেন্ না। অপর ব্যক্তি হয়ত বদ্ধ-স্থানের আতঙ্কে ট্রেনে চড়তে পারেন না, সিনেমায় যেতে পারেন না। আবার ঘরে একটা আরসুলা বা টিকৃটিকি দেখলেই কেউ হয়ত আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। এ-জাতীয় ব্যক্তির দৃষ্টান্তে আতঙ্ক অবশ্যই রোগ-লক্ষণ এবং তা চিকিৎসা-সাপেক্ষ।

ই। অনুকর্ষ (Compulsion)

অনেকের মধ্যেই নানা রকম যুক্তিহীন, অবাস্তর, অপ্রয়োজনীয় এবং এমনকি সামাজিকভাবে অন্যায় কাজ করবার বাধ্যবাধকতা দেখা যায় এবং সচেতনভাবে বিশেষ প্রয়াস করেও তাঁরা এ-জাতীয় কাজ থেকে বিরত হতে পারেন না। এ-জাতীয় কাজকে অনুকর্ষ বা 'কম্‌পাল্‌সন্‌' (Compulsion) বলা হয়। আবেশের (Obsession) দৃষ্টান্তে যেমন কোন অবাস্তর ধারণা বা চিন্তা ব্যক্তিবিশেষকে 'পেয়ে বসে' তেমনি অনুকর্ষর (Compulsion) দৃষ্টান্তে কোন অবাস্তর বা অবাঞ্ছিত কাজ করার প্রবণতা ব্যক্তিবিশেষকে 'পেয়ে বসে'—হাজার চেষ্টা করেও তিনি এই প্রবণতাকে স্বীয় আয়ত্তে আনতে পারেন না। সাধারণ শিশুদের মধ্যে অবশ্য এই জাতীয় আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন, রাস্তা দিয়ে চলবার সময় দাগ মাড়ানো হবে না (অর্থাৎ, দাগ এড়িয়ে পা-ফেলার বাধ্যবাধকতা), পার্কের পাশ দিয়ে চলার সময় রেলিং-এর প্রতিটি গরাদ স্পর্শ করতেই হবে, ট্রেনে চেপে যাবার সময় টেলিগ্রাফের পোষ্ট গুণতেই হবে ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরিণত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনুকর্ষর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন : শীতলাতলার সামনে দিয়ে যাবার সময় যন্ত্রচালিতের মতো মাথায় হাত ঠেকাতেই হবে। (মনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় সমস্ত আচরণই ধর্মভাবের পরিচায়ক নয়, আবার বিবিধ অনুকর্ষ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হতে পারে।) কিন্তু অনুকর্ষর অপেক্ষাকৃত অনুগ্র বা মৃদু দৃষ্টান্তগুলিকে রোগ-লক্ষণ বিবেচনা করা হয় না। অপরপক্ষে, অনুকর্ষর পরিচয় ব্যক্তিবিশেষের আচরণে বিশেষ প্রকট ও উগ্র হতে পারে। যেমন, রাতে শুতে গিয়ে মনে হল, দরজায় খিল দিয়ে এসেছি কিনা একবার দেখে আসা দরকার ; দরজাটি পরীক্ষা করে দেখা গেল খিল সত্যিই দেওয়া হয়েছে, অতএব ব্যক্তিটি ফিরে এসে আবার শয্যা-গ্রহণ করলেন ; কিন্তু আবার তাঁর মনে হল দরজায় খিল দেওয়া হয়েছে কিনা দেখে আসা দরকার ; তিনি আবার শয্যাত্যাগ করে দরজা পরীক্ষা করে এলেন, আবার শয্যাগ্রহণ করলেন ; কিন্তু আবার মনে হল দরজাটা দেখে আসা দরকার ; আবার উঠলেন, আবার দরজা পরীক্ষা করলেন, আবার বিছানায় শুলেন ; কিন্তু আবার তাঁকে উঠতে হল, দরজা দেখতে হল—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুকর্ষ-উদ্বায়ুর আর একরকম বহুল প্রচলিত দৃষ্টান্ত হল শুচিবায়ু,—চলতি কথায় আমরা যাকে বলি **শুচিবাই,** ইংরাজীতে **Washingmania**। ব্যক্তিটি অকারণে সারাদিনই হাত-পা ধুচ্ছে, সারাদিন ধরে হাত-পা না ধুয়ে কিছুতেই পারছে না।

অনুকর্ষ-উদ্বায়ুর আর একরকম চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত হল **চুরির-বাতিক (Kleptomania)**—অর্থাৎ, সাধারণ চোর যে-কারণে চুরি করে সেই কারণে চুরি করা নয়।

অপরপক্ষে অনুকর্ষ-উদ্বায়ুর এ-জাতীয় রোগীরা চুরি না-করে পারে না, তাদের মধ্যে চুরি করবার একরকম বাধ্যবাধকতা বা আয়ত্তাতীত প্রবণতা বর্তমান। তারা যে-বস্তুটি চুরি করছে তা মূল্যবান হতেও পারে, না-হতেও পারে, বস্তুটি হয়ত তাদের জীবনে কোনদিনই কোন কাজে লাগবে না; তবুও রোগীরা নিরুপায়—হাজার চেষ্টা করেও চুরি না-করে পারে না। দৃষ্টান্তবিশেষে দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিও দোকান বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে চামচ, কাগজ-কাটা প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তু চুরি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ঈ। দ্বিধা (Scruple)

কার্যবিশেষে অকারণ দ্বিধার দৃষ্টান্তও দুর্লভ হয়। সন্ধ্যা আকাশে এক-তারা দেখার পর অনেকেই কারুর মুখের দিকে তাকাতে 'দ্বিধা' করেন, তাঁরা আকাশের দিকে চেয়ে অপর একটি তারা দেখবার চেষ্টা করেন; জোড়া-তারা না-দেখে তাঁদের পক্ষে কারুর মুখ দেখা সম্ভব নয়। এ-জাতীয় ভিত্তিহীন দ্বিধার সঙ্গে প্রায়ই মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণা সংযুক্ত থাকে এবং দ্বিধাগুলি বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূতও হতে পারে। আবেশ, আতঙ্ক প্রভৃতির মতোই অনেকের আচরণে অকারণ দ্বিধার পরিচয় মৃদু বা অনুগ্র হতে পারে; স্বভাবতই তাঁদের মানসিক রোগী বলা হবে না। কিন্তু এই পরিচয় বিশেষ উগ্র হলে তা রোগ-লক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হয়।

৩। হিস্টিরিয়া (Hysteria)

হিস্টিরিয়ার লক্ষণ বহুবিধ হতে পারে। তবুও মোটের উপর বলা যায়, উদ্দীপক-গ্রহণ এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত আয়ত্তহীন অবস্থাই হিস্টিরিয়ার মূল লক্ষণ। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি হাসতে-হাসতে বা কাঁদতে-কাঁদতে এমন অবস্থায় পৌঁছান যে তাঁর পক্ষে আর কোনমতেই হাসি বা কান্না সামলানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আমরা বলে থাকি ব্যক্তিটি 'হিস্টিরিক্যাল' হয়েছেন। এখানে হিস্টিরিয়া বলতে প্রতি-বেদনের উপর আয়ত্তাভাব বোঝাচ্ছে। এই আয়ত্তাভাবের ফলে হিস্টিরিয়ার রোগীরা হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে পারেন, তাঁদের শরীরে 'খেঁচুনি' (convulsions) দেখা দিতে পারে, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা এমনকি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। গ্রামাঞ্চলে 'ভূতে-পাওয়া', 'দানায়-পাওয়া' প্রভৃতি নামে যেসব অবস্থার উল্লেখ করা হয় সেগুলি সাধারণত এ-জাতীয় হিস্টিরিয়ারই লক্ষণ। কিন্তু প্রতিবেদনের উপর আয়ত্তাভাবের অবস্থা আরো চূড়ান্তও হতে পারে; সে-অবস্থাকে হিস্টিরিয়া-সূচক পক্ষাঘাত (Hysterical Paralysis) বলা হয়। আবার হিস্টিরিয়া রোগীদের মধ্যে

উদ্দীপক-গ্রহণেরও চূড়ান্ত অক্ষমতা দেখা দিতে পারে; তাকে হিস্টিরিয়া-সূচক অসাড়তা (Hysterical Anesthesia) বলা হয়।

হিস্টিরিয়া-সূচক অসাড়তার দৃষ্টান্তে চোখ, ত্বক, কান প্রভৃতি গ্রাহক এবং তৎসংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু প্রভৃতির গঠনের (Structure) দিক থেকে কোন দোষ দেখা যায় না; তবুও তাদের চোখে আলো ফেললে বা গায়ে ছুঁচ বিঁধোলে বা কানের কাছে শব্দ করলে তারা টের পায় না—অর্থাৎ, তাদের অনুভূতি হয় না। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকেই হিস্টিরিয়া-সূচক অন্ধতা (Hysteric Blindness), হিস্টিরিয়া-সূচক বধিরতা (Hysteric Deafness) ইত্যাদি বলা হয়। অতএব, এ-জাতীয় অসাড়তা বা অনুভূতির অভাবকে গ্রাহক প্রভৃতির ক্রিয়া বা কর্মর বিকার বা 'ফাংসানাল' (functional) আখ্যা দেওয়া হয়। একই কারণে, হিস্টিরিয়া-সূচক পক্ষাঘাতের নানা রকম দৃষ্টান্তকেও 'ফাংসানাল' বলা হয়; অর্থাৎ দেহ গঠনের দিক থেকে (যেমন, পেশী, বহির্মুখী স্নায়ু প্রভৃতি) কোনরকম দোষ না-থাকা সত্ত্বেও শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার চূড়ান্ত অক্ষমতা বা পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

হিস্টিরিয়ার আর একরকম নমুনা হল তোতলামি (Stammering)। তোতলামি অবশ্য জিভের দোষ, স্বরযন্ত্রের দোষ প্রভৃতি শারীরিক কারণে হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু তার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। পক্ষান্তরে, তোতলামির অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই কথা বলার পক্ষে প্রয়োজনীয় শারীরিক অঙ্গগুলি গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অটুট বা অবিকৃত থাকে; তবুও সেগুলির কার্যাবলীতে (functions) বিশেষ বিকার দেখা দেয়। এই কারণে তোতলা ব্যক্তিরা সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমান তোতলামির পরিচয় দেন না হয়ত একা একা ঘরে বসে চেঁচিয়ে বই পডবার সময় বিনা-বাধায় গড় গড করে পড়ে যেতে পারেন, কিন্তু দশজন লোকের সামনে—বিশেষত সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে —কথা বলতে গেলে তাঁরা বিশেষ বাধা ও জড়তা অনুভব করেন। সুনির্দিষ্ট শারীরিক কারণের জন্য কথা বলার অসুবিধা হলে সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমান অসুবিধা হওয়া উচিত; সাধারণত তোতলা ব্যক্তিদের তা হয় না।

খ॥ বাতুলতা (Psychosis)

উন্মায়ুরোগের প্রধানতম নিদর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা গেল। আগেই বলেছি, এ-জাতীয় রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের 'মানসিক হাসপাতালে' ভর্তি করার দরকার হয় না। রোগগুলিও তুলনায় কম কঠিন বা কম দুরারোগ্য। অবশ্যই রোগগুলির প্রকৃত কারণ এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের

মধ্যেই গভীর মতভেদ আছে। সেই বিতর্কের মধ্যে বর্তমানে আমাদের পক্ষে প্রবেশ করার প্রয়োজনও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তার পরিবর্তে আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও দুরারোগ্য মনোবিকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখবো। এ-জাতীয় কঠিন মনোবিকারকে বাতুলতা বা 'সাইকোসিস্' (Psychosis) আখ্যা দেওয়া হয়। বাতুলতার চিকিৎসার জন্য রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়।

আগেই বলেছি, বাতুলতাও প্রধানত দু'রকম: (১) দৈহিক কারণ-জনিত (Organic) এবং (২) 'ফাংসানাল' (Functional)। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় ধরনের বাতুলতাই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতার আলোচনাও অবান্তর নয়। প্রথমে সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করা যাক।

১। দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতা (Organic Psychosis)

দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতা অনেক রকমের হতে পারে। সবগুলির উল্লেখ করা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। তার পরিবর্তে স্নায়ুতন্ত্রের রোগের—এবং সাধারণভাবে আচরণ-বিকারের—প্রধানতম দৈহিক কারণগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক। জীবাণু-সংক্রমণ (Bacterial Infection): নানা রকম জীবাণু সংক্রমণের ফলে স্নায়ুতন্ত্র—বিশেষত মস্তিষ্ক—সরাসরিভাবে অসুস্থ হতে পারে এবং তার ফলে আচরণের নানা রকম বিকার দেখা দেয়। এ-জাতীয় জীবাণুর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সিফিলিস (Syphilis) রোগের কারণ 'স্পাইরোকিট্' (Sphirochete) নামের জীবাণু।

খ। জীবাণু-জনিত বিষ (Toxins produced by Bacteria): জীবাণুরা মানুষের শরীরে নানা রকম বিষ (toxin) উৎপন্ন করে; এ-জাতীয় বিষের জন্যও গভীর বা গুরুতর আচরণ-বিকার দেখা দিতে পারে।

গ। মাদক দ্রব্য (Narcotic Drugs): দীর্ঘদিন ধরে এবং অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অতএব দেখা দিতে পারে বাতুলতার লক্ষণ। বিদেশের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাঁদের ভর্তি করা হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীদের রোগের কারণ হল অত্যধিক মদ্যপান।

ঘ। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত (Injuries to the Brain Tissues) এবং মস্তিষ্কে 'টিউমার' (Brain Tumours)।

ঙ। মস্তিষ্ক-কোষের মৃত্যু (Dying out of the Brain Cells): এই কারণে বেশি বৃদ্ধ বয়সে নানা রকম আচরণ-বিকার পরিদৃষ্ট হতে পারে।

চ। মস্তিষ্কে রক্ত-পরিবাহক ধমনীর কাঠিন্য (Hardening of the Arteries going to the Brain) : এর ফলে মস্তিষ্কে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত-সরবরাহ হয় না এবং রক্ত-সরবরাহের অভাবে মস্তিষ্ক-কোষগুলির পুষ্টি—অতএব কর্মক্ষমতাও—বিঘ্নিত হয়।

ছ। এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির বিবিধ রোগ (Disorders of the Endocrine Glands) : ইতিপূর্বে এগুলির আলোচনা হয়েছে।

২। 'ফাংসানাল' বাতুলতা (Functional Psychosis)

বাতুলতা রোগের প্রধানতম নিদর্শনগুলির কোন নির্দিষ্ট শারীরিক কারণ এখনো জানা যায়নি ; অতএব সেগুলিকে ক্রিয়ামূলক বা 'ফাংসানাল' আখ্যা দেওয়া হয়। এই রোগ প্রধানত তিন শ্রেণীর। যথা :—

অ। খেদোন্মত্ত বাতুলতা (Manic Depressive Psychosis)

এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল, রোগীর আচরণে পর্যায়ক্রমে বা পালা করে দু'রকম পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের চূড়ান্ত পরিচয়। কিছুদিন ধরে তার আচরণ চরম প্রফুল্লতা-উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রভৃতির পরিচায়ক ; তারপর অকস্মাৎ আবার কিছু-দিন ধরে তার আচরণ চরম বিষণ্ণতা-নিরাশা-ব্যর্থতাবোধ প্রভৃতির পরিচায়ক।

রোগীকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হল তখন হয়ত তার দারুণ স্ফূর্তির ভাব ; তার সমস্ত আচরণই তখন বিশেষ প্রফুল্লতার ও আশাবাদের পরিচায়ক। রোগী তড়বড় করে অজস্র কথা বলছে, যদিও সেই কথাবার্তা বেশ কিছুটা এলোমেলো বা অসংলগ্ন। সব সময়ই তার বিশেষ কর্মব্যস্ত ভাব। নিজের সম্বন্ধে তার তখন মস্ত বড়ো বড়ো ধারণা। সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি করা না-হলে এ-জাতীয় ধারণার প্রভাবে লোকটি হয়ত 'বিরাট এক ব্যবসা' ফাঁদার কল্পনা করে নিজের বিষয়-সম্পত্তির সবটুকুই জলাঞ্জলি দিয়ে বসতো। এ-অবস্থায় ব্যক্তিটি প্রচণ্ড প্রভুত্ব-পরায়ণ, তার কোন কথায় কোনভাবে কেউ বাধা দিলে সে হয়ত মারতে আসে। তার নিজের কাছে সে তখন এক বিরাট নাটকের অদ্বিতীয় নায়ক। তার এই স্ফূর্তির ভাব যত বাড়তে থাকে ততোই দেখা যায় তার সমস্ত বিশ্বাস এবং এমনকি প্রত্যক্ষও (Perceptions) এই মেজাজ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সে ক্রমশই বিশ্বাস করতে শুরু করে, সেই হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি ; তার তখন নানা রকম ভ্রম-প্রত্যক্ষ (Illusion) এবং এমনকি অমূল প্রত্যক্ষও (Hallucination) ঘটতে থাকে। এক ব্যক্তিকে সে অন্য ব্যক্তি বলে ভুল করতে শুরু করে। হয়ত

হাসপাতালের ডাক্তারকে দেখে তার মনে হয়, "এই তো আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া ছোট ভাইটি! আমি এখন পৃথিবীর রাজা হতে চলেছি; ওকে আমার সিংহাসনের পাশে বসিয়ে দেবো।" অমূল প্রত্যক্ষ হিসাবে সে হয়ত নানা রকম দৈববাণীও শুনতে শুরু করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই এই ব্যক্তির আচরণ একেবারে বদলে যায়। রোগী তখন চরম হতাশা, বিষণ্ণতা, নিরাশা, অনুতাপ প্রভৃতির অতলে ডুবে যেতে পারে। রোগী তখন কথা পর্যন্ত বলতে চায় না; নড়তে-চড়তে চায় না, বা, বড় জোর কেউ কাছে এলে হাত নেড়ে সরে যেতে ইংগিত করে। এই অবস্থায় রোগী যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে একান্তই সম্মত হয়, তাহলে তার কথা থেকে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে তখন এই চূড়ান্ত বিষণ্ণতার অনুরূপ নানা রকম অমূলক বিশ্বাস ও ধারণা বর্তমান। অর্থাৎ, এই অবস্থায় তার বিবিধ নূতন ধরনের অমূল প্রত্যক্ষও ঘটছে। হয়ত সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে জীবনে সে অত্যন্ত বীভৎস কোন পাপ করেছে, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্তই হয় না; কিংবা সে হয়ত তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কথা শুনতে পাচ্ছে—তারা সকলেই যেন তাকে কঠিন শাস্তি দিতে উদ্যত!

খেদোন্মত্ত বাতুলতার অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই পালা করে বা পর্যায়ক্রমে এ-জাতীয় বিরুদ্ধ অবস্থা দেখা গেলেও রোগীবিশেষের দৃষ্টান্তে মাঝে মাছে শুধু স্ফূর্তির অবস্থাই দেখা দিতে পারে, রোগীবিশেষের দৃষ্টান্তে আবার মাঝে মাঝে শুধু বিষণ্ণতার অবস্থাও দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, কোনো রোগী কিছুদিন বা কয়েকমাস দারুণ স্ফূর্তির অবস্থায় থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তেমনি কোন রোগী কিছুদিন বা কয়েকমাস বিষণ্ণতা ও অবসন্ন অবস্থায় থেকে আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। যাদের মধ্যে পালা করে উক্ত দ্বিবিধ অবস্থা দেখা দেয় তাদেরও সারা জীবন ধরে পালা করে এ-রকম দ্বিবিধ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলে না; দীর্ঘ দিন ধরে—জীবনের বেশির ভাগ সময়ই—তারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনই যাপন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের জীবনে উক্ত উন্মাদ অবস্থা দেখা দেয়।

আ ॥ প্যারানোইয়া (Paranoia)

'প্যারানোইয়া'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'ভ্রম-বাতুলতা' নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। কেননা, এই রোগের মূল লক্ষণ হল অমূল-প্রত্যয় বা ভ্রান্তি—বাঁধাধরা, অপরিবর্তনীয় ভ্রম (fixed, unalterable delusion)। রোগীদের ভ্রান্তি (delusion) প্রধানত দু'রকমের: (১) বিভবভ্রান্তি (Delusion of grandeur), (২) পীড়নভ্রান্তি (Delusion of persecution)।

বিভবভ্রান্তি মানে হল নিজেকে মস্ত ব্যক্তি মনে করা। রোগীর বদ্ধ ধারণা সে আসলে হল রাজা-উজির, বা, মহাপুরুষ, বা, বিরাট কোন ব্যবসাদার, বা, রাজনৈতিক নেতা, বা, বিজ্ঞানী, বা, এ-জাতীয় কোন ব্যক্তি। সে নিজেকে বুদ্ধদেব, ক্রাইস্ট, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ন, ইংলণ্ডের রাজা, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি প্রভৃতি কোন একরকম মহামানব মনে করে। রোগী চিৎকার করে ভ্রান্তিটি ঘোষণা করতে পারে, ভ্রান্তি-সুলভ বেশভূষা পরিধানের প্রয়াস করতে পারে: যেমন, কোমরে একটা কাঠের টুকরা ঝুলিয়ে তলোয়ারধারী রাজা সাজবার কল্পনা করতে পারে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পীড়নভ্রান্তি মানে হল নিজের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্ত, পীড়ন ইত্যাদির ভ্রান্তি। অর্থাৎ, রোগীর বদ্ধ ধারণা তার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত চলেছে: তাকে আক্রমণ করার জন্যে অন্যেরা প্রস্তুত হচ্ছে, তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ই। সিসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) বা ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্‌স্‌ (Dementia Praecox)

সিসোফ্রেনিয়ার মূল লক্ষণ হল সমগ্র ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি। রোগী ক্রমশই বহির্বাস্তব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় বা বাস্তব পরিবেশের প্রতি একান্ত উদাসীন হয়ে পড়ে এবং যেন এক কাল্পনিক বা মনগড়া জগতের ঐকান্তিক অধিবাসী হয়ে যায়। এমনকি জামাকাপড় পরা, খাওয়া প্রভৃতি অপরিহার্য বিষয়েও তার হুঁস থাকে না; কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, বা আপন মনে বিড়বিড় করে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বাভাবিক কাজকর্ম করা বা নড়াচড়া তো দূরের কথা—এমনকি নিজের শরীর সম্বন্ধেও তার কোন হুঁস নেই: তার শরীরকে কোন একরকম বিশেষ ভঙ্গিতে রেখে দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ভঙ্গি অপরিবর্তিত থাকে। রোগীদের সাধারণত অনেক রকম অমূল প্রত্যক্ষ (Hallucination) ঘটে: তারা নানা রকম কাল্পনিক শব্দ শুনতে পায়, নানা রকম কাল্পনিক দৃশ্য দেখতে পায়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন কোন রোগী অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে; এই অঙ্গভঙ্গিগুলি আসলে তাদের অমূল প্রত্যক্ষর সঙ্গে সম্পর্কিতই—রোগী হয়ত আকাশে কোন ব্যক্তিকে দেখছে এবং হাত নেড়ে তাকে কোন একরকম ইসারা করছে।

এই বাতুলতার উপসর্গ আসলে বহুবিধ মত হতে পারে; এখানে তার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায়, সমস্ত উপসর্গই একটি মূল বৈশিষ্ট্যের

পরিচায়ক : বাস্তব পরিবেশকে প্রত্যাখান করে কোন এক কাল্পনিক পরিবেশে মগ্ন হওয়া।

৩। চিকিৎসা

হাসপাতালে বিবিধ উপায়ে বাতুলতা রোগের চিকিৎসা হয় : ইলেকট্রিক সক্, ওষুধবিষুধ, রোগীদের কাজকর্মে নিয়োগ করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, আমাদের পক্ষে তার প্রয়োজনও নেই। আধুনিক বিজ্ঞানীরা 'ফাংসানাল' বাতুলতা রোগের কারণ সংক্রান্ত কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেননি। আগেই বলা হয়েছে, 'ফাংসানাল' বাতুলতার (Functional Psychosis) কোন সুস্পষ্ট শারীরিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, বা, অন্তত এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্যই 'মানসিক কারণ' নিয়ে নানা রকম মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছে; কিন্তু অন্তত এখন পর্যন্ত সেগুলি বিবিধ মতবাদমাত্রই—সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনঃসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-তত্ত্ব*

(Psychoanalysis and Freud's Theory of Dream)

১॥ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের পরিচিতি প্রসঙ্গে সাধারণত প্রথমে সম্প্রদায়টির উদ্ভব সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করা হয়। সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ও প্রধানতম প্রচারকের নাম সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড (Sigmund Freud)। উনবিংশ শতকের শেষে তিনি ভিয়েনা শহরে স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিকিৎসা শুরু করেন। এই সময় ভিয়েনা শহরে বড়ো ডাক্তার ছিলেন জোসেফ্ ব্রয়ার (Joseph Breuer); ফ্রয়েড তাঁরই সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করেন এবং ব্রয়ারের কাছ থেকে একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক রোগিণীর কথা শোনেন। মহিলাটি হিস্টিরিয়া রোগে ভুগছিলেন এবং ডাক্তারের কাছে মনের সমস্ত কথা বলতে বলতে ক্রমশই রোগ-লক্ষণ মুক্ত হন। যাতে রোগিণী মনের সমস্ত কথা অকপটে বলতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ব্রয়ার তাঁকে সংবিষ্ট (hypnotize) করতেন। ফ্রয়েডেরও মনে হয়, এই পদ্ধতিতে মানসিক রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা সম্ভব হতে পারে ; অতএব ব্রয়ার ও ফ্রয়েড উভয়েই এই পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁরা তখন পদ্ধতিটির নাম দেন 'বিরেচন চিকিৎসা' (Cathartic Treatment)। এই অবস্থায় তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, রোগীর জীবনের কোন অতীত ঘটনার বিস্মৃত রেশের সঙ্গে জড়িত নানা রকম আবেগ রোগীর মনে বদ্ধ থাকার ফলেই রোগী পীড়িত হয় ; অতএব সেই ঘটনার স্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ করতে পারলে এবং স্মৃতি-সংলগ্ন রুদ্ধ আবেগগুলিকে মন থেকে মুক্তি দিতে পারলে রোগীর মনে ক্রমশই শান্তি ফিরে আসে এবং সে রোগমুক্ত হয়। অর্থাৎ, পদ্ধতিটি অনেকাংশে জোলাপ দিয়ে পেট পরিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয় ; কিংবা, ফ্রয়েডেরই জনৈকা রোগিণীর বর্ণনানুসারে, ঝুল ঝেড়ে

* ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বর ব্যাখ্যায় বাংলা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট পুস্তক বর্তমান ; পুস্তকটির ভূমিকা মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটিও বিশেষ মূল্যবান। যথা : "স্বপ্ন", ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু রচিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সমর্থক ও প্রচারক হিসাবে ডাঃ বসু ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বর্তমান পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থের বিশেষ সহায়তা গৃহীত হয়েছে এবং গ্রন্থটি থেকে নানা উক্তি উদ্ধৃতও হয়েছে।

চিমনি সাফ করার মতো। কিন্তু এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তখন নানা রকম সামাজিক সমালোচনা হয়, বিশেষত এই কারণে যে চিকিৎসকের পক্ষে এইভাবে রোগিণীদে গোপন জীবনকাহিনী শোনা সঙ্গত নয়। তাই সামাজিক সুখ্যাতি বজায় রাখা উদ্দেশ্যে ব্রয়ার এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন। ফ্রয়েড কিন্তু অদম্য উৎসাহে এ পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেন। তিনি দেখেন, রোগীর মনে অতীত ঘটনার স্মৃ এবং তৎসংলগ্ন অবরুদ্ধ আবেগগুলি উদ্বুদ্ধ করা প্রায়ই সহজসাধ্য নয়; কিন্তু রোগীকে সংবিষ্ট অবস্থায় (Hypnotic State) নিয়ে যেতে পারলে তা তুলনায় সহজসাধ হয়। অতএব তিনি সে-সময়ের সংবেশন-পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যেরন্‌হাই (Bernheim) প্রভৃতির কাছে সংবেশন-পদ্ধতি শিক্ষা করেন। কিন্তু ক্রমশই তি মানসিক রোগের চিকিৎসায় সংবেশন-পদ্ধতির নানা রকম দোষত্রুটি অনুভব করে এবং তা পরিত্যাগ করে অনেক বেশি সময়-সাপেক্ষ ও ধৈর্য-সাপেক্ষ তবুও অনে বেশি নির্ভরযোগ্য অপর এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি এই নবপদ্ধতিটির না দেন 'অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি' (Free Association Method)। কিন্তু শুধু পদ্ধ পরিবর্তনই নয়: সেই সঙ্গে মানসিক রোগের স্বরূপ সংক্রান্ত—এবং সাধারণভা মনের গঠন সংক্রান্তও—ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত সংবেশন-পদ্ধ পরিত্যাগের বিশেষ কারণই হল উক্ত ধারণা-পরিবর্তন। অর্থাৎ, ফ্রয়েডের প চিকিৎসা-পদ্ধতির পরিবর্তন এবং মানসিক রোগের প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণার মৌলি পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত ছিল। অতএব ফ্রয়েড বলেন, সংবেশন-পদ্ধ পরিত্যাগ করে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকেই মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ে প্রকৃত সূত্রপাত।

২ ॥ অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Free Association Method)

আধ-অন্ধকার ঘরে কৌচ বা আরাম-কেদারার উপর রোগী শরীরকে সম্পূ (বা যথাসম্ভব) শিথিল করে শুয়ে থাকবেন; তিনি কোনো বিষয়েই মন নিব করবেন না; মন আপনা-আপনি যেদিকে যেতে চায় সেইদিকেই মনকে ছে দিতে হবে। এই অবস্থায় তাঁর মনে যে-সব কথা উঠবে সমস্ত কথাই তিনি অকপ বলে যাবেন। কথাগুলি সম্বন্ধে রোগী কোনরকম বিচার-বিবেচনা করবেন না। তাঁ নিজের বিচারে নানা কথা তুচ্ছ, অর্থহীন, অবান্তর, আজগুবি, অশ্লীল, অসামাজি ইত্যাদি নানা অর্থে আপত্তিকর হতে পারে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিচারে সম কথাই বলে যাবেন। "ন্যায্য, অন্যায্য, ভাল, মন্দ, শ্লীল, অশ্লীল, আবশ্যক, অনাবশ্য ইত্যাদি কোন বিচার না করিয়াই এবং লজ্জা, সংকোচ, ভদ্রতা ইত্যাদির কোন বা

। মানিয়াই'' তাঁকে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, শরীর ও নের সম্পূর্ণ (বা যথাসম্ভব) শিথিল বা নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রোগীর মনে সম্পূর্ণ স্বাধীন । স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে-সব ধারণার উদয় হয় বা যে-সব কথা ভেসে ওঠে সেগুলিকেই অবাধ অনুষঙ্গর উপাদান' (Free Association Material) আখ্যা দেওয়া হয়; বং ফ্রয়েড দাবি করেন যে এগুলিকে বিচার করে এবং এগুলির অন্তর্নিহিত মূল-ত্র অনুসরণ করে রোগ বা রোগ-লক্ষণের প্রকৃত বা মূল কারণ উদ্ঘাটন করা সম্ভব। সই কারণ রোগীর কাছে সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হলেই তাঁর রোগমুক্তি ঘটে: রোগ । রোগ-লক্ষণ থেকে তিনি মুক্তি পান।

ফ্রয়েডের স্বপ্ন-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এই পদ্ধতিটির আলোচনায় প্রত্যাবর্তন রবো। কিন্তু তার আগে আরো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেখা দরকার। প্রথমত, উপরোক্ত পদ্ধতিকেই মানসিক রোগের প্রকৃষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে গ্রহণ করা ানেই মানসিক রোগের প্রকৃত কারণ সংক্রান্ত কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। দ্বিতীয়ত, মানসিক রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ হিসাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ানেই সাধারণভাবে মনের গঠন সংক্রান্ত কোন এক মতবাদ গড়ে তোলা। অতএব, প্রশ্ন হল মনের গঠন সংক্রান্ত ফ্রয়েড কোন্ মতে উপনীত হন? এবং মনোবিকারের প্রকৃত কারণ হিসাবে তিনি কী অনুমান করেন? প্রশ্ন দু'টি পরস্পর-সম্পর্কিত এবং এ-দু'টির উত্তর না-দেখলে স্বপ্ন সংক্রান্ত ফ্রয়েডের নির্দিষ্ট মতবাদটি বোঝা যাবে না।

৩ ॥ নির্জ্ঞান (Unconscious)

উপরোক্ত 'অবাধ ভাষানুষঙ্গ উপাদান' (Free Association Materials) াপাতদৃষ্টিতে প্রায়ই অত্যন্ত এলোমেলো ও অর্থহীন মনে হলেও ফ্রয়েডের ক্রমশই রণা হয় যে এগুলির আপাত-পরিচয় ও প্রকৃত তাৎপর্য অভিন্ন নয়। কেননা াসলে এগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রোগীমানসের গহীন-গোপন প্রদেশের ভাব-আবেগ ারাই। কিন্তু রোগী নিজে তাঁর নিজের এ-জাতীয় গোপন-গহীন ভাবাবেগের কথা ছুই জানেন না; অর্থাৎ সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন। তবু ফ্রয়েড দাবি রেন, 'অবাধ অনুষঙ্গ উপাদানগুলি'কে বিচার করে বা সেগুলির মূলসূত্র অনুসন্ধান রে উক্ত ভাবাবেগের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এবং সেই ভাব-আবেগের রূপটি রোগীর নিজের কাছে সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত করতে পারলে রোগী ারোগ্যলাভ করবে। "অবাধ ভাষানুষঙ্গের দ্বারা বিশ্লেষণের সাহায্যে মনের জ্ঞাত প্রদেশের ভাবধারা রোগীর গোচরে আনার নাম সাইকোঅ্যানালিসিস Psychoanalysis) বা মনঃসমীক্ষণ।" ফ্রয়েড প্রবর্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতির

এইটিই হল মূল উদ্দেশ্য ; অতএব তাঁর সম্প্রদায়ও মনঃসমীক্ষণ বা সাইকোএ্যানালিসিস্ নামেই উল্লিখিত। এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসককেও মনঃসমীক্ষক বা সাইকোএ্যানালিস্ট (Psychoanalyst) বলে ; তাঁর মূল কাজ হল রোগীর কাছ থেকে অবাধ ভাবানুষঙ্গ উপাদান গ্রহণ করা এবং তা বিশ্লেষণ করে রোগীর মনের অজ্ঞাত প্রদেশের ভাবধারা রোগীর গোচরে আনা।

অতএব ফ্রয়েডের মতে রোগীর মনের প্রকৃত গভীর প্রদেশটি রোগীর নিজের কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, একমাত্র মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যেই তা উন্মোচিত হতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র মানসিক রোগীই নয়, সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের বেলাতেও একই কথা। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মন বলতে যেটুকু সম্বন্ধে সচেতন তাঁর মন আসলে শুধু সেইটুকুই নয়। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় মনের এটুকু হল 'সংজ্ঞান' (Conscious mind) ; কিন্তু সংজ্ঞান মানব-মনের নেহাতই উপরতল বা বহিঃপ্রদেশ (superficial) মাত্র ; কিন্তু মানব-মনের যেটি প্রকৃত গভীর প্রদেশ সেটি মানুষের কাছে শুধু অজ্ঞাতই নয়, স্বাভাবিক উপায়ে অজ্ঞেয়ও ; শুধুমাত্র মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যেই সেটি জানা সম্ভব। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায়, মনের এই অজ্ঞাত ও গভীর প্রদেশই হল 'নির্জ্ঞান' (Unconscious mind)।

নির্জ্ঞান সংক্রান্ত নির্দিষ্ট মতবাদটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মূল ভিত্তি। শব্দটি অবশ্য নূতন নয় ; কিন্তু শব্দটির ফ্রয়েডীয় বা পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণ নূতন। অর্থাৎ সাবেকী মনোবিজ্ঞানেও অচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) উল্লিখিত হয়েছে ; কিন্তু যে-অর্থে উল্লিখিত হয়েছে তার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় অর্থের বিশেষ পার্থক্য আছে।

সাবেকী মনোবিজ্ঞানে অচেতন বলতে বোঝায় অতীত অভিজ্ঞতাগুলির সংরক্ষণ-ক্ষেত্র বা অতীত অভিজ্ঞতার গুদামঘর জাতীয় কিছু। অতীতে একটি অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, বর্তমানে সেই অভিজ্ঞতা স্মৃতিরূপে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। এই পুনরুৎপাদন থেকেই প্রমাণ, অতীত অভিজ্ঞতাটি মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, বা, মুছে যায়নি। মনেরই কোথাও-না-কোথাও সংরক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু কোথায় সংরক্ষিত হয়েছিল? সংজ্ঞানে নয় ; কেননা পুনরুৎপাদনের আগে পর্যন্ত সে-বিষয়ে চেতনা ছিল না। অতএব অতীত অভিজ্ঞতাটি মনের নির্জ্ঞান প্রদেশেই সংরক্ষিত হয়েছিল।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মত সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমত, নির্জ্ঞানের উপাদান সহজে সংজ্ঞানের স্তরে উদ্বুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, স্বাভাবিক উপায়ে (মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সহায়তা ব্যতীত) তা একান্তই অসম্ভব। কারণ, নির্জ্ঞান-উপাদানের পক্ষে সংজ্ঞানের স্তরে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তির নিজের মধ্যেই একরকম প্রচণ্ড বাধা আছে।

দ্বিতীয়ত, নির্জ্ঞান বলতে অতীত অভিজ্ঞতার কোন একরকম সংরক্ষণ-ক্ষেত্র বা গুদামঘর জাতীয় কিছু বোঝায় না; ফ্রয়েডীয় মতে নির্জ্ঞানের স্বরূপ হল অন্ধ আপোষহীন যৌন বাসনামাত্র (Sexual Desires)। তৃতীয়ত, সংজ্ঞানে যে-ঘটনা ঘটে তা মূলতই—বা, অন্তত তার অধিকাংশই—নির্জ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত।

নির্জ্ঞানের এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য কামপ্রবৃত্তি সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদটি থেকে আলোচনা শুরু করা সুবিধাজনক। প্রচলিত ধারণা অনুসারে বয়ঃসন্ধিকালেই কামপ্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ ঘটে; শিশুর মধ্যে কামপ্রবৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ফ্রয়েড দাবি করেন, অত্যন্ত শৈশবেই কাম-প্রবৃত্তির সূত্রপাত হয়। বস্তুত, "বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যত প্রকার কামবিকৃতি দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক শিশুর মনে তাহার সকলগুলিরই অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। এজন্যই ফ্রয়েড শিশুকে বহুমুখকামী (Polymorpho-perverse) বলিয়াছেন।" ফলে শিশু স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সমস্ত রকম কামচেষ্টাও করে। কিন্তু কামচেষ্টার উপক্রম করলেই সে মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বাধা পায়; নানা রকম নিষেধ মানতে-মানতেই শিশু বড় হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের ফলে তার মনে ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য, কর্তব্য অকর্তব্য মূলক নানামুখী বিবেক গড়ে ওঠে; অর্থাৎ, তার নিজের মনের মধ্যেই গড়ে ওঠে সামাজিক শাসনের একরকম প্রতিনিধি-বিশেষ। তখন সে বাইরের বাধা-নিষেধের অপেক্ষা না-করে নিজের অসামাজিক কামভাবগুলিকে নিজে নিজেই নিগৃহীত করার আয়োজন করে। ফলে কামভাবগুলি ক্রমশই নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হয়। "অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে অসামাজিক ইচ্ছার নির্বাসনের নাম Repression বা অবদমন।" অবদমিত (Repressed) ভাবগুলি যাতে সংজ্ঞানে উঠে আসতে না পারে তার জন্যে সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মন নানা উপায় অবলম্বন করে; কিন্তু অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপ এবং সে-ইচ্ছাকে নির্জ্ঞানে অবরুদ্ধ রাখার যে-আয়োজন—তার কিছুই আমরা জানতে পারি না। অর্থাৎ, অবদমন ব্যাপারের অধিকাংশই নির্জ্ঞান মনে সম্পাদিত হয়। শুধু তাই নয়; নির্জ্ঞানে নির্বাসিত অসামাজিক ইচ্ছাকে সংজ্ঞানের স্তরে উদ্ঘাটিত করার যে-কোন প্রয়াসের বিরুদ্ধে মনের মধ্যেই একরকম প্রচণ্ড বাধা সৃষ্ট হয়; ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এই বাধার নাম 'রেসিস্টেন্স' (Resistance)। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রধানতম প্রয়াসই হল রোগীর নির্জ্ঞান তাঁর গোচরে আনা বা সংজ্ঞানে আনা। স্বভাবতই ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন, চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁদের প্রধানতম সমস্যা হল রোগীর রেসিস্টেন্স নিয়ে। রোগীর মনের এই বাধা বা রেসিস্টেন্স দূর করাই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ। ফ্রয়েড বলেন,

রেসিস্টেন্স ভাঙার পক্ষে একটি পরিস্থিতি বিশেষ সহায়ক হয়। ফ্রয়েডীয় পরিভাষা পরিস্থিতিটিকে ট্রান্‌স্‌ফারেন্স (Transference) বলা হয়। দিনের পর দি মনঃসমীক্ষকের কাছে মনের কথা বলতে বলতে মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে রোগীর একরক আবেগমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—রোগী সাময়িকভাবে মনঃসমীক্ষকের "প্রে পড়েন।" অবশ্যই এই প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়—বাস্তব জীবনে প্রকৃত প্রেমাস্পদে যে-প্রেম থেকে রোগী বঞ্চিত হয়েছেন সাময়িকভাবে চিকিৎসকের উপরই সে প্রেম গিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিকে ট্রান্‌স্‌ফারেন্স (Transference) বলে রোগ-নিরাময়ের সঙ্গে পরিস্থিতিটি পরিবর্তিত হয়; কিন্তু চিকিৎসার জন্য রেসিস্টে ভাঙার পক্ষে পরিস্থিতিটি বিশেষ সহায়ক।

অতএব দেখা গেল, ফ্রয়েডীয় মতে নির্জ্ঞান আসলে হল সামাজিক বিচা নিন্দনীয়—অতএব অবদমিত—যৌন-ইচ্ছাই। এবং এই নির্জ্ঞানের পক্ষে সংজ্ঞা উপনীত হবার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের মনের মধ্যেই বিশেষ বাধা আছে। এবারে দে যাক, সংজ্ঞানের নানাবিধ ঘটনা ফ্রয়েডীয় মতে কীভাবে নির্জ্ঞান দ্বারাই নিয়ন্ত্রি হয়ে থাকে।

"যে মানসিক ভাবসমষ্টি বা যে মানসিক শক্তি অসামাজিক কামজ ইচ্ছা অবদমিত করে এবং নির্জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে মনের প্রহরী বলা যাই পারে।" বস্তুত এই অর্থেই ফ্রয়েডীয় রচনায় সেন্‌সর (Censor) শব্দটি ব্যবহৃত এই প্রহরী বা 'সেন্‌সর' সবসময় সমান সতর্ক থাকে না; তার অসতর্কতার সুযো অবদমিত কামজ ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজন করে। কেননা, অবদমিত হ ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, শক্তিবিহীনও হয়ে যায় না। ইচ্ছার প্রকৃতিই হ পরিতৃপ্তি লাভের প্রয়াস। অতএব অবদমিত কামজ ইচ্ছাগুলি সর্বদাই কোন-ন কোন ভাবে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে এবং সেন্‌সর বা প্রহরীর অসতর্কতা এ পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে: জেলের প্রহরী অসতর্ক হলে যেমন কয়েদী বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু মনের প্রহরীর অসতর্কতা সত্ত্বে অবদমিত ইচ্ছার পক্ষে তার নিজস্ব রূপে পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভব নয়। তাহলে প্রহ সজাগ হয়ে উঠবে; তার অসতর্কভাব ভেঙে যাবে। অতএব, প্রহরী অসতর্কতার সুযোগে নির্জ্ঞানে অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছা চরিতার্থতা বা পরিতৃ লাভের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ (disguise) ধারণ করতে বাধ্য হয়। অবদমিত ইচ্ছা নানা রকম ছদ্মবেশী চরিতার্থতার কথা (Disguised satisfaction) মনঃসমীক্ষ সম্প্রদায়ে আলোচিত হয়েছে। যথা: দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি, হাসিতামাসা, স্বপ্ন মানসিক রোগ-লক্ষণ। এগুলির মধ্যে আমরা বিশেষত স্বপ্নের আলোচনা করবো।

১॥ স্বপ্ন-তত্ত্ব (Theory of Dream)

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছাপূরণ বা ইচ্ছার চরিতার্থতা (Wish-fulfilment)। অবশ্য, বিশেষত শিশুদের স্বপ্নে (Infantile dreams) কখনো কখনো কোন সংজ্ঞান ইচ্ছাই সরাসরিভাবে চরিতার্থতা লাভের আয়োজন করে। যেমন : পাহাড়ে বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না ; শিশু স্বপ্ন দেখলো পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় মতে এ-জাতীয় স্বপ্নেরও প্রকৃতপক্ষে কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে ; কিন্তু আপাতত সে-আলোচনার জটিলতায় প্রবেশ না-করেও বলা যায় যে মনঃসমীক্ষণ-মতে প্রায় সমস্ত স্বপ্নই—বিশেষত পরিণত বয়স্কদের সমস্ত স্বপ্নই—সামাজিক বিচারে বিশেষ নিন্দনীয়, অতএব নির্জ্ঞানে অবদমিত কামপ্রবৃত্তির বা যৌন ইচ্ছার ছদ্মবেশী চরিতার্থতা মাত্র।

এ-জাতীয় স্বপ্ন-তত্ত্বর বিরুদ্ধে অবশ্যই দু'টি প্রাথমিক আপত্তি উঠবে। সেই দু'টি আপত্তির ফ্রয়েডীয় উত্তর দেখা যাক।

প্রথমত, আমরা চলতি কথায় বলি "স্বপ্ন দেখা"। অর্থাৎ, স্বপ্ন প্রধানতই দার্শন প্রতিরূপ (visual imagery)। কিংবা, স্বপ্ন মূলতই দর্শন-অভিজ্ঞতা (visual experience)। অথচ, ফ্রয়েড বলছেন, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছা-পূরণ,—কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। অতএব প্রশ্ন উঠবে, দর্শন-অভিজ্ঞতা কীভাবে ইচ্ছার—বিশেষত কামপ্রবৃত্তির—চরিতার্থতা হতে পারে? উত্তরে ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, ইচ্ছার চরিতার্থতা দু'ভাবে ঘটে থাকে। এক : সরাসরি বা প্রত্যক্ষ চরিতার্থতা (direct satisfaction, বা, direct wish-fulfilment)। দুই : পরোক্ষ বা প্রতীকী চরিতার্থতা (vicarious satisfaction)। যেমন ধরা যাক, মিষ্টি খাবার ইচ্ছা। মিষ্টি খেয়ে ইচ্ছাটিকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব। কিন্তু মিষ্টি খাবার দৃশ্য পরিদর্শন করেও পরোক্ষভাবে ইচ্ছাটি কোন একভাবে চরিতার্থ হতে পারে ; তারই নাম প্রতীকী চরিতার্থতা। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে মিষ্টি খাওয়া নিষিদ্ধ ; অতএব ইচ্ছাটিকে সরাসরিভাবে চরিতার্থ করায় তাঁর পক্ষে বাধা আছে। তিনি কিন্তু মিষ্টি খাবার দৃশ্য দেখতে ভালবাসেন ; অর্থাৎ, এইভাবে মিষ্টি খাবার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারেন। প্রতীকী চরিতার্থতার প্রকট দৃষ্টান্ত অবশ্য অশ্লীল (pornography) গল্প পড়ে বা অশ্লীল চিত্র দর্শন করে যৌন বাসনার কোন একরকম চরিতার্থতা। যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যৌনপ্রবৃত্তিকে সরাসরিভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব ; কিন্তু যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না-করেও এ-জাতীয় ক্রিয়াসংক্রান্ত গল্প বা চিত্রের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও নিশ্চয়ই যৌন বাসনারই কোন একরকম চরিতার্থতা ঘটে। অতএব, স্বপ্ন মূলতই দর্শন-অভিজ্ঞতা হলেও তারই মাধ্যমে ইচ্ছা-পূরণ

হতে পারে। বস্তুত, ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্ন হল ইচ্ছার প্রতীকী চরিতার্থতাই (vicarious satısfaction)।

দ্বিতীয়ত, না-হয় মেনে নেওয়া গেল, দর্শন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও ইচ্ছা-পূরণ—অর্থাৎ, ইচ্ছার প্রতীকী চরিতার্থতা—ঘটতে পারে। কিন্তু আপত্তি উঠবে, অধিকাংশ স্বপ্নর দৃশ্য ঘটনাকে ইচ্ছা-বিশেষের প্রতীকী চরিতার্থতা মনে করাও কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। কেউ হয়ত স্বপ্নে দেখলেন, তিনি শ্যামবাজারের মোড়ে হাঁটছেন, বা, কূপে পতিত হচ্ছেন, বা, ট্রামরাস্তায় দু'টি বাসের সংঘর্ষ ঘটল। ফ্রয়েড কি বলবেন, ব্যক্তিটির শ্যামবাজার যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, বা, কূপে পতিত হবার ইচ্ছা হয়েছিল, বা, ইচ্ছা হয়েছিল দু'টি বাসের সংঘর্ষ ঘটে? ফ্রয়েড অবশ্যই তা বলবেন না। কেননা, তাঁর মতে স্বপ্ন হল নির্জ্ঞানে অবদমিত যৌন ইচ্ছারই ছদ্মবেশী চরিতার্থতা। কিন্তু সাধারণত আমরা যে-সব স্বপ্ন দেখি সেগুলিতে কামপ্রবৃত্তির কোনরকম পরিচয় কোথায়?

উত্তরে ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্নের আপাত বিষয়বস্তু বা প্রকট বিষয়বস্তু (Manifest content) এবং গূঢ় বিষয়বস্তু (Latent content) এক বা অভিন্ন নয়। স্বপ্নে আমরা যে-দৃশ্য বা যে-ঘটনা বাস্তবিকই দেখি বা প্রত্যক্ষ করি তা হল স্বপ্নের প্রকট বিষয়বস্তু বা আপাত বিষয়বস্তু। কিন্তু এই প্রকট বিষয়বস্তুই স্বপ্নের প্রকৃত বিষয়বস্তু নয়। তার অন্তরালে কোন গূঢ় বিষয়বস্তু বর্তমান। বস্তুত স্বপ্নের প্রকট বিষয়বস্তুটি এই গূঢ় বিষয়বস্তুরই ছদ্মবেশী রূপান্তরমাত্র। স্বপ্নর বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে (Interpretation of Dreams) স্বপ্নর সেই গূঢ় বিষয়বস্তুর স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব। এবং এই গূঢ় বিষয়বস্তুর পরিচয় থেকে আমরা দেখি যে তা নির্জ্ঞানে অবদমিত অসামাজিক যৌন বাসনার প্রতীকী চরিতার্থতা মাত্র।

কিন্তু স্বপ্ন বিশ্লেষণের বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি কী? ফ্রয়েডের মতে তা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিই। আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে পদ্ধতিটির উল্লেখ করেছি। স্বপ্ন বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে মনঃসমীক্ষকেরা কীভাবে পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন বর্তমানে তা উল্লেখ করা যাক।

৫ ॥ স্বপ্ন ব্যাখ্যার পদ্ধতি (Technique of Dream-interpretation)

স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলা হয়, স্বপ্ন দেখার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্বপ্নটি লিখে ফেলতে। স্বপ্নটি (বা স্বপ্নর নানা অংশ) স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে শীঘ্রই ভুলে যাবার সম্ভাবনা। নিদ্রাবস্থায় মনের প্রহরীর অসর্তকার সুযোগে অবদমিত ইচ্ছা ছদ্মবেশে চরিতার্থ খোঁজে বলে। জাগ্রত অবস্থায় মনের প্রহরী যখন সতর্ক হয়ে ওঠে তখন তা স্বপ্নটির পরিচয় সংজ্ঞান মন থেকে নির্বাসিত করতে চায়; তাই স্বপ্নকে ভুলে যাবার প্রবণতা। অতএব, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটির কথা লিখে ফেলা বাঞ্ছনীয়।

স্বপ্নদ্রষ্টা মনঃসমীক্ষকের বা ব্যাখ্যাকারীর কাছে স্বপ্নটির যথাসম্ভব নিখুঁত পরিচয় নিয়ে যাবেন। ব্যাখ্যাকারীর নির্জন আধো-অন্ধকার ঘরে তিনি বিছানা বা কৌচের উপর চোখ বন্ধ করে এবং শরীর যথাসম্ভব শিথিল করে শুয়ে পড়বেন এবং তাঁর মাথার কাছে ব্যাখ্যাকারী কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসবেন। প্রথমে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নর যথাসম্ভব নিখুঁত পরিচয় দেবেন; ব্যাখ্যাকারী তা লিখে নেবেন। তারপর তিনি স্বপ্নটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভেঙে নেবেন। স্বপ্নদ্রষ্টার মাথার কাছে বসে ব্যাখ্যাকারী স্বপ্নর এক-একটি করে অংশ স্বপ্নদ্রষ্টাকে শোনাবেন। প্রতিটি অংশ শুনে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে যে সব কথা বা যে-সব ভাবের উদয় হয় তিনি তা বলে যাবেন। অবশ্যই স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে বিচার-বিবেচনার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ স্বপ্নর অংশটি শুনে তাঁর মনে যে-সব কথা আসবে সেগুলি যতো অবান্তর, অর্থহীন, অশ্লীল বা আপত্তিকর—যাই-ই মনে হোকনা কেন, সমস্ত কথা বলে যেতে হবে। "মনের লাগাম একেবারে আলগা করিয়া দেওয়া দরকার।" ফ্রয়েডের মতে তার কারণ হল, স্বপ্নদ্রষ্টা 'মনের লাগাম সম্পূর্ণ আলগা করে' যে-কথাগুলি বলবেন, —অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে যে অবাধ অনুষঙ্গর উপাদান (Free Association Materials) পাওয়া যাবে,—তা থেকেই তাঁর নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপ প্রকাশিত হবে; কিন্তু এই প্রকাশ-সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের মনের মধ্যেই কঠিন বাধা (Resistance) বর্তমান। কিংবা, যা-একই কথা, স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যেই অবাধ অনুষঙ্গর উপাদানগুলি গোপন করবার বিশেষ প্রবণতা আছে, যদিও অবশ্য তিনি নিজে সে-বিষয়ে সচেতন নন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ফ্রয়েডীয় মতে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রধানতম অঙ্গ হল এই বাধা দূর করা বা ভেঙে দেওয়া এবং ট্রান্সফারেন্স (Transference) পরিস্থিতি সেই বাধা দূর করার বিশেষ সহায়ক হয়। মোটের উপর, মনঃসমীক্ষকের মতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও স্বপ্নদ্রষ্টার মনের আভ্যন্তরীণ বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাঁর কৌশলের একটি প্রধান অঙ্গ হল এই বাধা দূর করা বা দুর্বল করা।

এইভাবে, স্বপ্নর এক-একটি অংশ শোনার পর স্বপ্নদ্রষ্টার মনে সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে যতো কথার উদয় হয় ব্যাখ্যাকার তার সবই কাগজে লিখে নেন। এগুলিই হল অবাধ অনুষঙ্গর উপাদান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই উপাদানের মধ্যে বুঝি কোন সামঞ্জস্য নেই—এগুলি বুঝি এলোমেলো অর্থহীন কথামাত্র। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে, এগুলির মূলে প্রকৃতপক্ষে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা থেকেই প্রকাশিত হয় স্বপ্নর গূঢ় তাৎপর্য (latent content)।

৬॥ সমালোচনা

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় মতের প্রভাব বিশে: ব্যাপক হয়েছিল এবং এই প্রভাব শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি—শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অন্যেরা অবশ্য নান রকম আপত্তিও তুলেছিলেন। কারুর মতে কামপ্রবৃত্তির উপর ফ্রয়েড মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপণ করেছেন, কারুর মতে তিনি নির্জ্ঞান নিয়ে আসলে রহস্য সৃষ্টিই করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা বিবিধ যুক্তিতর্কর অবতারণা করেন। তাঁরা দাবি করেন যে তাঁদের কোন সিদ্ধান্তই মনগড়া বা কাল্পনিক নয়; বস্তুত ভূয়োদর্শনের উপরই তাঁদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ফ্রয়েডের কাছে যে-অজস্র তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তারই ভিত্তিতে তিনি নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাছাড়াও, ফ্রয়েড নিজে বারবার একটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। সাধারণের পক্ষে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ-ভাবে তাঁর মতবাদটি বিচার করা আসলে সম্ভবই নয়। পক্ষান্তরে. এই মতবাদের বিরুদ্ধে সাধারণের পক্ষে নানা রকম আপত্তি উদ্ভাবনেরই প্রবণতা আছে। কেননা, সামাজিক বিধিনিষেধের প্রভাবে যে-প্রবৃত্তিগুলি নির্জ্ঞানে অবদমিত হয় মনঃসমীক্ষণ সেগুলিকেই প্রকাশ (expose) করে দিতে চায়; অতএব সাধারণভাবে মনঃ-সমীক্ষণের বিরুদ্ধে একরকম বাধাই (Resistance) স্বাভাবিক। মনঃসমীক্ষণের নানা সমালোচনা আসলে এই বাধারই পরিচায়ক। অতএব, ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গমের জন্য মনঃসমীক্ষণের বিরুদ্ধে সহজাত বাধাটি দূর করা প্রয়োজন। এই বাধার পরিচয় সংজ্ঞানে নয়, নির্জ্ঞানে। তাই সমালোচকের পক্ষে স্বীয় চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করার সম্ভাবনা নেই। ফ্রয়েডীয় মতে নির্জ্ঞানের বাধা অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হল মনঃসমীক্ষণ—অর্থাৎ, মনঃসমীক্ষকের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের নির্জ্ঞান-উন্মোচনের ফলেই মনঃসমীক্ষণের বিরুদ্ধে সহজাত বাধা দূর হতে পারে। এই কারণেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের প্রধানতম উপায়ই হল কোন দক্ষ মনঃসমীক্ষকের কাছে নিজের মনঃসমীক্ষণ করানো।

অতএব ফ্রয়েডীয় মতে মনঃসমীক্ষণের সমালোচনা প্রসঙ্গেও একরকম অধিকারী-ভেদের প্রশ্ন ওঠে। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে নির্জ্ঞান-উন্মোচনের বিরুদ্ধে সহজাত বাধাটি নিজের মধ্যে থেকে দূর না-করলে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষভাবে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, নিস্পৃহভাবে সেগুলির বৈজ্ঞানিক সমালোচনাও সম্ভব নয়। অবশ্যই, মনঃসমীক্ষকের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের নির্জ্ঞান-উন্মোচন বিশেষ সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়-সাপেক্ষও।

অনেকের পক্ষেই তার সুযোগ-সম্ভাবনার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, অন্যেরা যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই মন্তব্য করতে পারেন, উপরোক্ত উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের আয়োজন করে মনঃসমীক্ষকেরা স্বীয় সিদ্ধান্তাবলীকে মন্ত্রগুপ্তির সমতুল্য করে রাখতে চান: এসব ব্যাপার যেন একরকম সাধনার ব্যাপার, অনুভূতির ব্যাপার, উপযুক্তভাবে দীক্ষিত হবার ব্যাপার ; সাধারণ যুক্তিতর্কমূলক বৈজ্ঞানিক বিচারের ব্যাপার নয়।

কিন্তু উপরোক্ত উপায়ে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে অন্যেরা অবশ্যই বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটি পরিস্থিতির নজির দেখাতে পারেন। আগেই বলেছি, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং এই উৎসাহ শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় শিল্পী-সাহিত্যিক মহলেও মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এবং এই পরিস্থিতি থেকেই অনুমিত হতে পারে, ফ্রয়েড তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে যে-স্বাভাবিক বাধা বা আপত্তি-প্রবণতার উল্লেখ করেছেন তা আসলে অতিরঞ্জনেরই পরিচায়ক।

ফ্রয়েডীয় মতের সমালোচনায় আরো দু'টি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে।

সম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ প্রয়াস হল, মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানে পরিণত করা। তারই উপায় হিসাবে সাবেকী অন্তর্দর্শন পদ্ধতি পরিহার করে পরিদর্শনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার আয়োজন হয়েছে। পক্ষান্তরে, ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের সমর্থকেরা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপরই নূতন করে গুরুত্ব আরোপণ করতে চান—মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে নিজের মনের গোপন-গহীন রহস্য উপলব্ধিই ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ।

দ্বিতীয়ত, এইভাবে মনের গোপন-গহীন রহস্য উপলব্ধিই একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকৃত হবার ফলে ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শুধু যে ব্যক্তিত্বর দৈহিক বা শারীরিক ভিত্তি বহুলাংশে অবজ্ঞাত হয়েছে তাই-ই নয়, এমন কি তাঁরা প্রতি পদেই বাস্তব জগতের বিবিধ বস্তু এবং ঘটনার প্রতীকী তাৎপর্যকেই (symbolic significance) একমাত্র তাৎপর্য বলে গ্রহণ করে ব্যক্তির উপর বস্তুজগতের প্রভাবকে স্থূলভাবে অবজ্ঞাই করেছেন। ফ্রয়েডীয় মতে আমাদের নির্জ্ঞান মন প্রতিটি বস্তুর এবং বাস্তব ঘটনার কোন একরকম বিশুদ্ধ মানসিক তাৎপর্য উদ্ভাবন করে এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মানসিক তাৎপর্যই একমাত্র তাৎপর্য বলে স্বীকৃত হবে। অর্থাৎ, বাস্তব পরিবেশের বাস্তব তাৎপর্যটি প্রকৃতপক্ষে গৌণ ; মানসিক তাৎপর্যটিই মুখ্য। এই কারণে অনেকে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদী দর্শনের (Idealistic philosophy) প্রভাব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা (Learning)

১ ॥ শিক্ষার অর্থ (Meaning of Learning)

'শিক্ষা' বলতে আমরা চলতি কথায় বুঝি 'লেখাপড়া শেখা'। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লেখাপড়া অবশ্যই একরকম শিক্ষা, কিন্তু তাই-ই শিক্ষার একমাত্র অর্থ নয়। অর্থাৎ, শিক্ষা শব্দটি মনোবিজ্ঞানে অনেক বেশি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনোবিজ্ঞানীর মতে, শুধুমাত্র মানুষই নয়—মানবেতর প্রাণীর আচরণেও শিক্ষার গুরুত্ব বস্তুত অপরিসীম।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা বলতে ঠিক কী বোঝায় ?

মনোবিজ্ঞানকে আমরা 'আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' অর্থে গ্রহণ করেছি। একদিক থেকে বলা যায়, আচরণ মূলত দু'রকম : (১) শিক্ষা-নিরপেক্ষ (Unlearned) এবং (২) শিক্ষা-লব্ধ (Learned)। দু'টি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। জন্মগ্রহণের পরই শিশু শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী থেকে জীবনধারণের উপযোগী অক্সিজেন সংগ্রহ করে। তার এই আচরণটিকে স্বভাবতই শিক্ষা-নিরপেক্ষ বলা হবে, কেননা এই আচরণ আয়ত্ত করার জন্য তার পক্ষে কোনরকম প্রয়াস বা অনুশীলনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রাণায়াম নামের প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষ এই শ্বাস-প্রশ্বাস মূলক আচরণকেই সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। তাঁর সে-আচরণ স্বভাবতই শিক্ষা-লব্ধ বলে পরিগণিত হবে। কারণ সে-আচরণ আয়ত্ত-সাপেক্ষ এবং তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের উপর নির্ভর করতে হয়। অতএব বলা যায়, অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের পরিণামে আচরণের যে-বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় বা আচরণ যে-ভাবে পরিবর্তিত হয় তা শিক্ষাজন্যই।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী তাই বলেছেন, অতীত আচরণের স্বাক্ষর-সমন্বিত সমস্ত আচরণকেই শিক্ষা-লব্ধ বলা হবে,—যদিও অবশ্যই ক্লান্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ক্রিয়াকর্মের স্বাক্ষর পরিদৃষ্ট হলেও সুস্পষ্ট কারণেই সেগুলিকে শিক্ষা-লব্ধ বলা হবে না। যার ফলে পরবর্তী আচরণের উপর পূর্ববর্তী আচরণের (কম-বেশি) স্থায়ী প্রভাব পড়ে তাই-ই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপদবাচ্য।

একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো, সহজ প্রবৃত্তি প্রভৃতি কয়েক রকম আচরণ ছাড়া আমাদের অধিকাংশ আচরণের দৃষ্টান্তেই পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কম-বেশি

প্রভাব বর্তমান। কথা বলা, চলাফেরা করা থেকে শুরু করে সাইক্‌ল্‌-চড়া, গাড়ি চালানো, টাইপ করা, যন্ত্র নির্মাণ ও পরিচালনা করা, অঙ্ক কষা, সাহিত্য রচনা করা—সবকিছুই শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই কারণেই আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বকে প্রায় অপরিসীম বলা হয়েছে। এই গুরুত্বর ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বলা যায়, শিক্ষার ফলে আমাদের আচরণ অনেক উন্নত হয়—অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমরা অনেক সহজে এবং অনেক বেশি সার্থকভাবে প্রতিযোজনে সমর্থ হই।

২ ॥ থর্ণডাইকের পরীক্ষা (Thorndike's Experiments)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে নানাবিধ সমস্যার সমাধানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষত শিক্ষা প্রসঙ্গেই এই পদ্ধতি সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে থর্ণডাইক পরিচালিত পরীক্ষাগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে যুগান্তকারী বলা যায়। অতএব, এখানে থর্ণডাইকের পরীক্ষাগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখা যাক।

থর্ণডাইক্ ইঁদুর, বেড়াল প্রভৃতি নানা রকম পশু নিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু পরীক্ষা পরিচালনা করেন, এগুলির মধ্যে বেড়ালদের নিয়ে তাঁর পরীক্ষাগুলিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বেড়াল নিয়ে পরীক্ষার জন্য তিনি নানা রকম ধাঁধার-খাঁচা (puzzle-boxes) তৈরি করেন। এ-জাতীয় খাঁচার মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত সরল সেগুলিতে ব্যবস্থা ছিল, খাঁচার ভিতরকার একটি দড়িতে টান দিলেই খাঁচার দরজা খুলে যাবে। (এছাড়াও তিনি অবশ্য আরো নানা রকম এবং অপেক্ষাকৃত জটিল খাঁচা ব্যবহার করেছিলেন ; কিন্তু আপাতত সবচেয়ে সরল খাঁচা নিয়েই তাঁর পরীক্ষার পরিচয় দেখা যাক।) এ-জাতীয় খাঁচার মধ্যে ক্ষুধার্ত বেড়ালকে বন্ধ করে রাখা হল এবং খাঁচার সামনে রাখা হল একটুকরো মাছ—ভিতর থেকে খাঁচা খুলে বেরুতে পারলে বেড়াল ওই মাছ 'পুরস্কার' পাবে। এই অবস্থায় ক্ষুধার্ত বেড়াল খাঁচা থেকে বাইরে বেরুবার জন্য নানা রকম এলোমেলো চেষ্টা করতে থাকে : খাঁচার গায়ে আঁচড়ানো-কামড়ানো, খাঁচা থেকে থাবা বা মুখ বার করবার চেষ্টা ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-জাতীয় এলোমেলো বহু চেষ্টা চলতে চলতে খাঁচা-খোলার দড়িতে টান পড়ে খাঁচার দরজা হঠাৎ খুলে যায়। অর্থাৎ, বেড়াল অনেক রকম ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবেই খাঁচা খোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।

একই বেড়াল নিয়ে বারবার এই একই পরীক্ষা করতে করতে থর্ণডাইক্ দেখলেন, প্রত্যেক পরবর্তী পরীক্ষায় বেড়ালটির ভুলভ্রান্তিমূলক এলোমেলো ক্রিয়া-

কর্মের সংখ্যা (অনিয়মিতভাবে হলেও মোটের উপর) ক্রমশই কমে আসছে এবং তার পক্ষে খাঁচা খোলবার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও কমে আসছে। এবং এইভাবে ভুলভ্রান্তির সংখ্যা এবং দরজা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বেড়ালটি আর ভুলভ্রান্তি করছে না—সরাসরি লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছে। অর্থাৎ, বলা যায়, বেড়ালটি খাঁচার দরজা খুলে লক্ষ্যে পৌঁছুতে শিখলো।

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। একই বেড়াল নিয়ে বারবার পরীক্ষা করে থর্ণডাইক্ দেখলেন, মোট ২৪ বার পরীক্ষার পর বেড়ালটি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে শিখলো। প্রথমবারের পরীক্ষায় দরজা খুলতে বেড়ালটির সময় লেগেছিল মোট ১৬০ সেকেণ্ড, দ্বিতীয়বার ৩০ সেকেণ্ড, তৃতীয়বার ৯০ সেকেণ্ড,—এইভাবে পরপর ৬০, ১৫, ২৮, ২০, ৩০, ২২, ১১, ১৫, ২০, ১২, ১০, ১৪, ১০, ৮, ৮, ৫, ১০, ৮, ৬, ৬, ৭ সেকেণ্ড। অর্থাৎ, (অনিয়মিতভাবে হলেও মোটের উপর) লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সময় ক্রমশই স্পষ্টভাবে কমে যাচ্ছে।

৩ ॥ 'শিক্ষার নিয়ম' সংক্রান্ত থর্ণডাইকের মত (Throndike's Laws of Learning)

ইঁদুর, বেড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু নিয়ে এ-জাতীয় বহু পরীক্ষার উপর নির্ভর করে থর্ণডাইক্ শিক্ষার স্বরূপ সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে-সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষা হল অন্ধ প্রয়াস ও ভুলভ্রান্তির পদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে উদ্দীপক ও প্রতিবেদনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন : Learning is the establishment of bonds between stimulus and response and it follows a mechanical process of blind trial and error. যেমন, উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখা যায়, বেড়ালটি বাস্তব পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোনরকম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না-দিয়েই যন্ত্র-চালিতের মতো অন্ধ প্রয়াস ও ভুলভ্রান্তি করে চলেছে; এইভাবে অগ্রসর হতে হতে ক্রমশই তার আচরণ থেকে ব্যর্থতামূলক—অতএব অপ্রীতিকর— প্রয়াসগুলির প্রভাব মুছে যায় (stamped out) এবং সাফল্যমণ্ডিত—অতএব প্রীতিকর—প্রয়াস-গুলির প্রভাব স্থায়ী হয় (stamped in); এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার আচরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিবেদনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে—যেমন, বেড়ালটি খাঁচা-খোলার দড়িতে (উদ্দীপক) ঠিকমতো টান দিতে (প্রতিবেদন) পারে।

শিক্ষা সংক্রান্ত এই মতবাদের ব্যাখ্যায় থর্ণডাইক্ তিনটি মূল বা প্রধান নিয়ম প্রস্তাব করেছেন। এগুলিকেই থর্ণডাইক্-প্রস্তাবিত শিক্ষার নিয়ম (Throndike's

Laws of Learning) বলা হয়। নিয়মগুলি হল : (১) ফল-সূত্র (Law of Effect), (২) অনুশীলন-সূত্র (Law of Exercise) এবং (৩) প্রস্তুতি-সূত্র (Law of Readiness)। অবশ্য এছাড়াও তিনি কয়েকটি গৌণ (Secondary) নিয়মের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথমে প্রধান বা মূল নিয়মগুলির পরিচয় দেখা যাক।

১। **ফল-সূত্র (Law of Effect) :** ক্ষুধার্ত বেড়াল লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য এলোমেলোভাবে নানা রকম চেষ্টা করে চলেছে—অর্থাৎ, তার আচরণে নানা রকম উদ্দীপকের প্রতি নানা রকম প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে। এই রকম এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে সে লক্ষ্যে পৌছুলো ; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দীপক-প্রতিবেদনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাফল্যমণ্ডিত হল। যে-সব উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাফল্যমণ্ডিত হয়নি সেগুলি তার কাছে অপ্রীতিকর ; পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেটি তার কাছে প্রীতিকর। অপ্রীতিকর বলেই বিফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনের প্রভাব তার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—অর্থাৎ, তার আচরণ থেকে এগুলির প্রভাব মুছে যায়। অপরপক্ষে, প্রীতিকর বলেই যে উদ্দীপক-প্রতিবেদনটি সাফল্যমণ্ডিত হয় সেটির প্রভাব গভীর বা স্থায়ী হয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ফলপ্রসূ উদ্দীপক-প্রতিবেদন তার আচরণে গভীর রেখাপাত করে ; নিষ্ফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনের প্রভাব তার আচরণ থেকে মুছে যায়।

২। **অনুশীলন-সূত্র (Law of Exercise) :** নানা রকম উদ্দীপকের সঙ্গে নানা রকম প্রতিবেদনের সম্পর্কের মধ্যে যে-নির্দিষ্ট উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক সম্পর্ক যত বেশি বার—এবং যতো বেশিক্ষণ ও বেশি তীব্রভাবে—ঘটে সেই নির্দিষ্ট উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক সম্পর্কের পক্ষেই স্থায়ী হবার প্রবণতা থাকে। বেড়ালটি যদি মাত্র একবারই নানা রকম এলোমেলো প্রয়াস এবং ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করে খাঁচা খুলতে পারতো তাহলে অবশ্য সে খাঁচা-খোলার কৌশল আয়ত্ত করতে বা শিক্ষা করতে পারতো না। কিন্তু বারবার তাকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এবং এই জাতীয় বহুবার পরীক্ষা প্রসঙ্গে নানা রকম নিষ্ফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক আচরণের তুলনায় খাঁচা-খোলা সংক্রান্ত সার্থক উদ্দীপক-প্রতিবেদনটিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এবং এই পুনরাবৃত্তির পরিণামেই আলোচ্য উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য প্রতিবেদনের সম্পর্ক তুলনায় দৃঢ় হয়েছে।

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, এই অনুশীলন-সূত্র এবং পূর্বোক্ত ফল-সূত্র পরস্পরের সহায়ক। কেননা, সাফল্যমণ্ডিত উদ্দীপক-প্রতিবেদনেরই পুনরাবৃত্তির-প্রবণতা থাকে ;

পক্ষান্তরে নিষ্ফল—অতএব অপ্রীতিকর—উদ্দীপক-প্রতিবেদনের পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা থাকে না। অর্থাৎ, সফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনেরই অনুশীলন স্বাভাবিক; নিষ্ফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনের অনুশীলন স্বাভাবিক নয়।

থর্ণডাইক্ এই অনুশীলন-সূত্রর ব্যাখ্যায় আরো দু'টি উপনীতির উল্লেখ করেন। যথা: (ক) সাম্প্রতিকতা-সূত্র (Law of Recency) এবং (খ) তীব্রতা-সূত্র (Law of Vividness or Intensity)। যে উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সম্পর্ক সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে সেটির পক্ষেই পুনরাবৃত্তির প্রবণতা বর্তমান—এই হল সাম্প্রতিকতা-সূত্রর মূলকথা। আর তীব্রতা-সূত্রর মূলকথা হল, উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ প্রভৃতি তুলনায় তীব্র উদ্দীপকের সঙ্গেই সাফল্যসূচক প্রতিবেদনের সম্পর্ক স্থাপিত হবার প্রবণতা বর্তমান—অর্থাৎ, এ-জাতীয় উদ্দীপকের সঙ্গেই আলোচ্য প্রতিবেদনের সম্পর্ক পুনঃপুনঃ ঘটার সম্ভাবনা বর্তমান।

৩। **প্রস্তুতি-সূত্র (Law of Readiness):** থর্ণডাইক্ বলছেন, শিক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হল প্রস্তুতি (Readiness)। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে বেড়ালটি ক্ষুধার্ত বলেই খাঁচা খুলে বাইরে এসে মাছ পাবার জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করছে এবং এইভাবে নানা রকম এলোমেলো চেষ্টা করতে করতেই শেষ পর্যন্ত খাঁচা খুলতে শিখছে। অর্থাৎ, বেড়ালটির মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের যোগাযোগ ঘটিয়ে ফললাভ করবার একরকম প্রস্তুতি বর্তমান; কোন লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এ-জাতীয় প্রস্তুতি আছে বলেই তার পক্ষে উক্ত উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সংযোগ অমন প্রীতিকর হয়, উক্ত উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সংযোগ ঘটাতে না-পারা অপ্রীতিকর হয়। অতএব, প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও শিক্ষালাভ সহজসাধ্য হয় না। অবশ্যই এই প্রস্তুতি বলতে থর্ণডাইক্ স্নায়ুতন্ত্রেরই কোন একরকম আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত তিনটি মূল বা প্রধান নিয়ম ছাড়াও থর্ণডাইক্ শিক্ষা-সংক্রান্ত আরো পাঁচটি গৌণ নিয়মের উল্লেখ করেছেন। যথা:

(১) একই বাহ্য অবস্থা বা উদ্দীপকের প্রতি বিবিধ প্রতিবেদন সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Multiple Response to the same External Situation)। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে বেড়ালটির কাছে উদ্দীপক বলতে একই খাদ্যবস্তু; কিন্তু এই উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদন একই রকমের নয়—খাঁচার গায়ে আঁচড়ে-কামড়ে নানাভাবে সে এই একই উদ্দীপকের প্রতি নানা রকম প্রতিবেদনের পরিচয় দিচ্ছে।

(২) প্রতিবিন্যাস, পূর্বপ্রস্তুতি এবং মেজাজ সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Attitude, Set and Disposition) : যেমন, ক্ষুধার্ত বেড়ালটির নির্দিষ্ট প্রতিবিন্যাস (Attitude), পূর্বপ্রস্তুতি (Set) এবং মেজাজের (Disposition) দরুনই সে সামনের মাছের টুকরোটি লাভ করার জন্য—অতএব খাঁচার দরজা খোলার জন্য—অমন অস্থির হয়।

(৩) আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম (Law of Partial Activity) : অর্থাৎ, শিক্ষার একটি নিয়ম হল কোন সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের প্রতি বেশি সক্রিয় হওয়া। যে-বেড়াল অনেকগুলি খাঁচা খুলে বাইরে এসে খাদ্যলাভ করতে পেরেছে তাকে একটা নূতন খাঁচায় পুরে দিলে দেখা যাবে যে খাঁচাটির নানা রকম বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সামগ্রিক গড়নটির মধ্যে বিশেষ করে দরজা-খোলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাটুকুর প্রতি বেড়ালটি তুলনায় বেশি মনোযোগী হচ্ছে।

(৪) তুলনা বা উপমান সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Assimilation or Analogy) : শিক্ষায় অগ্রগতির ফলে সমজাতীয় বস্তুদের সমজাতীয় হিসাবে গ্রহণ করার বা সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে গ্রহণ করার পরিচয় দেখা যায়।

(৫) আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের নিয়ম (Law of Associated Shifting) : অর্থাৎ, একটি পরিস্থিতির সঙ্গে অপর কোন পরিস্থিতি সম্পর্কিত হলে প্রথম পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া ক্রমশ দ্বিতীয়টির প্রতিও যেন সংক্রমিত হয়।

৪ ॥ শিক্ষা সংক্রান্ত গেস্টাণ্ট মত (Gestault Theory of Learning)

শিক্ষা সংক্রান্ত থর্ণডাইকের মতবাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালে গেস্টাণ্টবাদীরা বিশেষ আপত্তি তোলেন। এই আপত্তির মূল কথা হল, থর্ণডাইক্ শিক্ষা-পদ্ধতির যে-যান্ত্রিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। থর্ণডাইক্ দাবি করেছেন, যন্ত্রের মত অন্ধ প্রয়াস ও ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করেই শিক্ষালাভ করতে হয় এবং শিক্ষার মূল রহস্য হল দৈহিক বা স্নায়ুতন্ত্রমূলক ; কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। পক্ষান্তরে গেস্টাণ্টবাদীরা দাবি করেন, শিক্ষার মূল রহস্য হল পরিজ্ঞান (insight)—অর্থাৎ, সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং সে-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বোধ বা অন্তর্দৃষ্টি। অবশ্যই গেস্টাণ্টবাদীরাও একথা অস্বীকার করেন না যে শিক্ষা প্রসঙ্গে অনেক সময় ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু তাঁদের মতে ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে এগুলেও অকস্মাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একরকমের অন্তর্দৃষ্টির উদয় হয় এবং শিক্ষা বলতে

প্রকৃতপক্ষে এই অন্তর্দৃষ্টিই বোঝায়। এবং এ-জাতীয় অন্তর্দৃষ্টির উদয় হলে অকস্মাৎ ভাবেই পূর্ববর্তী ভুলভ্রান্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়। অতএব, শিক্ষা বলতে অন্ধ প্রয়াস ও ভুলভ্রান্তির যান্ত্রিক পরিণাম বোঝায় না—সমগ্র পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোন একরকম দ্রুত ও এককালীন অন্তর্দৃষ্টি বোঝায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত এই মতের সমর্থনে গেস্টাল্টবাদীরাও জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষার নজির দেখান। এ-জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কোয়েলার (Kohler) পরিচালিত কয়েকটি পরীক্ষা। আফ্রিকার ক্যানারি দ্বীপে তিনি সিম্‌পাঞ্জীদের নিয়ে কয়েক রকম পরীক্ষা করেন। তিনি দাবি করেন যে সিম্‌পাঞ্জীদের আচরণ পরিদর্শন করলে বোঝা যায় আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টি উদয়ের ফলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল চেষ্টাবলীর অবসান ঘটে। যেমন: একটি সিম্‌পাঞ্জী তার নাগালের বাইরে রাখা খাবার পাড়বার জন্য অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম চেষ্টা করতে করতে হয়রান হচ্ছিল। কিন্তু সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলো তার সামনেই যে-লাঠিটা পড়ে রয়েছে তার সাহায্যে খাবার পেড়ে নেওয়া সম্ভব। অতএব, সে বৃথা চেষ্টাব হয়রানি বন্ধ করে লাঠিটি দিয়ে খাবার পেড়ে নিতে শিখলো। কিংবা, আর একটি সিম্‌পাঞ্জীর সামনে অনেক উঁচুতে কলার কাঁদি ঝুলছিল; সিম্‌পাঞ্জী ছোট ছোট দুটো লাঠির টুকরোর সাহায্যে কলা পাড়বার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলো, লাঠি দুটো জোড়া দিয়ে লম্বা করে নিলে অনায়াসেই কলার নাগাল পাওয়া যায়। এ-জাতীয় আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টিই গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষার মূল রহস্য।

আমরা ইতিপূর্বে সাধারণভাবে গেস্টাল্টবাদের মূলসূত্রগুলি আলোচনা করেছি। এখানে তাঁদের শিক্ষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে।

গেস্টাল্টবাদীদের শিক্ষাতত্ত্ব সম্প্রতিকালে অনেকের কাছে সমাদৃত হলেও অন্যেরা এর মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনুভব করেছেন। বিশেষত মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে তাঁরা যে-ভাবে আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টির উদয় কল্পনা করেন তা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতীত হয় না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা-পদ্ধতির স্নায়ুতন্ত্রমূলক ভিত্তি (neurological basis) গেস্টাল্টবাদীদের আলোচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। অথচ শিক্ষা-পদ্ধতিকে স্নায়ুতন্ত্রেরই উচ্চতর প্রক্রিয়া (higher nervous activity) হিসাবে বোঝবার আয়োজনই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথ হওয়া উচিত। এই পথ পরিত্যাগ করে গেস্টাল্টবাদীরা শিক্ষা-পদ্ধতিকে মোটের উপর কোন একরকম বিশুদ্ধ মানসক্রিয়া বলেই কল্পনা করেছেন। ফলে তাঁদের আলোচনা অনেকাংশে ভাবালু (sentimental) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অনেক সময়ই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাহিত্য-জাতীয় বা কবিকল্পনা-জাতীয়ই। অবশ্যই তাঁরাও জীবজন্তু নিয়ে নানা

রকম পরীক্ষার নজির দেখান। কিন্তু সেই পরীক্ষালব্ধ বাস্তব তথ্যগুলির ব্যাখ্যা বা প্রকৃত তাৎপর্য সংক্রান্ত মতান্তরের অবকাশ আছে।

৫ ॥ শিক্ষা ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Learning and Conditioned Reflex)

শিক্ষার ব্যাখ্যায় থর্ণডাইকের সিদ্ধান্তগুলি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হোক-আর-নাই-হোক অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনিই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃৎ। এবং তাঁর গবেষণার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শিক্ষা-পদ্ধতির শারীরিক বা স্নায়ুতন্ত্রমূলক ভিত্তিটিই আবিষ্কারের প্রয়াস করেন। থর্ণডাইকের পর আর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মোটের উপর একই পথ অনুসরণ করে শিক্ষা-সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করেছে। এই আবিষ্কারকে 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' (Conditioned Reflex) আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত করেন, শিক্ষা বলতে মূলতই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বোঝায়।

'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত'র আলোচনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব, আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে সে-আলোচনার প্রয়াস করবো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

(Conditioned Reflex)

১॥ পাভ্‌লভের গবেষণা (Pavlov's Investigations)

রুশ বিজ্ঞানী পাভ্‌লভ্ (Pavlov) কর্মজীবনের প্রথমার্ধে পচনতন্ত্র (Digestive System) সংক্রান্ত গবেষণা করে এ-যুগের একজন অগ্রণী শরীরবিজ্ঞানী (Physiologist) হিসাবে সম্মানিত হন। সেই গবেষণা প্রসঙ্গেই কয়েকটি ঘটনা তাঁর কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে প্রতীত হয় এবং প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে এ-জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা অন্বেষণে অগ্রসর হয়েই তিনি 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' সংক্রান্ত মতবাদে (Theory of Conditioned Reflex) উপনীত হন। প্রথমে ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক।

চোয়ালের কাছে অবস্থিত লালাগ্রন্থিগুলি (Salivary Glands) থেকে লালা উৎপন্ন হয়। লালা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তার মধ্যে বিবিধ উপাদান বর্তমান। যথা : জল (water), শ্লেষ্মা (mucous)। লালাতে জলের ভাগ প্রধান হলে তাকে বলা হয় জলীয় লালা (Watery Saliva), শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকলে বলা হয় শ্লৈষ্মিক লালা (Mucous Saliva)।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রতিযোজনের পক্ষে লালাগ্রন্থিগুলির কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুখের মধ্যে লালার সরবরাহ না-হলে শুকনো ও শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম করে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। খাবারটিকে গেলবার মতো নরম অবস্থায় পরিণত করার জন্য লালার জলভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়; গলাধঃকরণের নালি দিয়ে খাবারকে পাকস্থলীর দিকে পাঠাবার জন্য (for the passage of the food through the oesophagus) লালার শ্লেষ্মাভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রতিযোজনের পক্ষে লালাগ্রন্থিগুলির কাজ কতো নিখুঁত তা কয়েকটি সুবিদিত ঘটনা থেকেই অনায়াসে বোঝা যায়। কুকুরের মুখে শক্ত ও শুকনো খাবার দিলে মুখের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লালার সরবরাহ হয়; সে-লালায় জলীয় উপাদান এবং শ্লৈষ্মিক উপাদান দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। ফলে কুকুরের পক্ষে শক্ত ও শুকনো খাবার নরম করে এবং গিলে খাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু মুখের মধ্যে কোন অম্ল বা

অ্যাসিড্ (Acid) দ্রব্য দিলে অস্বস্তিকর অবস্থার (Irritation) সৃষ্টি হয় ; তখন প্রয়োজন হয় উক্ত দ্রব্য মুখ থেকে ধুয়ে ফেলা ; তার জন্য অবশ্যই শ্লৈষ্মিক লালার প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন শুধু জলীয় লালার। এবং দেখা যায় এ-অবস্থায় মুখের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শুধু জলীয় লালারই সরবরাহ হয়। কিংবা, কুকুরের মুখে খাবারের বদলে পাথরের নুড়ি দিলে দেখা যায়, মুখের মধ্যে একটুও লালার সরবরাহ হচ্ছে না, কিংবা হয়ত বড় জোর দু-এক ফোঁটা মাত্র লালা আসে। এ-অবস্থায় নুড়ি-গুলি চিবিয়ে গেলার প্রশ্ন ওঠে না ; সমস্যা শুধু নুড়িগুলি মুখ থেকে বার করে ফেলে দেওয়া এবং তার জন্য লালার দরকার পড়ে না। পাথরের নুড়ির বদলে মুখের মধ্যে এক থাবা বালি দিলেও অবশ্য একই সমস্যা ; অর্থাৎ বালিগুলো মুখ থেকে বের করে ফেলে দেবার সমস্যা। কিন্তু তার জন্য জলীয় পদার্থ দিয়ে মুখের ভিতরটা ধুয়ে ফেলা দরকার ; অর্থাৎ দরকার হয় জলীয় লালার। এবং দেখা যায় এ-অবস্থায় কুকুরের মুখের মধ্যে বাস্তবিকই পর্যাপ্ত পরিমাণে জলীয় লালারই সরবরাহ হচ্ছে।

লালাগ্রন্থিগুলি দ্বারা প্রতিযোজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এ-জাতীয় কার্যাবলী কী করে সম্পাদিত হয় ? প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex Action) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই প্রশ্নটির উত্তরের ইংগিত পেয়েছি। খাদ্যবস্তু প্রভৃতির সংস্পর্শে এলে মুখের মধ্যে অবস্থিত গ্রাহকগুলিতে (Receptors) নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় ; অন্তর্মুখী স্নায়ু দিয়ে সেই স্নায়বিক শক্তি স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্রে পরিচালিত হয় ; তারই প্রত্যুত্তরে স্নায়ুতন্ত্রর কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী স্নায়ু দিয়ে লালাগ্রন্থি পর্যন্ত পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি, অতএব লালাগ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় নির্দিষ্ট উদ্দীপক-জনিত নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সাধক নির্দিষ্ট ধরনের লালা। জীবজগতে ক্রমবিকাশের ফলে উন্নততর প্রতিযোজনের জন্য উন্নততর প্রাণীদেহে এ জাতীয় নানা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরিচয় দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ, দেখা দিয়েছে নির্দিষ্ট অন্তর্মুখী স্নায়ুর সঙ্গে নির্দিষ্ট বহির্মুখী স্নায়ুর যোগাযোগ। তারই ফলে উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য এবং গ্রাহকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় : মুখে শুকনো আর শক্ত খাবার গেলে লালাগ্রন্থিগুলি থেকে জলীয় এবং শ্লৈষ্মিক লালার সরবরাহ হয়, মুখে অ্যাসিড্-দ্রব্য বা ধুলোবালি গেলে সরবরাহ হয় জলীয় লালার, মুখে পাথরের নুড়ি গেলে লালা সরবরাহ হয় না।

উন্নততর প্রাণীর দৃষ্টান্তে এ-জাতীয় যে-সব সাধারণ বা স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি অবশ্যই আর কোন সর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। মুখে শক্ত আর শুকনো খাবার এলেই লালা কাটবে ; এক্ষেত্রে লালা কাটা আর কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। পাভ্‌লভ্ এগুলির আখ্যা

দিয়েছেন 'নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত' (Unconditioned Reflex)। নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের পক্ষে স্বাভাবিক বা প্রাসঙ্গিক বা অপরিহার্য উদ্দীপক সুনির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে তারই প্রত্যুত্তরে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে। অতএব, দেখা যাচ্ছে তার লক্ষণ হিসাবে বিশেষ করে দু'টি কথা মনে রাখা দরকার। এক : সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদনের জন্য উদ্দীপক হিসাবে বস্তুর সুনির্দিষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্য। যেমন, মুখে লালা কাটার জন্য খাদ্যবস্তুর শুষ্কত্ব ও কাঠিন্য। দুই : সুনির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই জাতীয় উদ্দীপক গ্রহণ। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে উদ্দীপকটি গৃহীত হচ্ছে মুখের ভিতরকার ইন্দ্রিয় দ্বারাই—চোখ নয়, কান নয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয় নয়।

কিন্তু পাভ্‌লভ্‌ লক্ষ্য করলেন, এ-ছাড়া অন্যভাবেও লালাগ্রন্থির একই সক্রিয়তা পরিদৃষ্ট হতে পারে। বর্তমানে এ-জাতীয় শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যাক। খাবারের পাত্র দেখলেও কুকুরের মুখে লালা কাটে। ঘটনাটির বৈশিষ্ট্য কী? প্রথমত, এখানে উদ্দীপক বলতে লালা কাটার পক্ষে প্রাসঙ্গিক খাবারেরই কোন অনিবার্য বৈশিষ্ট্য নয়। তার বদলে এ-উদ্দীপক হল দৃশ্য (Visual)। দ্বিতীয়ত, এখানে লালা কাটার পক্ষে প্রাসঙ্গিক গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্দীপকটি গৃহীত হচ্ছে না। তার পরিবর্তে উদ্দীপকটি গৃহীত হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ইন্দ্রিয় দ্বারা। যথা : চোখ। সাধারণভাবে খাবারের পাত্র নামের দৃশ্য উদ্দীপকের সঙ্গে লালা কাটার কোন সম্পর্ক নেই ; যে-কোন কুকুরকে যে-কোন অবস্থায় শুধু এই খাবারের পাত্রটি প্রদর্শন করলে তার মুখে লালা কাটবে না। কিন্তু যে-কুকুরকে বারবার এই খাবারের পাত্রেই খাবার দেওয়া হয়েছে তাকে শুধু খাবারের পাত্রটি প্রদর্শন করলেই তার মুখে লালা কাটে। অর্থাৎ, এখানে প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট সর্তের উপর নির্ভরশীল। পাভ্‌লভ্‌ এ-জাতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নাম দিয়েছেন, 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' (Conditioned Reflex)।

'নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত'-র (Unconditioned Reflex) দৃষ্টান্তে উদ্দীপকটিকেও বলা হয় 'নিরপেক্ষ উদ্দীপক' (Unconditioned Stimulus)। এ-জাতীয় উদ্দীপক কোন পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত'-র (Conditioned Reflex) উদ্দীপকটিকে বলা হয় 'সাপেক্ষ উদ্দীপক' (Conditioned Stimulus)। কেননা, এই উদ্দীপক পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে, খাবারের পাত্রের দৃশ্য উদ্দীপকটি তার নিজ গুণে বা স্বকীয় বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দরুন লালা-উৎপাদনের কারণ হয় না। একমাত্র পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভর করেই তা হওয়া সম্ভব। সর্তটি হল : বারবার এই একই পাত্রে কুকুরটিকে খাবার দেওয়া। অর্থাৎ, খাদ্য-উদ্দীপকের সঙ্গে এই দৃশ্য উদ্দীপকের বারবার সহাবস্থান। 'নিরপেক্ষ

উদ্দীপকটির' সঙ্গে বারবার 'সাপেক্ষ উদ্দীপকটি' একত্রে থাকলে প্রথমাবস্থায় যদিও শুধুমাত্র 'সাপেক্ষ উদ্দীপক'টির দরুন আলোচ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে না তবুও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শুধুমাত্র এই 'সাপেক্ষ উদ্দীপক'টির দরুনই আলোচ্য প্রতিক্রিয়া ঘটছে। একই কারণে, 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত'র দৃষ্টান্তে প্রতিক্রিয়াটিকেও 'সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া' (Conditioned Response) বলা হয়, যেমন 'নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত'র দৃষ্টান্তে প্রতিক্রিয়াটিকেও 'নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া' (Unconditioned Response) বলা হয়।

এই পরিভাষা মনে রেখে এবার আমরা 'নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত' এবং 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত'র মধ্যে পার্থক্য দেখতে পারি :

নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত

নিরপেক্ষ উদ্দীপক———>নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

[নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রাসঙ্গিক উদ্দীপক]

[স্বাভাবিকভাবে প্রাসঙ্গিক উদ্দীপকেব প্রত্যুত্তবে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া]

দৃষ্টান্ত

মুখে খাদ্যদ্রব্য → লালা-উৎপাদন

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

নিরপেক্ষ উদ্দীপক ——> নিবপেক্ষ প্রতিক্রিয়া
+
সাপেক্ষ উদ্দীপক

[কিন্তু এই ঘটনা বহুবার ঘটার পর]

শুধুমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক——> সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

[অর্থাৎ, একই প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এখন তা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে]

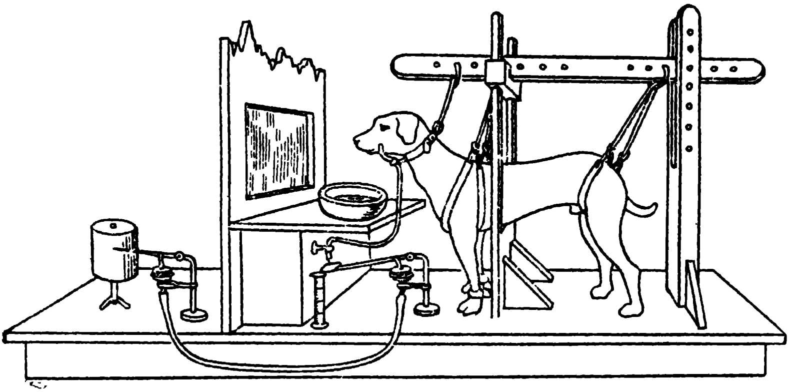
মুখে খাদ্যদ্রব্য ——> লালা-উৎপাদন
+
চোখে খাদ্য-পাত্র

[কিন্তু এই ঘটনা বারবার ঘটার পর]

শুধুমাত্র চোখে খাদ্য-পাত্র———>লালা-উৎপাদন]

২ ॥ পাভ্‌লভের পরীক্ষা (Pavlov's Experiments)

প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভ্‌লভ্‌ সিদ্ধান্ত করেন : যে-কোন নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের পক্ষে পৃথিবীর প্রায় যে-কোন উদ্দীপকই এইভাবে 'সাপেক্ষ উদ্দীপক' হিসাবে পরিণত হতে পারে। এখানে পাভ্‌লভের পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক।



কুকুরের চোয়ালের কাছে অপরেসন্‌ করে তার লালাগ্রন্থির সঙ্গে কাচের নল লাগিয়ে দেওয়া হল—এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হল যাতে লালাগ্রন্থিতে উৎপন্ন লালাটুকু মুখের ভিতর চলে না-গিয়ে কাচের নল দিয়ে বাইরে চলে আসে। কাচের নলের মধ্যে ঠিক কতটুকু বা ক'ফোঁটা লালা আসছে তা মাপবার জন্যেও নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হল—এই নলের মধ্যে কতটুকু লালা আসছে তা ছবিতে আঁকা সবচেয়ে বাঁদিকের ড্রামটির গায়ে চিহ্ন পড়া থেকে বোঝা যাবে। কুকুরের মুখের সামনের বাটিতে তাকে খাদ্য দেবার ব্যবস্থা। অবশ্য এই ছবিতে বর্ণিত ব্যবস্থা পাভ্‌লভের পরীক্ষার প্রথম দিককার পর্যায়ের পরিচায়ক। পরে তিনি পরীক্ষা-ব্যবস্থা আরো নিখুঁত করেন। সে-ব্যবস্থা অনুসারে কুকুরটিকে সম্পূর্ণ শব্দহীন কক্ষে রেখে পাশের কক্ষ থেকে যন্ত্রমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে কুকুরটির কাছে উদ্দীপক দেবার আয়োজন করা হয়—এই জাতীয় আয়োজনের ফলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ উদ্দীপক নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ নিখুঁত ব্যবস্থা থাকে যাতে পরীক্ষার সময় আলোচ্য উদ্দীপকের সঙ্গে অপর কোন উদ্দীপকের কোনরকম সম্পর্ক না থাকে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পরিচালিত বহু পরীক্ষার মধ্যে নমুনা হিসাবে এক পরীক্ষার পরিচয় দেখা যাক। লালা-উৎপাদনের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক হ

খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু উদ্দীপক হিসাবে শব্দতরঙ্গর সঙ্গে প্রতিবেদন হিসাবে লালা-উৎপাদনের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। পাভ্‌লভ্‌ উদ্দীপক হিসাবে 'খাদ্যবস্তু এবং একটি নির্দিষ্ট শব্দতরঙ্গ' (যথা : প্রতি সেকেণ্ডে ৬৩৭'৫ কম্পন) ব্যবহার করলেন। তিনি দেখলেন :

প্রথমবার শুধু এই শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হিসাবে এক ফোঁটাও লালা-উৎপাদন হল না।

৯ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাদ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হল ১৮ ফোঁটা লালা

১৫ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাদ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৩০ ফোঁটা লালা

৩১ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাদ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৬৫ ফোঁটা লালা

৪১ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাদ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৬৭ ফোঁটা লালা

৫১ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাদ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দতরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৬৯ ফোঁটা লালা

অতএব এই পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লালা-উৎপাদনের পক্ষে শব্দতরঙ্গটি শুরুতে অবান্তর হলেও ক্রমশ তা 'সাপেক্ষ উদ্দীপক'-এ পরিণত হচ্ছে।

একই জাতীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভ্‌লভ্‌ দেখান যে কুকুরের লালা-উৎপাদন নামের প্রতিক্রিয়াটির জন্য দৃশ্য, শ্রৌত, ঘ্রাণজ, স্পর্শজ—বহুবিধ উদ্দীপকই 'সাপেক্ষ উদ্দীপকে' পরিণত হতে পারে। ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন, এ-জাতীয় প্রতিটি দৃষ্টান্তে চক্ষু, কর্ণ, নাক, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লালা-উৎপাদক যন্ত্রের একরকম 'সাময়িক স্নায়ুপথ' (temporary nerve-path) প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু তাই নয়। প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভ্‌লভ্‌ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' বলে ঘটনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতো সহজ বা সরল বলে মনে হোক-না-কেন, অনেক ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জটিলও হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, তিনি দাবি করেন, আমরা চলতি কথায় যে-সব ঘটনাকে মানসিক আখ্যা দিয়ে থাকি তা সবই শেষ পর্যন্ত জটিল 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর এই দাবির সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার দীর্ঘবিস্তৃত হতে বাধ্য। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে শুধু এইটুকু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাঁর পথ অনুসরণ করে—'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' পদ্ধতির উপর নির্ভর করে—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন।